শান্তিময় গুহ
তপোবিজয় ঘোষ
দীপংকর চক্রবর্তী
নীলাদ্রিশেখর বসু
শুভ মিত্র
হিমাদ্রি মিত্র
ও
উৎপল মুখোপাধ্যায়ের
স্মৃতির উদ্দেশে

রচনাক্রম

বাংলার নবজাগরণের বিভিন্ন দিক নিয়ে নানা প্রথিতযশা ব্যক্তি গবেষণামূলক অনেক কাজ করেছেন। নবজাগরণের সময়কালের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক বিষয়ে কিছু মূল্যবান লেখাও প্রকাশিত হয়েছে। কেউ কেউ এই সময়ের ইতিহাস নিয়ে গবেষণার কাজও করেছেন। কিন্তু নবজাগৃতির প্রাণপুরুষরা এই সমগ্র সময়ে নিজেদের কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে দেশ ও মানুষের প্রতি যে মূল্যবান অবদান রেখেছিলেন, তার আনুপূর্বিক বিবরণ কোনো একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস সম্ভবত এই প্রথম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীব্যাপী নবচেতনার বিভিন্ন কর্ম-উদ্যোগ বঙ্গসমাজকে যেভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল, তা এখনো সকলের কাছে উপস্থিত করা যায় নি—এ কথা আজকের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। ইতালীর নবজাগরণ বা ফরাসী দেশের চিন্তার জগতে বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বঙ্গদেশের শিক্ষিত মহলে ওই সময়ে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। আর এরই অভিঘাতে বাংলার সমাজজীবনে এক বিরাট ঢেউ আছড়ে পড়েছিল।

ইতালী বা ফরাসী দেশে শিল্পবিপ্লব-উত্তর শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক অবস্থান এবং তাদের ওপর শোষণের মাত্রা নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছে। তাদের ন্যায্য পাওনার প্রশ্নকে সামনে রেখে সমগ্র সমাজ আন্দোলিত হয়েছে। তারই পরিণতিতে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আহ্বানে শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে মানুষের সমাবেশ সম্ভব হয়েছিল। সমাজ জীবন নিয়ে এ ধরনের মৌলিক চিন্তার ফলশ্রুতিতে এই বোধের জন্ম হয়েছিল যে, সমগ্র ইউরোপ জুড়ে সমাজবদ্ধ মানুষ মানে শুধু কলকারখানার মালিক বা জমির মালিক—এটা বোঝায় না। সমাজের তলানিতে পড়ে থাকা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মানুষও যে মানুষ, এই সত্যটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমগ্র সমাজ নিয়ে চিন্তার খোরাকও উপস্থিত হয়েছিল। আবার ইংলণ্ডের চার্টিস্ট আন্দোলন শ্রমজীবী মানুষের অধিকারবোধকে জাগ্রত করে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশে যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল, তার প্রভাবও ছিল সুদূরপ্রসারী।

ঠিক শিল্পবিপ্লব-উত্তর ইউরোপের সামাজিক অবস্থানের প্রতিচ্ছবি না হলেও, ভূস্বামীর সামাজিক অত্যাচার ও কৃষকের দৈন্যদশা ঘোচানোর প্রয়াস নিয়ে নবজাগরণের

ব্যক্তিত্বের অনেকেই বঙ্গদেশের সংস্কৃতি চেতনার মাত্রা বৃদ্ধি করতে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা পালন করেছেন। সামন্তবাদী সমাজের কু-আচার, অশিক্ষা, যুক্তিহীন কার্যাবলী কূপমণ্ডূক চিন্তা, ধর্মান্ধতার নাগপাশ থেকে সমাজকে মুক্ত করতে নিরলসভাবে সমাজবেত্তাদের নির্দেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সমাজসংস্কারের কাজে নবজাগরণের মহান পুরুষদের ভূমিকা সত্যিই আমাদের দেশের এক অনন্য বিরল ঘটনা।

তৎকালীন সমাজের কৌলীন্য প্রথার যূপকাষ্ঠে বন্দী নারীর অসহায়তার বিলোপ ঘটাতে, ব্রাহ্মণের ছায়া মাড়ালে মহাপাতক হবার অনৈতিক সমাজবিধান রোধ করতে, কুলনারীর শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে, তথাকথিত ধর্মভিত্তিক ছোঁয়াছুঁয়ি ও অস্পৃশ্যতার বিলোপ ঘটাতে, যে ঐকান্তিক কর্মপ্রয়াস অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাসে বিধৃত রয়েছে, তা আজও আমাদের অনুপ্রেরণা দেয়।

ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গলের সমাজে অবিচার অনাচার-বিরোধী কীর্তি এবং যুক্তিশীল বক্তব্য আজও আমাদের অমূল্য সম্পদ। রামমোহনের সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার প্রচেষ্টা বা বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ চালু ও বহুবিবাহরোধ, শিবনাথ শাস্ত্রীর পৌত্তলিকতা বিরোধী যুক্তিবাদী কর্মকাণ্ড তৎকালীন সময়ে সংঘটিত না হলে আমাদের সমাজ আজকের চেতনায় উন্নীত হোত কিনা সন্দেহ আছে।

সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও শিক্ষা প্রসারে নব ধারা গড়ে তুলতে অগাস্টাস হিকি, উইলিয়াম কেরী, ডেভিড হেয়ার, লালন ফকির, লর্ড বেথুন, আলেকজাণ্ডার ডাফ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, পাদ্রী লঙ, অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, হরিশ মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, গিরিশ ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মীর মশাররফ হোসেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবীর অবদানও অবিস্মরণীয়।

লালবিহারী দে তাঁর 'বাংলার চাষী' বইতে কৃষকের জীবনের সুখদুঃখ যেভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেছিলেন, তা কোনোদিন ভোলার নয়।

আমাদের চিন্তা-চেতনা-ভাবনায় যাঁকে কোনোদিন আমরা ভুলতে পারব না, যাঁর কীর্তির ছটা সারা বিশ্বে বিচ্ছুরিত হয়েছে—সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে বেশি কিছু উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না।

নবজাগরণের আন্দোলনের পুরো অধ্যায়কে বিভিন্ন লেখকের রচনার মাধ্যমে একটি পুস্তকের মধ্যে বিধৃত করার যে প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। আশা করা যায়, নবজাগৃতি অধ্যায়ের প্রাণপুরুষদের নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা এই গ্রন্থটি একটি আকর-গ্রন্থ হিসাবে পাঠকসমাজে সমাদৃত হবে।

□ বিমান বসু

বাঙ্গালী সমাজে আধুনিক কালের সূচনা হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে পলাশীর প্রান্তরে দেশের স্বাধীনতা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে। জাতির ইতিহাসে এ এক মর্মান্তিক পরিহাস। তার আগে প্রায় তেরশো বছর ব্যাপী সামন্ত ব্যবস্থা পূর্ণ জীবৎকাল অতিক্রম করে অন্তিম দশা প্রাপ্ত হয়েছিল। ইংরেজ বেনিয়ার মানদণ্ডের রাজদণ্ডে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এদেশে পুঁজিবাদের সূচনা হলেও কিংবা রাজনৈতিক চালচিত্রে অনেক মৌলিক পরিবর্তন ঘটলেও, আজ পর্যন্ত পঙ্গু বিকলাঙ্গ সামন্তব্যবস্থার ভূত আমাদের কাঁধ থেকে সম্পূর্ণ নামেনি। ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত জেলার সমাজ প্রধানত দুটি শ্রেণীধারায় বিন্যস্ত ছিল – রাজশাসক, সেনা ও আমলা, সামন্তপ্রভু, ধর্মীয় সমাজপতি প্রভৃতি নিয়ে পরশ্রমজীবী শোষকশ্রেণী একদিকে এবং অপর দিকে কৃষক ও কারিগরদের নিয়ে শোষিত বঞ্চিত উৎপাদক শ্রেণী। খণ্ড বিচ্ছিন্ন দ্রোহ-বিদ্রোহ ঘটলেও অবচেতন শ্রেণীদ্বন্দ্ব বিকাশের উপযুক্ত সুযোগ লাভ করেনি।

ইংরেজ-পূর্ব কালেও বাঙ্গালী সমাজ বার বার বিদেশী শক্তির পদানত হয়েছে, কিন্তু মানসিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে কখনো পরাভব স্বীকার করেনি, কেননা কোনো বিদেশী শক্তিই সভ্যতার বিচারে তেমন উন্নত ছিল না। ফলে তারা গণভিত্তি তৈরি করতে সমর্থ হয়নি। তাই শাসক শ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিশৃঙ্খলা, লুণ্ঠনবৃত্তির দ্বারা মার খাওয়া দর্শক হওয়া ছাড়া তাদের বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না।

১৭০৭ সালে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে এই বিশৃঙ্খলা ক্রমশ চরম রূপ ধারণ করে। আচার্য যদুনাথ সরকার এই সময়ের সুন্দর বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন: "ক্লাইভ যখন নবাবের উপর আঘাত হানে তখন দেখা যায় মোঘল সভ্যতা তার সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ভাল কিছু করার সামর্থ্য তখন আর তার নেই এবং তার অস্তিত্ব নগণ্য, দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা তখন নৈরাশ্যজনকভাবে অসৎ ও অথর্ব শাসকশ্রেণীর দ্বারা চরম দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা ও নৈতিক অধঃপতনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। জড়বুদ্ধি লম্পটেরা তখন সিংহাসনে বসেছে; আলিবর্দির পরিবার মানুষ নামের যোগ্য কোন পুত্র জন্ম দিতে পারেনি, আর সে পরিবারে মেয়েরা ছিল পুরুষদের চেয়েও বেশী অধঃপতিতা। ধর্মকামী সিরাজ ও মিরাণের অত্যাচারে দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রজারাও সর্বদা সন্ত্রাসের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। সেনাবাহিনী বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে হতে একেবারে অকেজো ও অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছিল। রাজদরবার ও অভিজাত শ্রেণীর বিপুল

অনাচার ও লাম্পট্যের ফলে সাধারণ পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা হয়েছিল বিপন্ন এবং রাজদরবার ও অভিজাতবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত ইন্দ্রিয় উদ্দীপক সাহিত্য তাতে যুগিয়েছিল ইন্ধন। ধর্ম তখন পরিণত হয়েছিল সর্বপ্রকার পাপ ও অনাচারের রক্ষা-কবচে।" (যদুনাথ সরকার—দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খন্ড)

স্বভাবতই রাজতন্ত্র তথা প্রশাসনের প্রতি মানুষের আস্থা সম্পূর্ণ শিথিল হয়ে গেছে। এমনকি সামন্তপ্রভুরাও রাজতন্ত্রের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পরস্পর ষড়যন্ত্রে নিজেদের বিজড়িত করে ফেলেছিল, এ যেন অন্ধকার যুগের সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিষ্ঠান সহজ হয়ে গিয়েছিল। আর সেক্ষেত্রে সহযোগী ভূমিকা পালন করেছিল তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজের উদীয়মান অংশ, যারা ইংরেজ-ফরাসী-ওলন্দাজ প্রভৃতি বিদেশী বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা ও চাকরি সূত্রে একটি নতুন শ্রেণী হিসাবে গড়ে উঠেছিল। অপর দিকে দেশের স্বাধীনতা মোঘলদের হারেম থেকে ইংরেজ কারাগারে যখন বন্দী হল, তখন জনগণ নিরাসক্ত, নীরব দর্শকমাত্র। তাদের কাছে পলাশীর যুদ্ধের পরাজয় শুধুই রাজাবদল, ঐতিহাসিক বিবরণ এর সাক্ষ্য দেবে: "পলাশীর প্রান্তরের প্রহসনের পর বিজয়োদ্ধত ক্লাইভ যখন মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেছিলেন তখন মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গের প্রতি অপেক্ষমান অসংখ্য জনতা শুধু মুগ্ধ ভীত বিস্ময়ে চাহিয়াছিল, কোনরূপ বাক্‌নিষ্পত্তি পর্যন্ত করে নাই। ক্লাইভ পার্লামেন্টারি কমিটিতে সাক্ষ্যদানকালে সগর্বে বলিয়াছিলেন, লক্ষ লক্ষ লোক দাঁড়িয়ে দেখছিল সে ঘটনা, ইউরোপীয়দের ধ্বংস করার কোন ইচ্ছা যদি তাদের থাকত তাহলে লাঠি এবং ঢিলের সাহায্যেই তারা তা করতে পারত।" ইংরেজদের ক্ষমতাদখলকে তাই জনসাধারণ খানিকটা বোধ হয় খুশি মনেই নিয়েছিল।

ইংরেজ উপনিবেশিক সমাজে আপাত শৃঙ্খলা কিছুটা ফিরে এল, উন্মুক্ত পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোয় কিছুটা দৃষ্টি উন্মোচন, কিছুটা ধন্দও দেখা দিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ইংরেজ অর্থনীতির সাহচর্য যাঁরা পেলেন ক্রমশ তাঁরা একটি মধ্যবর্তী শ্রেণীরূপে গড়ে উঠলেন। ইংরেজ শোষণের অংশভাগী এই শ্রেণীর আচরণ সদর্থক এবং নঞর্থক, উভয় ধারাতেই উনবিংশ শতাব্দীতে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। এ যুগের যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ খুবই দুরূহ কাজ। কেননা হিন্দু কি মুসলমান সাধারণ মানুষ ইংরেজ-পূর্ব প্রায় সাতশো বছরের মুসলমান শাসনকে স্বদেশীয় শাসন বলে ভাবতে পারেনি, ফলে নিজেদের স্বাধীন বলেও অনুভব করেনি। বখতিয়ার খিলজি থেকে মিরজাফরের পোষ্যপুত্র নাজিমদ্দৌল্লা পর্যন্ত যে শাসক বাংলায় ছিল, তার মধ্যে বাঙ্গালী মুসলমানের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। নবাব-আমীর-সুবাদার থেকে নায়েব-বক্‌সি-জমিদার-তালুকদার-আমিন-আমলা-কাজী সম্বলিত যে প্রশাসন, তার প্রায় সম্পূর্ণই বিদেশী বিভাষী তুর্কী, পাঠান, মোঘল, পারসিকদের দ্বারা পরিবৃত ছিল।

বাংলার সনাতন গ্রামসমাজের ওপর গড়ে ওঠা ভূ-স্বামীরাও নিষ্পিষ্ট হয়েছে

এইসব বিদেশী শাসকদের চাপে, তাই ভূস্বামীদের বিদ্রোহ বারবার ঘটেছে এবং সাধারণ কৃষক সমাজ এই বিদ্রোহকেই স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে বিবেচিত করে নিজেদের যুক্ত করেছে। যদিও অষ্টাদশ শতক থেকে কিছু পরিবর্তনও দেখা দিয়েছে। মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে নবাবরা বাঙ্গালীদের মধ্য থেকে ইজারাদার নিয়োগ শুরু করেছিল, কারণ নিজেদের উচ্চপদস্থদের বিশ্বাস করতে পারছিল না। আর সেকালের সমাজ-পরিস্থিতিতে বাঙ্গালী মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যেহেতু শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাদপদ ছিল প্রশাসনে স্থান পেয়েছিল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যরা। প্রশাসনে প্রবেশ করেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী এইসব রাজপুরুষেরা ক্ষমতা ও সম্পদবৃদ্ধি করে জমিদারে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এই সব হিন্দু জমিদাররা বিদেশী, বিভাষী শাসকদের প্রতি পুরোপুরি তুষ্ট ছিল না, বরং অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তনও কামনা করেছে। তাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে হিন্দু জমিদারদের সখ্যভাব দ্রুত গড়ে ওঠে এবং ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা করে তারা প্রচুর বিত্তশালী হয়ে ওঠে। এই মুৎসুদ্দি শ্রেণীর কাছে প্রথম দিকে পরাধীনতার বিষয়টি গৌণ হয়ে যায়। "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর এই হঠাৎ বড়লোকেরা জমিদারিতে পুঁজি খাটিয়ে নিজ নিজ পরিবারের জন্য স্থায়ী অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরী করতে তৎপর হয়।" ১৮৩৫ সালে বেন্টিঙ্কের আমলে যে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, তার লক্ষ্য হিসাবে মেকলের মিনিটস্-এ বলা হয় : "এখন আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এমন একটা শ্রেণী গড়ে তোলার জন্য যে শ্রেণীর লোকেরা হবে আমাদের ও আমরা যে কোটি কোটি লোককে শাসন করছি সেই শাসিতের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানকারী ; এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত লোকেরা হবে রক্তে ও রঙে ভারতীয় আর রুচিতে, মতে, নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ।" তাই বলা যায়, ইংরেজ রাজত্বে ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত ছিল শ্বেতকায় শাসকেরা আর সর্বনিম্নে ছিল বিপুল জনগণ—কৃষক, কারিগর ও শ্রমিক আর বাঙ্গালী জমিদার, চাকুরীজীবী ও ব্যবসায়ী-মহাজনদের অবস্থান ছিল এই দুই স্তরের মধ্যবর্তী। যদিও অর্থনৈতিক স্তর-বিন্যাসে এরা ছিল উচ্চশ্রেণীভুক্ত।

২

ইংরেজ শাসনের প্রতি কৃতজ্ঞ এই মধ্যবর্তী শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে প্রথম দিকে ইংরেজের সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে চায়নি। বরং ইংরেজের প্রশাসনিক ও উন্নত শিক্ষা সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহের সাহায্য গ্রহণ করে একাংশ সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়, সামাজিক রীতিনীতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিলোপ ও আধুনিক যুগের সূচনা ও বিকাশ ঘটতে থাকে। এরই মধ্যে ব্যবহারিক প্রয়োজনে সৃষ্টি হল বাংলা গদ্যের।

সম্প্রতি যে আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি, তা প্রধানত এই মধ্যবর্তী শ্রেণীর অবদান এবং এর সুফল সমাজের সর্বাংশের মানুষের ওপরই বর্তেছে। ইদানিং কোনো কোনো সমাজ-ঐতিহাসিক এই সাহিত্য সংস্কৃতিকে একান্তভাবে মধ্যশ্রেণীর, সমগ্র বাঙ্গালীর নয় বলে ভ্রান্ত মূল্যায়ন করেছেন। এঁরা ভুলে যান, ইতিহাসের ধারায় কোনো একটি যুগান্তরে যে পরিবর্তনগুলি সূচিত হয় তার ফলশ্রুতি সামাজিক স্তর পরম্পরায় ছড়িয়ে যেতে বাধ্য। বিশেষ করে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটা পঙ্গু পাণ্ডুর জাতিকে উজ্জীবিত করার সংগ্রাম এক ধরনের জাতীয়তাবোধ, উন্নত রুচি এবং স্বার্থ-দ্বন্দ্বও সৃষ্টি করেছিল ধীরে ধীরে। কার্ল মার্কস বলেছেন : "যে সব জাতি পূর্বে ভারতবর্ষে অভিযান করেছে তাদের মধ্যে ব্রিটিশদের সভ্যতাই ছিল ভারতীয় সভ্যতার চাইতে উন্নত। ব্রিটিশরা ভারতীয় গ্রাম্যসমাজের ভিত ভেঙ্গে দিয়েছে, শিল্পবাণিজ্য উচ্ছেদ করেছে এবং ভারতীয় সভ্যতার যা কিছু মহৎ ও গৌরবের বস্তু তা সমস্তই প্রায় ধ্বংস করেছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি এই ধ্বংসের কাহিনীতে কলঙ্কিত। বিরাট এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নবজাগরণের আলোকরশ্মি প্রবেশ করতে পারে না। তাহলেও স্বীকার করতেই হবে, ভারতের নবজাগরণ শুরু হয়েছে।" (ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল)

ব্রিটিশ ধনতন্ত্র প্রাচীন ভারতীয় সামন্তব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে অধিক মুনাফার অনুকূল বাস্তব অবস্থার সৃষ্টিতে নিয়োজিত ছিল। এরও একটা ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ভারতীয় সমাজে প্রতিফলিত হয়েছিল। কার্ল মার্কসের ভাষায় : "ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণী যা করতে বাধ্য হবে তাতে জনসাধারণের সামাজিক দুরবস্থার বাস্তব উন্নতি বা মুক্তি সম্ভব হতে পারে না। তার জন্য অর্থনৈতিক উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন এবং শুধু বৃদ্ধিও নয়, সেই উৎপাদন শক্তি জনসাধারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তাহলেও ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণী যা করতে বাধ্য হবে তাতে আর কিছু না হোক, এই উন্নতিতে মুক্তি ও শক্তি বৃদ্ধির বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হবেই। ইতিহাসে কোথাও কি বুর্জোয়াশ্রেণী এর চাইতে বেশি কিছু করতে পেরেছে ?" অন্যত্র মার্কস আরো সুন্দরভাবে বলেছেন : "এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, রেলপথ ভারতীয় শ্রমশিল্পযুগের অগ্রদূত··· রেলপথ বিস্তারের জন্য যে সব আধুনিক শ্রমশিল্পের বিকাশ হবে তার আঘাতে ভারতের অগ্রগতির পথের অন্তরায়গুলি একে একে দূর হয়ে যাবে, ভারতের বর্ণ গোঁড়ামি, গ্রাম্যসমাজের জড়তা, কূপমণ্ডুকবৃত্তি সব ভেঙ্গে যাবে।" মার্কসের এই ভবিষ্যদ্বাণী অনেকাংশে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলার প্রাণকেন্দ্র মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর এখানকার আধুনিক যুগের সূচনা কলকাতা ও গঙ্গার দুই ধারের নতুন গড়ে ওঠা শিল্পাঞ্চল থেকেই ঘটতে লাগল। হঠাৎ ধনীদের ঐশ্বর্যের আলোয় শহর কলকাতা উদ্ভাসিত হয়ে

ওঠে, পরিণত হয় বিলাস ভূমিতে। সামাজিক প্রয়োজনে আগমন হয় বিরাট সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের। তখনো নতুন কালের সাংস্কৃতিক ভাবনা দানা বেঁধে ওঠেনি। ফলে মধ্য যুগের কাহিনী-কাব্যের যুগাবসানে কবিগান, আখড়াই, হাফ আখড়াই, খেউড়, তরজা ইত্যাদির একটি ধারা দেখা দেয় যা কবিগানের ধারারূপে পরিচিত। উনিশ শতকের প্রথম তিন দশক পর্যন্ত এই ধারা জীবন্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায়ও সেই সমাজসত্য উন্মাটিত হয়েছে : "...ইংরাজের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলাকায়ন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস-আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল ? তখন নূতন রাজধানীতে নূতন সমৃদ্ধশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।

কবির দল তাহাদের সেই অভাব পূর্ণ করিতে আসরে অবতীর্ণ হইল। তাহারা পূর্ববর্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে চটক মিশাইয়া তাহাদের ছন্দোবন্ধ সৌন্দর্য সমস্ত ভাঙিয়া নিতান্ত সুলভ করিয়া দিয়া, অত্যন্ত লঘু সুরে উচ্চৈঃস্বরে চারি জোড়া ঢোল ও চারিখানি কাঁসি-সহযোগে সদলে সবলে চিৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। কেবল গান শুনিবার এবং ভাবরস সম্ভোগ করিবার যে সুখ তাহাতেই তখনকার সভ্যগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাহার মধ্যে লড়াই এবং হার-জিতের উত্তেজনা থাকা আবশ্যক ছিল। সরস্বতীর বীণার তারেও ঝন ঝন শব্দে ঝংকার দিতে হইবে, আবার বীণার কাষ্ঠদণ্ড লইয়াও ঠক ঠক শব্দে লাঠি খেলিতে হইবে। নূতন হঠাৎ-রাজার মনোরঞ্জনার্থে এই এক অপূর্ব নূতন ব্যাপারের সৃষ্টি হইল।" (লোকসাহিত্য)

সমকালেই অনুরূপ আর একটি ধারার উদ্ভব হয় যাকে, 'মুসলমানী বাংলা ভাষা'র কাব্য বলা হয়ে থাকে। "বিদেশাগত মুসলমান শাসকগোষ্ঠী ঘরে তুর্কী, দপ্তরে ফারসী, মসজিদে আরবী এবং সামাজিক ব্যবহারে আরবী-তুর্কী-ফারসী মিশ্রিত হিন্দুস্থানী ভাষা ব্যবহার করতেন।" নবাবী আমলে কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি নগর বন্দর অঞ্চলে রাজকর্মচারী সিপাই, ব্যবসায়ী প্রভৃতি নানা পেশার অবাঙ্গালী লোক বাস্তব কারণে বাংলাভাষী মানুষের সংস্পর্শে এসে নিজেদের মাতৃভাষা কথোপকথনের থেকে বিকৃত করে এক "খোট্টাভাষার" জন্ম দিল। এই মিশ্রভাষার প্রচলন বাংলাভাষী একাংশের মধ্যে ঘটেছিল, যার ফলে "মুসলমানী বাংলা ভাষা" তৈরি হয়ে গেল। এই দোভাষী রীতিতে প্রচুর সংখ্যক মুসলিম বীরগাথা, পীরপাঁচালী, প্রণয় কাহিনী, নবী ও আউলিয়া উপাখ্যান রচিত হয়। বাঙ্গালীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় এই কবিগান বা মুসলমানী বাংলা কাব্যের অবদান একেবারে সামান্য নয়।

ইংরেজ পুঁজিপতি শ্রেণীর একাধিপত্য ও ঔপনিবেশিক শোষণনীতির ফলে বাঙ্গালী বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বাভাবিক বিকাশ ঘটা সম্ভব ছিল না। অপর দিকে ব্যক্তিগত ভূমিস্বত্ব-ভোগী খাজনা আদায়কারী জমির সঙ্গে সম্পর্কহীন নতুন জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারে গ্রামীণ অর্থনীতির সংকটও বৃদ্ধি পেতে থাকল। শহর ও গ্রামের দূরত্ব বৃদ্ধি পেল, সামগ্রিক অর্থনৈতিক সংকটও তীব্র হল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী ও মধ্যবর্তী বুদ্ধিজীবী অংশের মধ্যে সৃজনশীলতা ও প্রাণশক্তির জোয়ার সৃষ্টি হয়। "এই গতিশীলতা ও প্রাণশক্তির জোরেই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলন উত্থান পতনের বন্ধুর পথে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে, নতুন মনীষা গঠন কুশলী সমাজ-সংস্কার ও সৃষ্টিশীল সাহিত্যশিল্প প্রতিভার বিকাশ হয়েছে।" (বিনয় ঘোষ)

৩

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল তার রেনেশাঁস নামকরণের সূত্রপাত সম্ভবত এই শতাব্দীর চল্লিশের দশকে। নামকরণের সময়ে ইউরোপের পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস নিশ্চয়ই স্মরণে রাখা হয়েছিল। প্রগতি লেখক সংঘ, ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ প্রভৃতি সংস্কৃতি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ইতিহাস বিচারের যে নতুন চেতনার জন্ম হয়েছিল, তা থেকেই এই আখ্যাটির উদ্ভব ও জনপ্রিয়তা এমনতর বিশ্বাসের উপযুক্ত ভিত্তি আছে। আদি রেনেশাঁসের সঙ্গে বাংলার নবজাগরণের তুলনা অনেকটাই ভাবাবেগ-প্রসূত, উভয়ের মধ্যে পটভূমির মিল ছিল না। পশ্চিমী রেনেশাঁস ঘটেছিল ইউরোপের স্বাধীন দেশগুলিতে, ইতালি পরাধীন হয় আন্দোলনের অবসানের কালে। ধর্ম বিপ্লব, সমাজ কাঠামোর ভাঙ্গন, বাণিজ্য কৃষি ও শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল পশ্চিম ইউরোপে। প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের মধ্যে তৎকালীন আধুনিক মন প্রশান্ত হতে চেয়েছিল। বাংলার নবজাগরণ এসেছিল উপনিবেশের সীমাবদ্ধ ও শৃঙ্খলিত পরিস্থিতিতে। এর মধ্যে স্বতস্ফূর্ততা ও আমূল পরিবর্তনের সুযোগ ছিলই না। উপরন্তু বাংলার নবজাগরণের প্রেরণা এসেছিল প্রধানত পশ্চিম থেকে, অতীত ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে নয়। বাংলার নবজাগরণের অতিরঞ্জন যেমন বাঞ্ছনীয় নয়, তেমনি বাস্তবতাবর্জিত অস্বীকৃতি বা অবমূল্যায়নও অনুচিত। সীমাবদ্ধতা ইউরোপীয় রেনেশাঁসেরও ছিল। পুনরুজ্জীবনের নামে অন্ধতা এবং অভিজাত ও সাধারণের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য সেখানেও তো ছিল।

তবে একটা দেশে চিন্তার জাগরণ যখন ঘটে, তখন তা কখনো একমুখী হয় না। বিশেষ করে ভারতের মতো একটি দেশে যেখানে নিরেট আঁধারের মধ্যে পশ্চিমী বিজ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক চিন্তা চেতনার আলোর ঝলকানি এসে পড়ল সেখানে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ

স্বাভাবিক। কিন্তু তর্ক-বিতর্ক, ভেদাভেদ, পরস্পর বিরোধিতা ঠিক পথ অন্বেষণে সহায়তাই করে। বাংলার নবজাগরণেও অনিবার্যভাবে ছিল এই অন্তর্বিরোধ। এই বিরোধ মূলত দুটি ধারার মধ্যে—পশ্চিমী দৃষ্টি ও প্রাচ্যাভিমান। এই দুটি ধারার জাগরণের অগ্রপথিকদের সুস্পষ্টভাবে ভাগ করা যাবে এমন নয়। একই ব্যক্তি বা একই ধারার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে পরস্পরবিরোধী ঝোঁক সহজেই লক্ষ্য করা যাবে। বঙ্গদর্শনের যুগে যাঁরা পশ্চিমী আদর্শের জয়গান করেছিলেন, তাঁরাই যখন প্রাচীন প্রাচ্য আদর্শের অনুগামী হয়ে পড়লেন, তখন রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছিলেন :

তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
ভেঙেছ মাটির আল
তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে
উজান স্রোতের কাল।

জীবনের নানা পালাবদলে রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই পরস্পর-বিরোধিতা থেকে মুক্ত ছিলেন না।

পশ্চিমী ধারার সুস্পষ্ট প্রকাশ সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ও শিক্ষা প্রসার পরিকল্পনায়। প্রাচ্যাভিমানীদের ধারাটিও যে সব সময়ে পশ্চিমী শিক্ষাদর্শের বিরুদ্ধে বা সমস্ত রকম সামাজিক কুপ্রথার সমর্থনে ছিল, তা নয়। বিদেশীদের সাহায্যে আইনের পথে সমাজ সংস্কারে অনেকের আপত্তি ছিল, তাঁরা কিন্তু জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইংরেজের আইনের বিরুদ্ধে ছিলেন না। রামমোহন-বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারের পক্ষে যে যুক্তিজাল রচনা করেছিলেন, তার আশ্রয় ভারতীয় শাস্ত্র হলেও তাঁরা প্রেরণা ও আদর্শ পেয়েছিলেন অবশ্যই পাশ্চাত্য থেকে। সমাজ সংস্কার, যুক্তিবাদ, আধুনিক মানবতাবাদ প্রভৃতি নবজাগরণের উপাদানগুলি পশ্চিমেরই অবদান।

পাশাপাশি প্রাচ্যাভিমানী ধারাটির প্রধান অবলম্বন ছিল প্রাচীন ঐতিহ্য স্মৃতি-মন্থন। আর যে প্রাচীন গৌরবের দিকে উনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবী বা মধ্যশ্রেণীর দৃষ্টি পড়েছিল তা হিন্দুত্বের গৌরব, ভারতীয়ত্বের গৌরব নয়। ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু, তাই ইংরেজ আন্দোলনের ফলে বাধ্য না হলে হিন্দু ভাবাবেগকে বড় একটা আঘাত করতে চায় নি। কিন্তু অ-হিন্দু জনসংখ্যাও তো কম নয়। আর হিন্দু জনসমাজও একীভূত ছিল না। জাতপাত বর্ণ, উচ্চ-নীচ অগণিত স্তরে বিভেদমূলকভাবে বিন্যস্ত ছিল। উনিশ শতকে প্রাচ্যাভিমানীদের একাংশের মধ্যে যে ভক্তিকেন্দ্রিক ভাবোচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছিল, তা বাংলার সমাজে অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু যুক্তি অতিভক্তির বিপরীত পথ। সুতরাং এই ভক্তির প্রাবল্যের বিরুদ্ধে সংস্কারবাদী, যুক্তিবাদীদের প্রবল ভাবেই লড়তে হয়েছিল।

এই উভয় ধারার মধ্যেই বিকৃতিরও অভাব ছিল না। পাশ্চাত্যপন্থীদের একাংশের মধ্যে অনুকরণের মাত্রাধিক প্রবণতা, উচ্ছৃঙ্খলতা—যাকে মধুসূদন, বাবুসভ্যতা বলে

নির্মম কষাঘাত করেছেন। অপর দিকে হিন্দু আচারকে, জ্ঞানহীনতাকে বিজ্ঞানের সমধর্মী করে দেখানোর প্রচেষ্টারও অভাব ছিল না। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধ ও কৌতুক নাট্যে রয়েছে এর শ্লেষাত্মক সমালোচনা। তাঁর একটি উক্তি স্মরণ করা যাক :

"স্পষ্ট মানিতে হয়, শাস্ত্রশাসন সকল কালে সকল স্থানে খাটে না। লোকাচার যদি অভ্রান্ত হইত, তবে পৃথিবীতে এত বিপ্লব ঘটিত না।···আমাদের কি নিজের কোনো শক্তি নাই। আমাদের সমাজে যদি কোনো দোষের সঞ্চার হয়···তবে তাহা দূর করিতে গেলে কি আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, বহু প্রাচীনকালে তাহার কোনো নিষেধ-বিধি ছিল কিনা।···দোষও কি প্রাচীন হইলে পূজ্য হয়।···আমাদের জীবন্ত মনুষ্যত্বের উপরে নিয়মের পর নিয়ম পাষাণ ইষ্টকের ন্যায় স্তরে স্তরে গাঁথিয়া তুলিয়া একটি দেশব্যাপী অপূর্ব প্রকাণ্ড কারাপুরী নির্মাণ করা হইয়াছে।···মানসিক আন্দোলনই হিন্দু সমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা আশঙ্কার কারণ।···নূতন জ্ঞান, নূতন আদর্শ, নূতন সন্দেহ, নূতন বিশ্বাস জাহাজ বোঝাই হইয়া এদেশে আসিয়া পেঁাছিতেছে।···ইংরেজী শিক্ষাতে কেবলমাত্র যতটুকু কেরাণীগিরির সহায়তা করিবে ততটুকু আমরা গ্রহণ করিব, বাকিটুকু আমাদের অন্তরে প্রবেশ লাভ করিবে না। এও কি কখনও সম্ভব হয়।" (সমুদ্রযাত্রা)

জড়শক্তি ও সমাজসংস্কার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথেরই অন্য দুটি উক্তি প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় উদ্ধৃত করা যেতে পারে : "জড়ের নিকট হইতে পলায়ন পূর্বক তপোবনে মনুষ্যত্বের মুক্তিসাধন না করিয়া জড়কেই ক্রীতদাস করিয়া ভৃত্যশালায় পুষিয়া রাখিলে এবং মনুষ্যকেই এই প্রকৃতির প্রাসাদে রাজারূপে অভিষিক্ত করিলে আর তো মানুষের অবমাননা থাকে না।" অন্যত্র : "যাহারা মনুষ্য প্রকৃতিকে ক্ষুদ্র ঐক্য হইতে মুক্তি দিয়া বিপুল বিস্তারের দিকে লইয়া যায় তাহারা অনেক অশান্তি অনেক বিঘ্নবিপদ সহ্য করে, বিপ্লবের রণক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদিগকে অশ্রান্ত সংগ্রাম করিতে হয়—কিন্তু তাহারাই পৃথিবীর মধ্যে বীর এবং তাহারা যুদ্ধে পতিত হইলেও অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে।" (পঞ্চভূতের ডায়ারি)

নবজাগরণের এমন আদর্শ ও বিপ্লবী মূর্তি রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিদ্যাসাগরের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের অসামান্য মন্তব্য : "পল্লী আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালী জীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতি প্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে, করুণার অশ্রুজল পূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে (তিনি) আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন···বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন।···তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে নির্বাসন-ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না।···এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন।"

নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ প্রতিমূর্তি রবীন্দ্রনাথ, কেননা তিনিই আন্তরিকভাবে বুঝেছিলেন অখণ্ড ভারতীয়ত্তাকে। ভারত বা বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, ঐক্যবদ্ধ ভারতের সমস্যা তিনি সরলভাবেই তুলে ধরেছিলেন। একই সঙ্গে জনসাধারণের সাথে শিক্ষিত মধ্য শ্রেণীর ব্যবধান দূর করাও যে জরুরী তাও তিনি অনুভব করেছিলেন, অন্যথায় জাগরণ ব্যর্থ হবে। তাঁর ভাষায় : "চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশী পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু কোনোমতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না। যে রাজপ্রাসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি। ভারতবর্ষের এই দুই প্রধান ভাগকে এক রাষ্ট্রসম্মিলনের মধ্যে বাঁধিবার জন্য যে-ত্যাগ, যে-সহিষ্ণুতা, যে-সতর্কতা ও আত্মদমন আবশ্যক তাহা আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। জনসমাজের সহিত শিক্ষিত সমাজের নানা প্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।" (পাবনা অভিভাষণ)

প্রাচ্যাভিমান বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বেশ প্রতিষ্ঠিতই ছিল, কিন্তু দেশের প্রধান গতি পশ্চিমী সভ্যতার দিকেই। এর স্বীকৃতি রয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবন সায়াহ্নের মূল্যায়নেও : "বর্তমান যুগের চিত্তের জ্যোতি পশ্চিম দিগন্ত থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে মানব ইতিহাসের সমস্ত আকাশ জুড়ে উদ্ভাসিত···প্রাচীন পাণ্ডিত্যের অন্ধ অনুবর্তনায় সে আপনাকে ভোলাতে চায় নি।···য়ুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণ বিধির সার্বভৌমিকতা, আর এক দিকে ন্যায় অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্র বাক্যের নির্দেশে, কোনো চির প্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না।"

(কালান্তর)

সভ্যতার সংকটে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদী পশ্চিমী শক্তিকে তীব্র কষাঘাত করেও রবীন্দ্রনাথ চিন্তা চেতনায় পশ্চিমের অবদানকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন।

৪

বাংলার নবজাগরণের প্রসঙ্গটি আর একটু তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে তিনটি ভাগ পরিলক্ষিত হয়। ডিরোজিও-ডেভিড হেয়ার-বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার-হরিশ প্রমুখের চিন্তাধারা ও সংস্কার আন্দোলন, রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-কেশব সেনের মধ্যপন্থী চিন্তাধারা ও সংস্কার আন্দোলন এবং রাধাকান্ত-ভবানীচরণ-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ প্রমুখের রক্ষণশীল চিন্তাধারা ও সংস্কার আন্দোলন। তৃতীয় ভাগে বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের মধ্যে নব্য হিন্দু আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয়তাবাদ যুক্ত হওয়ায় এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও

কোনো কোনো বিষয়ে ইতিবাচক দিক অস্বীকার করা যায় না। অপর দিকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তম্ভ স্বরূপ। তবে সামগ্রিকভাবে সব কটি ধারা সম্পর্কেই বলা যায়, এক দিকে উন্নত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি অতি আকর্ষণ ও শ্রেণীস্বার্থ এবং অপর দিকে সমাজসংস্কার-স্পৃহা ও জাতীয়তাবোধ যে নিয়ত দ্বন্দ্ব বজায় রেখেছিল তার প্রভাব সেকালের প্রায় সমস্ত যুগপুরুষের মধ্যে কম বেশি লক্ষ্য করা যাবে। এই দ্বন্দ্বের স্বাভাবিকতা ও অনিবার্যতা অনুধাবন না করতে পারলে নবজাগৃতির স্রষ্টাদের শ্রেণী সীমাবদ্ধতাই বড় হয়ে দেখা দেবে। মূল্যবোধের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানগুলি যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে তার উত্তরাধিকার থেকে বর্তমানের প্রজন্ম বঞ্চিত হবে, সম্প্রতি গবেষণার নামে একদল সমাজ ঐতিহাসিক বাংলার নবজাগৃতির মূল্যায়ন করতে গিয়ে কৃষক বিদ্রোহগুলির প্রতি সেকালের অধিকাংশ মনীষীর বিরূপতাকে মুখ্য করে তুলে অবমূল্যায়ন করছেন। তাঁরা যুগের ছোট বড় দ্বন্দ্ব ও বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে এক শতাব্দীর ব্যবধানের নিরাপদ অবস্থানে দাঁড়িয়ে বিপ্লবীয়ানার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন। এঁদের ভাবগতিক দেখে মনে হয় একালের কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ মানুষের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যেন এঁদের কত সম্পর্ক! সমাজ বিপ্লব, এমন কি সাধারণ সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন এইসব বুদ্ধিজীবীরা কেন জানি না নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থে তাড়িত হয়ে নবজাগরণের ইতিহাসে কলঙ্ক লেপন করে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য এই কাজ করে চলেছেন।

১৯৫১ সালের সরকারী সেন্সাস রিপোর্টে তৎকালীন সেন্সাস অফিসার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অশোক মিত্র লিখেছেন: "লক্ষ লক্ষ কৃষকের লুণ্ঠিত সম্পদে ধনবান ভূস্বামী শ্রেণীই শহরে লইয়া আসিল সাংস্কৃতিক নবজাগরণ। তাহাদের মুখপাত্র ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, যে শ্রেণীর লোক ইহা হইতে লাভবান হইয়াছিল, তাহারাই আদর করিয়া ইহার নাম দিয়াছিল 'রিনাসান্স'।··· এই জাগরণ আসিয়াছিল প্রধানত শহরের এবং বেন্টিঙ্ক যাহাদের পরজীবী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন সেই ভূস্বামীশ্রেণীর মধ্যেই ইহা ছিল সীমাবদ্ধ, এই মুৎসুদ্দি জমিদার গোষ্ঠীর অন্তরের কামনা ছিল গ্রাম হইতে দূরবর্তী শহরে বসিয়া শাসক গোষ্ঠীর গৌণ অংশীদার হওয়া। ইহা ছিল "রিনাসান্সে"র একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, এবং বৈশিষ্ট্যটি পরিণতি লাভ করিয়াছিল শাসকগোষ্ঠীর সহিত উক্ত পরজীবী জমিদারশ্রেণী ও ইংরেজ বণিকগণের মুৎসুদ্দিদের মৈত্রীর ভিতর দিয়া।···প্রকৃতপক্ষে কতিপয় শহর ব্যতীত বিশাল বঙ্গদেশের কোনো অস্তিত্ব ছিল না এই 'রিনাসান্সের নিকট। কেবল ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের পরে কৃষক বিদ্রোহের এক বিরাট যুগের অবসানে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের বঙ্গীয় ভূমিসংক্রান্ত আইন, ১৮৮০-৮১ খ্রীস্টাব্দের "দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট" এবং ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের "বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন" আবির্ভূত হইবার পরেই কতিপয় গ্রাম শহর রিনাসান্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।" এই উক্তির মধ্যে চমক আছে, অবহেলিত কৃষক

সম্প্রদায়ের জন্য ছদ্ম দরদ আছে, কিন্তু সততা নেই। নিজের শ্রেণীর অবস্থানের দিকে তাকালেই শ্রীমিত্র বুঝতে পারতেন, বিদেশী নবাবদের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা যখন বিদেশী ইংরেজের হাতে চলে এল, তখন মধ্যবর্তী শ্রেণীর সামনে মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি বরং নবাবী আমলের বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তির জন্য স্বস্তির অনুভব দেখা গিয়েছিল। এই একই শ্রেণীবোধ আরো উৎকট রূপে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম শ্রীমিত্রদের মতো সিভিলিয়ানদের মধ্যে, যখন ইংরেজের হাত থেকে ক্ষমতা এল কংগ্রেসের হাতে, ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃষকদের জন্য দরদীরা স্বাধীনতা-উত্তরকালে একই কৃষক দমন নীরবে হজম করলেন, একালের কায়েমী স্বার্থের প্রসাদপুষ্ট বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় সেকালের অনেক বুদ্ধিজীবী কৃষক আন্দোলন সমর্থন করে বরং সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আর ব্রিটিশের ভূমিকা সম্পর্কে শ্রীমিত্র নীরব কেন? চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ইংরেজ স্বার্থই বড় ছিল না কি? শুধু ভূস্বামীরাই শ্রেণী স্বার্থে নবজাগরণ এনেছিল, এই উক্তি কি ইতিহাসসম্মত? নবসৃষ্ট বুর্জোয়াদের ভূমিকা ছিল না? রামমোহন ভূস্বামী ছিলেন—কিন্তু বিদ্যাসাগর, হেয়ার, মধুসূদন, ডিরোজিও, হরিশ, দীনবন্ধু, বঙ্কিম প্রমুখরা কি ভূস্বামী শ্রেণীভুক্ত ছিলেন? একথাও কি ঠিক—নবজাগরণের সমাজ সংস্কার, শিক্ষা-বিস্তার, নারী শিক্ষা, নারী ব্যক্তিত্বের বিকাশ, নীলবিদ্রোহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, তার ফলশ্রুতি গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত কিছুমাত্র পৌঁছয় নি? তাহলে হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, ২৪ পরগণা, বর্ধমান এমনকি উত্তরবঙ্গেও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষ, দেড় শতবর্ষ বয়স হল কি করে? ইংরেজের বিরুদ্ধে নীল বিদ্রোহের নেতৃত্বে বাংলার ভূস্বামীশ্রেণীর একাংশ ছিল না? উভয়ের মধ্যে গাঁটছড়া যেমন ছিল, দ্বন্দ্বও ছিল, আবার শিক্ষা বিস্তারে কিংবা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভূস্বামী শ্রেণীর একাংশ যখন বাধা দিয়েছে, তখন সংস্কার আন্দোলনের প্রধান পুরুষেরা ইংরেজ প্রশাসনের সঙ্গে হাত মিলিয়েও অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছেন। মোটের ওপর পশ্চাদপদ একটা অসাড় সমাজে প্রাণের অধিকার বোধের, গণতন্ত্রের চেতনা জাগ্রত করতে যে সামান্য চেষ্টাটুকু হয়েছে শ্রেণী সীমাবদ্ধতা ও পরাধীনতার পরিবেশে, তার ইতিবাচক মূল্যায়ন খুব শক্ত কাজ। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বসে রুপোর চামচ মুখে দিয়ে বিগত শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহের প্রতি রোমান্স প্রকাশ সহজ কাজ, বাহবাও পাওয়া যায় এবং স্বীয় যুগের দায়িত্ব থেকে আড়ালেও থাকা যায়। স্মরণ রাখা দরকার, সামন্ত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া ব্যবস্থা এখানে গড়ে ওঠেনি, কিন্তু সামন্ত ব্যবস্থার অবক্ষয় ও অন্যায্যতা কালের অভিঘাতে ভূস্বামী শ্রেণীর আলোকপ্রাপ্ত অংশ ধীরে ধীরে অনুভব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন উক্তিতে, শরৎচন্দ্র ও তারাশংকর প্রমুখের লেখায় তার প্রকাশ রয়েছে। নবজাগরণের সার্থকতা এখানেই, তাই নবজাগরণের যথার্থ মূল্যায়ন হল: "ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহের পাশাপাশি রিনাসান্স নামে ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত জমিদার শ্রেণী ও মধ্যশ্রেণীর যে আন্দোলনটি চলিয়াছিল, তাহাও কৃষক বিদ্রোহগুলির মতই তাৎপর্যপূর্ণ।"

বাঙ্গালী সমাজের জাগরণ বা স্বাধীন বিকাশ শাসক ইংরেজ কখনো চায়নি, তা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই বাধ্য হয়েছিল এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বার খানিকটা খুলে দিতে। ফলে ইংরেজ রাজত্বে বাংলার উদীয়মান শ্রেণী পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা সভ্যতার রূপরস গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল, আর এই প্রথম বাঙ্গালী সমাজ বিশ্বদরবারে নিজেদের যুক্ত করতে পারল। বাঙ্গালী মনীষার সঙ্গে ইউরোপীয় প্রজ্ঞার মিলনে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এক জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, যার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তাঁদের মোহ ছিল, নিজস্ব শ্রেণীসীমাবদ্ধতা ছিল, কিন্তু দেশের প্রতি কর্তব্য, নিজের দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি মমতা, আত্মবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্রের বিকাশের জন্য সচেষ্টতা, মানবিক ও সামাজিক অধিকারসমূহের জন্য সংগ্রাম—এসবও ছিল তাঁদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে।

নবজাগরণের বিপুল কর্মকাণ্ডে বাংলার মনীষীরা যে গঠনমূলক কাজগুলি করেছিলেন তার ক্ষেত্র নিম্নরূপ :

(১) **সমাজ সংস্কার-বিষয়ক আন্দোলন**

(ক) সতীদাহ প্রথা নিবারণ
(খ) বিধবা বিবাহ প্রবর্তন
(গ) কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথা নিবারণ
(ঘ) স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তন ও নারীর ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা কামনা
(ঙ) বাল্যবিবাহ প্রথা রদ
(চ) পণপ্রথা ও কন্যা বিক্রয় প্রথা বিলোপ
(ছ) মদ্যপান নিবারণ
(জ) জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা নিরাকরণ
(ঝ) হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা
(ঞ) ইংরেজের অন্ধ অনুকরণের বিরোধিতা

(২) **ধর্ম-বিষয়ক আন্দোলন**

(ক) খ্রীস্টান মিশনারি ও হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব
(খ) সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বী ও ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়
(গ) রক্ষণশীল হিন্দু ও সংস্কারমুক্ত উদারপন্থী হিন্দুদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক
(ঘ) ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মতবিরোধ

(৩) **শিক্ষা-বিষয়ক**

(ক) পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুসারী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন
(খ) শিক্ষার বাহন রূপে মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা
(গ) নারী শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার
(ঘ) শহরের বাইরে গ্রাম গ্রামান্তরে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন
(ঙ) বিজ্ঞান ও মেডিকেল শিক্ষার প্রবর্তন
(চ) মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা
(ছ) বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রচার
(জ) উচ্চ শিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা
(ঝ) শিক্ষা প্রসারে দেশী ও বিদেশী বুদ্ধিজীবী ও সমাজ সংস্কারকদের যৌথ উদ্যোগ

(৪) **রাজনৈতিক আন্দোলন**

(ক) কৃষক বিদ্রোহগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ও বিতর্ক
(খ) জাতীয়তাবোধের উন্মেষ—হিন্দুমেলা, আত্মীয়সভা, ভারতসভা, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি সংগঠন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে আত্মশক্তির উদ্বোধন ও স্বাধীনতা কামনা জাগিয়ে তোলা
(গ) ইলবার্ট বিল, বঙ্গভঙ্গ প্রয়াস ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন
(ঘ) সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের সহকারী হিসেবে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের প্রকাশ ও ভূমিকা গ্রহণ
(ঙ) রাজনৈতিক দল হিসেবে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

(৫) **সাহিত্য-সংস্কৃতি**

(ক) বাংলা গদ্যের সৃষ্টি ও অজস্র বিতর্ক রচনার বাহন হয়ে ওঠা
(খ) নবজাগৃতির চেতনা সমন্বিত নবযুগের মহাকাব্য রচনা
(গ) বাংলা গল্প ও উপন্যাসের সৃষ্টি
(ঘ) বাংলা নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক আন্দোলনের শরিক হয়ে ওঠা
(ঙ) জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত স্বদেশীগান ও কাব্য সঙ্গীতের জোয়ার
(চ) যুগ চেতনার বাহকরূপে যাত্রা ও নাটকের ঐতিহাসিক ভূমিকা
(ছ) বাংলার নিজস্ব চিত্রকলা রীতির উন্মেষ ও বিকাশ
(জ) কথকতা, কবিগান, ছড়া, পাঁচালী, তরজা ইত্যাদি মৌখিক সাহিত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার, স্বদেশী আন্দোলনে ব্যাপক সহায়তা
(ঝ) বাংলা মুদ্রণ ব্যবস্থার সূচনা ও বিকাশ।

একটি শতাব্দীর আধারে এত ব্যাপক বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড সম্ভব হয়েছিল বহুসংখ্যক যুগপুরুষের অবদানে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ বড় সামান্য ঘটনা নয়। বাংলার নবজাগরণের পর্যালোচনায় সাধারণভাবে রামমোহন, ডিরোজিও, মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকটি নাম প্রথম সারিতে এসে যায়। তাঁদের মূল্যায়ন করতেই স্থান সঙ্কুলান হয় না। কিন্তু এই সব অগ্রগণ্য মনীষীর পাশাপাশি আরো অনেক দেশী ও বিদেশী বরণীয় ব্যক্তি এসেছিলেন, যাঁদের অবদান ছাড়া বাংলার নবজাগরণের সাফল্য সম্ভব ছিল না। আলো যেই জ্বালান না কেন, অন্ধকার দূর করা আলোর ধর্ম। তেমনি আলোকিত হওয়াও মানবিক অধিকার। আর সেই অধিকার বোধই জন্ম দেয় আলো ও অন্ধকারের তুলনামূলক দৃষ্টান্ত। এই দ্বন্দ্বই ইতিহাসকে এগিয়ে দেয় প্রগতির পথে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সার্থকতা সেখানেই।

বর্তমান সংকলনে সেইসব জ্যোতিষ্কদের জীবন ও অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যাঁদের মনীষার আলোক-বিচ্ছুরণে নবজাগরণের ছায়াপথ রচিত হয়েছিল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন সূর্যসম মনীষীকে জানাই শেষ কথা নয়, আজকের ইতিহাস ও সংস্কৃতিমনস্ক আধুনিক প্রজন্মকে যথেষ্ট অনুধ্যান সহকারে অনুপুঙ্খভাবে জানতে হবে, বুঝতে হবে সমস্ত স্মরণীয় ব্যক্তিত্বকে, যাঁদের কাছে রয়েছে আমাদের অপরিসীম ঋণ। আত্মবিস্মৃত জাতি বলে বাঙ্গালীর বদনাম দূর করতে এই সঙ্কলন যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

ভারতে সংবাদপত্রের জনক জেমস অগাস্টাস হিকি

....

ভারতে সংবাদপত্রের সূচনা হয়েছিল ১৭৮০ সালে। এই কলকাতা থেকেই প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ হয়েছিল, পলাশীর যুদ্ধের মাত্র বাইশ বছর পরে। আশ্চর্যের কথা পত্রিকাটি জন্মের পরে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রতিবাদী চরিত্র লাভ করেছিল। আইন-কানুন ছাড়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জঙ্গলের পরিবেশে পত্রিকাটি কিভাবে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল সেকথা চিন্তা করলে আশ্চর্য মনে হতে পারে। সম্ভবত এই কারণে যে মানুষ মর্মে মর্মে বুঝেছিল পলাশীর যুদ্ধে ভারতের পরাজয়ের কারণ ছিল বিশ্বাস-ঘাতকতা। ব্রিটিশ শৌর্যের দ্বারা জয়লাভ করে নি, করেছে শঠতা ও দুর্নীতির দ্বারা। সুতরাং হতাশার ঘোর কাটতে মাত্র কয় বছর সময় লেগেছিল, তারপরে জেলায় জেলায় বিদ্রোহের অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠে। ব্রিটিশ বণিকরা কিভাবে রাজশক্তি হয়ে উঠল তার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অনেক মানুষ ছিল। ব্রিটিশের বণিকবৃত্তির কাজে যারা ভারতে এসেছিল তারা সবাই বোম্বেটে ছিল না, কয়েকজন ভাল লোকও তাদের মধ্যে ছিলেন। এরূপ লোকদের মধ্যে একজন জেমস অগাস্টাস হিকি। জাতিতে তিনি ছিলেন আইরিশ। আরো কেউ ছিলেন যাঁরা হেস্টিংসের বিরোধী, তাঁরাও হিকির উদ্যোগের সমর্থক ছিলেন।

এই জে, এ, হিকি ভারতে সংবাদপত্রের জনক। ১৭৮০ সালে তিনি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বেঙ্গল গেজেট অর জেনারেল এডভারটাইজার' প্রকাশ করেছিলেন। ইংরেজি ভাষার এই পত্রিকাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি জানা দেশী-বিদেশী লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ তারিখ ২৯শে জানুয়ারি। পত্রিকাটির গায়ে লেখা থাকত—"সাপ্তাহিক রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক পত্রিকা, সকল দলের বার্তাবাহী কিন্তু কোনো দলের দ্বারা প্রভাবিত নয়।" এই কথাগুলি থেকে বোঝা যায় পত্রিকাটি নিরপেক্ষভাবে টিকে থাকতে এবং সত্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। ১১ই নভেম্বর তারিখে পত্রিকার নামের কিছুটা পরিবর্তন হয়, 'হিকির বেঙ্গল গেজেট অথবা ওরিয়েণ্টাল ক্যালকাটা জেনারেল এডভারটাইজার' নাম হয়। জে, এ, হিকি থাকলেন সম্পাদক। মুদ্রিত হত ৬৭ নম্বর রাধাবাজার স্ট্রীট থেকে। লোকে মুখে মুখে বলত হিকির গেজেট।

পত্রিকাটি কি করে প্রকাশ হয় সে সম্পর্কে সেকালের এক এটর্নীর সাক্ষ্যে প্রকাশ,—১৭৭৩ সালে হিকি ভারতে এসেছিলেন ব্যবসা করার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু ব্যবসায়ে

তিনি সুবিধা করতে পারেন নি, উপরন্তু দেনার দায়ে দুই বছর জেল খাটেন। জেলের মধ্যে তিনি মুদ্রণ ব্যবসা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং কলকাতায় একটি ছাপাখানা করার সংকল্প করেন। জেল থেকে মুক্তির পর তিনি কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন টাইপ তৈরি করার এবং বিজ্ঞাপন ও প্রচারপত্র ছাপার উপযোগী মেসিনের জন্য। এইভাবে কয়েক শ টাকা জমিয়ে ইংল্যান্ড থেকে একটি মুদ্রণ যন্ত্র আনেন। মুদ্রণ যন্ত্র আনার পর একটি পত্রিকা বার করার কথা তাঁর মাথায় আসে। ইংল্যান্ডে সংবাদপত্রের সঙ্গে তাঁর কিছুটা সম্পর্ক ছিল। এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপা হবে, তার সঙ্গে সংবাদ ও মন্তব্যসহ প্রতিবেদন। বন্ধু-বান্ধবরা তাঁকে উৎসাহ দিতে থাকেন। অবশেষে ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারি 'বেঙ্গল গেজেট' পত্রিকাটি প্রকাশ হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে "এক অভিনব ব্যাপার হিসাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, পত্রিকা পড়ার জন্য কৌতূহল জাগে এবং সকলে আনন্দ প্রকাশ করে। পত্রিকাটি জনপ্রিয় হয়।" ভারতে তখন ব্রিটিশের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের হায়দর আলীর যুদ্ধ বেধেছিল। যুদ্ধের খবর জানবার জন্য সকলে ঝুঁকেছিল এই পত্রিকার দিকে। জেমস হিকি যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যুদ্ধের খবর পরিবেশন করতেন। সাংবাদিক বুদ্ধি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। যুদ্ধের ও অন্যান্য খবরের মধ্যে তিনি শ্লেষ ও কৌতুক রসের মেশান দিতেন, যাতে পাঠকরা খুশি হতেন। এই 'বেঙ্গল গেজেট' পত্রিকাটি ছিল চার পৃষ্ঠার, তিন কলমে ভাগ করা। কাগজের দাম ছিল মাসিক ৪ টাকা। উল্লেখ্য যে পত্রিকাটিতে নিয়মিত একটা ফিচার বা স্তম্ভ ছিল, যার শিরোনাম ছিল—'পোয়েটস কর্নার' বা কবিদের জন্য। নিয়মিত চিঠিপত্রের কলাম প্রকাশ হত। এই সকল চিঠিপত্রে পাঠকদের নানা অভিযোগ, দৃষ্টি-আকর্ষণী ইত্যাদি প্রকাশ হত। এতে মনে করা যায়, কেবল জীবিকার উদ্দেশ্য নয়, লোকহিতের সদিচ্ছা সম্পাদকের ছিল। হিকির নিজের লেখা উদ্ধৃত করি— "প্রত্যেক প্রজার নিজস্ব নীতি ও মত ঘোষণার স্বাধীনতা থাকা উচিত। এই স্বাধীনতাকে দমন করার যে কোন চেষ্টা অত্যাচারের নামান্তর এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর।" ১৭৮০ সালের এই লেখা কি দুশো বছর আগে বলা ভবিষ্যৎবাণীর মতো শোনাচ্ছে না?

এইরূপ চেতনা যে সম্পাদকের, তাঁর সঙ্গে যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের মতো লুটেরা ও লম্পটের সংঘর্ষ হবে, এটা স্বাভাবিক ধরে নেওয়া উচিত। হিকির সাংবাদিক আদর্শ ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের লাম্পট্য, প্রতারণা, অর্থলোলুপতা এবং নানা রকমের অসামাজিক কাজগুলি পত্রিকার পৃষ্ঠায় তুলে ধরা। অবশ্য বড়-ছোট কাউকে তিনি রেহাই দিতেন না। এ জন্য অচিরেই তিনি লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ও সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পের বিরাগভাজন হন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার চলতে থাকে— কুৎসা প্রচারই তাঁর সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য। এই প্রচার দেশীয় কিছু 'ভদ্রলোকের'

মধ্যেও বিশ্বাসযোগ্য হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা দেখেন নি রাজপুরুষদের দুর্নীতির মুখোশ খুলে দিয়ে তিনি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পথ খুলে দিয়েছেন। রুশ চিত্রশিল্পী ইমহককে দশ হাজার পাউন্ড ঘুষ দিয়ে হেস্টিংস তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। হিকি তাঁর পত্রিকায়, গভর্নর জেনারেলের মতো লোকের এরূপ লাম্পট্যের ঘটনা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। সেকালে যে ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ অফিসাররা এদেশে আসত, অপরের স্ত্রীকে কলুষিত করা তাদের একটা মজার খেলা ছিল। হিকি হেস্টিংস ও ইম্পের বিরুদ্ধে অবিরাম লেখনী চালনা করলেও, হেস্টিংস-ফ্রান্সিসের ডুয়্যাল বা দ্বৈতযুদ্ধ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য দূরের কথা, সংবাদ পর্যন্ত প্রকাশ করেন নি। এই ডুয়্যাল হয়েছিল ১৭৮০ সালের ১৭ই আগস্ট, এবং স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস নিহত হয়েছিলেন। হেস্টিংস ফিলিপ ফ্রান্সিসকে খতম করে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটিয়েছিল।

যে ক্ষমতালোভী হেস্টিংস প্রতিদ্বন্দ্বীকে ডুয়্যালে খতম করতে পারে, তার পক্ষে সংবাদপত্রের সমালোচনা এবং সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা সহ্য হবে কেন? হিকিকে জব্দ করতে হেস্টিংস কতগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীকে কাজে লাগায়। এই সকল পত্রিকার কাজ হল হিকির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা। বিনিময়ে এই পত্রিকাগুলি প্রেরণের জন্য ডাক খরচ কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় স্ত্রীর কয়েকজন অনুগত লোক ছিল, যাদের এ কাজে লাগানো হয়েছিল। ব্যাপারটা হিকি বুঝতে পেরে 'বেঙ্গল গেজেট' উপভোগ্য কথোপকথনের ভঙ্গিতে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। এতে হেস্টিংস তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে এবং হুকুম জারি করে যে বেঙ্গল গেজেটে অশালীন লেখা প্রকাশ করা হচ্ছে, এতে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করা এবং ব্রিটিশ সেটেলমেন্টের অধিবাসীদের শান্তি নষ্ট করা হচ্ছে। সুতরাং এই পত্রিকা জেনারেল পোস্ট অফিসের মাধ্যমে প্রচারের সুযোগ আর পাবে না। এই হুকুম বেঙ্গল গেজেটের উপর দারুণ এক আঘাত হানে, প্রচার প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। এতেও নিরস্ত না হয়ে গভর্নর জেনারেল হিকিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে টেনে আনে এবং প্রধান বিচারপতি এলিজা ইম্পের আদালতে সোপর্দ করে। যিনি অভিযোগকারী তিনিই বিচারক। এখানে উল্লেখ দরকার যে, ইম্পে বাল্যকাল থেকে হেস্টিংসের বন্ধু, সহপাঠী এবং ভারতে আসার পর দুষ্কর্মের সহায়ক। সুতরাং বিচার কি হবে সকলেই তা বুঝতে পেরেছিল।

১৭৮১ সালের জুনমাসে হিকিকে গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে পাঠানো হয়, এবং চোর বদমাইসদের সাথে একই সঙ্গে রাখা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। প্রথম—চরিত্র হনন, দ্বিতীয়—শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা। জামিনের আবেদন করা হলে প্রতিটি অভিযোগের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা করে, মোট আশি হাজার টাক চাওয়া হয়। তাঁর পক্ষে এত বেশি টাকার জামিনদার হবার লোক ছিল না। সুতরা

তাঁকে হাজতে দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়। কিন্তু জেমস হিকির ছিল অসাধারণ মনোবল। তিনি দমবার পাত্র ছিলেন না। তিনি হাজতে থাকলেও ১৭৮২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত *বেঙ্গল গেজেট প্রকাশিত হয়েছে রাধাবাজার স্ট্রীটের অফিস থেকে। হাজত থেকেই তিনি লেখা পাঠাতেন। হেস্টিংস এবং ইম্পের মুখে কালি দিয়ে প্রতি শনিবারে পত্রিকাটি* বার হত, এবং একই ভাষায় কুকাজগুলি প্রকাশ করে দিত। বেঙ্গল গেজেটের এক সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন—"যে অপরাধে মহারাজ নন্দকুমারকে আমরা ফাঁসি দিয়েছি সেই একই অপরাধ ক্লাইভ বাংলায় করেছেন, অথচ ইংলণ্ডে তাঁকে লর্ড বানানো হল।"

বেঙ্গল গেজেট হিকির অনুপস্থিতিতেও প্রকাশ হওয়ায় হেস্টিংস ইম্পের আদালতের হুকুম জারি করিয়ে দেনার অভিযোগে টাইপগুলি দখল করে নেয়, তারপরে পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে নোটিশ জারি করে। প্রবল শক্তির বিরোধিতার মধ্যেও হিকি ১৭৮২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত পত্রিকাটি টিঁকিয়ে রেখেছিলেন। বেঙ্গল গেজেটের শেষ সংখ্যায় একটা হিসাব প্রকাশ করেছিলেন—কিভাবে গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস একের পর এক বাধা দিয়েছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত 'বেঙ্গল গেজেট'কে বন্ধ করার আদেশ জারি করেছিলেন।

এতরকমের দমনমূলক ব্যবস্থা, ক্রোক, নিযুক্ত লোক দ্বারা শারীরিক আক্রমণ—ইত্যাদির মধ্যে পত্রিকাটি দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পুরাতন সংখ্যাগুলি সংগ্রহের জন্য গ্রাহকরা আগ্রহ প্রকাশ করে। বেঙ্গল গেজেটের একটি সংখ্যায় (এপ্রিল ১৭৮১) নোটিশ প্রকাশ হয়েছিল—"বেঙ্গল গেজেট-এর সংখ্যাগুলির জন্য আবেদন আসতে থাকায় মিঃ হিকি পুরাতন সংখ্যাগুলির সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন এক খণ্ডে। এই সংকলন বাঁধাই ও অবাঁধাই রাধাবাজারস্থিত অফিস থেকে পাওয়া যাবে।" ১৭৮২ সালের ১৬ই মার্চের সংখ্যায় বেঙ্গল গেজেটে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। চিঠিতে একজন পাঠক লিখেছিলেন,—"মিঃ হিকি, স্যার, মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য আপনার উদ্যম চিরকাল মানুষ স্মরণ করবে, আপনার নামও এই সঙ্গে যুক্ত থাকবে ··· আজ না পেলেও একদিন আপনি সুবিচার পাবেন। জনসাধারণ সম্মানের সঙ্গে আপনার নাম স্মরণ করবে। একথা মনে রাখতে আনন্দ হচ্ছে যে জনসাধারণের হৃদয়ে আপনার স্থান আছে, কারণ আপনি তাঁদের অধিকারের সমর্থন করেছেন। এ জন্য স্বাধীনতার পুরুষ হিসাবে সকলে আপনাকে অভিনন্দন জানাবে···"। এই চিঠি যিনি লিখেছিলেন তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল। দুশো বছর পর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সংগ্রামে আমরা জেমস অগাস্টাস হিকিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। প্রেস আইনের প্রসঙ্গে হিকির কথা এসে যায়। বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে একটি রাস্তার নাম হয়েছে জেমস হিকি সরণি (ডেকার্স লেন)। প্রধান বিচারপতি ইম্পের প্রতিহিংসা-পরায়ণতায় হিকি চার বছর জেল খেটেছেন নতুন প্রেসিডেন্সী জেলে। তখন এই জেল ছিল বিরজীতে, বর্তমান রবীন্দ্রসদনের কাছাকাছি স্থানে। জেল থেকে ১৭৮৫ সালে

তিনি যখন বার হন তখন নিঃসম্বল। দুবেলা খাবার জোটে না। বিচারের প্রহসনের *সময় হিকি তাঁর বিপক্ষীদের বলেছিলেন,—"তাঁর তো হারাবার মতো আছে তিনটি মাত্র জিনিস। তাঁর পত্রিকা, তাঁর সম্মান, তাঁর জীবন।"*

বিশেষ আদর্শবোধ, একটা বিশেষ লক্ষ্য না থাকলে এরকম কথা বলা যায় না। দলিল পত্র থেকে জানা যাচ্ছে, নিঃস্ব হয়ে যাবার পরও জেমস হিকি হাল ছেড়ে দেন নি। তিনি লর্ড ওয়েলেসলিকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে যুক্তি সহকারে আবেদন করেছিলেন বাজেয়াপ্ত করা তাঁর প্রেসের জিনিসপত্র ফেরৎ দেবার অথবা ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য। কিভাবে তাঁকে সর্বস্বান্ত করা হয়েছে তার বিবরণ উল্লেখ করেছেন। বলাবাহুল্য তিনি এই চিঠির জবাব পান নি। উপরন্তু তিনি যাতে ভারত ছাড়তে বাধ্য হন, তার জন্য চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। সেকালে ব্রিটিশ শাসকদের বিরক্তিভাজন ব্যক্তিদের জোর করে জাহাজে তুলে দিয়ে ইংল্যাণ্ডে ফেরৎ পাঠানো হত। যেমন হিকির পূর্বসূরী উইলিয়ম বোল্টসকে বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগে একরকম বিনাবিচারে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। তিনি ছিলেন ওলন্দাজ। ১৭৬৮ সালে তিনি ভারতে সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতায় কোনো ছাপাখানা না থাকায় সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতি তাঁকে দেওয়া হয় নি। ১৭৬৮ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় ট্যাঙ্ক স্কোয়ার-এ কাউন্সিল হাউসের দরজায় তিনি হাতে লেখা দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এটাই ছিল তাঁর অপরাধ। এই অপরাধে জোর করে জাহাজে তুলে দিয়ে তাকে বিদায় দেওয়া হয়। জেমস হিকির শেষ পরিণতি সম্পর্কে নানা কথা প্রচলিত আছে। একটা মত আছে—কলকাতায় প্রায় অনাহারে থেকে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আরেক মত আছে ১৮০২ সালে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে চীনের পথে 'আজাক্স' জাহাজে তাঁকে তুলে দেওয়া হয়েছিল, সেই জাহাজে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সমুদ্রের জলে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। আরেকটা মত—লালবাজারের জেলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে পূর্বাপর ঘটনা দৃষ্টে জাহাজে মৃত্যু বিশ্বাস্য মনে হয়। দারিদ্রের চরম আঘাত, নিঃস্ব হয়ে যাওয়া এবং এরূপ মৃত্যু দুঃখজনক ঘটনা। কিন্তু ভারতে সংবাদপত্র প্রকাশে পথপ্রদর্শক হিকি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রামের পথ দেখিয়েছেন।

জেমস হিকির পরে আরো কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিকতায় প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের পরিনামও হিকির পথে হয়েছিল। 'এশিয়াটিক মিরর এণ্ড কমার্শিয়াল এডভারটাইজার' পত্রিকায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্যার জডরালের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের অভিযোগে সম্পাদক চার্লস কিং ব্রুসকে ১৭৯৪ সালে ভারত থেকে বহিষ্কার করা হয়। 'বেঙ্গল জার্নাল' পত্রিকার সম্পাদক উইলিয়ম দুরানী একটি সম্পাদকীয় লেখার জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁকে ক্ষমা চাইতে বলা হলে তিনি অস্বীকার করেন। এ কারণে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। উইলিয়ম দুরানী 'ইণ্ডিয়ান ওয়ারল্ড' নামে নতুন পত্রিকা বার করেন ১৭৯৪ সালে। কিন্তু পত্রিকার লেখা ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানীর কর্তাদের পছন্দ হয় না। তাঁকে গ্রেপ্তার করে জাহাজে তুলে ভারতের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ১৭৯৫ সালে। সিল্ক বাকিংহাম প্রকাশ করেন 'ক্যালকাটা জার্নাল' ১৮১৮ সালে। এটি ছিল দৈনিক পত্রিকা। শাসকদের সমালোচনা জনস্বার্থের কথা নির্ভীকভাবে প্রকাশ করায় এই পত্রিকা কোম্পানীর কোপদৃষ্টিতে পড়ে। ১৮২৩ সালে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনে সেন্সর ব্যবস্থা ও লাইসেন্স নিতে বাধ্য করা হলে সিল্ক বাকিংহাম তা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তিনি সেন্সর অগ্রাহ্য করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করতেন, এটাই তাঁর অপরাধ। এজন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করে জাহাজে তুলে ইংল্যাণ্ডে ফেরৎ পাঠানো হয়। 'ক্যালকাটা জার্নাল' বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখানে লর্ড হেস্টিংস বেশ একটা চাল চেলেছিলেন। হেস্টিংসের কাউন্সিল সদস্য জন এডামকে দিয়ে এ কাজটা করানো হয়েছিল, হেস্টিংস ১৯২৩ সালে ইংল্যাণ্ড যাওয়ার পরে। 'ক্যালকাটা জার্নাল' সম্পর্কে রেভারেণ্ড ড. মার্শম্যান বলেছেন,— "এটি ছিল ভারতবর্ষে প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। উঁচুমানের সাংবাদিকতা এতে প্রকাশ পেয়েছে। সাংবাদিকতার প্রতি গভীর আগ্রহ এতে ফুটে উঠত।"

'ক্যালকাটা জার্নাল' বন্ধ করা, সম্পাদককে ভারত থেকে বহিষ্কার করা এবং সংবাদপত্র সেন্সর আইন ইত্যাদির বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রকুমার ঠাকুর সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করেছিলেন। এই আবেদন অগ্রাহ্য হলে, ইংল্যাণ্ডে সম্রাটের পরিষদে পাঠিয়েছিলেন। তাতেও ফল কিছু হয় নি। প্রতিবাদে রাজা রামমোহন রায় তাঁর সাপ্তাহিক ফার্সি পত্রিকা 'মিরাত-উল-আখবর'-এর প্রকাশ বন্ধ করে দেন।

ব্রিটিশ ইতিহাসকার স্যার উইলিয়ম উইলিস হান্টার-এর মতে—"পঞ্চাশ বছর ধরে হিকির গেজেটের উত্তরাধিকারীরা নির্বাসন দণ্ডের খড়্গের নীচে সেন্সারের তোয়াক্কা না করে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করে এসেছে,...কে সেদিন ভাবতে পেরেছে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুর্গ প্রাচীরের পূর্বতম কোণ থেকে অতিক্ষীণ সেইসব অগ্রপথিকের তিরস্কার ধ্বনি একদিন সুস্পষ্ট বজ্রনাদে পরিণত হবে, সেই শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়া সৈনিকের দল মহান সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সমবেত হবেন। রাজনৈতিক দলগুলি নেমে পড়বেন সম্মুখ সমরে।"

জেমস অগাস্টাস হিকি বিদেশী ছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সাংবাদিক চেতনা ভারতে স্বদেশী সংবাদপত্রের প্রেরণা দিয়ে গেছে। হিকি সংবাদপত্রের স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধতায় সংবাদপত্র দমন আইনের নগ্ন চেহারা দেখা গেছে। দমন আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও প্রতিবাদের মাধ্যমে ভারতে সংবাদপত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের এক সহযোগী শক্তিরূপে ভূমিকা পালন করেছে। হিকি যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তাতে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা ও সংবাদপত্র প্রকাশের এক মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে রাজা রামমোহন রায় থেকে

অনেকে সমাজসংস্কার ও শিক্ষার আদর্শ নিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। এই সকল সংবাদপত্রের কয়েকটি রাজরোষে পড়ে বন্ধ হয়েছে। ১৮১৮ সাল থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরে কেবলমাত্র বাংলাভাষায় ২২৭টি পত্রিকা প্রকাশ হয়েছিল। দু'শো বছর আগের হিকির সাহস, উদ্যম এবং কষ্টের কথা স্মরণ রাখতে হবে। সেদিনের নিঃসঙ্গ পথিক পরাজিত হলেও ভবিষ্যতের জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার চেতনা রেখে গেছেন। জেমস অগাস্টাস হিকিকে ভারতের সংবাদপত্রের জনক হিসাবে স্বীকার করা উচিত।

তথ্য : মেমোয়ার্স অব উইলিয়ম হিকি, হিষ্টরী অব ইংলিস প্রেস, রিপোর্ট অন ফ্যাক্ট ফাইণ্ডিং কমিটি অন স্মল এণ্ড মিডিয়াম নিউজ পেপারস্।

☐ কল্পতরু সেনগুপ্ত

উইলিয়ম কেরী

আর সমস্ত সামাজিক আন্দোলনের মতোই ঊনবিংশ শতকের বাংলার নবজাগরণের পিছনেও দীর্ঘ প্রস্তুতির ইতিহাস রয়েছে। সাধারণভাবে ডিরোজিও এবং তাঁর হিন্দু কলেজের ছাত্রদেরকে এই নবজাগরণের প্রথম প্রকাশ বলে গণ্য করা হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী এঁদের অভিহিত করেছেন নব্যবঙ্গের প্রথম যুগের নেতৃবৃন্দ রূপে। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, যে শিক্ষা এঁদের প্রচলিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে অনুপ্রাণিত করেছিল—সেই শিক্ষার শুরুর সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবেই যুক্ত ছিলেন কয়েকজন মিশনারী। উইলিয়ম কেরীকে এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য বললে অত্যুক্তি হবে না।

উইলিয়ম কেরীর জন্ম ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর পিতা ছিলেন তন্তুবায়। কিন্তু তন্তুবায় হয়েও তিনি লেখাপড়া শেখেন। পরে কাজ পান কেরানীর। পিতৃ সংস্পর্শেই পুত্র উইলিয়মের জ্ঞানস্পৃহা। দরিদ্র পরিবারের অন্য সকলের মতো, তাঁকেও ১২ বছর বয়সে জীবিকার্জনের পথে যেতে হয়। প্রথমে যান কৃষিকর্মে, পরে কৃষিবিজ্ঞানে। আরও পরে শিক্ষানবিশ হন জুতো সেলাইয়ের কাজে। তবুও গ্রামের এক তন্তুবায় পণ্ডিতের কাছে লাতিন ও গ্রীক শিখতে আগ্রহী হলেন। পরে শিখলেন ফরাসি, ইতালিয়ান ও ডাচ প্রভৃতি ভাষা। তাঁর পরিশ্রম-নিষ্ঠার সত্যিই তুলনা নেই। ১৭৮৯-তে পাদ্রী হলেন। পরিচিত হলেন ভারতবর্ষে খ্রীস্টধর্ম প্রচারে উৎসাহী জন টমাস প্রমুখের সঙ্গে। মূলত এঁদের উদ্যোগেই কলকাতায় আসেন কেরী।

কেরী এদেশে এসেছিলেন খ্রীস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে—১৭৯৩ সালে। ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠা হয় শ্রীরামপুর মিশনের। মাঝের এই সাত বছর কেরীর জীবনে কঠোর সংগ্রামের সময়। কলকাতা, ব্যান্ডেল, নদীয়া, সুন্দরবন অঞ্চলে নদীতে নদীতে তাঁকে ভেসে বেড়াতে হচ্ছিল। মাথা গোঁজবার কোনো স্থান নেই। অভাবে, হতাশায় কেরীর স্ত্রী প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছেন। একটি পুত্রের মৃত্যু হল, তবুও প্রস্তুতির সংকল্পে অটল কেরী। বাংলা অনুবাদে বাইবেল প্রকাশ তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

১৭৯৪ সালে কেরী মালদহের কাছে মদনবাটীর নীলকুঠিতে তত্ত্বাবধায়কের চাকরী নিয়ে চলে যান। এখানেই তিনি শুরু করেন বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা, বাইবেলের অনুবাদ ও তা প্রকাশের পরিকল্পনা। কিন্তু প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় অর্থের অভাব। ইংলন্ডে ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি-কে ১৭৯৫ সালের ৬ই জানুয়ারি কেরী চিঠি লেখেন

বাংলা বাইবেল মুদ্রণের কাজে সাহায্য চেয়ে। সোসাইটি কিন্তু কেরীর উৎসাহে অংশীদার হয় নি। ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তারা লেখে…"We would not advise you to be too hasty in printing. As you proceed, you will perceive many errors in your early production."

১৭৯৮ সালের আগে বাইবেল ছাপানোর জন্য কোনো যন্ত্র কেরী যোগাড় করতে পারেন নি। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে জন ফাউন্টেনের সহযোগিতায় কেরী বাইবেলের অনুবাদের কাজ শেষ করতে সক্ষম হন। ঐ সালেই মিশনারী সোসাইটি সিদ্ধান্ত নেয় বাংলায় বাইবেল ছাপানোর কাজে সহায়তা করার। এ সময়, যাঁর নীলকুঠিতে কেরী কাজ করতেন, সেই উড্‌নী তাঁকে একটি কাঠের মুদ্রাযন্ত্র উপহার দেন।

মদনবাটী হয়ত প্রথম বাংলা বাইবেল প্রকাশের স্থান হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকত, কিন্তু উড্‌নী তাঁর নীলকুঠি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। বাধ্য হয়ে কেরী নিজে একটি ছোট নীলকুঠি কিনে চলে যান নিকটবর্তী খিদিরপুর গ্রামে। কিন্তু সেখানেও কেরী তাঁর কাজ শুরু করতে পারেন নি। তাঁদের এসে আশ্রয় নিতে হয় শ্রীরামপুরে। এখানে বলে রাখা ভালো, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কেরীর এই বাংলা বাইবেল প্রকাশের উদ্যোগকে কিন্তু মোটেই সুনজরে দেখে নি। প্রধানত এই কারণেই প্রথমে তাঁর সহকারীদের ও পরে স্বয়ং কেরীকে আশ্রয় নিতে হয় দিনেমার শাসিত শ্রীরামপুরে। তাছাড়া, শ্রীরামপুরের ডেনিস গভর্নর তাঁদের সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—সেটাও ছিল একটা বড় কারণ।

কেরী শ্রীরামপুরে আসেন ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি। ঐ বছরই অগাস্ট মাসে, বাংলায় মুদ্রিত বাইবেলের কিছু অংশ প্রকাশ করে বিতরণ করা হয়।

শুরু থেকেই লক্ষ করা যায়, বিভিন্ন সময়ে কেরী ইংলন্ডে জানিয়েছেন যে ছাপা বা হরফ তৈরির কাজে এদেশীয়দের নিয়োগ করা সম্ভব। মুদ্রণ ব্যয় সীমিত রাখার জন্য, এবং ভালো ও বেশি সংখ্যার ছাপার জন্য কেরী একটি ফাউন্ড্রী প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীরামপুরেই। দক্ষ হরফশিল্পী পঞ্চানন কর্মকার, এবং তাঁর জামাতা মনোহর ও পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র ইত্যাদির মিলিত উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই ফাউন্ড্রীর টাইপ, হরফনির্মাণ বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা লাভ করেছে।

১৮০১ খ্রীস্টাব্দে কেরীর জীবনের একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়। ঐ বছরই তিনি ৫০১ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। এর দ্বারা তিনটি উপকার সাধিত হয়। (১) শ্রীরামপুর মিশন কিছু পরিমাণে আর্থিক স্বচ্ছলতার মুখ দেখে, (২) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় ছাপাখানার কাজ স্বচ্ছন্দে চলতে থাকে—যদিও ইংরেজ কোম্পানীর প্রচেষ্টা ছিল প্রেস বন্ধ করে দেওয়ার। (৩) কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের সহযোগিতায় বাংলা গদ্য লিখতে এবং লিখিয়ে নিতে শুরু করেন। সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব।

১৮১৮ সালে প্রতিষ্ঠা হয় শ্রীরামপুর কলেজের। যে কোনো সমাজের বুদ্ধিমুক্তির পূর্বশর্ত, জ্ঞানচর্চার মুক্তি। শ্রীরামপুর কলেজ এ-বিষয়ে তার ভূমিকা পালন করেছে প্রশংসনীয়ভাবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, কেরী ছিলেন এর প্রধান চালিকাশক্তি। কলেজের উদ্দেশ্য হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল : "The aim of the College was to improve the minds of the pupils to any extent which might appear desirable, eventually supplying them instruction in every branch of knowledge peculiarly suited to promote the welfare of India"

এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে, কলেজে সেই সময় ভাষা, সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। পরিকল্পনা ছিল শারীরতত্ত্ব ও চিকিৎসাবিজ্ঞান বিভাগও খোলার। কলেজের নিজস্ব গ্রন্থাগারে ছিল নানা বিষয়ের নানা গ্রন্থের বিপুল সংগ্রহ। সব থেকে বড় কথা এই শিক্ষা ছিল সবার জন্যই উন্মুক্ত। কলেজের সংবিধান ঘোষণা করেছিল : "No caste, colour or country shall bar any man from admission into Serampore College."

আগেই বলা হয়েছে, মুদ্রণের ব্যয় কমানোর জন্য কেরী শ্রীরামপুরে টাইপ ফাউণ্ড্রী তৈরি করেছিলেন। টাইপ ফাউণ্ড্রীর সঙ্গে শ্রীরামপুরেই ছিল—কাগজ তৈরির ব্যবস্থা। এই কাগজ যে শুধুমাত্র সস্তায় মিশনের বা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বইপত্র ছাপতে সাহায্য করত তা নয়, গুণগত দিক থেকেও ছিল তা যথেষ্ট উন্নতমানের। ২৭শে মার্চ ১৮২০ ভারতবর্ষে এই কাগজের কলেই প্রথম স্টীম ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়। ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশেও এই কাগজ রপ্তানী করা হত।

গভীর মানবপ্রেম এবং দেশবাসীর প্রতি মমত্ব কেরীকে শুধুমাত্র একজন খ্রীস্টান ধর্মযাজকের থেকে আরও বেশি কিছুতে উন্নীত করেছিল। প্রথম থেকেই এদেশের প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম দরদ। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'আইডিয়ার আকাশ অপেক্ষা মাটির পৃথিবীর সঙ্গেই মানুষের প্রথম পরিচয় হওয়া প্রয়োজন'। তাই তিনি ছিলেন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য বদ্ধপরিকর। সেই শ্রদ্ধা আর আন্তরিকতা থেকেই বলতেন বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালীর জীবনযাত্রার জ্ঞান প্রত্যেক ইউরোপীয়ের পক্ষেই অপরিহার্য। ফলে, অবশ্যম্ভাবীভাবে ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটির সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ তৈরি হতে থাকে। সোসাইটি এইসব যুক্তিবাদী উদ্যোগ বা কলেজ সম্পর্কে মোটেই আগ্রহী ছিল না—যদিও কেরী ও তাঁর সহকর্মীরা এই কলেজকেই তাঁদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে বিবেচনা করতেন। শ্রীরামপুর মিশনের মধ্যে মতপার্থক্য ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮১৭ সালেই কয়েকজন তরুণ মিশনারী কলকাতায় শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে লন্ডন সোসাইটির একটি শাখা খুলেছিলেন। এঁরা ক্রমশ শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিদ্বন্দ্বী

হয়ে ওঠেন। কেরী চেয়েছিলেন শ্রীরামপুর মিশনকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে। এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে, ১৮২৮ সালে শ্রীরামপুর মিশন ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে। এর আগে ১৮২৭ সালেই শ্রীরামপুর কলেজ পেয়েছে ডেনমার্কের রাজার সনদবলে বিশ্ব-বিদ্যালয় হিসাবে পরিগণিত হওয়ার অধিকার। কিন্তু অধিকার জুটলেও, ছিল না প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান। ১৮৩২ সালে কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে অবসর নিলে—এই সংকট আরও তীব্র হয়। অবশেষে কলেজ ও মিশনকে রক্ষা করতে গিয়ে কাগজের কল, ছাপাখানা, বোর্ডিং ও স্কুল বিক্রী করে দেওয়া হয়। দেখা যায়, অস্তিত্বের ৩২ বছরে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ৪০টি ভাষায় দু লক্ষের অধিক বই ছেপেছিল। অবশ্যই এর একটা বৃহদংশ ছিল খ্রীস্টধর্ম বিষয়ক পুস্তক, কিন্তু তার সঙ্গে ছিল বাংলা গদ্যে রচিত পাঠ্যপুস্তক। ছিল রামায়ণ-মহাভারতের মতো অবশ্য প্রয়োজনীয় বই। একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, ছাপার অক্ষরের অসীম শক্তি সম্পর্কে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসই ভারতীয়দের সর্বপ্রথম সচেতন করতে পেরেছিলেন।

ছাপার অক্ষরের সাহায্যে কেরী আরও একটি কাজ করেছিলেন যা বাংলা গদ্যকে চিরস্থায়ী সাহায্য করে গেছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পড়াতে গিয়ে, শিক্ষক কেরী পাঠ্যপুস্তকের খুবই অভাব বোধ করেন। এই অভাববোধই তাঁকে উদ্যোগী করে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের লেখক ও পরিকল্পকের ভূমিকা পালনে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের দিয়ে বাংলা গদ্যপুস্তিকা লিখিয়ে নেওয়ায় তাঁর ভূমিকা অসামান্য। রামরাম বসুর লেখা 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' যা কিনা প্রথম মুদ্রিত বাংলা গদ্যগ্রন্থ এবং কেরীর নিজের নামে প্রকাশিত গ্রন্থ 'কথোপকথন'—এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য, যদিও অনেকের ধারণা কথোপকথনের (১৮০১) সহজ চলতি এবং মৌখিক বাংলা পুরোটা কেরীর লেখা নয়—সম্ভবত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের। তবুও অশিক্ষিত, খেটে খাওয়া বাঙ্গালীর মুখের ভাষাকে প্রথম এই মর্যাদার আসনে বসানোর অবদান কিছু কম নয়। অনুরূপভাবে, 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রভৃতি আর দেশীয় নানা ঐতিহাসিক ঘটনার সমন্বয়ে ১৪৮টি অনুবাদ গল্পের সংকলন 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) এবং বাংলা-ইংরাজি অভিধান রচনা (১৮১৮—১৮২৫) ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের জীবন্ত যোগসূত্র ছিলেন কেরী। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বই—বিশেষত বাংলা বই ছেপে মিশন প্রেস আর্থিক স্বচ্ছলতার মুখ দেখেছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজও তার প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক পেয়েছে। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে আরও একটি চর্চার দিক। তা হল প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক রচনা ছাড়াও, বা বাংলায় খ্রীস্টধর্ম বিষয়ক বইপত্র অনুবাদ ছাড়াও, পুরনো সাহিত্যের প্রকাশ, আইনকানুনের অনুবাদ, ব্যাকরণ, অভিধান, উদ্ভিদবিজ্ঞান

ও প্রকৃতিবিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রভৃতি বই প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারার সৃষ্টি—যা প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছিল ভারতবাসীকে তার নিজের ঐতিহ্যকে চিনে নিতে।

ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষমাত্রই তাই কৃতজ্ঞ উইলিয়ম কেরীর কাছে। নিজে সাহিত্যশিল্পী না হয়েও, তাঁর প্রধান উদ্যোগ ছিল—সাহিত্যের বাহনকে সাধারণ মানুষের উপযোগী করে নির্মাণের। যুক্তিবাদী মানসিকতার অধিকারী ছিলেন বলেই হয়তো তিনি অনুধাবন করতে পারতেন—গদ্যের প্রাথমিক প্রয়োজন। যোগাযোগের, আলোচনার, যুক্তি-চিন্তার বাহক হিসেবে, ভাষাকে মানুষের জ্ঞান-জীবনকে মুক্ত করার মাধ্যমে পরিণত করার প্রয়োজন। একজন মিশনারী ধর্মযাজক হয়ে এদেশে এসে, বহু আত্মত্যাগ, পারিবারিক বিপর্যয়, এবং নানা নির্যাতনের মধ্য দিয়েই তিনি অতিক্রম করেছিলেন তাঁর অপরিসীম কর্মময় জীবন। জীবনের শেষ প্রান্তে, ১৮২৫ সালে যখন তাঁকে বলতে শুনি : "My heart is wedded to India, and through I am of little use, I feel pleasure in doing the little I can,"—তখন সত্যই অভিভূত হতে হয়।

অসামান্য পরিশ্রমী, বহুভাষাবিদ এই মনীষীর কাছে ভারতবর্ষের ঋণ অপরিশোধ্য।

□ **অনিরুদ্ধ মৈত্র**

বাংলার নবজাগরণ ও ডেভিড হেয়ার

উনবিংশ শতাব্দী বাংলার ইতিহাসে একটা বড় যুগ। ঐ শতাব্দীর প্রায় প্রথম থেকেই বাঙ্গালীর মানস-জীবনে যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তারই ফলশ্রুতি হিসাবে ঘটেছিল বাংলার নবজাগরণ। এই নবজাগরণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত স্বদেশী এবং বিদেশী মানুষের অবদান অপরিসীম, ডেভিড হেয়ার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করে তিনি বুঝেছিলেন যে একমাত্র শিক্ষাই পারে বাংলার জনগণের দুঃখ দুর্দশার অবসান ঘটাতে। তাই এদেশে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি নিজের সমস্ত শক্তি ও সম্পদ উজাড় করে দিয়েছিলেন। সে যুগে হেয়ারের মতো আর কেউই বোধহয় এদেশে শিক্ষার যথার্থ অভাব-এর বিষয়টি উপলব্ধি করেন নি। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনে বিশ্বাসী ছিলেন। ইংরাজি শিক্ষা ও মাতৃভাষা চর্চা এই দু-বিষয়েই তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। তিনি মনে করতেন পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানচর্চা এদেশের মানুষের উন্নতির জন্য অপরিহার্য।

ডেভিড হেয়ার ১৭৭৫ সালে স্কটল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম জানা যায় না। তবে তিনি লণ্ডনের একজন ঘড়ি ব্যবসায়ী ছিলেন। হেয়ারের মামার বাড়িও ছিল স্কটল্যাণ্ডে। ১৮০০ সালে ডেভিড হেয়ার কলকাতায় আসেন ঘড়ির ব্যবসা করতে। অল্পদিনের মধ্যেই এই ঘড়ির ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত সুনাম অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ১৮১৬ সালের প্রায় প্রথম থেকেই হেয়ার এদেশে ইংরাজি শিক্ষা প্রচলন করার চেষ্টায় বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন এবং এ বিষয়ে এত বেশি জড়িয়ে পড়েন যে ঘড়ির ব্যবসায়ে মন দেওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। তাই ১৮২০ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি তাঁর কর্মচারী গ্রে সাহেবকে নিজের ঘড়ির ব্যবসা বিক্রি করে দেন। ব্যবসা বিক্রির সমস্ত টাকাই তিনি নিজের গ্রাসাচ্ছাদন ও শিক্ষা বিস্তারের কাজে ব্যয় করেন। ১৮২০ থেকে ১৮৪২ সাল পর্যন্ত তিনি এদেশে আধুনিক শিক্ষা প্রসারের কাজে একান্তভাবে ব্রতী ছিলেন।

১৮১৬ সালের ২১শে মে হেয়ার এক সভার আয়োজন করেন। এই সভা থেকেই শিক্ষা বিস্তারের জন্য কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে হিন্দু কলেজের উদ্বোধন হয়। পরে এটি চিৎপুরের রূপরেণু রায়ের বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। কলেজ স্কোয়ারের উত্তর দিকে হেয়ারের কিছু জমি ছিল। সেই জমি তিনি হিন্দু ও

সংস্কৃত কলেজের জন্য দান করলেন। ১৮২৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি কলেজ ভবনের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপিত হয়। পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হন ডেভিড হেয়ার। ডিরোজিও ছিলেন ঐ কলেজের অন্যতম শিক্ষক। তিনি সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ে অবাধ আলোচনার প্রেরণা জোগাতেন। ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার প্রমুখ। এঁদের বলা হত 'ইয়ং বেঙ্গল'। ধর্মের বিরুদ্ধে এঁদের বিক্ষোভ প্রকাশ রক্ষণশীল পরিবারগুলি ভাল চোখে দেখতেন না। তাঁরা কলেজ থেকে ছাত্রদের ছাড়িয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। ফলে কলেজের পরিচালকমণ্ডলী ডিরোজিওকে কলেজ থেকে অপসারণ করতে উদ্যোগী হন। একমাত্র হেয়ার-ই ডিরোজিওকে কলেজ থেকে অপসারণ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তাঁর মতে ডিরোজিও ছিলেন একজন সুযোগ্য শিক্ষক।

১৮১৭ সালে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার সময় থেকেই ডেভিড হেয়ার এই সোসাইটির একজন দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। ১৮১৭ থেকে ১৮৪২ সালে তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত হেয়ার, স্কুল বুক সোসাইটির তহবিলে বছরে ১০০ টাকা করে চাঁদা দিতেন। সে সময়ে প্রাথমিক পাঠের উপযোগী কোনো বই ছিল না। হেয়ার স্কুলের ছাত্রদের জন্য বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করার গুরুত্ব অনুধাবন করে সে কাজে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। ১৮১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে হেয়ারের অবদান ছিল অপরিসীম। স্কুল সোসাইটির কাজ ছিল স্কুলগুলিকে সাহায্য করা, সেগুলির উন্নতি সাধনে সহায়তা করা এবং নতুন স্কুল খোলায় উৎসাহ দেওয়া। এই সোসাইটির সক্রিয় সদস্য হিসাবে হেয়ার শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত পাঠশালাগুলি নিয়মিত পরিদর্শন করতেন। কিছু হিন্দু ছেলেকে নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি পটলডাঙ্গায় একটি পাঠশালা খুলেছিলেন। পাঠশালার প্রত্যেক ছাত্র সম্পর্কে তিনি নিয়মিত খোঁজ-খবর নিতেন এবং পরিচালনার সঙ্গে জড়িত সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় তিনি নিজে দেখতেন। এছাড়া তিনি এগ্রিকালচারাল এ্যাণ্ড হর্টিকাল-চারাল সোসাইটি অব্ ইণ্ডিয়া এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। ১৮২৮ সালে হেয়ার এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৩৩ সালে তিনি এই সোসাইটির 'কমিটি অব্ পেপারস্'-এর সদস্য নির্বাচিত হন। এই কমিটির কাজ ছিল সোসাইটিতে পাঠযোগ্য বা সোসাইটি জার্নাল এবং বিভিন্ন পুস্তকে প্রকাশ করার জন্য প্রাপ্ত রচনা নির্বাচন। উচ্চ শিক্ষিত বিদ্বান ব্যক্তিরাই এই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হতেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত প্রায় ন বছর হেয়ার এই পেপার কমিটির সদস্য ছিলেন।

১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৩৭ সালে হেয়ার ঐ কলেজের সম্পাদক নিযুক্ত হন। মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে সে সময়ে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল উদ্যোক্তাদের। বিশেষ করে গোঁড়া হিন্দুদের আপত্তি

ছিল প্রবল। প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই কলেজে ছাত্র পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল। কারণ শব-ব্যবচ্ছেদ করলে হিন্দুধর্মে জাতিচ্যুত হবার আশঙ্কা। কিন্তু ডেভিড হেয়ার নিজে উদ্যোগী হয়ে ছাত্র সংগ্রহ করেছিলেন। প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ করেন উমাচরণ শেঠ এবং মধুসূদন গুপ্ত। এঁরা দুজনেই ছিলেন হেয়ার-এর ছাত্র। রামতনু লাহিড়ীর ছোটভাই কালীরেণুকেও হেয়ারের পরামর্শে রামতনু মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দেন। এই মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং ছাত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন এবং ডিরোজিও-র ইয়ং বেঙ্গল-এর শিষ্য ও ছাত্ররাও প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। ডেভিড হেয়ারের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ১৮৩৮ সালে ২০টি এবং ১৮৩৯ সালে আরো ৬০টি, মোট ৮০টি শয্যা বিশিষ্ট এক হাসপাতাল ভবন তৈরি করা হয়। কলেজের ছাত্রদের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থাও হয় এই হাসপাতালে। ১৮৪১ সালে হেয়ার মেডিকেল কলেজের সম্পাদক পদ ত্যাগ করেন। সম্পাদক থাকাকালীন তাঁর পারিশ্রমিক নির্ধারিত ছিল ৪০০ টাকা। কিন্তু তিনি তা নিতেন না।

শুধু শিক্ষার ব্যাপারেই ডেভিড হেয়ার এগিয়ে আসেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বহু জনহিতকর কাজেও তিনি সামিল ছিলেন। ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিতে তিনি নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন। সে সময়ে ভারত থেকে জোর করে সুদূর মরিশাস প্রভৃতি ইংরেজদের উপনিবেশগুলিতে ভারতীয় কুলি-মজুরদের নানান প্রলোভন দেখিয়ে চালান করা হত। হেয়ার এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। ১৮৩৮ সালের ১০ই জুলাই এই বিষয়ে এক জনসভা করা হয়। শেষপর্যন্ত কোম্পানী অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করে এবং তার রিপোর্টের ভিত্তিতে 'কুলি-মজুর আইন' পাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হেয়ার উপলব্ধি করতেন। তাই তিনি সে-যুগে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কিত আন্দোলনেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থক ছিলেন হেয়ার। খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী হলেও শিক্ষার মধ্য দিয়ে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। তাই মিশনারীদের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষার উদ্দেশ্য থেকে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। অপরদিকে এদেশীয় গোঁড়ামিরও তিনি বিরোধী ছিলেন। শিক্ষার সঙ্গে কোনো অবস্থাতেই তিনি ধর্মের সংযোগ ঘটাতে দেন নি। তিনি চেয়েছিলেন এদেশের মাটিতে প্রকৃত মানুষ তৈরি করতে। তাঁর আশা ছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরে এদেশে সৃষ্টি হবে সুশিক্ষিত যুবকের দল, যারা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাবে শিক্ষার মশাল। ১৮৩১ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্মদিনে হিন্দু কলেজের তদানীন্তন ছাত্ররা তাঁকে যে মানপত্র দিয়েছিল, তা থেকে বোঝা যায়, সেকালের ছাত্ররা তাঁকে কী চোখে দেখত। ঐ মানপত্রে লেখা হয়েছিল—"এদেশের যে মহদুপকার আপনি করিয়াছেন তাহার প্রতি অন্যেরা অবহিত হইতে না পারে, কিন্তু যাহারা উপকৃত হইয়াছে, একথা

চিরদিন তাহাদের মনে গাঁথা থাকিবে"।

আমরা আজকের মানুষেরা অবাক হয়ে যাই এই মানুষটির জীবনের লক্ষ্য, কর্মসাধনা ও আদর্শপূরণের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার কথা স্মরণ করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে এদেশীয়দের উন্নতির জন্য এই মহান মনীষী আজীবন নিরলস প্রচেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। এদেশের সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশা দেখে হেয়ার-এর মন আলোড়িত হয়েছিল। রামমোহন, দ্বারকানাথ, রাধাকান্ত, ডিরোজিওর মতো বিদ্বান, বিচক্ষণ, চিন্তাশীল ও কর্মবীর মানুষদের দেখে ও তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে তিনি বুঝেছিলেন যে, মৌলিক যোগ্যতায় এদেশের মানুষ ইউরোপের মানুষদের তুলনায় এতটুকুও হীন নয়। শুধু কঠোর দারিদ্র এবং অন্ধ কুসংস্কারের চাপে নুয়ে পড়া মানুষগুলি বুদ্ধি-বিবেচনার শক্তি হারিয়ে ফেলে মুখ বন্ধ করে প্রচলিত প্রথাগুলি মেনে চলতে বাধ্য হচ্ছে। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে এদের দরকার শিক্ষার। স্বাধীন মননশক্তি বিকাশের উপযোগী যুক্তিভিত্তিক শিক্ষা তখনকার সময়ে ভারতের কোথাও প্রচলিত ছিল না। বৃহত্তর জনসমাজে তার প্রসার ঘটান ছিল কল্পনার বাইরে। তাই হেয়ার চেয়েছিলেন এদেশে বিজ্ঞান-ভিত্তিক ও যুক্তি-ভিত্তিক শিক্ষার প্রসার। তিনি চেয়েছিলেন এদেশের যুবসমাজ শেক্স্পীয়ার, মিল্টন, বেকন, হিউম প্রভৃতির রচনাবলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করে তাঁদের বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করুক। শিখুক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা-পদ্ধতি। এই কারণে এদেশে রেনেসাঁর প্রবর্তক হিসাবে রামমোহনের সঙ্গে ডেভিড হেয়ার এর স্বীকৃতি। তাঁর প্রচেষ্টার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবেই বিকাশ ঘটেছিল বাংলার নবজাগরণের।

কমবয়সী ছেলেদের, বিশেষ করে তাঁর ছাত্রদের হেয়ার প্রচণ্ড ভালবাসতেন। কেউ কখনও না খেয়ে আছে জানতে পারলে তিনি আগে তাকে খাওয়াতেন তারপর অন্য প্রয়োজনীয় কথা বলতেন। কোনো ছাত্র পরপর কয়েকদিন স্কুলে না এলে, তিনি তার বাড়ি গিয়ে খবর নিয়ে আসতেন। অসুখ করলে ওষুধ এবং পথ্যের ব্যবস্থা করতেন। ছাত্রদরদী ডেভিড হেয়ার তাঁর এই আচরণের মাধ্যমে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করতেন মানবদরদী হবার জন্য। মানুষকে ভাল না বাসলে, সমাজকে ভাল না বাসলে, সমাজ সংস্কার করা যায় না, এই কথাটা তিনি সর্বদাই বোঝাতে চাইতেন—কথায় এবং কাজে। কিন্তু এই দরদী এবং জনকল্যাণকারী মানুষটি এদেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে সচেষ্ট থাকলেও, তাঁর ছাত্রদের ও দেশের সাধারণ মানুষকে দারিদ্রের মূল কারণের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে শেখান নি। হেয়ারের পক্ষে তা সম্ভবও ছিল না। বাংলার নবজাগরণের প্রথম দিকের কোনো পথিকৃৎই এ পথের সন্ধান মানুষকে দিতে পারেন নি। আর এটাই বোধহয় সেদিনের নবজাগরণের সীমাবদ্ধতা। তবুও তদানীন্তন মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর কেউই যে প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা ভাবেন নি, সেই চাষীদের ন্যায্য পাওনার বিষয়ে যখন দেখি হেয়ার সরব হয়েছিলেন, তখনই এই সীমাবদ্ধতার বিষয়টি আরও বেশি

করে নজরে পড়ে। যদিও চাষীদের ন্যায্য পাওনার জন্য হেয়ার-এর দাবীর ফলশ্রুতি কিছু ছিল না, তবুও এর থেকে আমরা তাঁর মানবদরদী মনোভাবের মূল্যায়ন করতে পারি।

ভারতবর্ষের সুখ ও স্বার্থের জন্য হেয়ার এদেশে ইংরাজি শিক্ষার প্রচারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ছাত্রদের তিনি নিছক কেরানী হিসাবে দেখতে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে। নিছক পুঁথিগত বিদ্যায় বা মুখস্থ বিদ্যার সাহায্যে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এই কারণে হেয়ার কলেজের বাইরে ছাত্রদের বিভিন্ন কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার উপদেশ দিতেন। তিনি ডিরোজিও প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন এবং ডিরোজিয়ানদের জ্ঞানোপার্জিকা সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইংরাজি শিক্ষার মাধ্যমে তিনি এদেশের ছাত্রদের নৈতিক গুণের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। স্বাধীন চিন্তায় প্রভাবিত ছাত্রদের তিনি সমাজশিক্ষক হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। অ্যাকাডেমিক এসো-সিয়েশনের সভায় নৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে স্বাধীন ও দ্বিধাহীন আলোচনার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। প্রতীচ্যের উন্নত মূল্যবোধ প্রচারে হেয়ার যে কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন, হেয়ার-ডিরোজিও-র ছাত্রেরা সেই যজ্ঞের আগুন অনির্বাণ রাখে। অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনে এই নৈতিকতা ও বুদ্ধিচর্চার ফলশ্রুতি হিসাবে পরবর্তীকালে এদেশে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছে। বাংলার নবযুগের দুজন শিক্ষাগুরু নতুন দিশার সন্ধান দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ডিরোজিও ছাত্রদের মধ্যে ভাববিপ্লব সৃষ্টি করে প্রতীচ্যানুরাগের জন্ম দিয়েছিলেন, আর হেয়ার তাঁর ব্যাপক জনসংযোগের মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থাকে গ্রহণ করার উপযোগী ছাত্রবৃন্দের সৃষ্টি করেছেন এবং নব্য-শিক্ষাব্যবস্থাকে সমাজের গভীরে পেঁছে দেবার জন্য হাতে কলমে কাজ করেছেন। একদিকে রাধাকান্ত দেব, অন্যদিকে রামমোহন—বাংলার নবজাগরণের সূচনাকালে এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েই হেয়ার ইউরোপের উন্নত শিক্ষাব্যবস্থাকে সমাজের সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। নিজের লক্ষ্যে অবিচল থেকে একদিকে রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে স্কুল সোসাইটিতে এবং অন্যদিকে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভার সঙ্গে নব্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠার জন্য যোগাযোগ রেখেছেন।

১৮৪২ সালের ১লা জুন ডেভিড হেয়ার-এর জীবনাবসান ঘটে। এদেশের মানুষ তাঁকে ভালবাসলেও তখনকার ইংরেজ শাসক সম্প্রদায় ও তাদের তল্পিবাহক ইউরোপীয় সমাজ তাঁর কাজকর্ম কোনদিনই সমর্থন করতে পারে নি। তাঁর শিক্ষা-আন্দোলন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন সেদিনের ইংরেজ শাসকরা ভাল চোখে দেখে নি। তাই তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শবদেহ ইউরোপীয় সমাজ তাদের সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করতে দেয় নি। জন্মসূত্রে খ্রীস্টান হেয়ারকে খ্রীস্টানরা নাস্তিক বলে মনে করেছে। এমন কি তাঁর সমাধিকালে ডিরোজিওপন্থী হিসাবে খ্যাত ও হেয়ারের একদা স্নেহধন্য রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ও অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এদেশের সাধারণ

মানুষের হৃদয় জয়কারী হেয়ারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শোকযাত্রায় প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ যোগদান করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রসময় দত্ত প্রভৃতি। সমাধিস্থলের সমাবেশে অন্যান্যদের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সবান্ধবে উপস্থিত ছিলেন। কলেজ স্কোয়ারে তাঁর দেহ সমাহিত করা হয়।

ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের ফলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি ঘটে। একটি উন্নত ব্যবস্থার মধ্যে ইউরোপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি নবজাগরণের বৈশিষ্ট্যগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উপনিবেশিক ভারতবর্ষে আমরা মূল্যবোধগুলি পেয়েছি, কিন্তু তা সুপ্রতিষ্ঠিত করার বাস্তবভূমি পাই নি। দীর্ঘকালের সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয়ের ফলে মনোজগতের অবস্থা যখন প্রায় জড়ত্বপ্রাপ্ত, ঠিক সেই সময়ে ইউরোপের এই উন্নত মূল্যবোধ লাভ করাকে আমরা ইংরেজ শাসনের আশীর্বাদ বলে মনে করেছি। বিভিন্ন বিষয়ে সেদিনের পথপ্রদর্শকরা গতানুগতিক আন্দোলন করেছেন। কিছু বিদেশী মানুষও সেই গতানুগতিক আন্দোলনে সহায়তা করেছেন। কিন্তু যে বিষয়ের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন ছিল, তা করা হয় নি। উপনিবেশিক শাসনে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বা বিকাশ যে সম্ভব নয়—এই সহজ সত্যটি সে-সময়ে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক কারণেই তা হয়েছে। সেদিনের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষ বিশ্বাস করেছিল যে ইংরেজ শাসকদের সদিচ্ছায় একদিন এদেশে স্বাধীনতা আসবে। উনিশ-শতকের নবজাগরণের প্রথম দিকে তাই দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ প্রসারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। হেয়ারের ক্ষেত্রেও এই সীমাবদ্ধতা ছিল। বস্তুত দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ এই দুটিই পরিণত নবজাগরণের লক্ষণ। ডেভিড হেয়ার যখন এদেশের মানুষের মঙ্গল কামনায় ইংরাজি শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, ঠিক সেই সময়েই ব্রিটেনের বস্ত্রশিল্পের বাজার দখলের প্রচেষ্টায় এদেশের তাঁতশিল্প প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে।

হেয়ার তখনকার যুগের দুঃখ-দুর্দশা এবং সমস্যার মূল কারণের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেন নি বটে, কিন্তু কলকাতা শহরের দরিদ্র পরিবারগুলির ন্যায়সংগত অধিকারকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিনা বেতনে শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছিলেন। যার ফলে রামতনু লাহিড়ী বা কৃষ্ণমোহনের মতো অনেক দরিদ্র পরিবারের সন্তান আত্মমর্যাদা লাভ করে পরবর্তীকালে অসাধ্য-সাধন করেছেন। হেয়ার নবযুগের নব্যশিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মমর্যাদা সৃষ্টির কাজে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছেন। বাংলার নবজাগরণের ক্ষেত্রে এটি তাঁর এক উল্লেখযোগ্য অবদান। এইসব কারণে এদেশে মধ্যযুগীয় অবস্থা থেকে নবযুগে উত্তরণের ক্ষেত্রে হেয়ার-এর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানদৃষ্টিসমৃদ্ধ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলেই বাংলা তথা সমগ্র ভারতের শিক্ষার সুযোগপ্রাপ্ত মানুষ আজ দুনিয়ার কাছাকাছি আসতে পেরেছে। একই ভাবে তাঁরই প্রবর্ত্তিত পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যা ও বিজ্ঞান-শিক্ষা-

ব্যবস্থার ফলশ্রুতি হিসাবে আজ আমরা বিশ্বের যে কোনো দেশের চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণার সুফল ভোগ করতে পারছি। বিদেশী ডেভিড হেয়ার এদেশকেই তাঁর নিজের দেশ বলে মনে করেছিলেন। মনোজগত ও চিন্তাদর্শের দৈন্য ঘুচিয়ে নবযুগের উন্নত চেতনার উত্তরণের জন্য, তিনি এদেশের মানুষের হাত ধরেছিলেন প্রকৃত বন্ধুর মতো— আদর্শ শিক্ষকের মতো।

❑ গোপাল দেব

আধুনিক ভারতবর্ষ ও রামমোহন

....

রামমোহন স্থায়ীভাবে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন ১৮১৫ সালের শেষের দিকে।[১] তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে ১৭৭২ সালের ২২শে মে।[২] সে সময়ের অবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "রামমোহন রায় যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন তখন এখানে চতুর্দিকে কালরাত্রির অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। আকাশে মৃত্যু বিচরণ করিতেছিল। মিথ্যা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।...আমাদের অজ্ঞান আমাদের হৃদয়ের দুর্বলতাই তাহাদের (মিথ্যা ও মৃত্যু—লেখক) বল।...অজ্ঞানের মধ্যে মানুষ যেমন নিরুপায় যেমন অসহায়, এমন আর কোথায়। রামমোহন রায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গসমাজের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন বঙ্গসমাজ সেই প্রেতভূমি ছিল। তখন শ্মশানস্থলে প্রাচীনকালের জীবন্ত হিন্দুধর্মের প্রেতমাত্র রাজত্ব করিতেছিল। তাহার জীবন নাই, অস্তিত্ব নাই, কেবল অনুশাসন ও ভয় আছে মাত্র।"[৩]

রামমোহন সে সময়ের প্রথা অনুযায়ী বাংলা পাঠশালার লেখাপড়া শেষ করে ৯/১০ বছর বয়সে পাটনা গিয়েছিলেন আরবী ও ফারসি ভাষায় উপযুক্ত দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে। সেখানেই সুফী সাধকদের রচনার সাথে পরিচিত হন। শোনা যায় সে সময়ে কোরান পাঠ করে হিন্দুদের পৌত্তলিকতার যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে তাঁর সংশয় জাগে এবং ষোল বছর বয়সে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর মত প্রকাশ করেন। তাঁর বাবা-মা হিন্দু-সমাজের আচার-বিচার, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিভিন্ন লেখকের বক্তব্য থেকে জানা যায় রামমোহনের পৌত্তলিকতাবিরোধী মনোভাবের জন্য তাঁর সাথে তাঁর বাবা-মার তীব্র মতবিরোধ হয়। ডঃ ল্যান্ট কার্পেন্টারের মতে রামমোহন তাঁর বাবার বিশ্বাসের পিছনে যুক্তি কি তা জানার জন্য তাঁর সঙ্গে তর্ক করতেন। তাঁর বাবার কাছ থেকে সে সম্পর্কে কোন সদুত্তর না পেয়ে তিনি তাঁর পারিবারিক পরিবেশের বাইরে চলে যাওয়া স্থির করে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে তিব্বতে যান, বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য। সেখানে জীবিত লামাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করার রীতির বিরুদ্ধতা করায় তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা হয়। শোনা যায় সেই অবস্থায় কয়েকজন তিব্বতীয় মহিলার সাহায্যে প্রাণরক্ষা করে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। তিনি প্রায় তিন বছর তিব্বতে ছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত হন। তিব্বত থেকে ফিরে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করতে কাশীতে যান। তারও পরে তাঁর চব্বিশ বছর বয়সে ইংরাজি ভাষা শেখা শুরু করে খুব অল্প সময়ের

মধ্যে ইংরাজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। রামমোহনের সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী জন ডিগবীর সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। রামমোহন তাঁর অধীনে দেওয়ান হিসাবে কাজ করেন। তাঁর বক্তব্য থেকে রামমোহনের মানসিক গঠন সম্পর্কে আমরা কিছু জানতে পারি—"By persuing all my public correspondence with diligence and attention ; as well as by corresponding and conversing with European gentlemen, he acquired so correct a knowledge of English language to be enabled to write and speak it with considerable accuracy. He was also in the constant habit of reading the English newspapers, of which the continental politics chiefly interested him and from thence he formed a high admiration of the talents and prowers of the late ruler of France and was so dazzled with the splendour of his achievements as to become sceptical as to the commission, if not blind to the atrocity of his crimes, and could help lamenting his downfall, not withstanding the profound respect he ever professed for the English nation. But when the first transport of his sorrow had subsided, he considered that part of his political conduct which led to his abdication to have been so weak, and so madly ambitious, that he declared his future detestation of Buonaparte would be proportionate to his former admiration."[৪]

ভারতীয় সমাজের অবস্থা সম্পর্কে ১৮৫৩ সালে লেখা প্রবন্ধে কার্ল মার্কস বলেছিলেন—"আমরা কখনও ভুলতে পারি না এইসব কাব্যকল্প ছবির মতো গ্রামগুলি প্রাচ্যস্বৈরাচারের ক্রীড়াভূমি ছিল। ঐ সমাজ মানুষের মনকে ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার ফলে তা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধকারী যন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। ঐসব গ্রামসমাজ মানুষের মনকে বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত আচারের দাসে পরিণত করে তার বিশাল ঐশ্বর্য ও শক্তি থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল।"[৫] রামমোহন রায় কলকাতায় বসবাস শুরু করেন ১৮১৫ (মতান্তরে ১৮১৪ সালে) সালে। সে সময়ের অবস্থা সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন, "রামমোহন রায় যে সময়ে কলকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল ; পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর তার সীমা থেকে সীমান্তে পরিব্যাপ্ত ছিল…বঙ্গভূমি তিমিরাবৃত অরণ্যভূমি রাক্ষসভূমি ছিল, ভ্রষ্টাচারের পিশাচ সকল তাহাতে রাজত্ব করিত।"

১৮২৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি রামমোহন তাঁর এক বন্ধুকে লেখা এক একটি চিঠিতে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেন, "দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে ধর্মের আচার যা হিন্দুরা এখনও ধরে রেখেছে তা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থকে উন্নত করতে সাহায্য করবে না। বর্ণবৈষম্য অসংখ্য ভেদ ও ব্যবধান প্রবর্তন করেছে। এই ভেদাভেদ তাদের দেশপ্রেমের আবেগ থেকে বঞ্চিত করেছে। অগণিত আচার পালন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেকোনো কঠিন উদ্যোগ নেওয়ার ব্যাপারে তাদের অযোগ্য করে রেখেছে। আমার মনে হয় অন্ততঃপক্ষে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা এবং সামাজিক জীবনের স্বস্তির জন্য তাদের ধর্মে কিছু পরিবর্তন ঘটা উচিত।"[৬]

সে সময়ের ভারতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তাকে যথাযোগ্যভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নিজেদের উপযুক্ততা অর্জনের জন্য হিন্দুসমাজের সংস্কার প্রয়োজন বলে রামমোহন মনে করেছিলেন। ভারতবর্ষে উপনিবেশবাদী শাসকেরা তাদের বাণিজ্যের স্বার্থে রেলপরিবহণ সহ বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। তার ফলে ভারতীয় সমাজে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে সে সম্পর্কে কার্ল মার্কস বলেছিলেন, "রেল-যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে গড়ে উঠবে আধুনিক শিল্প এবং সেই শিল্প বংশানুক্রমিক শ্রম-বিভাগ (যার উপর বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত)-কে ভেঙে দেবে। এই বর্ণাশ্রমই ভারতবর্ষের প্রগতি ও উন্নতির পথে বাধা।"[৭]

রামমোহন তাঁর পূর্বোক্ত চিঠিতে যে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তাতে বোঝা যায় সে সময়ের আচারসর্বস্ব সংস্কারবদ্ধ সমাজ ভারতবাসীর "রাজনৈতিক স্বার্থের উন্নতির পরিপন্থী" এবং "যেকোনো কঠোর উদ্যোগ নেওয়ার অযোগ্য" ছিল। জাতিভেদের কঠোরতা, মধ্যযুগীয় সংস্কার, পৌত্তলিকতা, বেদের অপৌরুষেয়তা প্রভৃতির উপর নিঃশর্ত আনুগত্য অর্থাৎ বুদ্ধি, যুক্তি ও ব্যক্তির স্বকীয়তায় আস্থাহীনতা সমাজ বিবর্তনের গতিশীলতাকে শ্লথ করেছিল। জন ডিগবীর বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে রামমোহন সে সময়ে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন এবং রামমোহনের সমস্ত কর্মকাণ্ডকে পর্যালোচনা করলেও আমরা বুঝতে পারি যে পাশ্চাত্য দর্শন ও ইতিহাস তাঁর জীবনাদর্শ গঠনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। উদারনৈতিক চিন্তাধারাসম্পন্ন ইউরোপীয়দের সংসর্গ তাঁর চিন্তাধারাকে আরও উদার করতে সাহায্য করেছিল। ইংলন্ডের শিল্পবিপ্লবের সূচনাপর্বে সামাজিক উন্নতি ও অগ্রগতির যে বাতাবরণ সেখানে তৈরি হয়েছিল তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি ভারতীয় সমাজের, বিশেষ করে হিন্দু সমাজের, সংস্কারসাধনে প্রয়াসী হন। তিনি ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে প্রাচীন প্রথার উপর ঐকান্তিক নির্ভরতা ত্যাগ করে যুক্তিপূর্ণ বিচারের পথ অনুসরণ করার সপক্ষে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে বলেছেন—"সকল হিন্দুর কাছে যা ধর্মরূপে

স্বীকৃত হবে, রামমোহন জানতেন তাই হবে বিশ্বধর্ম। নিরাকার একেশ্বরের ধ্যান ও উপাসনা ব্যতীত সর্বমানব মিলনকেন্দ্র কোনো বিশেষ প্রতিমা, প্রতীক বা গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।"

রামমোহন বৈদিক সাহিত্য বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজিভাষী মানুষের কাছে সহজলভ্য করার জন্য নীচের উদ্ধৃত গ্রন্থগুলি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন—(১) বেদান্ত গ্রন্থ (বাংলা, হিন্দি) (২) বেদান্তসার (বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজি) (৩) কেনোপনিষদ (বাংলা, ইংরাজি) (৪) ঈশোপনিষদ (বাংলা, ইংরাজি) (৫) কঠোপনিষদ (বাংলা, ইংরাজি) (৬) মণ্ডুক্যোপনিষদ (বাংলা, ইংরাজি) (৭) মুণ্ডকোপনিষদ (বাংলা, ইংরাজি)।

রামমোহনের ভাবনা ও কাজের ধারা বিশ্লেষণ করে বিনয় ঘোষ বলেছেন—"ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের কয়েক বছর আগে থেকেই রামমোহন নবযুগের ঐতিহাসিক দিক নির্ণয়ের কাজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় প্রথম বেদান্তগ্রন্থ (১৮১৫) তিনি প্রকাশ করেছেন। বিচার বিতর্কও আরম্ভ করেছেন পূর্ণোদ্যমে, 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার' (১৮১৬-১৭) 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (১৮১৭) 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮) 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তক সম্বাদ' (১৮১৮ ও ১৮১৯) 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০) 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' ইত্যাদি। কেবল ভোজসভা নয়, তার সঙ্গে এইসব বিচার বিতর্কের সভাও শুরু হয়েছে। যুগপথিক রামমোহন নতুন যুগের পথ নির্দেশ করতে আরম্ভ করেছে।" [বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—বিনয় ঘোষ, পৃ. ৪২]।

পৌত্তলিকতা ও ধর্মের নামে চিরাচরিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্যেই রামমোহন হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ এবং অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেন। গোঁড়া হিন্দুদের কাছে এটাও ছিল অপরাধ। সে সময়ে অব্রাহ্মণ এবং মহিলাদের বেদপাঠ ছিল নিষিদ্ধ। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় কেবলমাত্র সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেই তার পবিত্রতা রক্ষা করা সম্ভব বলে তাঁরা মনে করতেন। রামমোহন এই কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের দুর্গে দারুণ সাহসের সাথে আঘাত করে-ছিলেন।

সতীদাহ নিবারণ

১৮০৩ সালে রামমোহনের বাবা রামকান্ত রায় মারা যান। বাবার মৃত্যুর পর তিনি চাকরি উপলক্ষে মুর্শিদাবাদে যান এবং সেখানে 'তহতুল মোহদ্দীন' নামে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ রচনা ফারসি ভাষাতে প্রকাশ করেন। এরপর তিনি ডিগবীর দেওয়ানের পদে রংপুরে কাজ করার সময় 'একেশ্বরবাদ' প্রচার করেন। এবং এ নিয়ে পণ্ডিত সমাজে তীব্র বাদানুবাদ হয়। অনেকের ধারণা ১৮১৭ সালে 'হিন্দু একেশ্বরবাদ' সম্বন্ধীয় যে বই প্রকাশিত হয় তা রংপুরেই তিনি রচনা করেছিলেন। ঐ সময়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রংপুরের

জজসাহেবের দেওয়ান গোরীকান্ত ভট্টাচার্য রামমোহনের মত খণ্ডন করে 'জ্ঞানাঞ্জন' নামে একটি বই রচনা করেন, যা সংশোধিত আকারে কলকাতায় ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই বাদানুবাদ বহুদিন ধরেই চলে। রামমোহন রায়ের ধর্মাচার বিষয়ে বিচার প্রথমে হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮২০ সালে 'যীশুর উপদেশাবলী এবং খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রতি আবেদন' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে তিনি আর এক বিতর্কের সৃষ্টি করেন। এরপর ১৮২১ সালে 'দ্বিতীয় আবেদন' ও ১৮২৩ সালে 'তৃতীয় আবেদন' প্রকাশ করেন। ১৮২১ সালে ব্যাপ্টিস্ট সম্প্রদায়ভুক্ত মিশনারী উইলিয়াম এ্যাডাম রামমোহন রায়ের সংস্রবে এসে 'ত্রিত্ববাদী বিশ্বাস' পরিত্যাগ করে রামমোহন রায়ের প্রচারিত 'একেশ্বরবাদ'-এ আস্থা প্রকাশ করেন। যুক্তিতে পরাস্ত হয়ে হিন্দু ও খ্রীস্টান উভয় সম্প্রদায়ের গোঁড়া সনাতনপন্থীরা রামমোহন রায়ের উপর ক্ষিপ্ত হন এবং তাঁর মতের সক্রিয় বিরোধিতা করেন। রামমোহন রায়ের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মূলকথাই ছিল উদার বিশ্বজনীনতা ও মানবতা। তিনি চেয়েছিলেন ধর্মচিন্তাকে সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করতে।

রামমোহনের যুক্তিবাদী কুসংস্কারমুক্ত মানসিকতার আর একটা অন্যতম বড় নিদর্শন হল 'সতীদাহ' বা 'সহমরণ' প্রথা অবসানের জন্য দুঃসাহসিক সংগ্রাম। 'সতী' কথাটার উৎপত্তি 'সৎ' থেকে হলেও যে সমস্ত বিবাহিত মহিলাকে পতি বা স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হত তাকেই বলা হত 'সতী'। অবশ্য স্বর্গলাভের লোভ দেখিয়েও অনেক বিধবাকে স্বামীর চিতায় পাঠানো হত। কেউ কেউ অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে বা দেশাচারের চাপে পড়েও 'সহমরণ'-এ যেতে বাধ্য হতেন। সে সময়ে এই কুৎসিৎ দেশাচারকে শাস্ত্রসম্মত বলে প্রচার করা হত।

সতীদাহ সম্পর্কে পরিসংখ্যান[৮]

	1815	1816	1817	1818	Total	1825	1826	1827	1828	Total
কলকাতা ডিভিশন	253	289	442	544	1528	398	324	337	309	1368
ঢাকা "	31	24	52	58	165	101	65	49	47	262
মুর্শিদাবাদ "	11	21	42	30	104	21	8	2	10	41
পাটনা "	20	29	49	57	155	47	65	55	55	222
বেনারস "	48	65	103	137	353	55	48	49	33	185
বেরেলি "	15	13	19	13	60	17	8	18	10	53
মোট	378	441	707	839	2365	639	518	510	464	2131

এই কুপ্রথা ভারতবর্ষের সব জায়গায় সমানভাবে প্রচলিত না থাকলেও কমবেশি সব জায়গাতেই চালু ছিল। ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায় পেশোয়া ও মোগল সম্রাটেরা এই কুপ্রথা বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন। এদের মধ্যে মোগল সম্রাট আকবরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। তবে হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের উপর আঘাত না করে যাতে এই প্রথাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, সেই চেষ্টাই তাঁরা করেছিলেন। বেন্টিঙ্কের আগে পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকেরাও ঐ একই পথ অনুসরণ করে এই নৃশংস প্রথাকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেছে। পূর্বপৃষ্ঠায় পরিসংখ্যান থেকে প্রকৃত অবস্থা অনেকটা আন্দাজ করা যাবে। ইংলন্ডের সমাজসেবীরাও সতীদাহ প্রথার অবসানের জন্য 'হাউস অব কমন্স' এবং ইস্ট ইন্ডিয়া হাউসে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৮২১ সালে এই বিষয়ের উপর প্রথম 'ব্লু বুক' প্রকাশিত হয়।

১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে 'সতীদাহ' বা 'সহমরণ' প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ভারতবর্ষের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের এ-এক বিরাট জয়। এই সংকাজটি সম্পাদনে সে সময়ের গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কের অবদান বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করার মতো। তবে রামমোহন ও তার সতীর্থদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা, অদম্য সাহস এবং নিষ্ঠার সাথে ধারাবাহিক সংগ্রামই যে এই সাফল্য আনতে সাহায্য করেছিল, তা আর উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। 'সতীদাহ প্রথার সপক্ষীয় ও বিপক্ষীয়দের মধ্যে আলোচনা' শিরোনামে বাংলায় লিখিত ও প্রচারিত একটি রচনার ইংরাজি অনুবাদ ১৮১৮ সালের ৩০শে নভেম্বর তিনি প্রকাশ করেন। জনৈক মিসেস্ ফ্রান্সেস্ কীথ মার্টিন তাঁর ২৬শে নভেম্বর ১৯২৯-এর লেখা ২৮শে তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিতে সতীদাহ প্রথার অবসানের জন্য রামমোহনের সহানুভূতি, ত্যাগ ও সাহসের ভূয়সী প্রসংসা করে বলেন যে তিনি বিগত আঠার বছর ধরে যে সংগ্রাম করেছেন, তার ফল হিসাবে ভারতের নারীসমাজ আজ একটি চরম অমানুষিক নিগ্রহ থেকে মুক্তি পেল। এছাড়াও সে সময়ের সমস্ত অগ্রসর চিন্তার ধারক ও খ্যাতিমান লোকেরা এই কুপ্রথার অবসানের জন্য রামমোহন ও তাঁর সহযোগী দ্বারকানাথ ঠাকুরের অবদান একবাক্যে স্বীকার করে তাঁদের কাজের জন্য প্রভূত প্রশংসা করেছেন।

সতীদাহ সম্পর্কিত তাঁর দ্বিতীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৮২০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি। 'সহমরণ' প্রথার সপক্ষে যেসব যুক্তি দেখান হত, উল্লিখিত নিবন্ধ দুটিতে রামমোহন সেগুলির বিরুদ্ধে অত্যন্ত সরল অথচ জোরালো ভাষায় উত্তর দেন। তিনি দেখিয়ে দেন, এই কু-প্রথা যে শুধু শাস্ত্রসম্মত নয় তাই নয়—এই প্রথা সম্পূর্ণ মানবিকতাবিরোধী এবং যেকোন সভ্য সমাজের পক্ষে কলঙ্ক। সভা-সমিতি ও পুস্তিকা প্রকাশের মধ্যেই তিনি তাঁর কর্মসূচীকে আবদ্ধ রাখেন নি। শ্মশানঘাটে গিয়ে তিনি সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, একাজ সঙ্গত নয়, অন্যায়। এসবের জন্য তাঁর বিরোধীরা তাকে উপহাস করেছে, বাধা দিয়েছে এমনকি প্রাণনাশেরও হুমকি দিয়েছে। কিন্ত তা সত্বেও তিনি তাঁর পথ থেকে সরে যান নি।

সতীদাহ প্রথা অবসানের জন্য রামমোহন রায়ের অবদান সম্পর্কে ১৮২৯ সালের ২৭শে জুলাই 'ইণ্ডিয়া গেজেট' যা লিখেছিল তার অংশবিশেষ নীচে উল্লেখ করা হল—'An eminent native philanthropist who has long taken the lead of his countrymen on this great question has been encouraged to submit his views of it in written form, and has been subsequently honoured with an audience by the Governor General, who, we learn, has expressed his anxious desire to put an end to a custom constituting so foul a blot……"[৯]

শিক্ষাসংস্কার প্রসঙ্গ :

খ্রীস্টান পাদ্রীদের ভারতে অবাধ প্রবেশ ও ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের দাবীতে ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উইলবারফোর্স প্রস্তাব আনেন। তাঁর উভয় প্রস্তাবই নাকচ হয়ে যায়। কোম্পানী বৈষয়িক কারণেই মিশনারীদের কার্যকলাপে উৎসাহ দেখাত না। তাদের ধারণা ছিল খ্রীস্টান মিশনারীরা ভারতীয়দের ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে তাদের কোম্পানী-বিরোধী করে তুলতে সাহায্য করবে। শিক্ষা প্রসার সম্বন্ধেও তাদের অনুরূপ ভীতি ছিল। শিক্ষা প্রসারের ফলে আমেরিকা ইংরেজদের হাতছাড়া হয়েছিল বলে অনেক নেতৃস্থানীয় ইংরেজের বিশ্বাস ছিল। তাই তারা ভারতে শিক্ষা প্রসারে বিরোধী ছিলেন। কিন্তু চার্লস গ্রান্ট প্রমুখ মিশনারীরা মনে করতেন যে হিন্দুদের মনের মুক্তির জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার। ধর্ম প্রচার ও শিক্ষার প্রসার হলে ইংরেজদের আরও যেসব সুবিধা হতে পারে তার দিকেও তাদের যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল। গ্রান্ট স্পষ্টই বলেছেন যে শিক্ষার গুণে রুচি বদলাবে, তখন তারা বিদেশী সামগ্রীর জন্য লালায়িত হবে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে সে সময়ে ইংলন্ডে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থকে। 'অবাধ বাণিজ্য' নীতির সমর্থকেরা ভারতে সমস্ত ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যের অবাধ অধিকারের দাবী করে। মিশনারীরা দাবী করে ভারতে প্রবেশ এবং সেখানে শিক্ষা প্রসারের অবাধ অধিকার। ভারতবর্ষের দ্বার সকলের কাছে উন্মুক্ত হোক এই দাবীতে পার্লামেন্ট ও কোর্ট অব ডাইরেক্টরস্-এর উপর চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে ১৮১৩ সালের চার্টারে ইউরোপীয়দের কিছুটা সুবিধা দেওয়া হয় ভারতে এসে বাণিজ্য করতে এবং বিশেষ শর্তে জমি কিনে বসবাস করতে। ব্রিটিশ মিশনারীদেরও অনুমতি দেওয়া হল ভারতে আসতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য যে ব্রিটিশ শাসন ও বাণিজ্য প্রসারের ফলে পুরনো গতিহীন স্থাবর ভারতীয় গ্রাম সমাজ ভেঙে পড়তে থাকে এবং বংশগত পেশা ও বৃত্তি থেকে বহুলোক চ্যুত হতে শুরু করে। পুরানো শিক্ষা-দীক্ষা ও ধ্যান-ধারণা এই শ্রেণীর লোকদের নতুন অবস্থার

মোকাবিলা করতে কোনভাবে সাহায্য করতে পারে না। এ ছাড়াও নতুন ব্যবসা ও শাসন-ব্যবস্থার ফলে এক শ্রেণীর ভারতীয়দের হাতে এই সময়ে মূলধন সৃষ্টি হতে আরম্ভ করেছে এবং তারা মূলধন বিনিয়োগের পথ সন্ধান করছে।

এই অবস্থায় ১৮১৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তৃতীয়বার সনদ পরিবর্তনের সময় পার্লামেন্ট ভারত সরকারকে জানালেন যে, প্রতি বছর কোম্পানীর আয় থেকে ন্যূনপক্ষে এক লক্ষ টাকা সাহিত্যের পুনরুদ্ধার ও উন্নতির এবং দেশীয় পণ্ডিতদের উৎসাহ দেবার জন্য ও ব্রিটিশ এলাকার মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান প্রচারের জন্য ব্যয়িত হবে। কিন্তু শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা ও কার্যকরী করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিল। একদলের মত হল ঐ অর্থ প্রধানত প্রাচীন ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি অনুশীলনের জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত। অপর পক্ষ আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের পক্ষে দৃঢ় মত ব্যক্ত করেন। ১৮২৩ সালে সরকারী কর্তৃপক্ষ কলক্যাতায় একটা সংস্কৃত কলেজ স্থাপনে প্রয়াসী হন। সংস্কৃত চর্চার সমর্থন-কারী গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দুরা রাজ পুরুষদের অভিপ্রায় তাদের মতের অনুকূল দেখে আনন্দিত হয়েছিলেন। রামমোহনের সংস্কৃত, আরবী, ফারসি প্রভৃতি সকল প্রাচীন ভাষায় লিখিত বিভিন্ন সাহিত্য, দর্শন ও শাস্ত্র সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভ করে এই প্রতীতি জন্মেছিল যে চিন্তার জগতে ভারতবর্ষকে কূপমণ্ডুকতা থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন। এবং ইংরাজি ভাষায় লিখিত আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন করে তিনি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছিলেন যে ভারতের কল্যাণের জন্য বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিকাশ এবং বিজ্ঞানচর্চা ভারতীয়দের একান্ত কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে লেখা চিঠির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি—

'কিন্তু আমরা দেখতে পারছি যে, ইতিমধ্যে ভারতে প্রচলিত রয়েছে এমন সব বিদ্যা-শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকার হিন্দু পণ্ডিতদের অধীনে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করছেন। আত্মা কিভাবে দেবতার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়? ঐশ্বরীক শক্তির সাথে তার সম্পর্কই বা কি? বেদান্তে উল্লিখিত এসব তত্ত্বের আলোচনার দ্বারা বিশেষ কোন উপকারই হতে পারে না। আবার ঐসব বৈদান্তিক তত্ত্ব—যা এই শিক্ষা দেয় যে, দৃশ্যমান বস্তু সকলের বাস্তব কোন অস্তিত্ব নেই; যেহেতু পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতির বাস্তব কোন মূল্য নেই, তাই তারা কোন প্রকার স্নেহ-ভালবাসা দাবী করতে পারে না এবং তাই যত শীঘ্র সম্ভব তাদের কাছ থেকে এবং সংসার থেকে আমরা সরে যেতে পারি ততই মঙ্গল—এর দ্বারা আমাদের যুবকরা সমাজের উৎকৃষ্টতর সভ্য হওয়ার উপযুক্ততা অর্জন করবে না। আবার বেদান্তের কয়েকটি অনুচ্ছেদ আবৃত্তি করেই কিভাবে একজন ছাগনিধনকারী পাপমুক্ত হতে পারে এবং বেদের অনুচ্ছেদগুলির প্রকৃত স্বরূপ কি, তাদের কার্যকরী প্রভাবই বা কি, ইত্যাদি জ্ঞান লাভ করে মীমাংসা শাস্ত্রের ছাত্রদের কোন প্রয়োজনীয় উপকার সাধিত হতে পারে না।

"জাগতিক বস্তুনিচয়কে কয়টি আদর্শ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। আত্মার সঙ্গে শরীরের, শরীরের সঙ্গে আত্মার, চক্ষুর সঙ্গে কর্ণের, ইত্যাদি সম্ভাব্য সম্পর্ক সম্বন্ধে ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করে ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্রদের মনের যথেষ্ট বিকাশ ঘটে বলে মনে করার কোন কারণ নেই।

"মহামান্য সরকার বাহাদুর যদি উপরি উল্লিখিত উদ্ভট শিক্ষাকে উৎসাহ দেওয়ার নিরর্থকতা সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি করতে চান, তবে আমি অনুরোধ করব মহামান্য সরকার বাহাদুর যেন অনুগ্রহ করে লর্ড বেকনের পূর্ববর্তী কালের ইউরোপের বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অবস্থার সঙ্গে বেকনের পরবর্তী সময়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তার তুলনা করে দেখেন।

"ব্রিটিশ জাতিকে যদি প্রকৃত জ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রাখাই উদ্দেশ্য হতো তবে স্কুলম্যানদের দ্বারা পরিবেশিত শিক্ষাকে বা প্রথাকেই বেকনীয় দর্শন দ্বারা কখনই স্থানচ্যুত হতে দেওয়া হতো না। ব্রিটিশ আইনসভার উদ্দেশ্য যদি এই হতো, এই দেশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখতে হবে, তবে তার জন্য সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থাই সবচেয়ে উপযুক্ত হতো। কিন্তু যেহেতু সরকারের উদ্দেশ্য হল, দেশীয় লোকদের উন্নতি বিধান করা, তাই সরকার অবশ্যই আরও উদার ও উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করবে। যার মধ্যে থাকবে অংক, প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, শারীরবিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান। মঞ্জুরীকৃত অর্থে ইউরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন মেধাবী ও পণ্ডিত ব্যক্তিকে নিয়োগ করে এবং প্রয়োজনীয় পুস্তক, সাজসরঞ্জামসহ একটি কলেজের ব্যবস্থা করেই তা করা সম্ভব।"

সামন্ত স্বার্থের প্রতিভূ রক্ষণশীল দল শিক্ষা জগতে আধুনিকতার বাতাস যাতে বইতে না পারে, পশ্চাদপদ ক্ষয়িষ্ণু ধ্যান ধারণার মধ্যে যাতে বুদ্ধিজীবীরা আবদ্ধ থাকে এবং 'ধর্ম' ও 'সত্য' বলে কতকগুলি বস্তাপচা সংস্কারের বেসাতি করে, সেজন্য চেষ্টা চালাতে থাকে। অবশ্য আমরা দেখতে পাই বাস্তব অবস্থার চাপে রক্ষণশীলদের আর এক অংশ, যারা ধর্মীয় কুসংস্কারের ব্যাপারে অত্যন্ত সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁরা শিক্ষার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম গোঁড়ামির পরিচয় দেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার এবং রাধাকান্ত দেব প্রমুখের নারীশিক্ষা প্রসারের প্রয়াস এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। অপর-দিকে রামমোহন বুর্জোয়া উদারনৈতিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে পশ্চাদমুখীনতার বিরুদ্ধে এবং অগ্রগতির পক্ষে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনরুজ্জীবনের জন্য আধুনিক বিজ্ঞান এবং যুক্তিবাদী দর্শনের অনুশীলন যে একান্ত প্রয়োজন তা রামমোহন অনুভব করেছিলেন এবং স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ইংরেজ শাসক, খ্রীস্টান মিশনারী এবং

রামমোহন একই লক্ষ্য সাধনে 'আধুনিক শিক্ষার' সমর্থক ছিলেন না। ১৮২৩ থেকে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগ ভারতীয় প্রাচীন ভাষার মাধ্যমে প্রাচ্যজ্ঞান প্রসারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলে নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণা করে বলেন ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারই হবে সরকার পৃষ্ঠপোষিত শিক্ষার লক্ষ্য। এই সময়ের মধ্যে ইংরেজরা সারা ভারতে তাদের প্রভুত্ব বিস্তার করে স্থায়ীভাবে এ দেশকে শাসন করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বিদেশী শাসক ও ভারতবর্ষীয় শাসিতের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী উভয়ের ভাষায়পারদর্শী একশ্রেণীর লোকের প্রয়োজন হয়ে পড়ল ইংরেজ শাসকদের। প্রশাসনিক কাজেও দরকার ইংরেজি জানা অনেক কর্মচারী, কারণ সকল স্তরের কর্ম-চারীকে ইংলন্ড থেকে আনা ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। এই সময়ে ইংলন্ডে শিল্পায়নের ফলে সেখানকার কর্মীদের বেতনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকেরা তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থে ভারতবর্ষে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশী-বিদেশী ও সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন মহলের উদ্যোগে পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার ভারতের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে কার্ল মার্ক্স বলেন—"ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে তাদের অনিচ্ছা ও কার্পণ্য সত্ত্বেও ভারতবাসীদের মধ্য থেকে একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছে—যারা শাসনব্যবস্থার গুণাবলী প্রাপ্ত হচ্ছে এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানের আলোকে প্রভাবিত হচ্ছে।"

এই প্রক্রিয়ার অন্যতম ফসল হলেন রামমোহন। যিনি এই প্রক্রিয়াকে আরও বিকশিত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই কাজে দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার প্রভৃতি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিত্তশালী ভারতীয় চিন্তাবিদ্ এবং ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ও কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই তাঁর সহযোগী ছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা তাদের শোষণ ও শাসনের স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাদের সমস্ত উদ্যোগ নিয়োজিত করলেও, শিক্ষা সম্পর্কে রামমোহনের মৌলিক চিন্তা ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তায় রামমোহনের আদর্শের সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। তিনি চেয়েছিলেন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার এবং যুক্তিবাদী মানসিকতা গঠনে সহায়ক একটি শিক্ষাব্যবস্থা।

'হিন্দু স্কুল' প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব আলোচিত হয় ১৮১৬ সালে। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয়-সভা'র ১৮১৬ সালের একটি সভার শেষে "হেয়ার পুনরায় ইংরাজী শিক্ষার উপায় বিধানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। কথোপকথনের পর স্থির হইল যে, একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হইবে।...বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় আত্মীয় সভার একজন সভ্য ছিলেন...অনুমান করা যায়, বৈদ্যনাথ মুখুয্যেই হেয়ার ও রামমোহন রায়ের প্রস্তাবিত ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংবাদ তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের

প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ইষ্ট (Sir Hyde East) মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করিয়া থাকিবেন।...হঠাৎ সংবাদ প্রচারিত হইল যে, রামমোহন রায় এই প্রস্তাবের মধ্যে আছেন এবং তিনি প্রস্তাবিত কলেজ কমিটিতে থাকিবেন। সে সময়ে সহরের হিন্দু ভদ্রলোকদিগের রামমোহন রায়ের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি এমনি প্রবল ছিল যে, এই সংবাদ প্রচার হইবামাত্র সকলে বাঁকিয়া বসিলেন, 'তবে এই কলেজের সহিত আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকিবে না।'...তিনি (স্যার হাইড ইস্ট—লেখক) নিরুপায় দেখিয়া ডেভিড হেয়ারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।...তিনি বলিলেন, 'আপনি চিন্তা করিবেন না, রামমোহন রায় শুনিবামাত্র নিজেই কমিটি হইতে নিজের নাম তুলিয়া লইবেন।'...তিনি গিয়া রামমোহনকে এই কথা বলিবামাত্র তিনি বলিলেন, 'সে কি কথা। কমিটিতে আমার নাম থাকা কি এতই বড় কথা যে, সেজন্য একটা ভাল কাজ নষ্ট করিতে হইবে?' তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের নাম তুলিয়া লইবার জন্য স্যার হাইড ইষ্টকে পত্র লিখিলেন।"[১০]

আধুনিক শিক্ষা প্রসারের জন্য রামমোহনের অন্যান্য উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার উল্লেখ ও আলোচনা করে এই প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত করা উচিত হবে না। শুধুমাত্র আর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। ১৮২৭ সাল থেকে যে বৈষম্যমূলক 'জুরী আইন' প্রচলিত হয়েছিল তার প্রতিবাদে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের সই সম্বলিত একটি আবেদন রামমোহন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উভয় সভায় উপস্থাপনের জন্য ১৮২৮ সালের ১৮ই আগস্ট মিঃ জে ক্রফোর্ড-এর কাছে পাঠান। তাতে তিনি বলেন,

"Supposing that some 100 years hence the native character becomes elevated from constant intercourse with Europeans and the acquirements of general and political knowledge as well as of modern arts and sciences, is it possible that they will not have the spirit as well as the inclination to resist effectually any unjust and oppresive measures, serving to degrade them in the scale of society ?"[১১]

উপরের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাবে ভারতীয়দের মধ্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের বিষয়টিকে রামমোহন কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন।

গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসঙ্গেঃ

জুরী আইন—১৮২৭ সালে প্রবর্তিত নূতন "জুরী-আইন"-এর বিষয়টি আগে অন্য প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। ঐ আইনের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে রামমোহন বলেন, "নূতন জুরী-আইনের মারফৎ দেশের বিচার ব্যবস্থায় ধর্মভিত্তিক বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা চালু করে বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের প্রাক্তন সভাপতি মি. উইন (Mr. Wyun) যে শুধু সাধারণভাবে ভারতীয়দের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার করেছেন

তাই নয় ; রাষ্ট্র পরিচালনের বিধি-নিয়ম সম্পর্কে যাঁরা অবহিত তাঁদের প্রত্যেকেই এই ধরনের ব্যবস্থায় বিশেষ উদ্বেগ বোধ করছেন। এই আইনের বলে হিন্দু বা মুসলমান ধর্মাবলম্বী যে কোনো ভারতীয়ের বিচারের জন্য যে কোনো ইউরোপীয় বা ভারতীয় খ্রীষ্টান জুরী হিসাবে নিযুক্ত হতে পারবেন অথচ কোনো হিন্দু বা মুসলমান, তিনি সমাজে যতই মান্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকৃত হন না কেন, ভারতীয় ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানসহ যে কোনো খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী মানুষের বিচারের জন্য তিনি জুরী হিসাবে নির্বাচিত হতে পারবেন না। এমনকি এই আইনে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে তাঁদের সমধর্মাবলম্বী মানুষদের বিচারের জন্য 'গ্র্যান্ড জুরী'র সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। মি. উইনের বিলের এই মূল দৃষ্টিভঙ্গীর আমরা তীব্র বিরোধিতা করি।"[১২]

রামমোহনের প্রচেষ্টা এবং মি. চার্লস গ্রাণ্টের সহযোগিতায় ১৮৩১ সালে জুরী নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টররা 'ইণ্ডিয়ান বোর্ড'-এর সভাপতির কাছে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের বিরুদ্ধে যে যুক্তিগুলি উল্লেখ করে চিঠি দেন, রামমোহন তার প্রতিটির উত্তর দিয়ে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেন। 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত' রাজা রামমোহন রায়ের ইংরাজি রচনাবলী থেকে এ সম্পর্কে আরও বিশদ জানা যাবে।

প্রেস আইন ১৮২৩ সালের 'প্রেস অর্ডিন্যান্স'-এর বিরুদ্ধে রামমোহন স্বতন্ত্র-ভাবে এবং দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার এবং অন্যান্যদের সাথে সুস্পষ্টভাবে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাকে প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সপক্ষে ভারতে এখনও যে আন্দোলন চলছে তারই সার্থক সূচনা বলা যেতে পারে।

'প্রেস আইন'-এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন ভারত সরকারের অফিসারদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিরুদ্ধ মতামত প্রকাশের সমস্তরকম সুযোগ বন্ধ করা। মোট আটটি নিষেধাত্মক বিধির সমষ্টি ছিল উক্ত প্রেস আইনটি। রামমোহন তাঁর দীর্ঘ প্রতিবাদ পত্রে ঐ আইনের প্রতিটি ধারার এবং সামগ্রিকভাবে আইনটির যৌক্তিকতা চ্যালেঞ্জ করে দীর্ঘ প্রতিবাদপত্র রচনা করেন। প্রতিবাদপত্রের নীচে উদ্ধৃত উক্তিগুলি আমাদের দেশের সংবাদপত্র ও পুস্তিকাদি প্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্নে আজও প্রাসঙ্গিক।

এ সম্পর্কে রামমোহনের লেখা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল—

"...ever since the art of printing has become generally known among the natives of Calcutta, numerous publications have been circulated in the Bengalee language, which by introducing free discussion among the Natives and inducing them to reflect and enquire after knowledge, have already served greatly to improve their minds and ameliorate their

condition. This desireable object has been chiefly promoted by the establishment of four native papers, two in Bengalee and two in the Persian languages, published for the purpose of communicating to those residing in the interior of the country, accounts of whatever occurs worthy of notice at the Presidency or in the courtry, and also the interesting and valuable intelligence of what is passing in England and in other parts of the world, conveyed through the English Newspapers or other channels.

"After this Rule and Ordinance shall have been carried into execution,...a complete stop will be put to the deffusion of knowledge and the consequent mental improvement now going on,...And the same cause will also prevent those Natives who are better versed in the laws and customs of the British Nation, from communicating to their fellow subjects a knowledge of the admirable system of Government established by the British, and the peculiar excellencies of the means they have adopted for the strict and impartial administration of justice. Another evil of equal importance in the eyes of just Ruler, is, that it will also preclude the Natives from making the Government readily acquainted with the errors and injustice that may be committed by its executive officers in the various parts of this extensive country ;..." (From Memorial to the 'Supreme Court' by Chunder Coomar Tagore, Dwarkanath Tagore, Rammohan Roy & others).

"A Government conscious of rectitude of intention, can not be afraid of public scrutiny by means of the Press, since this instrument can he equally well employed as a weapon of defence,...

"It is well known that despotic Governments naturally desire the suppression of any freedom of expression might tend to expose their acts to the obloquy which ever attends the exercise of tyranny or oppression, and argument they constantly

resort to, is, that the spread of knowledge is dangerous to the existence of all legitimate authority, since, as a people become enlightened, they will discover that by a unity of effort, the many may easily shake off the yoke of the few, and thus become emancipated from the restraints of power altogether forgetting the lesson derived from history, that in countries which have made the smallest advances in civilization, anarchy and revolution are most prevalent—which on the other hand, in nations the most enlightened, any revolt against governments which have guarded inviolate the rights of the governed, is most rare, and that the resistence of a people advanced in knowledge has ever been—not against the existence,—but against the abuse of the Governing power." (From 'Appeal to the King in Council'—Ref. the English Works of Raja Rammohan Ray published by Sadharan Bramho Samaj.)

আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় স্বাধীন সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে রামমোহনের স্বচ্ছ ধারণা ও সুগভীর চিন্তাপ্রসূত মতামত ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধিকার ও নাগরিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনের ইতিহাসে এক অমূল্য সম্পদ।

বিচার ব্যবস্থা প্রসঙ্গে :

রামমোহন সিলেক্ট কমিটিতে তাঁর বক্তব্য পেশ করার সময় ভারতবর্ষের সে সময়কার বিচারব্যবস্থার একটা সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে অন্যান্য বিষয়ের সাথে নীচের বিষয়গুলি উল্লেখ করেন—আদালতের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম হওয়ায়, দূরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা অর্থ ও সময়ের অভাবের জন্য এবং স্থানীয় ধনী প্রতিবেশীদের নিপীড়নের ফলে বিচারালয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন, ঐ একই কারণে একটি বিরোধ নিষ্পত্তিতে প্রচুর সময় লাগে এবং খরচও অনেক বেড়ে যায়। বিলম্বিত ও ব্যয়বহুল বিচারের সুযোগ সব সময় বড়লোকেরাই পেয়ে থাকে। বিদেশী বিচারকেরা স্থানীয় ভাষা না জানার ফলে বিচার্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য তাঁদের স্বল্প বেতনের দেশীয় কর্মচারীদের উপর নির্ভর করতে হয়। এর সুযোগে এই সমস্ত কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিচারকে সম্পূর্ণ প্রহসনে পরিণত করে থাকে। তিনি আরও বলেন—কোনো বিধিবদ্ধ আইন (code of law) না থাকায় এবং যে সমস্ত 'রেগুলেশন'-এর ভিত্তিতে বিচারের কাজ চলে, সেগুলি সহজে পাওয়া না যাওয়ায় বিচারপ্রার্থী ও তাদের প্রতিনিধিরা চালু আইনগুলির সাথে পরিচিত হওয়ার

সুযোগটুকু থেকেও বঞ্চিত হয়। এই অবস্থা সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থার সাথে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যে ভাষায় মামলার বিবরণী লিপিবদ্ধ হয় সেই ফারসি ভাষা অধিকাংশ বাদী, বিবাদী ও সাক্ষীরা জানেন না, ফলে সাধারণ মানুষ সুবিচার থেকে বঞ্চিত হন।

এই সমস্ত অব্যবস্থা দূর করার জন্য রামমোহন বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করেন। যার মধ্যে দুটি দাবি ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। আজ থেকে ১৫০ বছরেরও আগে তিনিই প্রথম যিনি জুরি নিয়োগের এবং বিচার ও শাসন বিভাগকে পৃথকীকরণের দাবি উত্থাপন করেছিলেন। ভারতবর্ষের গ্রাম-সমাজের যৌথ বিচারব্যবস্থার ইতিবাচক দিকের সাথে আধুনিক চিন্তা-চেতনা থেকে উদ্ভূত বিধিবদ্ধ বিচার পদ্ধতির সমন্বয়সাধনের কথা তিনি বলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হল—

"In order however, to render the administration justice, efficient and as perfect as human efforts can make it, and to remove the possibility of any undue influence which a native assessor might attempt to exercise on the bench under a European judge of insufficient capacity, as well as to do away the vexatious delays and grievous suffering attending appeals, it is necessary to have recourse to trial by Jury, as being the only effectual check against corruption, which, from the force of inveterate habit, and the contagion of example, has become so notoriously prevalent in India." (The English Works of Raja Rammohan Roy, Part III, P. 18)

স্বৈর-শাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁর উপরোক্ত চিন্তা ও প্রয়াস ভারতের সামাজিক ইতিহাসের পাঠককে নিশ্চয়ই আকৃষ্ট করবে।

১৮৩২ সালের রিফর্ম এ্যাক্ট পাশ হওয়ার আগে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভূস্বামী ও অভিজাত শ্রেণীর প্রভাবাধীন ছিল। এদের চিন্তা ও ধ্যান ধারণা নবসৃষ্ট বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল না হওয়ায় বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। শ্রেণী স্বার্থের খাতিরেই এই বুর্জোয়ারা ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিচার বিভাগের স্বাধিকার দাবী করে এবং শাসন থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করতে সক্ষম হয়। স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে মন্টেস্কুর বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। রামমোহন এইসব চিন্তাধারায় পুষ্ট হয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করার আশায় ভারতবর্ষেও এই দুই বিভাগের পৃথকীকরণ দাবী করেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের ২৫ বছর পরেও ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয় নি,

বরং বিচার বিভাগের উপর শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ বেড়ে চলেছে এবং মাঝে মাঝেই তা নগ্ন রূপ ধারণ করছে।

ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা প্রসঙ্গে :

রামমোহন ভারতবর্ষের চাষীদের অবস্থা সম্বন্ধে যে বিশেষভাবে ওয়াকেবহাল ছিলেন ভূমি ও রাজস্ব সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটিতে তাঁর উত্থাপিত বক্তব্য থেকে স্পষ্টই তা বোঝা যায়। চাষীর উপর খাজনার দুঃসহ বোঝা সম্পর্কে তিনি বলেন, "কাগজে পত্রে বলা হয়ে থাকে যে দেয় খাজনা উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের সমান। এই অর্ধেকের ১০/১১ বা ৯/১০ ভাগ রাজস্ব হিসাবে সরকারকে দেয়, বাকী ১/১১ বা ১/১০ ভাগ জমিদারের প্রাপ্য নীট খাজনা। চাষের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম ও বীজ বাবদ সম্পূর্ণ ব্যয় চাষীকে বহন করার পর উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক রাজস্ব। কিন্তু কার্যতঃ ১৭৯৩ সাল থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী ব্যবস্থায় জমিদারেরা তাদের নবলব্ধ ক্ষমতার সুযোগে খাজনা বাড়াবার সমস্ত রকম কৌশলগুলিকে ব্যবহার করে।"[১৩]

প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতে জমির উপর চাষীর অধিকারের সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ছিল না, প্রধানত ব্রিটিশ রাজশক্তিই চাষীর এই অধিকার হরণ করে নেয়, এই প্রসঙ্গে রামমোহন নিম্নোক্ত বক্তব্য রাখেন—"পূর্বে 'খুদখাস্ত' রায়তেরা (গ্রামের যৌথ মালিকানাভুক্ত জমির কর্ষণকারী চাষী) বৃদ্ধির অযোগ্য নির্দিষ্ট খাজনার ভিত্তিতে চিরদিন জমি ভোগ দখল করার অধিকারী ছিল···যখন বাংলাদেশে (১৭৯৩) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয় তখন সরকার জমিদারদেরই জমির একমাত্র স্বত্বাধিকারীরূপে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু চাষীদের জমির উপর অনুরূপ কোন অধিকার স্বীকৃত হয় নি।"[১৪]

জমিদারেরা যে নীতি বিগর্হিতভাবে নিকৃষ্ট স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা প্ররোচিত হয়ে প্রজাদের খাজনা বৃদ্ধি করতেন সে সম্পর্কে তিনি নিম্নলিখিত তথ্য তুলে ধরেন,—"নীতি হিসাবে গুণানুযায়ী একটি জোতের বিভিন্ন অংশকে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ এই চারটি শ্রেণীতে ভাগ করে ঐ জেলার প্রচলিত খাজনা হারের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রত্যেক শ্রেণীর জমির বিঘা প্রতি খাজনার হার নির্ধারিত করা হয় এবং এই হার চাষীদের দেয় খাজনার নিরিখ হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু যেহেতু জমির শ্রেণী নির্ধারণ ব্যাপারটি সব সময়ই বিতর্কমূলক এবং জমির শ্রেণী সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা জমিদার অথবা সরকারী আমিনদের খেয়াল খুশির উপর নির্ভরশীল এবং আমিনদের অজ্ঞতা, অসৎ উদ্দেশ্য অথবা ইচ্ছাকৃত ভ্রান্তির ফলে জমির পরিমাণের হিসাবের হেরফের প্রতিনিয়তই হওয়ার সম্ভাবনা, সেইহেতু কাগজে-কলমে খাজনার একটা নিরিখ নির্ধারিত থাকলেও বাস্তবে কোন নির্দিষ্ট নিরিখ কার্যকরী নেই, যা চাষীর উপর খাজনার হার ও মোট খাজনার পরিমাণ নির্ধারণে চাষীর স্বার্থ রক্ষা করতে পারে।···মোট উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক, খাজনার হার হিসাবে কাগজে-কলমে লিপিবদ্ধ থাকলেও প্রায়শই বিভিন্ন কৌশলে এর

চেয়ে অনেক বেশি হারে খাজনা বৃদ্ধি করে আদায় করা হয়। যে বছর প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়; যখন শস্যের দাম খুব কম থাকে; জমিদারের পাওনা মেটাতে চাষীদের সমস্ত শস্য বিক্রী করে দিতে হয়। বীজ ও নিজেদের খাওয়ার জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।"[১৫]

বাকী খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারেরা প্রজার প্রতি কি রকম দুর্ব্যবহার করত সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"কয়েকটি জিনিষ ছাড়া জমিদারেরা চাষীর সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি পুলিশের সাহায্যে ক্রোক করে নিয়ে এসে বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় বিক্রি করে থাকে।...অবশ্য বাকী খাজনা আদায়ের জন্য অতি দ্রুততার সাথেই বিচারালয় জিনিসগুলি বিক্রীর জন্য সম্মতি দিয়ে থাকে।...তারপর সাধারণ বিভাগীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং এরপরও যদি বকেয়া খাজনা পরিশোধ না হয় তবে চাষীকে গ্রেপ্তার করা হয়।"*

রায়তওয়ারী অঞ্চলের চাষীদের অবস্থাও যে অত্যন্ত শোচনীয় ছিল সে সম্পর্কে রামমোহন বলেন—"উভয় ব্যবস্থাতেই চাষীর অবস্থা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত। এক ক্ষেত্রে চাষীরা জমিদারদের অর্থলিপ্সা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার শিকার, অন্যক্ষেত্রে তারা আমিন ও রাজস্ব বিভাগের অন্যান্য আমলাদের অত্যাচার ও চক্রান্তের কবলিত। আমি উক্ত উভয় অঞ্চলের চাষীদের দুরবস্থার জন্য গভীর মর্মবেদনা অনুভব করি।"[১৬]

চাষীদের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি যে দাবি করেন তা নীচে উদ্ধৃত করা হল— "নতুন ব্যবস্থা চালু হবার পর বিগত চল্লিশ বছর ধরে জমিদারেরা নিজেদের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে জমি বন্দোবস্তকে ব্যবহার করেছে এবং বারে বারে চাষীর উপর খাজনার বোঝা অত্যধিক বৃদ্ধি করেছে।... সরকার যদি চাষীদের জন্য ন্যূনতম কিছু করতে ইচ্ছুক থাকেন তবে যা করা উচিত তা হল চাষীদের উপর খাজনা বৃদ্ধি (যে কোন অজুহাতে) সম্পূর্ণ বেআইনী ঘোষণা করা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের সময় (রেগুলেশন ১, ১৭৯৩; ধারা ৮, উপধারা ১) চাষীদের অসহায় অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে চাষীদের স্বার্থরক্ষার অধিকার ও দায়িত্ব সরকারের থাকবে এবং এ বিষয়ে জমিদারদের কোন কারণেই বিরোধিতা করার অধিকার থাকবে না। এ আইনে (রেগুলেশন ৮, ধারা ৬০, উপধারা ২) সরকার 'খুদখাস্ত' চাষীদের তাদের চাষকৃত জমিতে স্থায়ী অধিকার নীতিগত ভাবে স্বীকার করেছিলেন এবং কয়েকটি অবস্থা ব্যতিরেকে এই সব চাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা বা জমির স্বত্ব বাতিল করা বে-আইনী বলা হয়েছিল। যে যে বিশেষ অবস্থায় চাষীদের

* "Then there were the lands of the Russian and Indian communes that had to sell a portion of their product and increasing one of that for the purpose of obtaining money for the taxes wrug from them by the pitiless despotism of the state .." Marx, Capital III

বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে বলে উল্লিখিত হয়েছিল তা অবশ্যই ১৭৯৩ সালে সাধারণ বন্দোবস্তের সময়ের কথাই বলা হয়েছে—পরবর্তী চল্লিশ বছর ধরে ঐ ব্যবস্থা চলতে থাকবে তা নিশ্চয়ই তাতে বলা হয় নাই।"[১৭]

"খাজনা বৃদ্ধি ছাড়া অন্য উপায়ে সরকার যদি আয় বৃদ্ধি করতে পারেন বা প্রশাসন ব্যয়, বিশেষ করে রাজস্ব বিভাগের, সংক্ষেপ করতে পারেন তবে যে সব জেলায় খাজনার হার অত্যধিক বেশি সেখানকার চাষীদের জমিদারকে দেয় খাজনা কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং সমহারে জমিদারদের দেয় রাজস্বও কমান যেতে পারে।"[১৮]

এ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন—"কোন অজুহাতেই নতুন বন্দোবস্ত ও খাজনা বৃদ্ধি করা চলবে না। এবং এই মর্মে স্থানীয় ভাষায় জনসাধারণের জন্য প্রত্যেক গ্রামে ইস্তাহার টাঙিয়ে দিতে হবে এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে হবে যে তারা যেন লক্ষ্য রাখে যে ঐ ইস্তাহার কমপক্ষে বারমাস প্রকাশ্যে প্রদর্শিত অবস্থায় থাকে এবং এই আইন যাতে জমিদারেরা ভঙ্গ করতে না পারে। তৃতীয়তঃ, মুনসেফদের (বাকী খাজনার দায়ে) সম্পত্তি বিক্রী করার নির্দেশ দেবার আগে দেখতে হবে যে জমিদারেরা যে দায়ে চাষীর সম্পত্তি ক্রোক করেছে তা পূর্ব বৎসরের খাজনার হারের চেয়ে বেশি হারের ভিত্তিতে দাবী হয়েছে কি না। এবং চাষীর এ দায় সম্পর্কে যদি সে নিঃসন্দেহ না হয় তবে ঐ ক্রোককৃত সম্পত্তি ছেড়ে দেওয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেবে। চতুর্থতঃ, জজ বা ম্যাজিস্ট্রেটরা এই ধরনের মামলার বিচারের জন্য সপ্তাহে একটি দিন ধার্য করে রাখবে এবং যদি কোন জমিদার পূর্ব বৎসর থেকে বেশি হারে খাজনা দাবী করে তবে সেই অপরাধে চড়া হারে জমিদারদের জরিমানা করবে। যদি কোন পুলিশ অফিসার বা দেশীয় কর্মচারী এই খাজনা বৃদ্ধির ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত আছে বা এ সম্পর্কে তার কর্তব্যের অবহেলা করেছে বলে প্রমাণিত হয় তবে তাদের জরিমানা ও চাকুরী থেকে বরখাস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। পঞ্চমতঃ, দরিদ্র চাষীদের স্বার্থে রচিত আইন ঠিকমত কার্যকরী হচ্ছে কি না তা সরেজমিনে দেখবার জন্য প্রতি জেলার জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রতি বছর শীতকালে একবার করে সমস্ত জেলা ঘুরে দেখবার নির্দেশ দিতে হবে। ষষ্ঠতঃ, প্রত্যেক জেলার কালেক্টরকে এই মর্মে নির্দেশ দিতে হবে যে সে একটা রেজিস্টার রাখবে যাতে প্রত্যেক চাষীর নাম, জমির পরিমাণ এবং প্রস্তাবিত নিয়মানুযায়ী স্থায়ীভাবে নির্ধারিত খাজনার পরিমাণ উল্লেখ থাকবে।"[১৮]

নূতন ভূমি ব্যবস্থার ফলে কোন শ্রেণীর লোক বেশি লাভবান হয়েছে সে সম্পর্কে রামমোহনের বক্তব্য নিম্নরূপ—"আমার জ্ঞান অনুযায়ী বলা যায় তাদের (চাষীদের) অবস্থার সামান্য উন্নতিও হয় নাই। অপরপক্ষে জমির মালিকদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে নিঃসন্দেহে। এলাকার উন্নতির ভিত্তিতে ক্রমবর্ধমান রাজস্বের বদলে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' স্থায়ী রাজস্ব ব্যবস্থার ফলে জমিদারদের অবস্থার অনেক পরিমাণে উন্নতি ঘটে। এই ব্যবস্থার ফলে তারা পতিত জমিকে কর্ষণযোগ্য করে এবং জমির খাজনা বৃদ্ধি

করে তাদের নিজস্ব আয় বাড়িয়েছে। ফলে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি ঘটেছে।”[১৯]

চাষীর খাজনা বৃদ্ধি সম্পর্কে রামমোহনের বক্তব্য আমরা আগেই আলোচনা করেছি। উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে তিনি আরও বলেন—“১৭৯৩ সালের আইনের ১নং ও ৮নং রেগুলেশনের বলে এবং পরবর্তী অন্যান্য রেগুলেশনের দ্বারা জমিদারদের নতুন-ভাবে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া এবং খাজনা বৃদ্ধির অধিকার দেওয়ায় অজস্র প্রজার স্বার্থের বিনিময়ে বরং বলা চলে তাদের ধ্বংস করে, মুষ্টিমেয় জমিদার লাভবান হয়েছে।”[২০]

কিন্তু দেখা যাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এত কুফল জানা থাকা সত্বেও রামমোহন কোনোখানে এই ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার কথা বলেন নি। বরং তিনি বলেন—

“যদি এ ব্যবস্থা (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) প্রচলিত না হত তবে রাজস্ববৃদ্ধি প্রতিরোধ করার জন্য জমিদারেরা পতিত জমিকে কর্ষণযোগ্য করত না এবং খাজনা বৃদ্ধি কৌশলে এড়িয়ে যেত। অথচ চাষীদের অবস্থা এখনকার চেয়ে বিশেষ কিছু ভাল হত না।” সরকার যদি বাংলা বিহার ও উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী ব্যবস্থা চালু না করে মাদ্রাজের মতো রায়তওয়ারী ব্যবস্থার অধীন রাখত তবে, রামমোহনের মতে—“সমস্ত জমিদারসমাজ… দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ত।”[২১] এর আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যেখানে রামমোহন বলেছেন—“চিরস্থায়ী ব্যবস্থার ফলে জমিদারেরা পতিত জমিকে কর্ষণযোগ্য করে… তাদের নিজস্ব আয় বাড়িয়েছে, ফলে দেশের সম্পদবৃদ্ধি হয়েছে।” রামমোহনের এই আপাতদৃষ্ট পরস্পরবিরোধী মনোভাব লক্ষণীয়। শ্রেণীসুলভ পিছটান তো থাকতেই পারে। কিন্তু তবু কিছু জিনিস আছে যা বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত। এ কি শুধু সাধারণ জমিদারী শোষণ (যার তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন), তারই আকর্ষণের প্রতিচ্ছবি না কি এমন কিছু আছে যাতে শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে (ভুল-ঠিক যাই হোক) দেশেরও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু আশা পোষণের স্বপ্ন ছিল ?

ইংরেজ আসার আগে গ্রামের ভিতর ব্যক্তির অধিকার যাই থাকুক, মোট গ্রামসমাজের আধিপত্যের পরিপ্রেক্ষিতে সে অধিকার সীমিত ছিল। আবার স্বৈরাচারী রাজার বাস্তব ক্ষমতার সম্মুখে গ্রামসমাজের অধিকারও ছিল সীমিত। ইংরেজ আসার আগে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মর্যাদা যাই হোক তার নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা কিছুই ছিল না। এক রাজার বদলে আর এক রাজা এলে অবস্থাটা খুবই অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়াত।

"...The Ain proves that Akbar considerably interested with Sayurghal land arbitrarily resuming whatever lands he liked... to the ruins of many a muhammedan (Afghan) family..." (Aini Akbari, Jarret, Asiatic Society, 1891—Page 270) "...And yet the lands which had been withdrawn became the dwelling places of wild animals and thus belonged neither to the Aimadars nor to the farmers..." (Ibid—Page 274)

আকবর-মানসিংহের বাংলা জয়ের পর কবি কঙ্কনের সম্পত্তিহানির বর্ণনা উপরের সঙ্গে খাপ খায়। ইংরেজের আমলেও সেই একই ব্যাপার। পরে জমিদারের স্বত্বের স্থায়িত্ব হলেও প্রজার সে অধিকার থাকল না। রামমোহন জমিদার ও প্রজা উভয় ক্ষেত্রেই বক্তব্য রাখার সময় স্বত্বের স্থায়িত্বের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর উভয় বক্তব্যের মধ্যে মিল শুধু এখানেই।

ভারতবর্ষের বুর্জোয়া উন্নতি পরাধীনতার বেড়াজালে কতটা সম্ভব সে কথা বাদ দিলে এটা স্বীকার করতে হবে যে বুর্জোয়া উন্নতির সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তার কামনা সঙ্গতিপূর্ণ। "...The Zamindar and Ryotwar themselves, abominable as they are, involve two distinct forms of private property in land—the greatest **desideratum** of Asiatic Society..." (—Marx, New York Herald Tribune, August 8, 1853)। মার্কস একে greatest desideratumও বলেছেন আবার abominableও বলছেন। (desideratum বলতে বোঝায় 'ঈপ্সিত' বস্তু, যে-বস্তুর অত্যন্ত অভাব বোধ করা যায় এবং abominable হচ্ছে নিন্দার্হ বা বীভৎস।)

তিন দশক আগে ভারতের বুর্জোয়া উন্নয়নের যিনি স্বপ্ন দেখছেন এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আদর্শের মধ্যেই যাঁর আদর্শ সীমাবদ্ধ জমিদারী abominable হলেও, ইতিহাসের নির্দেশে যা desideratum সেই desideratum-এর স্বীকৃতির ছাপ তাঁর মধ্যে পাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। ঠিক একইভাবে খাসপড়া-পতিত জমি বিলি-বন্দোবস্তের ব্যাপারে জমিদারদের মুনাফার লোভের সমালোচনা করলেও, পড়া-পতিত জমি আবাদ হওয়ায় এবং চাষের আয়ত্তে আসায় তিনি সন্তোষলাভ করেছেন এবং এর মধ্যে উন্নতির লক্ষণও দেখেছেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের সম্বন্ধে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরবর্তী কালের তথাকথিত বাঙ্গালি 'ভদ্রলোকের' চিন্তাধারার একটা বড় পার্থক্য নজরে পড়বে। গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে সমাজের দিকপালদের মধ্যে মুষ্টিমেয় দু-একজনের নাম বাদ দিলে বাকি কেউই প্রজার অধিকার সম্বন্ধে উৎসাহ দেখান নি। প্রজাদের সম্বন্ধে দরদের কথা হয়তো কিছু কলম থেকে বেরিয়েছে, কিন্তু নির্দিষ্ট অধিকারের সমর্থনে বা দাবিতে কিছু উচ্চারিত হতে দেখা যায় না। খাজনা বৃদ্ধি চলবে না এবং উচ্ছেদ চলবে না—রামমোহনের এই নির্দিষ্ট দাবি পরবর্তী যুগে তাঁর শ্রেণীর মানুষদের কাছে সমর্থন পায় নি। বরং জাতীয় আন্দোলনের অভিব্যক্তি বলে যা গঠিত হল—ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—বাংলাদেশে জমিদার বনাম প্রজা প্রশ্নে বারবার জমিদার পক্ষে এবং প্রজার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত এই নিরবচ্ছিন্ন বিরোধিতা চলেছে। ১৯৩৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের সময় যখন কংগ্রেস প্রজাপক্ষ সমর্থন করল তখন তার মূল্য ছিল না, কারণ সে সমর্থন ব্যতিরেকেই ঐ আইন পাশ হয়ে যেত। রামমোহন যা দাবি করেছিলেন,

তা পুরোপুরি এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কৃষকের সপক্ষে তাঁর দাবির মূল্য যাচাই করতে হয় এই ইতিহাসের পটভূমিকায়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের অবতারণা করতে হয়। রামমোহন মনে করতেন "যদি মূলধন বিনিয়োগে সক্ষম ও সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয়দের এদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয় তবে এদেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং উন্নত ধরনের চাষ ব্যবস্থা এবং শ্রমিক ও অন্যান্য অধীনস্থ ব্যক্তিদের যথাযথভাবে নিয়োগ করার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে এদেশের অধিবাসীদের অবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি ঘটবে।" তবে তিনি ঢালাওভাবে ইউরোপীয়দের ভারতে এসে বসবাস করবার পক্ষপাতি ছিলেন না। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল—"তার অর্থ হবে ভারতীয়দের ভারত থেকে উৎসাদন।" তিনি আরও বলেন, "ইউরোপীয় বিত্তশালীরা ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে প্রতি বছর যে প্রচুর অর্থ ভারত থেকে চলে যাচ্ছে তা বন্ধ হবে এবং ভারতের সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক হবে। অবশ্য রামমোহনের এই বিদেশী মূলধন আমন্ত্রণ এবং বর্তমান ধনপতিদের ঐরূপ আমন্ত্রণ এক নয়। রামমোহন হেতু হিসেবে বলেছেন, দেশের প্রচুর অর্থ বাইরে বেরিয়ে যাওয়া। এর প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাঁর নেই কিংবা যেখানে বলেছেন সেখানে সেইরূপ প্রতিরোধ আলোচ্য নয়। কিন্তু স্বাধীন ভারতে সেদিনের মতো ভারতের অর্থ বেরিয়ে যেতে হবে এমন কোনও কারণ নেই। চীন, উত্তর ভিয়েতনাম বা কোরিয়ায় এমন ঘটছে না। তবু ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর ইতিবাচক দিক রামমোহনকে যে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, উপরোক্ত বক্তব্য তার প্রমাণ। এই একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইউরোপীয় উৎপাদকদের পরিচালনায় ভারতে নীলচাষের প্রসারকে তিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন।

যে সব কারণে ইউরোপীয়ানদের বসবাসের কথা রামমোহন বলেছিলেন তার প্রথম হচ্ছে চাষবাসের উন্নতি।

"European settlers in India will introduce the knowledge they possess of superior modes of cultivating the soil and improving its products (in the article of sugar, for example), as has already happened with respect to indigo and improvements of the mechanical arts and in the agricultural and commercial systems generally by which the nations would of course benefit "[২২]

অর্থাৎ রামমোহন আশা করেছিলেন ইউরোপীয়ানরা এদেশে চাষের উন্নত ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে। এরকম আশা করার কারণ কি? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অর্থাৎ মোটামুটি রামমোহন রায়ের জীবনকালের গোড়া থেকেই ইংলন্ডে কৃষির বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন শুরু হয়। একেই ইংলন্ডের ইতিহাস লেখকেরা এগ্রিকালচারাল রেভলিউশান বা 'কৃষি বিপ্লব' বলে আখ্যা দেন।

"What inspired agricultural revolution was a rapidly rising demand for farm produce. England's numerous wars, the swift expansion of her merchant marine, the growth of the woollen industry and other manufactures and the remarkable increase of population (which almost doubled in the eighteenth century) naturally stimulated the production of foodstuffs and raw materials... To increase agricultural production required the adoption of more efficient and more scientific methods of farming. This, however was not easy for the ordinary small farmer or tenant farmer. Hence the leadership in effecting agricultural revolution was taken by 'gentlemen farmers' that is by wealthy landlords—noblemen or country squires who possessed considerable capital and who owned large estates."

(Modern Europe, Vol. I Carlton Hayes 1932 edition, Page 466, 468).

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ইংলন্ড যুদ্ধে ব্যাপৃত। এক শতাব্দীতে জনসংখ্যাও দ্বিগুণ দাঁড়িয়েছে। শিল্প বিপ্লবের দরুণ শিল্পও দ্রুতগতিতে এগিয়েছে। সুতরাং খাদ্য ও কাঁচামালের প্রয়োজন। উভয় কারণেই কৃষি ও পশুপালনের উন্নতির প্রয়োজন হল। সে উন্নতি গরিব কৃষকের দ্বারা সম্ভব নয়। তথাকথিত 'ভদ্রলোক কৃষকরা' ও অভিজাতরা এই উন্নতির সূচনা করল। এই সূত্রেই এই ব্যাপারে যাঁরা পথ দেখালেন তাঁদের নাম ও খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। জেথরো টাল (১৬৭৬-১৭৪০), ভাইকাউন্ট টাউনশেন্ড (১৬৭৪-১৭৩৮), রবার্ট বেকওয়েল (১৭২৫-১৭৯৫), আর্থার ইয়ং (১৭৪১-১৮২০) প্রমুখ এঁদের মধ্যে নামকরা। শেষোক্ত জন শুধু বৈজ্ঞানিক উন্নতিতেই ক্ষান্ত হলেন না, কলম ধরলেন এবং নতুন বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতির সুলেখক ও প্রচারক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেন। "অ্যানেলস অব এগ্রিকালচার" নামে এঁর একটি বহুল প্রচারিত মাসিক পত্রিকাও ছিল। রামমোহনের সমসাময়িক কালে প্রচারিত এই পত্রিকা এদেশে আসত বলে ধরে নেওয়া খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার কিছুই নয়। এদেশেও অনুরূপভাবে কৃষির উন্নয়ন হোক রামমোহনের এই কামনা এসব কারণেই উৎসাহিত হয়ে থাকতে পারে।

যাই হোক এই সব ব্যাপারে রামমোহন ও তাঁর সহযোগী দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখের আগ্রহে একটা পরমুখাপেক্ষিতার পরিচয় পাওয়া যায়—যা আজকের দিনে আমাদের ভাল লাগে না। সতীদাহ প্রথা বন্ধ থেকে শুরু করে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার সূচনা প্রভৃতি সব বিষয়েই যাদের ইংরেজের মুখাপেক্ষি হতে হয়েছিল এবং দেশীয় সমাজের স্তম্ভ জমিদার প্রভৃতিদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাদের পক্ষে

এইরূপ পরমুখাপেক্ষিতা যতটা সহজ ছিল, আজকের মানুষের কাছে ততটা সহজে বোধগম্য নয়।

প্রচলিত ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয়দের ধারণা কেমন ছিল সে সম্পর্কে রামমোহনের মূল্যায়ন ছিল নিম্নরূপ : "চাষী ও দূরবর্তী গ্রামবাসীরা অতীত এবং বর্তমান সরকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও নিরাসক্ত।...উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন এবং বর্তমান শাসনের ফলে যাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা হ্রাস পেয়েছে তারা সরকারের অধীনে অতি সাধারণ কাজ করা মর্যাদাহানিকর মনে করে। তবে যারা অধুনা ব্যবসা বাণিজ্য করে ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে ধনশালী হয়েছে এবং ব্রিটিশ শাসন ভবিষ্যৎ উন্নতির যে বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করেছে এদের মধ্যে যারা এই সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়েছে তারা শুধু এই শাসনকে মেনেই নিচ্ছে না, তারা ব্রিটিশ শাসনকে দেশের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ মনে করে।"

রামমোহন তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে উপরোক্ত সর্বশেষ শ্রেণীর ভাবমানসের গণ্ডীর সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি।

'হিতকরী'র প্রতিবেদন : 'মহাত্মা লালন ফকীর' : কিছু প্রশ্ন

....

এক. সূচনা :

অনুজপ্রতিম, পরমহিতৈষী ওপার বাংলার বন্ধু এবং অনেক দুঃখ-সুখের সাথী অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী তাঁর 'লালন শাহ' গ্রন্থের [১৯৯২—দ্বি. সংস্করণ] ৭৩-৭৪ পৃষ্ঠায় 'লালনচর্চার ইতিহাস' আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন : "লালন সম্পর্কে প্রথম বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় মীর মশারফ হোসেন পরিচালিত পাক্ষিক 'হিতকরী' পত্রিকায়। লালনের মৃত্যুর [১৭ অক্টোবর ১৮৯০] পরপরই [১৪ দিনের ব্যবধানে] ১৮৯০ সালের ৩১ অক্টোবর [১৫ কার্তিক ১২৯৭] 'হিতকরী' পত্রিকার [১ ভাগ ১৩ সংখ্যা : পৃ. ১০০-০১] সম্পাদকীয় স্তম্ভে 'মহাত্মা লালন ফকীর' নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।"

'হিতকরী'র ঐ প্রতিবেদন অতি পরিচিত। অনেক জায়গায়ই তা ছাপা হয়েছে। বন্ধুবর অধ্যাপক চৌধুরী উক্ত প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে ওপরে উদ্ধৃত অংশের পরে পরেই লিখেছেন : "নিবন্ধটি সংক্ষিপ্ত হলেও তা তথ্যবহুল, প্রামাণিক ও সুলিখিত। লালন ফকীরের কিংবদন্তী-শাসিত জীবন কাহিনীর রহস্য-উন্মোচনে এই নিবন্ধটি গবেষকদের বিশেষ সহায়ক হয়েছে।"

যথার্থ ইতিহাসনিষ্ঠা, বিজ্ঞানবুদ্ধি তাড়িত গবেষককে ঐ নিবন্ধ [?] কতখানি সাহায্য করেছে জানি না ; তবে যাঁরা 'কিংবদন্তীর শাসন' মেনে নিয়ে গবেষণা করেন বা করেছেন তাঁদের ঐ প্রতিবেদন বিশেষভাবে সাহায্য করে মানতেই হবে। যেমন, তাঁর জন্ম তারিখ, স্থান, কোন জাতি ইত্যাদি নিয়ে বিশ্বাস [যুক্তি নয়]। আমরা এখানে ঐ প্রতিবেদনটিকে কায়া গঠনের দিক থেকে বিচার করে দেখবার চেষ্টা করব যে ঐটি কতখানি 'তথ্যবহুল, প্রামাণিক ও সুলিখিত।'

আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যায় চিহ্নিত করে সমগ্র প্রতিবেদনটিকে উদ্ধৃত করা হবে। প্রসঙ্গত বলি যে, মূল প্রতিবেদনে ঐরকম কোন সংখ্যা দেওয়া নেই। আমিই ঐ সংখ্যাদের ব্যবহার করেছি। বিষয়বস্তু অনুযায়ী বাক্যগুলিকে যে-সব পর্যায়ক্রমে রাখা হয়েছে তাও মৎকৃত।

দুই. 'মহাত্মা লালন ফকীর':

১. লালন ফকীরের নাম এ অঞ্চলে কাহারও শুনিতে বাকী নাই।

২. শুধু এ অঞ্চলে কেন, পূর্বে চট্টগ্রাম, উত্তরে রঙ্গপুর, দক্ষিণে যশোহর এবং পশ্চিমে অনেকদূর পর্যন্ত বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক লোক এই লালন ফকীরের শিষ্য; শুনিতে পাই ইঁহার শিষ্য দশ হাজারের উপর।

৩. ইঁহাকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি।

৪ কুষ্টিয়ার অনতিদূরে কালীগঙ্গার ধারে সেওরিয়া গ্রামে ইঁহার একটি সুন্দর আখড়া আছে।

৫. আখড়ায় ১৫।১৬ জনের অধিক শিষ্য নাই।

৬. শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল ও ভোলাই নামক দুইজনকে ইনি ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন; অন্যান্য শিষ্যগণকে তিনি কম ভালবাসিতেন না।

৭ শিষ্যদিগের মধ্যে তাঁহার ভালবাসার কোন বিশেষ তারতম্য থাকা সহজে প্রতীয়মান হইত না।

৮. আখড়ায় ইনি সস্ত্রীক বাস করিতেন; সম্প্রদায়ের ধর্মমতানুসারে ইঁহার কোন সন্তান-সন্ততি নাই।

৯. শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকের স্ত্রী আছে, কিন্তু সন্তান হয় নাই।

১০. এই আশ্চর্য ব্যাপার শুধু এই মহাত্মার শিষ্যগণের মধ্যে নহে বাউল-সম্প্রদায়ের অধিকাংশ স্থানে এই ব্যাপার লক্ষিত হয়।

১১. সম্প্রতি সাধুসেবা বলিয়া এই মতের এই নূতন সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে।

১২. সাধুসেবা হইতে লালনের শিষ্যগণের না হউক নিজের মত বিশ্বাস অনেকাংশে ভিন্ন ছিল।

১৩. সাধুসেবা ও বাউলদের দলে যে কলঙ্ক দেখিতে পাই লালনের সম্প্রদায়ে সে প্রকার কিছু নাই।

১৪. আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি সাধুসেবায় অনেক দুষ্ট লোক যোগ দিয়া কেবল স্ত্রীলোকদিগের সহিত কুৎসিত কার্যে লিপ্ত হয় এবং তাহাই তাহাদের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়।

১৫. মতে মূলে তাহার সহিত ঐক্য থাকিলেও এ সম্প্রদায়ের তাদৃশ ব্যভিচার নাই।

১৬. পরদার ইহাদের পক্ষে মহাপাপ।

১৭. তবে প্রত্যেক সৎ-নিয়মের ন্যায় ইহারও অপব্যবহার থাকা অসম্ভব নহে।

১৮. বাউল, সাধুসেবা ও লালনের মতে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন শ্রেণীতে যে

একটি গুহ্য ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে লালনের দলে তাহাই প্রচলিত থাকায় ইহাদের মধ্যে সন্তান জননের পথ এককালে রুদ্ধ।

১৯. 'শান্ত-রতি' শব্দের বৈষ্ণব শাস্ত্রে যে উৎকৃষ্ট ভাব বুঝায়, ইহারা তাহা না বুঝিয়া অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয় সেবায় রত থাকে।

১০. এই জঘন্য ব্যাপারে এ দেশ ছারেখারে যাইতেছে তৎসম্বন্ধে পাঠকবর্গকে বেশী কিছু জানাইতে স্পৃহা নাই।

২১. শিষ্যদিগের ও তাহার সম্প্রদায়ের এই মত ধরিয়া লালন ফকীরের বিচার হইতে পারে না।

২২. তিনি এ সকল নীচ কার্য হইতে দূরে ছিলেন ও ধর্ম-জীবনে উন্নত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

২৩. মিথ্যা জুয়াচুরিকে লালন ফকীর বড়ই ঘৃণা করিতেন।

২৪. নিজে লেখাপড়া জানিতেন না; কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁহাকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়।

২৫. তিনি কোন শাস্ত্রই পড়েন নাই; কিন্তু ধর্মালাপে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত।

২৬. বাস্তবিক ধর্ম সাধনে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্মের সারতত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না।

২৭. লালন নিজে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মাবলম্বী ছিলেন না; অথচ সকল ধর্মের লোকেই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার আহার-ব্যবহার থাকায় অনেকে তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত; বৈষ্ণবধর্মের মত পোষণ করিতে দেখিয়া হিন্দুরা ইঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত।

২৮. জাতিভেদ মানিতেন না, নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস দেখিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে ইঁহাকে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য নহে; কিন্তু ইঁহাকে ব্রাহ্ম বলিবার উপায় নেই; ইনি বড় গুরুবাদ পোষণ করিতেন।

২৯. অধিক কি ইঁহার শিষ্যগণ ইঁহার উপাসনা ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিত না।

৩০. সর্বদা 'সাঞ' এই কথা তাহাদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

৩১. ইনি নোমাজ করিতেন না।

৩২. সুতরাং মুসলমান কি প্রকারে বলা যায়?

৩৩. তবে জাতিভেদবিহীন অভিনব বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে; বৈষ্ণবধর্মের দিকে ইঁহার অধিক টান।

৩৪. শ্রীকৃষ্ণের অবতার বিশ্বাস করিতেন।

৩৫. কিন্তু সময় সময় যে উচ্চ-সাধনের কথা ইঁহার মুখে শুনা যাইত, তাহাতে তাঁহার মত ও সাধন সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইত।

৩৬. যাহা হউক তিনি একজন পরম ধার্মিক ও সাধু ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই।

৩৭. লালন ফকীর নাম শুনিয়াই হয়ত অনেকে মনে করিতে পারেন ইঁনি বিষয়হীন ফকীর ছিলেন ; বস্তুত তাহা নহে ; ইঁনি সংসারী ছিলেন ; সামান্য জোতজমা আছে ; বাটীঘরও মন্দ নহে।

৩৮. জিনিষপত্রও মধ্যবর্তী গৃহস্থের মতো।

৩৯ নগদ টাকা প্রায় ২ হাজার বলিয়া মরিয়া যান।

৪০. ইঁহার সম্পত্তির কতক তাঁহার স্ত্রী, কতক ধর্মকন্যা, কতক শীতলকে ও কতক সৎকার্যে প্রয়োগের জন্য ইঁনি একখানি ফরমমাত্র করিয়া গিয়াছেন।

৪১. ইঁনি নিজে শেষকালে কিছু উপায় করিতে পারিতেন না।

৪২. শিষ্যেরাই ইঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিত।

৪৩. বৎসর অন্তে শীতকালে একটি ভাণ্ডারা [মহোৎসব] দিতেন।

৪৪. তাহাতে সহস্রাধিক শিষ্যগণ ও সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হইয়া সংগীত ও আলোচনা হইত।

৪৫. তাহাতে তাঁহার ৫।৬ শত টাকা ব্যয় হইত।

৪৬. ইঁহার জীবনী লিখিবার কোন উপকরণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছুই বলিতেন না।

৪৭. শিষ্যেরা হয়ত তাঁহার নিষেধক্রমে না হয় অজ্ঞতাবশত কিছুই বলিতে পারে না।

৪৮. তবে সাধারণে প্রকাশ লালন ফকীর জাতিতে কায়স্থ ছিলেন।

৪৯. কুষ্টিয়ার অধীন চাপড়া ভৌমিক বংশীয়েরা ইঁহার জাতি।

৫০. ইঁহার কোন আত্মীয় জীবিত নাই।

৫১. ইঁনি নাকি তীর্থগমনকালে পথে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন।

৫২. মুমূর্ষু অবস্থায় একটি মুসলমানের দয়া ও আশ্রয়ে জীবনলাভ করিয়া ফকীর হয়েন।

৫৩. ইঁহার মুখে বসন্তরোগের দাগ বিদ্যমান ছিল।

৫৪. ইঁনি ১১৬ বৎসর বয়সে গত ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে মানবলীলা সম্বরণ

করিয়াছেন।

৫৫. এই বয়সেও তিনি অশ্বারোহণ করিতে দক্ষ ছিলেন এবং অশ্বারোহণেও স্থানে স্থানে যাইতেন।

৫৬. মৃত্যুর প্রায় একমাস পূর্ব হইতে ইঁহার পেটের ব্যারাম হয় ও হাত পায়ের গ্রন্থি জলস্ফীত হয়।

৫৭. দুধ ভিন্ন পীড়িত অবস্থায় অন্য কিছু খাইতেন না।

৫৮. মাছ খাইতে চাহিতেন।

৫৯. পীড়িতকালেও পরমেশ্বরের নাম পূর্ববৎ সাধন করিতেন মধ্যে মধ্যে গানে উন্মত্ত হইতেন।

৬০. ধর্মের আলাপ পাইলে নববলে বলীয়ান হইয়া রোগের যাতনা ভুলিয়া যাইতেন।

৬১. এই সময়ের রচিত কয়েকটি গান আমাদের নিকট আছে।

৬২. অনেক সম্প্রদায়ের লোক ইঁহার সহিত ধর্মালাপ করিয়া তৃপ্ত হইতেন।

৬৩ মরণের পূর্ব রাত্রিতেও প্রায় সমস্ত সময় গান করিয়া রাত্রি ৫টার সময় শিষ্যগণকে বলেন 'আমি চলিলাম।'

৬৪. ইহার কিয়ৎকাল পরে শ্বাসরোধ হয়।

৬৫. মৃত্যুকালে কোনো সম্প্রদায়ী মতানুসারে তাঁহার অন্তিমকার্য সম্পন্ন হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না।

৬৬. তজ্জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই।

৬৭. গঙ্গাজল হরে রাম নামও দরকার [হয়] নাই।

৬৮. হরিনাম কীর্তন হইয়াছিল।

৬৯. তাঁহারই উপদেশ অনুসারে আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাঁহার সমাধি হইয়াছে।

৭০. শ্রাদ্ধাদি কিছুই হইবে না।

৭১. বাউল সম্প্রদায় লইয়া মহোৎসব হইবে, তাঁহার জন্যে শিষ্যমণ্ডলী অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।

৭২. শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল, মহরম সা, মানিক সা ও কুধু সা প্রভৃতি কয়েকজন ভাল লোক আছেন।

৭৩. ভরসা করি, ইহাদের দ্বারা তাঁহার গৌরব নষ্ট হইবে না, লালন ফকীরের অসংখ্য গান সর্বত্রে সর্বদাই গীত হইয়া থাকে।

৭৪. তাহাতেই তাঁহার নাম, ধর্ম, মত ও বিশ্বাস সুপ্রচারিত হইবে।

এরপর প্রতিবেদক লালনের জাতি নির্ণয়সূচক 'সবলোকে কয় লালন কি জাত সংসারে' গানটি উদ্ধৃত করেছেন।

তিন. তথ্যস্তূপ :

ক. খ্যাতি : ১, ২ = ২
খ. আখড়া-প্রসঙ্গ : ৪ = ১
গ. শিষ্য-প্রসঙ্গ : ৫-৭, [৪০], ৭২ = ৪½
ঘ. প্রতিবেদকের প্রত্যক্ষ [?] অভিজ্ঞতা : ৩, ৫৩, ৬১ = ৩
ঙ. ব্যক্তিগত জীবন : [৮], ৩৭-৩৯, [৪০] = ৪
চ. সাধন পদ্ধতি : [৮]. ৯-২০ = ১২½
ছ. সাধুতা : ২১-২৩, ৩৬, ৬২ = ৫
জ. শিক্ষা + পাণ্ডিত্য : ২৪-২৬ = ৩
ঝ. ধর্মবিশ্বাস : ২৭-৩৫ = ৯
ঞ. শেষ জীবনে জীবিকার ব্যবস্থা : ৪১, ৪২ = ২
ট. উৎসব-অনুষ্ঠান : ৪৩-৪৫ = ৩
ঠ. সত্যকথা : ৪৬, ৪৭, ৫৪ [শেষ অর্ধেক] = ২½
ড. কিংবদন্তী : ৪৮-৫২, ৫৪ [প্রথম অর্ধেক] = ৫½
ঢ. শেষ জীবন ও মৃত্যু : ৫৫-৬০, ৬৩-৬৪ = ৮
ণ. অন্ত্যেষ্টি : ৬৫-৭১ = ৭
ত. উপসংহার বা প্রতিবেদকের আশা : ৭৩, ৭৪ = ২

৭৪

দেখা গেল, প্রতিবেদনটিতে বাক্যসংখ্যা চুয়াত্তর। এবং সমগ্র প্রতিবেদনের বক্তব্য অসংবদ্ধভাবে বিন্যস্ত। প্রতিবেদক প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে এলোমেলোভাবে ঘুরেছেন। অতএব প্রতিবেদনটিকে 'সুলিখিত' বলা কঠিন।

চার. বিশ্লেষণ :

এখন বিষয়ভিত্তিতে বিভক্ত প্রতিটি বাক্যের গঠন ও বক্তব্য এবং পূর্ববর্তী বক্তব্যের সঙ্গে তার / তাদের সামঞ্জস্য ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে 'তথ্য'—'প্রামাণিকতা' —যা নাকি 'গবেষকদের বিশেষ সহায়ক হয়েছে',—প্রতিষ্ঠিত হয় কি না দেখি !

১. [ক] : এই বাক্য দুটি সম্পর্কে কিছু বলার নেই। তবে প্রতিবেদক পশ্চিমের সীমানাকে অনির্দিষ্ট রেখেছেন কেন? এবং দ্বিতীয় বাক্যের শেষাংশের আরম্ভেই 'শুনিতে পাই' অনুমানসূচক শব্দ প্রয়োগ প্রতিবেদকের তথ্যনিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠককে নাড়া দেয়।

২. [খ] : এই আখড়া আজও বর্তমান। গত ২. ৬. ৯২. তারিখেও আখড়ার পশ্চিমমুখী প্রধান ফটকের বাঁদিকের থামে শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা দেখা গেল, 'লালন ফকির : জন্ম অজ্ঞাত' / মৃত্যু ১৮৯০'।

৩. [গ] : মোট সাড়ে চারটি বাক্য রয়েছে। ৬নং-এ দুটি ভাগ—শীতল ও ভোলাইকে 'ঔরসজাত পুত্রের ন্যায়' ভালোবাসা এবং বাকী ১৩।১৪ জনকে [১৫।১৬—২] ভালোবাসতেন, কিন্তু 'ঔরসজাত পুত্রের ন্যায়' নয়—কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর শিষ্যদের প্রতি ভালোবাসার তারতম্য বোঝা যায় না [৭নং বাক্য]। আরো আছে—৪০নং বাক্য দেখুন। লালন মারা যাবার পর তাঁর সম্পত্তি চার ভাগ হয়েছে—১ স্ত্রী+১ ধর্মকন্যা [এর কথা আর কোথাও নেই…সম্পত্তির ভাগের বেলায় জুটেছে]+১ শীতল+১ সৎকার্য=৪ ভাগ [হায়, (অপর ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় !) ভোলাই তোমার ভাগ্যে শুধুই দগ্ধকদলী]! এবং সম্পত্তি-বিভাজন মুখে মুখে বা ভাবুকের ঘোরে নয় 'একখানি ফরমমাত্র করিয়া গিয়াছেন' [বিষয়বুদ্ধির চূড়ান্ত]। এবং সবশেষে ৭২নং বাক্যে শিষ্যদের মধ্যে 'ভালো লোক'-এ শীতল রয়েছেন এবং সঙ্গে নতুন আরো তিনজন—কিন্তু 'ঔরসজাত পুত্রের ন্যায়' ভোলাই 'ভালো লোক' হতে পারলেন না। এরপরেও 'হিতকরী'র প্রতিবেদন 'প্রামাণ্য ও তথ্যবহুল' ?

৪. [ঘ] : 'হিতকরী'র প্রকাশ স্থান, প্রতিবেদকের নিবাস ও লালনের আখড়া কাছাকাছি জায়গায়। এবং এ অঞ্চলে কারও শুনতে বাকী নেই যে লালনের নাম, তাঁকে স্বচক্ষে দেখা বিচিত্র কিছু নয়।

৫. [ঙ] : লালনের ব্যক্তিগত জীবনের বাইরের এই সংবাদও প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফল। তবে ইনি 'সাধন-সঙ্গিনী'কে স্ত্রী বললেন কেন [৮নং প্রথম অর্ধ] ? ৩৭নং বাক্যে কি একটু শ্লেষ বা কৌতুকের সুর মিশেছে ?

৬. [চ] : ৮নং বাক্যের দ্বিতীয়াংশ থেকে ২০নং পর্যন্ত 'সাধুসেবা সম্প্রদায়', বাউল ও লালন সম্প্রদায়ের করণ-কারণ ও সাধন পদ্ধতি সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে তা অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত ও সমগ্র বিষয়টির গভীর তত্ত্ব সম্পর্কে [তা ভালো বা মন্দ যাই হোক না কেন] কিছু না জেনে বা লোকমুখে শুনে লিখেছেন। এবং লালনের দলে খারাপ কাজ বা জঘন্য ব্যাপার প্রচলিত থাকলেও ব্যক্তি লালন সব কিছুর উর্ধ্বে [২১-২৩নং]। কিন্তু একথা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে গুরুর শিষ্যেরা কু-আচার করে, 'না বুঝিয়া অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয় সেবায় রত থাকে' তাঁর সাধুতার সাধনার জৌলুষ নষ্ট হয়, তাঁর মতাদর্শও ব্যর্থ হয়। এবং নিজেরই মত-পথের পথিকেরা গোল্লায় যাক, আমি ভালো থাকি—এই চিন্তা যে গুরুর, আত্মতন্ত্রতাদুষ্ট তাঁর সাধনা সম্পর্কে সংশয় জাগে বইকি। সমস্ত বাউল-সম্প্রদায়ের ধ্যান-ধারণা বিশ্বাস-আচার-আচরণ নিরপেক্ষ [যা বাদ দিলে বাউল / ফকীর আর বাউল থাকে না] লালনকে মহাত্মা বানিয়ে halo সৃষ্টির বিপক্ষে ৮নং বাক্যের শেষাংশ থেকে ২১নং বাক্যের প্রথমাংশ পর্যন্ত খুব সার্থকভাবেই ব্যবহার করা যায়।

৭. [ছ,জ] : এ প্রসঙ্গ পর্যালোচনার বিশেষ প্রয়োজন নেই। তবে এখানেও প্রতিবেদক তিনবার সংশয়সূচক শব্দ 'বোধ হয়' ব্যবহার করে তাঁর বক্তব্যকে দুর্বল করে

দিয়েছেন [২২, ২৪, ২৫নং বাক্য]।

৮. [ঝ]: লালনের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে প্রতিবেদকের সংশয়? কিন্তু এই সংশয় থাকতো না, যদি তিনি বাউল ফকীরদের সাধনার তাৎপর্য বুঝতেন। "সুফী-প্রভাবান্বিত মুসলমান 'নেড়া' বা 'বে-শরা' ফকীররাই বাংলায় বাউলধর্ম-সাধনার আদি প্রবর্তক।... তাঁহাদের ধর্ম ফকিরি ধর্ম—আউল-বাউলদের জাতি-ধর্ম-সংস্কার নির্বিশেষে একটি নির্দিষ্ট সাধনমার্গের ধর্ম" ['বাঙলার বাউল']। তাই লালনকে কোনো সম্প্রদায়ই তার নিজের কোটে আনতে পারে নি—তিনিই সবার কোটে ঘুরে বেড়াতে চেয়েছেন [সব বাউল / ফকীরেরাই করেন]।

৯. [ঠ]: প্রতিবেদক যথার্থভাবে এখানে সত্য সংগ্রহ করেছেন [৪৬ ও ৪৭নং বাক্য], না করে উপায়ও নেই, এবং ৫৪নং বাক্যের 'গত ১৭ই অক্টোবর...সম্বরণ প্রতিবেদক কেন করিয়াছেন' ঘটনা তাঁর জ্ঞাতসারেই ঘটেছে। এই সত্য প্রতিষ্ঠা / অনুসন্ধান করে এসেই কেন কিংবদন্তী রটনা / রচনা করলেন তা বোঝা গেল না। কারণ, দেখা যাচ্ছে:

১০. [ড]: ৪৮ থেকে ৫২নং বাক্য এবং ৫৪নং বাক্যের প্রথমাংশ তাঁর ৪৬ ও ৪৭নং বাক্যের প্রতিপাদ্যকে নস্যাং করে দিচ্ছে। এবং এই 'স্টোরি' তৈরির জন্য তিনি নির্দ্বিধায় এবং সংকোচহীনভাবে 'তবে সাধারণে প্রকাশ', 'ইনি নাকি', 'ইঁহার কোন আত্মীয় জীবিত নাই', 'নিজে কিছুই বলিতেন না', 'জীবনী লিখিবার কোন উপকরণ পাওয়া কঠিন'— প্রভৃতি শব্দ সচেতনভাবে ব্যবহার করার পরেই গল্পের গরুকে গাছে তোলার জন্যে '১১৬ বছর বয়স', 'হিন্দু-কায়স্থ', 'তীর্থগমনকালে পথে', ইত্যাদি কিংবদন্তী তৈরি করে দিলেন—কেন এবং কার স্বার্থে? এবং পরবর্তী গবেষকেরা তাকেই পরম-নির্ভর / নির্ভয়ে, বিশ্বাসে [যুক্তির দরকার নেই] আঁকড়ে ধরলেন [আজও ছাড়তে পারছেন না]।

মোট ৭৪টি বাক্যে রচিত 'হিতকরী'র প্রতিবেদনকে শব্দ ধরে ধরে বিচার করে দেখা গেল যে, ঐ প্রতিবেদক নিজেই নিজের বক্তব্যের যেভাবে বিরোধিতা করেছেন তাতে তাঁর প্রতিবেদনকে 'তথ্যবহুল ও প্রামাণিক' বলে ধরলে সত্যের অপলাপ করা হয়। এই রকম অ-শৃংখল রচিত, শিথিলচিন্তা প্রসূত, স্ববিরোধিতাপূর্ণ প্রতিবেদনকে অবলম্বন করে যুক্তিনিষ্ঠ ও বস্তুনির্ভর গবেষণা [!] চালানো যায় কি না, তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

১১. প্রতিবেদনের ৭৫নং বাক্যটি লালনের একটি গান উদ্ধৃত করার উল্লেখ। এবং তাঁর [লালনের] সুপরিচিত 'সব লোকে কয় লালন কি জাত' গানটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই গানটি সম্পর্কে আমার কয়েকটি সংশয় রয়ে গেছে। তা এই রকম:

১. রবীন্দ্র-সংগ্রহে [যা আমার 'লালন ফকির / কবি ও কাব্য' গ্রন্থে ছাপা হয়েছে] এটি নেই।

২. তা না থাকুক। ওই সংগ্রহের বাইরেও কিছু লালনের গান রবীন্দ্রনাথ শুনে-

ছিলেন। এর প্রমাণ 'প্রবাসী'র [১৩২২] 'হারামণি' সংগ্রহ।

৩. 'হিতকরী'-পরবর্তী সকলেই বলেছেন যে লালনকে তাঁর জাত জিজ্ঞাসা করলেই তিনি এই গানটি গেয়ে শোনাতেন [দ্রষ্টব্য 'ভারতী' ১৩০২]।

৪. আমার কৌতূহল—একজন লোককে দেখলেই তার জাত জিজ্ঞাসা করা, এ কীরকম সৌজন্যবোধ? তবুও তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যেতে পারে, সেকালে, নিরক্ষর গ্রাম্য-সমাজে এত ভদ্রতা-টদ্রতা ছিল না। অতএব জাত-টাত জিজ্ঞাসা করা যেতেই পারে।

৫. লালন ফকীর হিসাবেই পরিচিত। সাধারণভাবে সেদিনের মানুষ অন্তত জানতো, যাঁরা ফকীর হিসাবে পরিচিত তাঁরা তো মুসলমান। অতএব মুসলমানকে আবার মুসলমান না হিন্দু জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে কি? মনে হয় না। আমার ধারণা এই গানটি অন্য কারো লেখা, লালনের নামে চলে গেছে।

৬. পরিশেষে, লালন সম্পর্কে শেষ গবেষণা করে দিয়েছেন [?] এমন এক আধুনিক লালন-গবেষকের লোকধর্ম-বাউল-ফকীর-লালন সম্পর্কে করা সাম্প্রতিক কিছু মন্তব্য উদ্ধার করবো, যা থেকে বোঝা যাবে যে জাত সম্পর্কে লালনকে প্রশ্ন এবং উত্তরে তাঁর ঔই গান হাস্যকর ছেলেমানুষী মনে হয়। তিনি বলেছেন :

ক. 'লোকধর্মের দিগন্ত বহুল-প্রসারিত এবং ঔদার্যে অনাবিল। ভূগোলের বেড়া নেই, ধর্মের বেড়ি নেই, কেননা মানুষ তাঁদের উপাস্য।...তাঁরা কাছে টানেন কেবল মানুষকে, যে-মানুষ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ।...তাঁরা মেনে নেন মাটি আর মানুষ, বীজ আর জমি, নর আর নারী, উর্বরতা আর প্রজনন এবং তার নিয়ন্ত্রণ নিজের পরিসীমায়।'

খ. 'লালন ফকির ছিলেন অলৌকিকতা বিরোধী মুক্ত চৈতন্যের লৌকিক সাধক। মানুষের সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল। মানুষজন্মই তাঁর মতে ছিল শ্রেষ্ঠ।'

গ. 'তাঁর ছিল প্রখর বিচারবোধ ও যুক্তিশীলতা। সেই বিচার ও যুক্তি মানবতা-বাদের এক সমুন্নত প্রসারণ।'...ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অতএব এমন বলিষ্ঠ ও দৃঢ়চেতা সাধক, যিনি মন্দির-মসজিদ বাতিল করে দিয়ে-ছিলেন, যিনি হিন্দুধর্ম আর ইসলামধর্মের দুটি নির্ভরযোগ্য ছত্রছায়া ত্যাগ করে দরবেশ ও ফকীর হয়েছিলেন, [যদিও সব প্রকৃত বাউলেরাই এ কাজ করেন] এবং বাস্তববোধবুদ্ধি নির্ভর করে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তাঁর কাছে আবার জাতের প্রশ্ন কেন, আর সে-প্রশ্নকে তিনি প্রশ্রয় দেবেনই বা কেন? কারণ ওই প্রশ্নকে যতই লাই দেওয়া হবে ততই সে মাথায় উঠবে।

☐ সনৎকুমার

ড্রিংকওয়াটার বীটন (বেথুন): স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক

আর একজন অ-ভারতীয় এদেশকে ভালোবেসেছিলেন, এদেশে এসে জীবন দিয়ে গেছেন। ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে একমাত্র তিনিই তুলনার যোগ্য। ডেভিড হেয়ার স্বাধীন জীবিকানির্ভর ছিলেন, আর বীটন ছিলেন সরকারী আমলা। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে তিনি জন্মেছেন, ডেভিড হেয়ার-এর থেকে ২৬ বৎসরের ছোট। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংলার। এ ছাড়া অনেকগুলি ধ্রুপদী ও আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা তিনি জানতেন। ব্যারিস্টারী পেশা হিসাবে নিয়েছিলেন, দু-চার বৎসর ব্যবহারজীবীর জীবনযাপন করার পরে বুঝলেন, এ জীবন তাঁর নয়। ৩৬ বৎসর বয়সে তিনি স্বরাষ্ট্র বিভাগের কর্মচারী হলেন। তার এগার বৎসর পরে তিনি ভারতের শাসন পরিষদের আইন (Law) সদস্য হিসাবে ভারতে এলেন। এর পূর্বে লাটসাহেবের শাসন পরিষদের আইন সচিব ছিলেন কর্মক্ষম অথচ অহংকারী লর্ড মেকলে। মেকলে-ভাষিত ও নির্দিষ্ট পথে তিনি হাঁটেন নি। তখন আইন সচিবরা একই সঙ্গে কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি থাকতেন। মেকলে খ্যাতনামা গদ্য লিখিয়ে এবং ঐতিহাসিক, বীটন এমন সুকৃতির অধিকারী নন। কিন্তু তিনি যে নানা বিদ্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, এ খবর চাপা থাকে নি। মাত্র তিন বৎসর তিনি এদেশে ছিলেন, এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এমন কোনো কোনো সৎকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, যার জন্য তাঁর নাম লোকে কোনোদিন ভুলবে না।

২

১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায়তায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথমে এই স্কুলের নাম ছিল ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল। পরে ১৮৫১ সালে তাঁর মৃত্যু হলে এই স্কুলের নাম বদলে বেথুন স্কুল করা হয়। বেথুনের প্রকৃত নাম বীটন, কিন্তু আমাদের দেশীয় উচ্চারণে বীটন হয়েছেন 'বেথুন'। অশুদ্ধ বানান বা উচ্চারণই চলছে।

তবে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কৃতিত্ব বারাসতের কালীকৃষ্ণ মিত্র ও নবীনকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়দের। তাঁদের সহযোগী ছিলেন প্যারীচরণ সরকার। বিদ্যাসাগর মহাশয়

এই মিত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের বন্ধু ছিলেন। এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৭ সালে।

বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে এই বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। তিনি সস্ত্রীক বারাসতে গিয়েছিলেন এবং একটি সাত-আট বৎসরের বালিকার চিবুকে হাত দিয়ে আদর করেছিলেন বলে বারাসতের অধিবাসীরা জাতিনাশ হল বলে ঘোঁট পাকিয়েছিল। দু-দিন পরে কলকাতায় হেদুয়ার পাশে যখন বালিকা বিদ্যালয় হল, তখন দৃশ্যপট অন্যরকম।

বেথুন স্কুলে মদনমোহন তর্কালংকারের দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালা ভর্তি হন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর এক কন্যাকে এখানে ভর্তি করে দেন।

বেথুন স্কুলের ছাত্রীদের আনার জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছিল, এই ঘোড়ার গাড়ির গায়ে উৎকীর্ণ ছিল, "কন্যাপেব্যং পালনীয়া যত্নয়াতিরক্ষিতঃ।" মহানির্বাণ তন্ত্র থেকে এই শ্লোকটি সংগৃহীত।

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ইয়ং বেঙ্গল দলের অন্যতম নেতা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন। বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয় যে জমিতে, তার মালিকানা ছিল দক্ষিণারঞ্জনের। তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে জমিটা স্কুল গড়ার জন্য দিয়েছিলেন। যথেষ্ট কম দামে।

বেথুন সাহেব অফিসের কাজকর্ম করে স্কুলের কাজে অনেকটা সময় দিতেন। তাঁর মুখে লাগাম পরিয়ে কোনো ছাত্রী তাঁর পিঠে সওয়ার হয়ে 'এই ঘোড়া, হঠ্ হঠ্' বলে চেঁচাচ্ছে—এই দৃশ্যও দেখা যেত।

সমর্থন তিনি যেমন পেয়েছেন, বিরূপতাও পেয়েছেন। ঈশ্বর গুপ্ত মজাদার ছড়া কেটে বললেন, এই মেয়েরা একদিন বগী হাঁকিয়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে বেড়াবে। (সংবাদ প্রভাকর ৭ মে, ১৮৪৯)। পদ্যে যাই বলুন, গদ্যে তিনিই সমর্থনসূচক প্রবন্ধ লিখলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার একটি ছোট ইতিহাস লিখে ফেললেন। সমাচার চন্দ্রিকা লিখল, এতে মেয়েদের চরিত্র নষ্ট হবে। সংবাদ প্রভাকর সমাচার চন্দ্রিকার সম্পাদক ও ধর্মসভার সভাপতিকে প্রভূত সমালোচনা করলেন। সংবাদ প্রভাকর সেই সঙ্গে ভূম্যধিকারী সভার সদস্যদের এই স্ত্রী-শিক্ষা বিরোধী মনোভাবের জন্য ভর্ৎসনা করলেন। ১২ মে তারিখের সংখ্যায় মহানির্বাণ তন্ত্রের দুই শ্লোক উদ্ধৃত করে দিলেন—এইটিই বিদ্যাসাগর মহাশয় স্কুলের গাড়ির উপর উৎকীর্ণ করিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য এই শ্লোকটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার ১২ জানুয়ারী, ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের অধিবেশনে।

ঈশ্বরচন্দ্র মজাদার ছড়া কাটার লোভ সংবরণ করতে পারতেন না। তাই দুই ইতালীয় মহিলার কোন্দল বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতীয় জেনানাদের পক্ষে কল্যাণকর নয়। তাদের এই শিক্ষা থেকে তফাৎ থাকা উচিত। (১২ এপ্রিল, ১৮৫২)।

৩

বেথুনের আর একটি ভূমিকা ভুললে চলবে না। তিনি ছিলেন শিক্ষা পরিষদের সভাপতি, অথচ তাঁর পূর্বসূরীর মতো অহংকারী দাম্ভিক আমলা নন।

মধুসূদনের কাব্য 'ক্যাপটিভ লেডী' মাদ্রাজে ছাপা হয়েছে, সুখ্যাতিও পেয়েছে। তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু গৌরদাস বসাকের অনুরোধে এক খণ্ড 'ক্যাপটিভ লেডী' কবি শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ড্রিংকওয়াটার বীটনকে পাঠালেন। এই কাব্য পড়ে বীটন খুব বিনীতভাবে লিখলেন—তোমার বন্ধুর কাব্য পেয়েছি, কিন্তু তোমার মারফৎ তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে হচ্ছে বলে আমি সংকোচ বোধ করছি। আমি তাঁকে পরামর্শ দেব, তিনি যেন তাঁর প্রতিভা মাতৃভাষার সেবায় নিয়োগ করেন, বিদেশী ভাষার সেবায় নয়। তাতেই তাঁর অবদান মূল্য পাবে।

"...if he will employ the taste and talents which he has cultivated by the study of English in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own Language if poetry at all events he must write." তারপরেই কুললক্ষ্মী তাঁকে বলে দিলেন, 'যা রে ফিরি ঘরে।' কারণ তাঁর ভাণ্ডারে অমূল্য রতন রয়েছে। সেসব অবহেলা করা সম্মাননীয় নয়। বাংলা কাব্যের যুগ-পরিবর্তনে এই চিঠির মূল্য কোনোদিনই অস্বীকৃত হবে না।

গৌরমোহন বিদ্যালংকারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' গ্রন্থটির তিনি একটি ছাত্রীপাঠ্য সংস্করণ প্রচার করেন।

৪

অকস্মাৎ তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটল ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে, তারিখটি ১৮ অগাস্ট। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি সবই বেথুন স্কুলের নামে উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতায় তাঁর কোনো ভূসম্পত্তি ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর বড়লাট লর্ড ডালহৌসি বিদ্যালয় পরিচালনায় সরকারি তত্ত্বাবধান চালু করলেন। বাংলাদেশের ছোটলাট স্যার সিসিল বীডন এই বিদ্যালয়টিকে পুরোপুরি সরকারী বিদ্যালয় রূপে গ্রহণ করলেন এবং বিদ্যালয়টি পরিচালনার জন্য রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, কালীপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করলেন। কমিটির সম্পাদক মনোনীত করা হল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে। সদস্যদের সকলেই যে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, এমন নয়। বিশেষ করে কালীপ্রসাদ ঘোষ তাঁর ইংরেজি পত্রিকা 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সিয়া'-য় স্ত্রীশিক্ষার বিপক্ষতা করে এক জোরালো প্রবন্ধ লেখেন। অথচ এই কালীপ্রসাদ হিন্দু কলেজের এক খ্যাতনামা ছাত্র। কবি ও

প্রা:ন্তিক হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। এই সমালোচনার জবাব দিলেন পণ্ডিত গৌরীশংকর তর্কবাগীশ 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায়।

এই সময়ে 'সর্বশুভকরী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, ওই পত্রিকায় মদনমোহন তর্কালংকার স্ত্রী-শিক্ষা বিরোধীদের সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করেন এবং স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে এক জোরালো বক্তব্য রাখেন। এইভাবে বীটন-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় কেবল একটি প্রতিষ্ঠান হল না, হল একটি আন্দোলন।

একমাত্র রাধাকান্ত দেব এই বিদ্যালয় স্থাপনে সহযোগিতা করলেন না, বরং নিজগৃহে একটি পালটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। তবে সংবাদপত্রে এই বিদ্যালয়ের বিরোধিতা কেউ করে নি, বরং একে একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান বলে 'সংবাদ ভাস্কর'-এ মন্তব্য করা হয়েছিল :

> "আমরা শ্রবণ করিলাম শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দেব তাঁহার বাটিতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার্থে এক পাঠশালা করিয়াছেন। সংস্কৃত কলেজের একজন ভদ্র বালিকাগণকে ইংরেজি বাঙ্গলা উভয় ভাষায় কথায় শিক্ষাদান করিতেছে" (২৯শে মে, ১৮৪৯)।

'সম্বাদ ভাস্কর'-এর সম্পাদক ছিলেন গৌরীশংকর তর্কবাগীশ, তিনি রাধাকান্ত দেবের প্রয়াসকে অপমানিত করলেন না। তিনি স্ত্রীশিক্ষার একজন বড় উৎসাহদাতা। কিন্তু তর্কবাগীশের তর্ক-পারঙ্গমতা দৃশ্যমান হল কালীপ্রসাদ ঘোষের ইংরেজি বয়ান পড়ে। তিনি কালীপ্রসাদ ঘোষের পারিবারিক ও সামাজিক উভয় জীবনের খবর প্রকাশ করে দিলেন।

> "আমরা 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সিয়া'র সম্পাদক মহাশয়ের অন্তঃপুর বহিঃপুরের প্রথার তাবৎ সমাচার লিখিলাম কিন্তু সম্পাদক মহাশয় কোন ধর্মাবলম্বী ইহা বলিতে পারিলাম না, যাঁহার কোনো ধর্মের চিহ্নই দেখি না তাঁহাকে কোন ধর্মাবলম্বী কহিব" (সম্বাদ ভাস্কর, ১২ জুন, ১৮৪৯)।

১৮৫০ সালে 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় প্রথম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখা 'বাল্য-বিবাহের দোষ' নামে এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার ২য় সংখ্যায় মদনমোহন তর্কালংকার স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লেখেন। এই নিবন্ধে তিনি বারাসতে মিত্র মহাশয়ের সাধু প্রচেষ্টা উল্লেখ করে বেথুন সাহেবের সৎ উদ্যোগের জন্য সাধুবাদ দেন।

> "এক বৎসরের অধিক কাল গত হইল কন্যাসন্তানদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এই মহানগরীতে এবং বারাসতে ও অন্যান্য কতিপয় স্থানে শিক্ষাস্থান সংস্থাপিত হইয়াছে। এই শ্রেয়স্কর বিষয় প্রচারিত করিবার নিমিত্ত কতকজন মহাত্মা প্রথমত দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া আপন আপন কন্যাসন্তানদিগকে তত্তৎ পাঠস্থানে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ঐ ভদ্র মহাশয়েরা সর্বদাই মনের মধ্যে এইরূপ প্রত্যাশা করেন যে

বঙ্গদেশস্থ সমস্ত ভদ্র ব্যক্তিই তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব কন্যাগণের অধ্যয়ন সম্পাদনে যত্নপূর্বক প্রবৃত্ত হন। (সর্বশুভকরী পত্রিকা, ১৭৭২ শকাব্দ, ১ম ভাগ, ২য় সংখ্যা, আশ্বিন ১)।

হিন্দু কলেজ ও পটলডাঙ্গা স্কুল প্রতিষ্ঠায় ডেভিড হেয়ার বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেই পটলডাঙ্গা স্কুল আজ তাঁর নামে পরিচিত এবং ওই বিদ্যালয় অঙ্গনে তাঁর একটি চমৎকার শ্বেতমর্মর মূর্তি শোভা পাচ্ছে।

সিস্টার নিবেদিতা আয়ার্ল্যান্ডের মেয়ে ও তাঁর পূর্বনাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল, ১৮৯৮ সালে তিনি ভারতে আসেন। এই সন্ন্যাসিনী মহিলা রাজনৈতিক কার্য-কলাপের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে বাগবাজার ঘোষপাড়া লেনে তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বেথুন ছিলেন বিদেশী, তিনিও ছিলেন বিদেশিনী। হিন্দু মেয়েদের শিক্ষাদানে এগোতে গিয়ে তিনি পদে পদে বাধা পেতেন। বাধা জয় করে এই ভদ্রমহিলা ভারতের স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে এক কালজয়ী স্বাক্ষর রেখে গেছেন—তিনি বেথুনের যোগ্য উত্তরসাধিকা।

বীটন সাহেব শুধু স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে শ্রম করেন নি। তিনি দেশীয় রায়তদের ওপর থেকে অত্যাচার জুলুম নিবারণের জন্য, মফঃস্বলবাসী ইংরেজদের আইনের চোখে এক পর্যায়ে আনার চেষ্টা করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত ফৌজদারী আদালত তাদের বিচার করবার অধিকারী ছিল না। অথচ নীল চাষের ব্যাপক প্রসারে মফঃস্বলে ইংরেজ বাসিন্দাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সেই অনুপাতে তাদের অত্যাচারও বেড়েছিল। আইন সচিব বীটন এই ব্যবস্থার সংশোধনে চারটি আইনের খসড়া তৈরি করেন এবং এর বয়ান প্রকাশ হয়ে পড়লে এদেশীয় ইংরেজগণ এই আইনকে 'কালা কানুন' (Black Act) নাম দিয়ে তুমুল আন্দোলন শুরু করলো। এই আইনের প্রস্তাবনাতে এত শোরগোল দেখা দিল যে স্বভাবতই এর চেহারাটা কেমন ছিল, জানার কৌতূহল স্বাভাবিক।

প্রথম শিরোনামটি এই রকম : 1. Draft of an Act abolishing exemption from Jurisdiction of the East India Company's Criminal Courts.

এই প্রস্তাব শিকেয় তুলে রাখা হল। কিন্তু এর ফলে ইংরেজদের সঙ্গে দেশীয়দের পার্থক্যটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। ইংরেজের যাঁরা সহযোগী ছিলেন, তাঁদের অনেকে নিজেদের অবস্থাটা ঠাহর করতে পারলেন। ১৮৫১ সালের অক্টোবর মাসে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' গঠিত হল। এই সংগঠনের সভাপতি হলেন রাধাকান্ত দেব আর সম্পাদক হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তবে এমন মিলন বেশিদিন টেঁকে নি।

□ সুরেশচন্দ্র মৈত্র

উনিশ শতক ও মিশনারি আলেকজান্ডার ডাফ্

উনিশ শতকের বাংলায় যে বিরাট পরিবর্তনের জোয়ার এসেছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্বলিত মানুষের মনোজগতে—তাকে জাগরণ, জাগৃতি, নব জাগৃতি, রেনেসাঁ, পরিবর্ত-সময়, নবজাগরণ ইত্যাদি নানা অভিধায় অভিহিত করেছেন বাংলার নানা সময়ের মনীষীরা। আমরা এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া 'নবজাগরণ' কথাটি ব্যবহারেই বেশ স্বস্তি বোধ করি। উনিশ শতকের বাংলার মানুষের মনোজগতে যে মহা কল্লোল দেখা দিয়েছিল, তার চরিত্র বিশ্লেষণে দেশী-বিদেশী সমাজ-বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক এবং দার্শনিকগণ মোটামুটি ঐকমত্য হয়ে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা মোটামুটিভাবে এইরকম :

(ক) ব্যক্তির মুক্ত চেতনা, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও বিশ্বানুভূতি,

(খ) যুক্তিবাদ, ঐহিকতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য,

(গ) স্বদেশ প্রেম, জাতীয়তাবাদ ও মানবতাবাদ,

(ঘ) সংশয়, জিজ্ঞাসা ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়ন,

(ঙ) সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা,

(চ) মানবিকতার বিকাশ, নারীর বন্ধনমুক্তি ইত্যাদি।

দেখা গেল এই নবজাগরণ মানুষকে দেবতা করলো না, দানবও করলো না, সে দেবতাও মানলো না, দানবও মানলো না। তার হৃদয়ের বস্তু হয়ে উঠলো মানুষ আর বিশ্বসংসার। এক কথায় উনিশ শতকে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম যে এই নবজাগরণ মানুষকে শাস্ত্রের নাগপাশ থেকে, দেবতার রোষানল থেকে, গুরুর হাত থেকে, পুরোহিতের দাপট থেকে, রাজার উদ্যত খড়্গ থেকে, সামন্তের লোলুপতা থেকে, কুসংস্কার, কুপ্রথা, অধীনতা ও অসাম্যের হাত থেকে মোটামুটি সরিয়ে একটা ভিন্ন অবস্থানের মাটিতে এনে দাঁড় করিয়েছে, যেখানে তার পাশে শুধুই মানুষ আর মানুষের কর্মশালা : মানুষ বিশ্বাস করলো সেই বিখ্যাত বক্তব্য, "God made man to know the laws of the universe, to new its beauty, to admire its greatness. He bound him to no fixed place, to no prescribed form of work, and by no iron necessity but gave him mobility and free will."

(Burkherdt)

উনিশ শতকের এই মর্মবাণী দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল করার কাজে এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে অসংখ্য মনীষী ও নায়কগণ অত্যন্ত উল্লেখ্য ভূমিকা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত বললেন—"মানুষের ব্যক্তিত্ব ইতিহাসকে অনেকখানি ছাপাইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু সে ইতিহাস হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন নহে। বড় ব্যক্তিত্ব বৃহত্তর ইতিহাসকে আপনার ভিতরে সংবরণ করিয়া লয়—ইতিহাসে তাহার দামও হয় বৃহৎ। কিবা ধর্মক্ষেত্রে, কিবা রাষ্ট্রে, কিবা সমাজে এমন কোথাও কোনও দিন এমন ব্যক্তিপুরুষের আবির্ভাব ঘটে নাই, যাঁহার আবির্ভাব ইতিহাসের সহিত নিবিড় ভাবে যুক্ত নহে। সৃষ্টির ভিতরে কোন বস্তু বা ঘটনাই একান্তভাবে খাপছাড়া নহে।" [সাহিত্যের স্বরূপ ইতিহাস ও ব্যক্তিত্ব]

সেই ইতিহাসের ধারাবাহিকতার পরম্পরার প্রয়োজনেই রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-বিপিনচন্দ্র প্রমুখ আরও অনেক চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব এসেছেন এবং তাঁদের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। এক্ষেত্রেও শুধু বাঙ্গালী মনীষীগণই নন, পরাধীন ভারতবর্ষে একদল বিদেশী মহাপ্রাণ ও ভারতবন্ধু, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বড় ইংরেজ' আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ, যুক্তি-নির্ভর বিচার বিশ্লেষণ, মানবিকতাবোধ, বিশ্বানুভূতি—এক কথায় আমাদের দেশের মানুষকে আধুনিক ভাবনায় ভাবিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা হয়তো নানা সময়ে নানা দায় দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন এদেশে, কিন্তু সময়ধারায় আমরা দেখেছি তাঁদের ওপর সরকারীভাবে ন্যস্ত দায়িত্বের বাইরে বা সেই দায় দায়িত্ব কিছুটা গৌণ রেখে বা অনেক ক্ষেত্রে একেবারে ভিন্ন পথে সরে এসে এদেশের মানুষের মঙ্গলে, কল্যাণে, শিক্ষা-দীক্ষার অগ্রগমনে ভালো-মন্দের বিশেষত ইওরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তিবাদিতা, মানবিকতা, বিশ্বভাবনার বাণী প্রচার-প্রসার ও মানুষের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'ত্রাতার' ভূমিকা না নিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই বন্ধুর এবং আত্মীয়ের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এঁরা ইংরেজের মধ্যে 'বড় ইংরেজ' আর বিশ্বমানবতার মধ্যে মানুষের 'বড় আমি' সত্তার মূর্ত স্বরূপ হিসেবে ইতিহাসে বেঁচে আছেন। এমনিভাবেই বেঁচে আছেন ডিরোজিও-কেরী-মার্শম্যান-বেথুন-হেয়ার-ডাফ-ব্রাইস-ম্যাকডোনাল্ড, হেস্টিটমরি সিমেজার-এনড্রুজ-লেয়ার্ড প্রমুখ বড় ইংরেজগণ। এঁরা সকলেই এদেশে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের কাজে মিশনারির ভূমিকা নিয়েই এসেছিলেন, কিন্তু কালক্রমে এঁরা সকলেই এদেশের ভাল-মন্দের শরিকানা গ্রহণ করে পরম আত্মীয় হয়ে উঠলেন। প্রায় দুশো বছরের ইংরেজ শাসনের সমগ্র সময়কালেই মিশনারিদের কার্যক্রম সমান গৌরবের বা সব সময়ের মিশনারিগণই সমান মানবিক গুণাবলী এবং অগ্রবর্তী শিক্ষা-সংস্কৃতি চেতনার নায়ক, তাও আদৌ সত্য নয়। আর তা হওয়াও সম্ভব নয়। বাংলাদেশে মিশনারিদের ভূমিকা—মিশনারিদের নানা প্রচেষ্টা-প্রয়াস-পিছুটান, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নানা সময়ে নানাভাবে বাঙ্গালী সমাজে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তাও আমাদের সামাজিক ইতিহাসের অঙ্গ। তার অনেকটাই

মিশনারীদের লেখা না হলেও খ্রীস্টানদের লেখা এবং বাঙ্গালীদেরও লেখার অনেক কিছুই মিশনারিদের লেখার উৎস থেকে তথ্যাবলী সংগৃহীত। উভয় ক্ষেত্রেই নিজের নিজের ধর্মীয় ও জাতিগত সংস্কারের পিছুটান কমবেশি কাজ করেছে। এ দুইয়ের মাঝখানে উনিশ শতকের নবজাগরণে মিশনারিদের যোগ্য ভূমিকা নিয়ে কিছু সঠিক তথ্যসম্বলিত ইতিহাসও সত্যিই লেখা হয়েছে।

দুই

উনিশ শতকের বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে মিশনারিদের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে জড়িত হয়ে আছে। এবং সে প্রসঙ্গে কিছু বলতে গেলে স্কটিশ মিশনারি আলেকজান্ডার ডাফের কথা এবং কার্যক্রমের ইতিবৃত্ত বিশেষ শ্রদ্ধার সাথেই স্মরণ করতে হবে। ঐতিহাসিক কারণেই স্কটল্যান্ডে দীর্ঘদিনের সংগ্রাম এবং শহীদের আত্মদানে প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের ব্যাপক প্রচার ও প্রতিষ্ঠা ঘটে। রোমান চার্চ ও পোশাকি সম্বন্ধে স্কচদের মধ্যে একটা নিরাপত্তা ছিলই। ছেলেবেলা থেকেই পিতার প্রভাবে ভারতবাসীর কুসংস্কার এবং ভয়াবহ দুরবস্থার কথা ডাফ্ জানতেন এবং একমাত্র খ্রীস্টের পরম করুণাই ভারতবাসীকে এই অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসতে পারে এমন বিশ্বাস থেকেই তিনি মিশনারির কাজ নিয়ে ভারতে এলেন মাত্র বাইশ বছর বয়েসে সেন্ট এ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ডিগ্রী লাভের পরেই। ঊনবিংশ শতকের প্রথম পর্বের বাংলাদেশের ঘটনাবলীর সাথে ইওরোপের রেনেসাঁর এবং রিফরমেশন যুগের ঘটনার সমধর্মিতা উপলব্ধি করে রামমোহন মিশনারি আলেকজান্ডার ডাফ্কেই বলেছিলেন, "I began to think, that something similar might have taken place in India, and similar results might follow here from a reformation of the popular idolatry।" বিস্ময়কর মননশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসার ফলেই এমন অনুভব সম্ভব হয়েছিল।

ভারতবর্ষের প্রতি আবাল্য অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং মিশনারিসুলভ ধর্মপ্রচারের আকুলতা সম্বল করেই দু-দুবার জাহাজডুবির ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৮২৯ সালের ১৪ই অক্টোবর আলেকজান্ডার ডাফ্ কলকাতায় এলেন। এলেন এন্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান সঞ্চিত জ্ঞান, অদম্য সাহস ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে। চার্চ অফ্ স্কটল্যান্ড ডাফ্কে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছিলেন মূলত এক বা একাধিক ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। কিন্তু অন্যান্য মিশনারিগণ কাজটাকে খুব প্রসন্নচিত্তে নিতে পারলেন না। কলকাতার আশেপাশে স্কুল স্থাপন করার সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল স্কচ মিশনারি কর্তৃপক্ষের। সরকারী বিধিনিষেধের ফলে ইতোপূর্বে মিশনারিগণকে কলকাতার অদূরে শ্রীরামপুরে যেতে হয়েছিল। শ্রীরামপুর মিশনারিদের বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের বিষয় বাদ দিলে সেকালে এদেশের মানুষের উচ্চশিক্ষার কথা মিশনারিরা তেমন ভাবেন নি।

তাই তাঁরা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে শুধু ভারতবাসীকে ধর্মোপদেশ দান এবং ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ প্রচারের মাধ্যমেই তাঁদের সমস্ত উদ্যোগ ব্যয় করলেন।

উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন বাঙ্গালীই সম্ভবত প্রথম সবচেয়ে বেশি অনুভব করেছিলেন। ডাফ্ কলকাতায় আসার অনেক আগেই হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কলকাতায় ইংরেজি স্কুলের সংখ্যা ছিল খুবই কম। স্কুল স্থাপনের পেছনে ডাফের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রথমে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা, পরে কুসংস্কার দূরে করা এবং সবশেষে সম্ভাব্যক্ষেত্রে খ্রীস্টধর্মে শিক্ষাদান। তিনি অশিক্ষিত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের বদলে বর্ণহিন্দু, মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল এর ফলে খ্রীস্টধর্ম সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে যাবে। তাই ডাফ্ অপেক্ষাকৃত কঠিন পথটাই বেছে নিলেন। ডাফ্ যখন কলকাতায় এলেন তখন বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায় হিন্দুকলেজের প্রভাবে হিন্দুধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষতা পোষণ করছে কিন্তু খ্রীস্টধর্ম বিষয়ে যে খুব আগ্রহ বোধ করছেন এমনও নয়। একটা বিশেষ নাস্তিক্যবাদী বুদ্ধি তখন ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। টমাস পেনের 'Age of Reason' বা 'Rights of Man' পড়ার আগ্রহ তরুণদের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা গেল। হিন্দু-কলেজে শিক্ষিত যুবকদের দ্বারা পরিচালিত 'জ্ঞানান্বেষণ' এবং 'Enquirer' ইত্যাদি পত্রিকায় হিন্দুধর্ম এবং খ্রীস্টধর্ম দুইই আক্রান্ত হচ্ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে ডাফ্কে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের ব্যাপকতা থেকে স্কুল স্থাপনের কর্মতৎপরতায় বেশি করে আত্মনিয়োগ করতে হল। এই পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যেই ১৮৩০ সালের ২রা আগস্ট স্কটল্যান্ডের জেনারেল অ্যাসেম্ব্রির বাৎসরিক অধিবেশনে 'জেনারেল অ্যাসেম্ব্রিস ইন্সিটিউশন' প্রতিষ্ঠিত হল, যা, দেড়শত বছরেরও বেশি কলকাতায় শিক্ষা প্রসারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শুধু স্কুল প্রতিষ্ঠাই নয়, স্কুল প্রতিষ্ঠার কারণ এবং খ্রীস্টধর্মের মর্মবাণী দুইই সমান গুরুত্বে মানুষের মনে স্থান করে দেবার উদ্দেশ্যে ডাফ্ কলকাতার প্রটেস্টান্ট মিশনারিদের সংঘবদ্ধ করে বিভিন্ন পর্যায়ে সর্বসাধারণের বোধগম্য বক্তৃতামালা অনুষ্ঠানেরও উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কলকাতার হিন্দু কলেজের ছাত্ররাও সেই বক্তৃতা শুনতে যেতেন। হিন্দু কলেজ থেকে এই বক্তৃতা না শোনার জন্য ছাত্রদের মধ্যে নোটিশ দেওয়া হোত। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী লিখলেন, "এই আদেশ প্রচার হইলে চারিদিকে লোকে ছি ছি করিতে লাগিল। লোকের স্বাধীন চিন্তার উপরে এতটা হাত দেওয়া কাহারও সহ্য হইল না।" এই বক্তৃতামালার মধ্যে উইলির 'প্রাচীন ভারতবর্ষ', ডাফের 'মনু এবং তার বিধান' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখ্য। ডাফ্ শুধুমাত্র সরকারী কর্মচারী তৈরিতেই উৎসাহী ছিলেন না। সে সময়ে ডেভিডসন্ নামে একজন ম্যাজিস্ট্রেট হিন্দু কলেজ থেকে ডাফ্-এর কলেজের ছাত্রদের সরকারী কাজে নিয়োগের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। পরে হিন্দু

কলেজ পরিচালিত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় এই মনোভাবের কঠিন সমালোচনা করা হয়।

তিন

ডাফ্ কলকাতায় আসার পর থেকে মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র সরকার প্রমুখ অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বর্ণহিন্দু তরুণ সম্প্রদায়ের কয়েকজনকে ধর্মান্তরিত করায় তার প্রভাব দ্রুত সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে এই আশংকায় হিন্দুসমাজ ডাফের বিরুদ্ধে বিশেষ প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছিলেন। ১৮৬৩ সালে শেষবারের মতো ভারতবর্ষ ত্যাগ করার আগে তাঁর এদেশে থাকাকালীন ৩৩ বছর সময়কালে মাত্র আটচল্লিশ জনকে ডাফ্ ধর্মান্তরিত করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে এদেশে খ্রীস্টধর্ম প্রচার ও শিক্ষাদান—এই দুই উদ্দেশ্য যা নিয়ে ডাফের এদেশে আসা, তার মধ্যে শুধু খ্রীস্টধর্মের প্রচার প্রসারের কাজ অনেকখানি গৌণ ভূমিকায় চলে গেছে, পরিবর্তে শিক্ষা প্রসারে তাঁর কার্যক্রম অগ্রবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। ধর্মপ্রচার ও বিদ্যাদান এই উভয়ের কোনটির দ্বারা এদেশে মিশনারিরা অধিকতর উপকার করেছেন—এর উত্তরে শতবর্ষ আগের 'সোমপ্রকাশ' বলেছে, "ধর্মান্ধ মিশনারিরা বলিবেন ধর্ম দ্বারা, কিন্তু বাস্তবিক ধর্ম দ্বারা নয়, বিদ্যাদান দ্বারাই তাঁহারা এদেশের অধিকতর উপকার সাধন করিয়াছেন। কেবল ধর্মের দ্বারা আত্মার উন্নতি লাভ ও মুক্তিলাভ হয় না। যাহাদিগের হিতাহিতবোধ ও কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান ও চিত্তশুদ্ধি নাই, তাহাদিগের আত্মার উন্নতি ও মুক্তি লাভের সম্ভাবনা কি? মূর্খ যে ধর্ম অবলম্বন করুক তাহার এ সকল গুণ হয় না"।

বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে শিক্ষাব্রতী ডাফ্ই সর্বকালের মানুষের কাছে একান্ত গ্রহণযোগ্য। ফাদার পিয়ের ফ্যাঁলো আলেকজান্ডার ডাফের কীর্তিকে উইলিয়ম কেরীর থেকে অধিকতর মহৎ বলে মনে করেছেন। ডাফের ছাত্রগণ নতুন বিজ্ঞাননির্ভর চিন্তা-চেতনা ও নবযুগের যুক্তিবাদ দ্বারাই তাঁদের হৃদয় জগৎ মথিত করেছিলেন। এমন গোত্রের ছাত্র তৈরির কাজেই তিনি সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন সারাজীবন।

রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তরে' বলেছেন, "য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ আমাদের দেশে এসেছিল এবং ইংরেজি শিক্ষার ফলে উনিশ শতকে বাঙালী তরুণ সমাজ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছে, প্রতিদিন জয় করেছে সে জ্ঞানের জগতকে কেননা তার বুদ্ধির সাধনা বিশুদ্ধ, ব্যক্তিগত মোহ থেকে বিমুক্ত।" উনিশ শতকে আরও অনেক বিদেশী শিক্ষকের মতো আলেকজাণ্ডার ডাফ্ তরুণ বাঙ্গালী সমাজের চিত্তমুক্তিসাধনে ব্রতী হয়েছিলেন বলেই তাঁর কাছে আমাদের অপ্রতিশোধ্য ঋণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ খেতাবধারী (যা সেকালে মিশনারিদের ক্ষেত্রে বিশেষ বিরল) হয়েও জীবনের একটা বড় অংশ নিম্নতম শ্রেণীতে পড়ানোর গৌণ কাজে তিনি ব্যয় করেছেন। ডাফের মতো স্কচ মিশনারিগণ সকলেই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন এবং স্কটল্যাণ্ডের জেনারেল এসেম্ব্লি বরাবরই এদেশে

উচ্চশিক্ষা প্রসারের কথা ভেবেছেন। এদেশে মিশনারিগণ অনেক বাংলা ও ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেছেন নানা সময়ে, কিন্তু উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁরা তেমন কিছুই করেন নি। ডাফ্ চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতি হিসেবে প্রথমে উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপন করতে। ১৮৩৪ সালে যে সময়ে হিন্দু কলেজে নিচের ক্লাসে মাসিক মাইনে পাঁচ টাকা, ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে তিন টাকা, তখন ডাফ্ সাহেবের স্কুলে বিনা বেতনে পড়ানো হোত এবং ছাত্র সংখ্যার প্রাচুর্যের কারণে সকাল ও দুপুর দুবেলা স্কুল চালানো হোত।

প্রাথমিক থেকে একেবারে কলেজী উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষাদান তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বলেই তিনি শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এবং তার আগে শিক্ষকদের শিক্ষাদানের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষকের কাজ শুধু তথ্য পরিবেশন নয়। যথার্থ শিক্ষকের কাজ ছাত্রের চিন্তাশক্তিকে জাগিয়ে তোলা, স্বাধীন বিচারবোধকে বিকশিত করা এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে তীক্ষ্ণতর ও পরিণত করে তোলা। ইনটেলেকচুয়াল সিসটেম এবং ইনটেরগেটরি সিসটেমে পড়ানোর পদ্ধতি তিনিই চালু করেন। তিনি ক্লাসে নোট দেবার বিরোধী ছিলেন। অন্ধের মতো মুখস্থ বিদ্যায় আস্থা ছিল না তাঁর। বর্ণমালা মুখস্থ করার থেকে বেশি জোর দেওয়া হোত শব্দার্থ শেখানোর ওপর। ডাফের ছাত্র লালবিহারী দে তাঁর স্মৃতিকথায় এই শিক্ষাপদ্ধতির নতুনত্বের কথা বারবার বলেছেন। ডাফ্ চাইতেন ছাত্রের স্বয়ংলব্ধ ও পূর্বলব্ধ জ্ঞান আগে তার মনকে সচেতন করে তুলুক। প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে তিনি ছাত্রদের চিন্তাসূত্রকে সুগ্রথিত ও স্পষ্ট করে তুলতে চাইতেন। ছাত্রদের দৈহিক শাস্তি দানে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। ছাত্র নিজে দেখে বুঝে চিন্তা করে তা ভাষায় প্রকাশ করুক, তবেই তার অধীত বিষয়ের প্রতি অধিকার বাড়বে আর নিজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিও আস্থা জন্মাবে। ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার জন্য ডিরোজিওর উত্তরসূরী হিসেবে ডাফও বিতর্ক সভার আয়োজনে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

শুধু ক্লাসে পড়ানোর আধুনিক পদ্ধতি নিয়েই যে তিনি ভেবেছিলেন তাই নয়। পাঠ্যগ্রন্থের মান নিয়ে, বয়স এবং শ্রেণী অনুযায়ী পাঠক্রম নিয়েও তিনি চিন্তা করেছেন। তিনি তিন খন্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থমালা সংকলন করেছিলেন। শুধু ভাষা শিক্ষা বা ধর্ম-শিক্ষাই নয়, অন্যান্য নানা বিষয়ই তাঁর স্কুলে পড়ানো হোত। ভারতবর্ষের শিক্ষাক্রমে অর্থনীতি পড়ানোর ক্ষেত্রে ডাফ্ ছিলেন পথিকৃৎ। সহকর্মী শিক্ষক ব্রিফ্টের লেখা এবং তাঁর নিজের সংশোধিত ও সম্পাদিত অর্থনীতি সেকালে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। অর্থনীতি পড়ানোর আগ্রহ এবং অর্থনীতিকে পাঠক্রমে স্থান দেওয়া তখনকার মিশনারিগণ ভালো চোখে দেখেন নি। স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা অগ্রগণ্য। ১৮৪০ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের স্কুল কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার তেমন প্রসার ছিল না। ১৮৪০ সালেই ডাফ্ তাঁর জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিস ইনস্টিটিউশনকে স্কুল ও কলেজ দুই ভাগে

ভাগ করলেন। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে কলেজের প্রথম বছরের ছাত্র ছিলেন। ডাফ্ ধর্মতত্ত্ব, গণিত, সাহিত্য, বিজ্ঞান-দর্শন, অর্থনীতি এবং ইতিহাস সব কিছুকেই সমান গুরুত্ব দিতেন। তিনি নিজে কলকাতায় এসেই বাংলা ভাষা শিখেছিলেন। বাংলায় সাবলীলভাবে বক্তৃতা করতে পারতেন। তিনি মাতৃভাষার চর্চাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। কলকাতায় জেনারেল অ্যাসেম্বলিস্ ইনস্টিটিউশন, ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন (পরে যার নাম ডাফ্ কলেজ) ইত্যাদি ছাড়াও তিনি টাকী, বাঁশবেড়িয়া, কালনা, ঘোষপাড়া, চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানেও অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষা বিস্তার করেছিলেন। এদেশে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি, লেডিজ সোসাইটি এবং লেডিজ অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের কাজ দ্রুত ছড়িয়ে যায়। ১৮৫৮ সালের সংবাদ প্রভাকরের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে ডাফ্ সাহেবের নারী শিক্ষার এবম্বিধ কর্মতৎপরতার জন্য তাঁকে বিশেষভাবে সাধুবাদ জানানো হয়েছে।

আলেকজাণ্ডার ডাফ মিশনারি শিক্ষক হিসেবে এদেশে এসেছিলেন। কিন্তু শুধু গির্জার চৌহদ্দির মধ্যে তাঁর কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি অচিরেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতবাসীর মনোজগতের উন্নতি সাধনে ধর্মশিক্ষার বাইরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা অধিকতর প্রয়োজন। এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনে তাঁর ভূমিকা আরও বেশি কার্যকরী হয়েছিল। উনিশ শতকে ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে ডাফের অবদান একালের সকল ঐতিহাসিকই আন্তরিকভাবে স্বীকার করেছেন। ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন রূপে ঘোষণা করার সরকারী নীতি রচনায় ডাফের ভূমিকা বিশেষত ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে শ্রদ্ধার সাথেই স্বীকৃত হয়েছে। ইংরেজ উপনিবেশের শহর কলকাতায় বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সাধারণত শুধুই একজন মিশনারির তৎপরতা থাকার কথা নয়। এদেশে উচ্চশিক্ষার প্রসারই তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ফেলো, প্রথম সিনেটের সদস্য, আর্ট ফ্যাকালটির প্রথম সভাপতি, আর্টস জুনিয়ার বোর্ড পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ইত্যাদি নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে যোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। চিরদিনই শিক্ষার ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত সরকারী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে সমতা, উদারতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মেঘনাদ বধ কাব্য' পাঠ্য করার ক্ষেত্রে ডাফের অবদান অনস্বীকার্য।

কলকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অগ্রগণ্য ভূমিকা সত্যিই বিস্ময়কর। ইতোপূর্বে সংস্কৃত কলেজে এবং মাদ্রাসায় যৎকিঞ্চিৎ চিকিৎসাবিদ্যা পড়ানো হোত। ডাফ্ ইংরাজিকে শিক্ষার বাহনরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাই ইংরাজিতে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ানোর ব্যবস্থায় তিনি উদ্যোগী ছিলেন। বিজ্ঞানচর্চা, স্বাস্থ্যরক্ষা

ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করাই ছিল একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। তখনো পর্যন্ত শব ব্যবচ্ছেদে হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে নানারকম কুসংস্কার কাজ করতো। ১৮৪৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে চারজন ছাত্রকে লন্ডনে উচ্চতর চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়ানোর জন্য পাঠানো হয়েছিল। তার মধ্যে দ্বারকানাথ বসু ছিলেন ডাফ্-এর কলেজের ছাত্র। ১৮৯৯ সালে লাহোরে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সমাবর্তন ভাষণে তদানীন্তন ছোটলাট ডাফের ভূমিকার বিশেষ উল্লেখ করেন। সেকালে ইংরেজ এবং বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মানসিক ভাব বিনিময়ের সর্বজনমত-স্বীকৃত স্থান হল 'বীটন সোসাইটি', যার সাথে ধর্মীয় কার্যক্রমের কোনো রকম সম্পর্ক ছিল না। শুধু মিশনারি ডাফের হৃদয়ে ভারতবর্ষের নবজাগরণের যে সাধ ছিল তার বাস্তব রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যেই তিনি এই 'বীটন সোসাইটি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

আলেকজান্ডার ডাফ্ বিভিন্ন সময়ে Calcutta Christian Observer, Free Churchian এবং পরে Calcutta Review নামের পত্রিকার সম্পাদনার কাজে যুক্ত থেকেছেন। Calcutta Review পত্রিকার ওপর চার্চের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এই পত্রিকায় তিনি অনেক প্রবন্ধ লেখেন, তার মধ্যে বাংলা বিহার প্রভৃতি রাজ্যের শিক্ষা সমস্যার নানা দিক, পশ্চিম ভারতে নারীশিক্ষা, বাংলায় সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা, ভারতের মানুষের বিবাহিত জীবন, বেদান্ত দর্শন, সিংহলের ইতিহাস, বৌদ্ধ দর্শন, কন্দ আদিবাসীদের বিভিন্ন সংস্কার ইত্যাদি নানা বিষয়ের উল্লেখ নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং এর কোনো ক্ষেত্রেই মিশনারি সুলভ ছকের ছাপ দেখা যাবে না। তিনি Calcutta Review খুব বেশিদিন সম্পাদনা করেন নি, তবু তাঁর অবদান কেউই অস্বীকার করবেন না। এই পত্রিকা সম্পাদনার মধ্যে ডাফের উদার-অসাম্প্রদায়িক শিক্ষানুরাগী ও দার্শনিক মনের পরিচয় বিশেষভাবে বিধৃত হয়ে আছে।

এদেশের বিচার ব্যবস্থায়, বিশেষত শেতাঙ্গদের অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে, সেই সময়ের তুলনায় তিনি অনেক বেশি যুক্তিগ্রাহ্য এবং মুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন, যা আদৌ সে সময়ের মিশনারিদের মতো নয়। ১৮৫৮ সালে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে যখন দেশবাসী পর্যুদস্ত এবং পাশাপাশি নীলকর-বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল, তখন আলেকজান্ডার ডাফের মতো দু-একজন মিশনারি শিক্ষাব্রতীই নীলচাষীদের প্রতি সরকারের সুকর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে ডাফ্ ও লঙ-এর ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবজনক। সমাজসংস্কারে, শিক্ষামূলক এবং রাজনৈতিক নানা সংস্কার আন্দোলনে এই দুই ভারত-বন্ধু একসাথে কাজ করেছেন। নীলদর্পণ অনুবাদ প্রচার মামলায় লঙ-এর কারাদণ্ড হয়। ডাফ্ সর্বতোভাবে তাঁকে নৈতিক সমর্থন জানান।

ডাফ্ যেমন এদেশের মানুষকে ভালোবেসেছেন, এদেশের মানুষের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সার্বিক স্বীকৃতিও তিনি লাভ করেছেন। লালবিহারী দে, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ খ্রীস্টান বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীই শুধু নন, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ

মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো অখ্রীস্টান বুদ্ধিজীবী এবং মনীষীগণও আলেকজান্ডার ডাফ্ সম্পর্কে তাঁদের অগাধ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন লেখায়। ন্যায়পরায়ণ, শিক্ষাব্রতী, সুশিক্ষিত, সুবক্তা, মনোবিজ্ঞানী, সময়ের দাবী-সচেতন মানুষটি অত্যন্ত সাধারণ জীবন, এমনকি কষ্টের জীবনও স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন। অথচ তাঁর মতো উচ্চশিক্ষিত ইংরেজ সে সময়ে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থনৈতিক মর্যাদায় দিন কাটাতে পারতেন। কিন্তু সহজ পথে তিনি চলেন নি কোনো দিনই। মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন আগে ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষ ডক্টর ফাইফ্‌কে তিনি লিখেছেন, 'Indeed wherever I wander, wherever I stay, my heart is still in India, in deep sympathy with its multitudinous inhabitants and in earnest longings for their highest welfare in time and in eternity।'

উনিশ শতকে বাঙ্গালী সমাজের নবজাগরণের ইতিবৃত্তের সাথে মিশনারিদের কার্যধারার এক গভীর যোগসূত্র কেউই অস্বীকার করেন না। এমন ভারতবন্ধু, যথার্থ ভারতপ্রেমী ও শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে আলেকজান্ডার ডাফ্ এক মহান ব্যক্তিত্ব এবং সেই সাথে জন ম্যাকডোনাল্ড, উইলিয়াম হেস্টিং, আলেকজান্ডার টমুরি, প্রমুখ স্কচ মিশনারিদের নামও বিশেষ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হবে। এইসব বড় ইংরেজের কার্যক্রমের সঠিক মূল্যায়ন এবং প্রজন্ম পরম্পরার কাছে তা পেঁছে দেবার কাজ এখনো তেমনভাবে করা হয় নি। ডাফের জীবনের ৭৩ বছরের সময়সীমার মধ্যে ৩৩টি মূল্যবান বছর তিনি আমাদের এই কলকাতায় কাটিয়ে ১৮৬৩ সালে নিতান্ত অসুস্থ অবস্থায় দেশে ফিরে যান। এখনো স্কটল্যান্ডের কোনো সমাধিক্ষেত্রের এপিটাফে তাঁর শেষ ইচ্ছার এই পরিচয়টুকু লেখা আছে কিনা জানি না, "By profession a missionary ; by his life and labours, the true and constant friend of India", তবে প্রতিটি শিক্ষিত ভারতবাসীর হৃদয়ে এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে।

□ প্রণব চট্টোপাধ্যায়

হেনরী ডিরোজিও

প্রতীচ্যে আধুনিক চেতনার প্রথম স্থপতিদের অন্যতম টম পেইন তাঁর 'দ্য এজ অব রিজ্ন' বইটি প্রকাশ করেছিলেন ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে। ঠিক তার আগের বছর কলকাতার মৌলালির মোড়ের একটি বাড়িতে জন্মেছিলেন হেনরি লুই ভিভিআন ডিরোজিও, পরবর্তীকালের বিচারে যিনি প্রতীত হয়েছেন এদেশের যুক্তিবাদী ভাবধারার প্রথম পথিকৃৎ হিসেবে। অবশ্যই টম পেইনের ভাবধারার দ্বারা ডিরোজিও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তবে আমাদের সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক প্রেক্ষিতে উনিশ শতকের প্রথম দিকে যে বিশেষ একটি পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই ডিরোজিওর বস্তুবাদিতা এবং যুক্তিনিষ্ঠারও উদ্ভাস ঘটে। এদেশের পটভূমিকায়, সেটিকেই 'এজ অব রিজ্ন' প্রতিষ্ঠার মুখবন্ধ বলতে পারা যায় স্বচ্ছন্দে।

অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আজও যেখানে অন্ধ-কুসংস্কার আমাদের সমাজমানসের সমস্ত স্তরেই তার নিকষ কালিমা নিয়ে সুস্থিত রয়েছে, সেখানে পৌনে দুশো বছর আগে এদেশে যুক্তির যুগপত্তন ঘটিয়েছিলেন হেনরী ডিরোজিও, এমন কথা কতখানি মান্য? এই সংশয়ের যথার্থতা অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এ-ও তো আবার ঠিক যে, উনবিংশ শতাব্দীর বৃহদংশ জুড়ে আমাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে যে বহুবিচিত্র পালাবদলের ঘটনা ঘটেছে, তাতে প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বও একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল। সেই দ্বন্দ্বের নানা রকম মাত্রা, নানাবিধ প্রেক্ষিত ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু সামগ্রিকভাবে প্রগতিচেতনার প্রতীতি যাঁদের প্রয়াসে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সংগ্রাম এবং মধ্যপন্থার সঙ্গে সমঝোতা করেই, তাঁদের ভূমিকাগুলো ছিল অসামান্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এঁদেরই অগ্রপথিক ডিরোজিও।

হেনরী ডিরোজিওর জন্ম ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল। ফ্রান্সিস এবং সোফিয়া ডিরোজিওর পাঁচটি ছেলেমেয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। পিতৃকুল পর্তুগীজ এবং মাতৃকুল ইউরেশীয় [এখনকার পরিভাষায়, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান] হলেও, ডিরোজিও নিজেকে পুরোদস্তুর ভারতীয় বলেই দাবী করেছেন। বস্তুতপক্ষে, এদেশের সাহিত্যে স্বাদেশিকতার প্রথম উন্মেষ তিনিই ঘটিয়েছিলেন। সে কথায় পরে আসছি।

সে আমলের বিশিষ্ট শিক্ষক ডেভিড ড্রামন্ডের পরিচালিত ধর্মতলা একাডেমিতে ডিরোজিও ভর্তি হন ছ বছর বয়সে। এই স্কুলটির বিশেষত্ব ছিল এই যে, এখানে ইউরোপীয়, ইউরেশীয় এবং ভারতীয় ছাত্ররা একই সঙ্গে পড়াশোনা করবার সুযোগ

পেতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত যুক্তিবাদী দার্শনিক ডেভিড হিউমের ভাব-ধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন এই ড্রামন্ড সাহেব। ডিরোজিও তাঁর শ্রেষ্ঠ ছাত্র। বছর আটেক ড্রামন্ডের কাছে পড়াশোনার পরই ডিরোজিও বাধ্য হন কর্মজীবনে প্রবেশ করতে। এর কারণ ছিল তাঁর পিতৃবিয়োগ। বাবার কর্মস্থলে বছর দুই কেরানীর কাজ করার পর হেনরী চলে যান ভাগলপুরে তাঁর মামার নীলকুঠিতে কাজ নিয়ে। তাঁর সাহিত্যচর্চারও সূত্রপাত ঘটে সেখানেই। ড্রামন্ডের অধ্যাপনায় জ্ঞান ও চিন্তার যে জগতে তাঁর অবাধ অধিকার জন্মেছিল, তারই সূত্র ধরে ডিরোজিও নিজের পড়াশোনাটাকেও সঙ্গে সঙ্গে অব্যাহত রেখেছিলেন।

ভাগলপুর থেকে কলকাতায় 'ইন্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় প্রায়ই কবিতা পাঠাতেন হেনরী। গেজেটের সম্পাদক ড. গ্র্যান্ট তাঁকে ছাত্রাবস্থা থেকেই ভালোভাবে জানতেন, সুতরাং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা পেতে ডিরোজিওর আদৌ অসুবিধে হয় নি। এই সময়ে তাঁর জীবনে একটি ব্যর্থ প্রণয়ের ঘটনাও ঘটে। এ ব্যাপারটা ডিরোজিওর কবিতাকে অলক্ষ্যে প্রভাবিত করে গেছে বরাবরই।

১৮২৬ সালের গোড়ার দিকে হেনরী কলকাতায় ফিরে এলেন হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষকের পদ নিয়ে। আর এখান থেকেই আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক নূতন পর্বের সূচনা হল। তাঁর নিজের প্রায় সমবয়স্ক ছাত্ররা এমন এক ভাবপ্রেরণায় প্রবুদ্ধ হয়ে উঠলেন 'গুরু'-র শিক্ষায়, যে যুক্তিবাদিতা এবং প্রশ্নমনস্কতাই হয়ে দাঁড়ালো তরুণ ঐ প্রজন্মের অগ্রগামী অংশের মুখ্য চারিত্র্যলক্ষণ। স্বভাবতই রক্ষণশীল সমাজপতিরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

ইতোমধ্যে পরপর দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ডিরোজিওর : 'দ্য পোয়েমস' (১৮২৭) এবং 'দ্য ফকীর অব জঙ্গীরা অ্যান্ড আদার পোয়েমস' (১৮২৮)। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার প্রমুখ অগ্রগণ্য ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে প্রথমে 'পার্থিনন' এবং তার পরে 'হেসপেরাস' নামে দুটি স্বল্পস্থায়ী পত্রিকাও বার করলেন ডিরোজিও। সমাজপতিদের আক্রমণে দুটিই বিধ্বস্ত হয় অচিরে। বস্তুতপক্ষে এই পত্রিকাদুটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সুপ্রবল একটা সামাজিক সংঘর্ষেরই সূচনা করেছিল সন্দেহ নেই।

এই সংঘর্ষের প্রেক্ষিত এখানে একটু বিচার্য। হিন্দু কলেজের ক্লাসে কিংবা ছাত্রদের অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনের বৈঠকে ডিরোজিও যে বিষয়গুলি তাঁর তরুণ অনুগামীদের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠ করে দিতে প্রয়াসী হতেন, তা হল : ক. স্বাদেশিকতার প্রেরণা, খ. বিশ্বতোমুখিন দৃষ্টিভঙ্গি, গ. নিরীশ্বরবাদী যুক্তিবাদিতা এবং ঘ. সমস্ত ধরনের অন্ধ ও পশ্চাৎমুখী সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করবার মতো মানসিকতা। এদের সমন্বয়েই তিনি এদেশের ইতিহাসে 'এজ অব রিজন' গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

স্বাভাবিকভাবেই এতখানি প্রতিস্পর্ধী মানসিকতাকে কায়েমী সামাজিক স্বার্থের প্রতিভূদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হল না। 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর যৌবন-জল-তরঙ্গ প্রতিহত করার জন্য তাঁরাও সংঘবদ্ধ হতে লাগলেন, রক্ষণশীল সমাজপিতারা— প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ। এঁদের বিরুদ্ধে ছিলেন মধ্যপন্থীরাও—ডিরোজিওর সময়ে যাঁদের অধিনায়ক ছিলেন রামমোহন স্বয়ং। আর প্রগতিপন্থী তরুণেরা রুখে দাঁড়ালেন ডিরোজিওর নেতৃত্বে। সমাজবিকাশের স্বাভাবিক নিয়মেই রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে মধ্যপন্থী এবং প্রগতিপন্থীরা কাছাকাছি এসেছিলেন সেদিন। কৃষ্ণমোহনের 'দ্য পার্সিকুটেড' নাটকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। যে সামাজিক সংঘাত ওই নাটকে চিত্রিত, তা বাস্তব পরিকাঠামোর ওপরেই গড়া। ডিরোজিয়ানদের যে 'পার্সিক্যুশন' সেদিন ভোগ করতে হয়েছে—ওই নাট্যকৃতি তারই দলিল।

কী ছিল ওই উৎপীড়নের স্বরূপ? ···ডিরোজিয়ানরা পরিবারে এবং সমাজে নিন্দিত, ধিক্কৃত এবং বস্তুত 'একঘরে' হয়ে পড়লেন। কিন্তু বৃহত্তম আঘাতটা স্বভাবতই এসে পড়লো তাঁদের প্রেরণার যিনি উৎস তাঁরই ওপর। প্রথমে, কলেজের কর্তৃপক্ষ—যাঁরা ছিলেন ওই রক্ষণশীল গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত, হুমকি দিয়ে ছাত্রদের ডিরোজিওর প্রভাবমুক্ত করার চেষ্টা করলেন। তাতে কিছুই কাজ না-হওয়ায়, এবার তাঁরা সরাসরি আক্রমণ চালালেন ডিরোজিওর ওপর। তিনটি গুরুতর অভিযোগ গড়ে তুলে ডিরোজিওকে প্রকারান্তরে 'চার্জশীট'ই ধরালেন হিন্দু কলেজের পরিচালকমণ্ডলী।

অভিযোগগুলি ছিল এই-এই :

ক. ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের নিরীশ্বরতাবাদে দীক্ষিত করেন।

খ. তিনি বাপ-মায়ের অবাধ্য হবার জন্য ছাত্রদের প্ররোচিত করে থাকেন এবং

গ. ছাত্রদের কাছে ভাই-বোনে বিয়ে হওয়ার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন।

ঘৃণ্য ওই তৃতীয় অভিযোগটিকে সরাসরি অস্বীকার করে, দ্বিতীয়টিকে যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে খণ্ডন করে এবং প্রথমটি যুক্তি এবং সিদ্ধান্তের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে নিজের যথার্থ অবস্থানটিকে বুঝিয়ে ডিরোজিও হোরেস হেম্যান উইলসনের কাছে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলেন এবং আনুষ্ঠানিক পদত্যাগপত্রও পাঠিয়ে দিলেন। এর আগে হিন্দু কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর যে সভায় তীব্র বিতণ্ডা এবং ভোটাভুটির পরিণামে ডিরোজিওকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, সেখানে উইলসন প্রমুখ কয়েকজন তাঁকেই কিন্তু জোরালোভাবে সমর্থন করেছিলেন। ডিরোজিওর উইলসনকে চিঠি লেখা ওই ঘটনারই অনুষঙ্গে তাঁর কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি হিসেবে।

ওই পদত্যাগ-সংক্রান্ত পত্রে ডিরোজিও যা লিখেছিলেন তার মূল কথা ছিল এই যে, তিনি সর্বদাই মুক্তবুদ্ধি-সঞ্জাত যুক্তির আলোচনাকে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। ছাত্রদের মনে কোনো গূঢ় সত্যনির্ভর মৌলিক প্রত্যয়কে পূর্বাভিমানের দ্বারা তিনি

প্রভাবিত হতে দেন নি। যুক্তিবাদী ড্রামন্ডের হাতে-গড়া ছাত্র ডিরোজিও-ও তাঁর কাছে শিখতে আসা সমস্ত তরুণকেই যুক্তির পথে পদক্ষেপ করতে শিখিয়েছেন। এতে কেউ হয়েছে নিরীশ্বরবাদী, কেউ বা ঈশ্বরবিশ্বাসী। মুক্তবুদ্ধির উদ্ভাসনই ছিল তাঁর একমাত্র অভীপ্সা।

এমন মুক্তবুদ্ধির উদ্ঘাটন স্বাভাবিকভাবেই কায়েমী-সামাজিক স্বার্থের ধারকদের পছন্দসই হয়নি। ডিরোজিওকে কলেজ ছাড়তেই হল অতএব। ভারতবর্ষের প্রথম 'ছাঁটাই-হওয়া শিক্ষক' সেই বাইশ বছরের তরুণের পাশে অবশ্য তাঁর সহযোদ্ধা ছাত্রেরা রইলেন। কিন্তু ওই সুতীব্র সামাজিক সংঘর্ষের ঝল্সানির সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যের আঁচেও ক্রমশ ক্রমশ পুড়তে লাগলেন ইয়ং বেঙ্গলের প্রেরণাপুরুষ। এবং দারিদ্র্য নামে ওই অনারোগ্য ব্যাধিটি ডেকে নিয়ে আসে আরো দু-পাঁচটা উপব্যাধিকে। এদেরই একটি ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের শেষ দিকে কলকাতায় মহামারী হিসেবে নখদন্ত ব্যাদান করেছিল। সেটার আভিধানিক পরিচয়, কলেরা মর্বাস। এরই আক্রমণে ২৬ ডিসেম্বর তারিখে এদেশে যুক্তিবাদ, স্বদেশচেতনা এবং সমাজপ্রগতিবোধের প্রথম উদ্গাতা হেনরী লুই ভিভিআন ডিরোজিওর জীবনাবসান ঘটলো। মৃত্যুশয্যায় তিনি ইংরেজ কবি টমাস ক্যাম্বেলের বিখ্যাত 'প্লেজার্স অব হোপ' কবিতার আবৃত্তি শুনতে চেয়েছিলেন ছাত্রদের কাছে। ওই কবিতায় ১৭৯৯ সালে ক্যাম্বেল স্বপ্ন দেখেছিলেন ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন হবে। সেই একই 'স্বপ্ন' দেখতে দেখতে ডিরোজিওর-ও জীবনাবসান ঘটলো মাত্র বাইশ বছর আট মাস বয়সে।

২

ডিরোজিওর মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে সামাজিক আলোড়নটা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। অল্প কিছুকাল পরে রামমোহনেরও জীবনাবসান হয়। ফলে, সমাজপিতাদের 'চক্ষুশূল' দুই প্রতিবাদী—তাঁদের ভাবনা এবং অভিব্যক্তিতে মাত্রাগত যতটা পার্থক্যই থাকুক না কেন—'দৃশ্যপট থেকে অপসৃত' হওয়ায় আবার একটা সামাজিক স্থিতাবস্থা দেখা দিল। ইয়ং বেঙ্গলের বৃহদংশই নিষ্ক্রিয়তায় গ্রস্ত হলেন—যদিও রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তার ব্যাপারটা একেবারে ঘুচে গেল না। সামাজিক উপপ্লব পরে আবারও একবার ব্যাপক হয়ে উঠলো যখন বিদ্যাসাগর মশাই বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করার জন্য ব্যাপক-ভাবে আন্দোলন শুরু করলেন, তখন। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা।

ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ প্রভাবে সেটা ঘটেনি, প্রাক্তন ইয়ং বেঙ্গলীদের প্রত্যক্ষ প্রেরণাতেও নয়। কিন্তু যে অমোঘ আঘাত হেনে ডিরোজিও সমাজের স্থবির আয়তনকে কম্পমান করেছিলেন, তার অভিঘাতটা অলক্ষ্যে ক্রিয়াশীল ছিলই। ডিরোজিও আমাদের মানসকে নানান ভাবেই প্রবুদ্ধ করেছেন আমাদের অজান্তেই হয়তো বা। যুক্তিনিষ্ঠা,

স্বদেশপ্রেম, বিশ্বতোমুখিনতা—এসব তো বটেই, আর এদেরই সঙ্গে সঙ্গে যেটা সবচেয়ে বেশি তিনি শিখিয়েছেন, তা হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। ঠিক এই জন্যেই আমাদের সামাজিক মননে যখনই যেখানে প্রতিবাদ কিংবা তিরস্কারের প্রবণতা ব্যক্ত হয়েছে, তখনই চৈতন্যের অন্তরালে আমরা ডিরোজিওর-ই উত্তরাধিকার বহন করে চলেছি। এ দেশে, "অন্যায়ের মুখোমুখি" তিনিই "প্রথম প্রতিবাদ" যেহেতু!

প্রকৃতপক্ষে তাঁর যুক্তিবাদ এবং প্রতিবাদ, একই মানস-ক্ষেত্রের ফসল। অন্ধ সংস্কার—যার থেকে ধর্মীয় এবং সামাজিক মৌলবাদের সৃষ্টি হয় এবং অন্ধ আনুগত্য, যা পরাধীনতার বোধকে আচ্ছন্ন করে দেয়, ডিরোজিও ছিলেন দুয়েরই পরম পরিপন্থী।

ডিরোজিওর গদ্য-নিবন্ধের সংখ্যা নিতান্তই কম। সামান্য ক-টি মাত্র সঙ্কলিত হয়েছে। তাঁর ভাষণ, আলোচনা ইত্যাদিরও প্রায় কোনোই নথি মেলে না। যা মেলে, তা হল তাঁর কবিতা। যা ছিল জীবনাদর্শ, ভাবনার প্রতীতি—তাকে সন্ধান করতে গেলে তাই স্বভাবতই আগ্রহী পড়ুয়াকে অভিনিবিষ্ট হতে হবে তাঁর কবিতায়। স্বদেশচেতনার প্রকাশ, মানবাধিকারের দাবী, অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে উচ্চারণ—এর সবই স্পষ্ট স্বরে অভিব্যক্ত হয়েছে ডিরোজিওর বিভিন্ন কবিতায়। এই সব কিছুই তাঁর মননে একত্রে উদ্ভাসিত হয়েছিল 'সত্য' রূপে। ঠিক এই জন্যেই উত্তরকালে ডিরোজিও এবং তাঁর অনুগামী ছাত্রদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: "They were all considered men of TRUTH." [ডিরোজিওর অ-শিক্ষক সহকর্মী হরমোহন চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা : Thomas Edwards-এর 'Henry Derozio : 1884, পৃষ্ঠা ৬৮ দ্রষ্টব্য]

একই কথার প্রতিধ্বনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ করেছেন তাঁর একটি গল্পে: "আমার পিতা সনাতন দত্ত ডিরোজিয়োর ছাত্র। মদের সম্পর্কে তাঁর যেমন অদ্ভুত নেশা ছিল সত্যের সম্বন্ধে ততোধিক।" ('ভাইফোঁটা', রবীন্দ্র-রচনাবলী, শতবার্ষিকী সংস্করণ, ৭ম খণ্ড : ১৩৬৮ / পৃষ্ঠা ৬৪৯)। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (১৯৫৪ সংস্করণ) বইতে এই 'সত্য'-এর স্বরূপটি আরো স্পষ্ট করে বোঝানো হয়েছে: "ডিরোজিও ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভগবানকে সরাইয়া দিয়া Reason-এর পূজা করিতেন।" (পৃষ্ঠা ১৩১)...যে এজ অব রিজন্ তিনি গড়তে চেয়েছিলেন, তার পরিকাঠামোটি যে ঠিক কী উপকরণে সাজানো ছিল, বোধ হয় ওপরের মন্তব্যগুলিই সেই কথা বোঝানোর পক্ষে যথেষ্ট।

ডিরোজিওর স্বদেশপ্রেম কুসংস্কার-বিরোধিতা মানবাধিকার ঘোষণা ধর্ম-ঈশ্বর প্রভৃতিকে না-মানা ইত্যাদি যেসব প্রবণতা তাঁর ট্রুথ ও রিজনের অভিব্যক্তি হিসেবে গ্রাহ্য, কবিতার মাধ্যমে তাদের প্রত্যেকটিরই তিনি অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন এবং অবশ্যই সেটা কবিতার শিল্পসম্মতিকে অনাহত রেখেই।

স্বদেশপ্রেমের প্রথম উদ্গাতা হিসেবে ডিরোজিওর উল্লেখ এখন অবশ্য করা হয় মাঝে-মাঝে। কিন্তু তাঁর মানস-প্রবণতার অন্যান্য দিকগুলি মোটামুটি অনালোচিতই থেকে যায়। এ নিবন্ধে তাই সেগুলির বিষয়েই একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া যাচ্ছে।

ধরুন, মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠার অভিপ্রেরণার কথাই। তাঁর একটি কবিতা আছে 'ফ্রীডম অব দ্য স্লেভ।' ১৮২৭ সালে যখন এই কবিতা লেখা হয়েছে, তখনো ইংরেজ সাম্রাজ্যে দাস-ব্যবসা একটা ফলাও কারবার রূপে সচল ছিল। এরও সিকি শতাব্দী পরে প্রকাশিত হয়েছিল মিসেস স্টো-র 'আঙ্কল টম্স কেবিন'। সুতরাং সেই প্রেক্ষিতে ক্রীতদাসের মুক্তির মতো একটি ভাবনা নিয়ে কবিতা লেখা একান্তভাবেই তাৎপর্যময়। প্রিয় কবি ক্যামবেলের এক ছত্র উদ্ধৃতি দিয়ে কবিতা শুরু করেছেন ডিরোজিও : "And as the slave departs, the man returns."—মানুষের 'পরিচয়ে' এই প্রত্যাবর্তনই হল ডিরোজিওর কবিতারও অন্তর্লীন আবেগ। ডিরোজিও লিখছেন :

"He kneels no more ; his thoughts were raised
He felt himself a man."

মুক্তির এই প্রেরণা আর মানবাধিকারের দাবী ঘোষণা পরবর্তী একটি কবিতার মধ্যেও আমরা পেয়েছি। 'ইন্ডিপেন্ডেন্স' নামের ওই কবিতায় ডিরোজিও এই জিনিসটাই বর্ণনা করেছেন একটা প্রতীকের মাধ্যমে। মুক্তির প্রেরণা সেখানে ব্যঞ্জিত হয়েছে 'অত্যাচারী' ঝোড়ো বাতাসের বিরুদ্ধে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ব্রতী একটি প্রদীপ শিখার সঙ্গে। শিখাটি এক সময়ে নিভে গেলেও, শেষ চরণে কবি সোচ্চারে বলে উঠেছেন : "Away ! it cannot be." নিজের অন্তরকে প্রদীপের কম্পমান শিখার রূপকে অভিব্যঞ্জিত করেছেন ডিরোজিও ঠিক সেই সময়ে, যখন বাইরের ঝঞ্ঝাবাত্যা তাঁর ব্যক্তিসত্তাকেও আক্রমণ করেছে। কিন্তু সেখানেও তো তিনি অপরাজিতই ছিলেন। হিন্দু কলেজের গোষ্ঠী-পিতারা তাঁকে একটুও নোয়াতে পারেন নি। সেখানেও তাঁর সেই একই বিঘোষণা : "Away ! it cannot be !"

ধর্মীয় মৌলবাদ এবং অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে ডিরোজিওর যে প্রতিবাদ কাব্যে অভিব্যক্ত হয়েছে, তাও সমান তীব্র। তাঁর সময়কালে আমাদের সমাজে ধর্মসংস্কার সংক্রান্ত যে বিরোধ একটা প্রবল আলোড়ন তুলেছিল, সেই সহমরণ প্রথার প্রবক্তাদের সঙ্গে সংগ্রামে শুধু রামমোহন নয়, ডিরোজিওর-ও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বরং বলতে পারেন, ডিরোজিওর লড়াইটা ছিল অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠ। রামমোহন যেখানে শাস্ত্রের সূত্রবিচার করে গোঁড়াদের বোঝাতে অথবা বাধা দিতে চেয়েছিলেন, সেখানে ডিরোজিও সরাসরি মানবতা এবং সামাজিক মূল্যবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

১৮২৯ সালের ডিসেম্বরে লর্ড বেন্টিঙ্ক আইন করে সতীদাহ-প্রথা রদ করে দিলে, ডিরোজিও সেই ঘটনাকে স্বাগত জানান আগুন আর আবেগের বিমিশ্রণে রচিত একটি

কবিতার মাধ্যমে: 'অন দ্য অ্যাবলিশন অব সতী।' এর আগেই 'দ্য ফকীর অব জঙ্গীরা' কাব্যে এই কুৎসিত প্রথা সম্পর্কে তাঁর সুতীব্র মনোভাবের একটি পরিচয় মিলেছিল। সে সম্পর্কে পরে বলছি। এই কবিতাটির তীব্রতা আরও জ্বলন্ত এবং প্রগাঢ়। কাব্যগুণে, চিত্রকল্পের বিন্যাসে এবং সবার ওপরে ছন্দোস্পন্দনের সঙ্গে ভাববস্তুর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এই কবিতাটি অত্যন্ত ব্যঞ্জনাবহ হয়ে উঠেছে। রাত্রির অন্ধকারে ঢাকা গঙ্গার বুকে সূর্যোদয় হবার রূপকে তিনি ওই ভয়ংকর অন্ধতার সমাপ্তিকে রূপায়িত করেছেন। প্রবল ধিক্কারে ধর্মান্ধ পুরোহিততন্ত্রের পরাভবকে বর্ণনা করার পর কবিতার মধ্যে বেণ্টিঙ্কের উদ্দেশে জয়ধ্বনি তুলেছেন তিনি: "He is the friend of the man, who breaks the seal." 'মানবতার বন্ধু' বলেই বেন্টিঙ্ক এখানে তাঁর কাছে বরেণ্য। শুধু আইন প্রণেতা হিসেবে ডিরোজিও তাঁকে ভাবেন নি বা দেখেন নি। সমাজবিধানে নারীর অসহায়তার স্বরূপটা এই কবিতায় উদ্‌ঘাটিত করেছেন তিনি আবেগের সঙ্গেই। যুক্তি আর ভাবাবেগের একটা সুষম সমন্বয়ে কবিতাটি সমাপ্ত করেছেন তিনি। সমাসন্ন এক সমাজবিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছেন শেষ কটি স্তবকে। চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে বলেছেন কবি: ঝড় গতমান, ইন্দ্রধনু আদিগন্ত বিস্তৃত, অন্ধকারের মসীরথ বিদায়ের পথে সঞ্চরমান। ভোরাই বাতাস আদর করছে ঊষার শিশুকে এবং "Morning's Herald star / Comes trembling into day: O! Can the sun be far? INDIA." ···কবিতার সমাপ্তিতে স্বদেশের নামটুকু লেখার ব্যাপারটা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য, সন্দেহ নেই!

বিধবার বেদনা এবং সতীদাহের ঘৃণ্য অস্তিত্ব ডিরোজিওকে যে খুব ব্যাপকভাবে আলোড়িত করতো, তার প্রমাণ মেলে 'সং অব দ্য ইন্ডিয়ান গার্ল" নামে একটি কবিতার মধ্যেও। কিন্তু, আরো অনেক ব্যাপক এবং গভীর তাৎপর্যময় করে তিনি সমস্যাটিকে কাব্যের মাধ্যমে দেখিয়েছেন 'দ্য ফকীর অব জঙ্গীরা'-র মধ্যে। ওই কাব্যের একটি অংশের টীকা হিসেবে 'হিন্দু উইডো' বলে যে ছোট নিবন্ধিকাটি ডিরোজিও সন্নিবিষ্ট করেছেন, তা-ও এখানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

'জঙ্গীরা' কাব্যের কাহিনী বিন্যাস রোম্যান্টিক একটি প্রণয়-ট্র্যাজেডি অবলম্বনে করা হলেও, এর অন্তর্বিলীন একটি সামাজিক তাৎপর্যের কথাও অবশ্য-বিচার্য। এর একটি মাত্রায় রোম্যান্টিসিজ্‌ম, আর এক মাত্রায় ধর্মান্ধতা-এবং-মৌলবাদী ভাবধারার বিরোধিতা একে পূর্ণায়ত রূপে গড়ে তুলেছে।

এই আখ্যান-কাব্যের কাহিনীটি সংক্ষেপে একটু বলা এখানে বাঞ্ছনীয়: প্রথম সর্গে দেখা যায়, স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন দিয়ে 'সতী' হবার জন্যে শ্মশানভূমিতে নিয়ে আসা হয়েছে সদ্যোবিধবা ব্রাহ্মণ তরুণী নলিনীকে। তার অন্তর উদ্বেল নিদারুণ এক দ্বন্দ্বে—একদিকে সুতীব্র জীবনতৃষ্ণা, আর একদিকে যুগার্জিত ধর্মপ্রত্যয়ের সর্বগ্রাসী সংস্কার। ধর্মীয় অভিচারের প্রাবল্যে বিহ্বল হয়ে শেষ অবধি নলিনী স্বামীর সাজানো

চিতায় উঠে বসে সূর্য বন্দনা করতে শুরু করে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তার পূর্ব-প্রণয়ী এক মুসলিম তরুণ—প্রেমে ব্যর্থ হয়ে যে রবিন হুডের মতো এক মহদাশয় দস্যু সর্দারে পরিণত হয়েছে—সদলে এসে পৌঁছয় সেখানে। নলিনীকে অনিবার্য-প্রায় মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে সে ঘর বাঁধে জঙ্গীরা পাহাড়ের দুর্গম অরণ্যে।

দ্বিতীয় সর্গে, রাজমহলাধীশ শাহ সুজা নলিনীর আত্মীয়দের আবেদনে সাড়া দিয়ে 'দস্যু'-দের ধরবার জন্যে সৈন্য পাঠিয়েছেন, দেখা গেল। হারানো দিনগুলোকে ফিরে পেয়ে সে আর নলিনী তখন সুখে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু নবাবী সৈন্যের আক্রমণ প্রতিহত করতে সেই সুখের নীড় ছেড়ে উঠে আসতেই হয় তাকে। কাহিনীর শেষে দেখা গেল, নবাবের বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গেছে বটে, কিন্তু রণক্ষেত্রে সুদৃঢ় আশ্লেষে পরস্পরকে বাঁধা দুই প্রণয়ীর প্রাণহীন দেহদুটিও পড়ে রয়েছে একধারে। এবারে আর মৃত্যু এসে নলিনীকে প্রিয়জনের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি।

এই কাহিনীর কিছুটা উপকরণ জুগিয়েছিল স্থানীয় একটি লোকগাথা। বাকিটুকু ডিরোজিওর একান্তভাবেই নিজস্ব। সহমরণের চিতা থেকে ব্রাহ্মণ তরুণীর অব্যাহতি (বরং বলা ভালো, পরিত্রাণ) পাবার এই ঘটনা তো অবশ্যই ডিরোজিওর সতীদাহ-বিরোধী মানসিকতার স্বাভাবিক জাতক। কিন্তু এর পাশে-পাশে আরো কয়েকটি কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রথমত, ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গে মুসলিম তরুণের প্রেম। দ্বিতীয়ত, ধর্মসংস্কার বিসর্জন দিয়ে ব্রাহ্মণ-বিধবার. স্বামীর চিতাশয্যা থেকে পালিয়ে গিয়ে সেই মুসলমান প্রণয়ীর সঙ্গে ঘর বাঁধা। তৃতীয়ত, প্রেমের জন্য ওই মুসলিম তরুণের মুখে এমন কথাও ধ্বনিত হওয়া—

> "No more to Mecca's hallowed shrine
> Shall wafted be a prayer of mine
> Henceforth I turn my willing knee
> From Alla, Prophet, Heaven, to Thee !"

…ধর্মসংস্কারের থেকেও জীবনবোধকে বড় করে দেখানোর এই ব্যাপারগুলির মধ্যেই ডিরোজিওর মানস-প্রবণতার একটা বিশিষ্ট ভাবরূপ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মৌলবাদী সংস্কার - তা হিন্দুরই হোক, আর মুসলমানেরই হোক, ডিরোজিও সামগ্রিকভাবেই তার বিরোধী ছিলেন—এই কাব্যকল্পনা সেটিরই দ্যোতনাবাহী নিঃসন্দেহে। শুধু এ-ই নয়, 'মুসলিম দস্যু'-কর্তৃক 'অপহৃতা' হিন্দু বিধবাকে ফিরিয়ে আনার জন্য মুসলমান নরপতি সৈন্য পাঠাচ্ছেন, তা-ও দেখছি এই কাব্যে। ধর্মের ঘনিষ্ঠতার চেয়ে রাষ্ট্রবিধান রক্ষার দায়িত্বই যে সেখানে বড়, তাও তো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সহমরণের চিতাশয্যা থেকে উঠে গিয়ে প্রণয়ীর সঙ্গে ঘর বাঁধার বহু কাহিনী পরবর্তীকালে এদেশের সাহিত্যে লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'মহামায়া' নিশ্চয়ই মনে পড়ছে? হিন্দু-মুসলমানের ঘর বাঁধার স্বপ্নের গল্পও অনেক। পুনরপি রবীন্দ্রনাথ।

'মুসলমানীর গল্প'। আমাদের সমকালেও এমন সৃষ্টি অনেক—বাংলা, উর্দু, হিন্দী, ওড়িয়া, মালয়ালম—আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের নানা এলাকাতেই এ জিনিস দেখি। নিঃসন্দেহে, আরো অনেক কিছুর মতোই এক্ষেত্রেও ডিরোজিও পাইওনিয়ার। ধর্ম-সংস্কারবিমুক্ত যে মানবতাবোধ তাঁর অস্তিত্বের এবং অভিব্যক্তির ভরকেন্দ্র বলে মান্য, এ ছিল সেটিরই একটি উদ্ভাসন। এখানেও তাঁর সংস্কারবিহীন আধুনিক মনের একটি মাত্রা অন্বিত।

৩

'জঙ্গীরা'-র নায়কের মুখে ঈশ্বর, অবতার, ধর্ম, আচার, তীর্থ এমন কি, স্বর্গ-সম্পর্কেও যে অনীহা বিঘোষিত হয়েছে, সেটা শুধু ওই কাহিনীর অনুষঙ্গেই সীমায়ত নয়। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে আরো অনেক জায়গাতেই এটা দেখা গেছে। যেমন, 'পোয়েট্রি অব হিউম্যান লাইফ' কবিতায় ডিরোজিও লিখেছেন, "But Man has thought to which he giveth form." এই বস্তুনিষ্ঠ দার্শনিক প্রত্যয়েই তাঁর চূড়ান্ত অবস্থান। মোপাতুইই এবং কান্টকে ডিরোজিও বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে চর্চা করেছিলেন। 'ম্যান' আছে বলেই 'থট্' রয়েছে এবং সেই 'ম্যান'-ই যে ওই 'থট্'-কে 'ফর্ম'-এ পরিণত করে, এই বস্তুবাদী দার্শনিক প্রতীতি তিনি অর্জন করেছিলেন অবশ্যই। [তবে, যে কোনো 'ফর্ম'-ই যে উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য, সে কথা প্রতিষ্ঠিত করার মতো দৃষ্টিকোণ মার্ক্সীয় তত্ত্বের বিকাশ ঘটার আগে সম্ভাব্য নয়, সেটুকু এখানে মনে রাখতেই হবে।]

'এ ড্রামাটিক স্কেচ' নামে তাঁর একটি নাট্য-কবিতা আছে। সেটির পটভূমি, পশ্চিম হিমালয়ের কোনো এক দুর্গম, নির্জন গুহা। এক ঋষি, আসীন হয়ে আলোক এবং ঈশ্বরের বন্দনা করে শোনান 'পুণ্যনগরী' রোম-থেকে-আসা তাঁর শিষ্যকে। কিন্তু 'এক-ব্রহ্মের মাহাত্ম্য এবং ঐহিকতার অতিরেকে প্রাপ্য দিব্যজীবনের মহৎ বার্তা' শোনায় তার অনীহা। জীবনপ্রেমিক এই তরুণ চায় মানুষের মধ্যে থেকেই সাধনা করতে। সমাজ ও মানুষের সম্পর্কের মধ্যেই তার অন্বেষার প্রমা মিলবে বলে সে মনে করে। ক্ষুব্ধ ঋষি তিরস্কার করেন তাকে। উত্তরে সে তাঁকে কোনো এক অনবদ্যাঙ্গীর রূপ বর্ণনা করে শোনায়। প্রেমের মধ্যেই সে ঈশ্বরের উপলব্ধি অর্জনে প্রয়াসী। দ্বি-সংলাপী এই নাট্যচিত্রের কথাবস্তুর রূপরেখা হল এটুকুই। স্পষ্টতই 'জীবনের কবি' ডিরোজিয়োর সহানুভূতি 'জীবনপ্রেমিক' তরুণ রোমান শিষ্যটির প্রতিই। আধ্যাত্মিকতা বনাম মানবমুখিনতার এই চিত্ররূপের অনুষঙ্গে ডিরোজিওর মানসপ্রতীতির মূল ভাবমূর্তিটি আবারও উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়।

মোপাতুইয়ের কথা ওপরে একবার উল্লেখ করা হয়েছে। এই অষ্টাদশ শতকীয় ফরাসী দার্শনিক সম্পর্কে জনৈক তত্ত্ববিদ্ বলেছেন যে, তিনি ছিলেন "one of the

early precursors of evolutionary hypothesis." বিবর্তনবাদী চিন্তাধারার অন্যতম এই অগ্রপথিক বিজ্ঞানের দর্শনকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এঁর একটি দীর্ঘ নিবন্ধ ডিরোজিও অনুবাদ করেন। এই ব্যাপারটির সূত্রে ডিরোজিওর মানসিকতার আরো একটি দিকের হদিশ মেলে। সর্বোপরি, মোপাতুইয়ের চিন্তাধারার মধ্যে যে একটা বিশ্বজনীন প্রতিভাস দেখা যায়, ডিরোজিও তার দ্বারাও অনুপ্রাণিত হন ভালোভাবেই।

ডিরোজিওর কাব্যের মধ্যে স্বদেশচেতনার কথা বারবারই নানানভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 'টু ইন্ডিয়া, মাই নেটিভ ল্যান্ড' কিংবা 'হার্প অব ইন্ডিয়া' প্রভৃতি বিখ্যাত সব দেশপ্রেমাত্মক কবিতাগুলি ছাড়াও, আরো নানাভাবে তাঁর দেশচেতনার পরিচয় পাওয়া গেছে। 'অন দ্য অ্যাবলিশন অব সতী' কবিতার পরিসমাপ্তির কথা এখানে আবারও স্মরণযোগ্য। তাছাড়াও, তাঁর অন্য অনেক লেখার মধ্যে—কবিতা এবং প্রবন্ধ উভয়ত্রই—দেশভাবনার নানাবিধ মাত্রাবিন্যাস ঘটেছে। ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, আস্তিক্য ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি অনীহ হলেও ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি যথেষ্টই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 'জঙ্গীরা'-র বিভিন্ন অংশে ঋক্‌বেদ এবং কোনো কোনো উপনিষদের বিভিন্ন ভাবনার যা সব প্রতিফলন ঘটেছে, সেগুলি এই মন্তব্যের সমার্থক।

ডিরোজিও-র স্বদেশচেতনার মধ্যে দেশের মানুষ, তার ঐতিহ্য, তার শ্রেয়-অশ্রেয়ের বিচার এবং প্রকৃতি-নিসর্গ—সবই একত্রে সমাহৃত হয়েছে। "Lovely is my Native Land" এবং "Harp of my country, let me strike the strain"-ও যেমন লিখেছিলেন তিনি, তেমনই আবার ভবিষ্যতের উজ্জ্বল প্রহরের প্রতিভাস তাঁর সুকৃতী ছাত্রদের মুখে প্রত্যক্ষ করে এমন কথাও ডিরোজিও লিখে গেছেন : "I feel, I've not lived in vain !" ···এর সব কিছু মিলিয়েই ডিরোজিও-র স্বদেশভাবনা, যার সূক্ষ্ম অথচ সুসংহত আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে : "And let the guerdon of my labour lie / My fallen country ! One kind wish from thee !"

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে প্রণিধেয়। স্বদেশভাবনা এবং বিশ্বভাবনা, দুয়েরই উৎস এক জায়গায়। গ্রীস ফ্রান্স ইতালী প্রভৃতি দেশের ঐতিহ্যের কথা বহুবিচিত্রভাবে তাঁর কবিতায় এসেছে। হোমার, ভার্জিল, শেক্সপীয়ার, মিলটন এবং সমকালীন ইংরেজ কবিদের সৃষ্টির অভিঘাত তাঁর অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং সাহিত্যকৃতি—সব কিছুর ওপরেই গভীরভাবে পড়েছিল। ভারতীয় সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এক সুসমন্বিত মেলবন্ধন, তাঁর মনন ও সৃষ্টির সীমানাকে চিহ্নিত করেছে। তাই ডিরোজিও শুধু আমাদের কাছে জাতীয়তাবোধের পথিকৃৎই নন, আন্তর্জাতিকতার ভাবনাকেও আমাদের মনের মধ্যে প্রদীপ্ত করেছিলেন তিনি।

হিন্দু কলেজের ছাত্রসংঘের উদ্দেশে লেখা একটি সনেটে ডিরোজিওর এই মানস-প্রতীতিটুকু উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছেন :

"I watch the gentle opening of your minds.../...
And how you worship truth's omnipotence.../...
Ah, then I feel I have not lived in vain !"

সত্যের সন্ধিৎসাই শুধু নয়, তাকেই সর্ব-মহীয়ান বলে আরাধনা করার মধ্যেই তাঁর ঈশ্বর-ধর্ম-জীবন-মননের পূর্ণায়ত পরিচয় স্বপ্রতিষ্ঠ। কবিতার মধ্যে, প্রবন্ধের মধ্যে, আলোচনার মধ্যে সেটাই তিনি বিম্বিত করেছেন। স্বদেশচেতনা, বিশ্বতোমুখিনতা, মানবতার বন্দনা, সংস্কার থেকে মুক্তির দাবী, শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভীপ্সা—এই সব কিছুই তাঁর কাছে "Truth's omnipotence" রূপে আবির্ভূত। তাঁর মৃত্যুর পর দেড় শতাব্দীরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে। কিন্তু যে সত্য সন্ধান তিনি আমাদের করতে শিখিয়েছিলেন, 'অনার' এবং 'লিবার্টি'র···পথ খুঁজে যেভাবে এদেশের বুদ্ধিজীবী মানুষকে চলতে শিখিয়েছিলেন, তা এখনো সঞ্চরমান।

এই দেড়শো বছর ধরে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সত্যের অন্বেষণ এবং আপসহীন সংগ্রাম নানাভাবে সমাজে, রাজনীতিতে, সংস্কৃতিতে চলে এসেছে। সে লড়াইয়ে কখনো হার হয়েছে, কখনো জিৎ। কিন্তু লড়াই থামে নি। সেই সংগ্রামের মধ্যেই অনিবার্য প্রমায় ডিরোজিওর উত্তরাধিকার বহন করছি আমরা।

□ পল্লব সেনগুপ্ত

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

....

ঊনিশ শতকের শুরুতে কলকাতা শহরের দক্ষিণে রাজপুর, হরিনাভি, চাংড়িপোতা ইত্যাদি গ্রামে বেশ প্রসিদ্ধ বিদ্বৎসমাজ গড়ে উঠেছিল। এই পরিবেশে ১৮১৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু দ্বারকানাথের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

চাংড়িপোতা গ্রামে যখন গুরুমশায় প্রাচীন পদ্ধতির চৌহদ্দির মধ্যে তাঁর ছাত্র দ্বারকানাথকে ভাষা, ব্যাকরণ ও গণিতের পাঠ দিচ্ছেন, অদূরে কলকাতা শহরে তখন নবীন বাংলার তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর ছাত্ররা বেকন, হিউম প্রমুখ দার্শনিকের চিন্তাজগতের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। প্রাচীন শাস্ত্রের বিধান ও অনুশাসনে আবদ্ধ এক স্থাণু সমাজে নতুন এক জীবনবোধ ও ভাবধারার আবির্ভাব সম্পর্কে কিন্তু কিশোর দ্বারকানাথ বা তাঁর গুরুমশায় কেউই অবহিত ছিলেন না।

দ্বারকানাথ ১৮৩২ সাল থেকে ১৮৪৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত কলকাতার সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। এখানে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ঘটে। ঈশ্বরচন্দ্রের মতো তিনিও ছিলেন কলেজের কৃতী ছাত্র। কলেজের শেষ পরীক্ষায় তিনি 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি লাভ করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কিছুকাল শিক্ষকতার পর তিনি সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক, ও পরে ব্যাকরণ ও সাহিত্যের অধ্যাপক এবং স্বল্পকাল অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের সহকারী রূপে কাজ করেন।

১৮৫৬ সালে পিতার সহযোগিতায় দ্বারকানাথ একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। এখান থেকেই ১৮৫৭ সালে তাঁর স্বরচিত রোম ও গ্রীসের ইতিহাস প্রকাশিত হয়। উৎকৃষ্ট বাংলা ভাষায় লেখা ইতিহাস গ্রন্থ সম্ভবত এই-ই প্রথম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়ে যাতে দেশের মানুষের জ্ঞানের পরিধির বিস্তার ঘটে সেই উদ্দেশ্যেই বোধ হয় দ্বারকানাথ এ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। প্রকাশের অল্পকালের মধ্যেই এই গ্রন্থ তৎকালীন বাংলার পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দ্বারকানাথের নাম অচিরেই লেখকসমাজে পরিচিতি লাভ করে। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে ছাত্রপাঠ্য 'নীতিসার', 'পাঠামৃত', 'ছাত্রবোধ', 'ভূষণসার ব্যাকরণ', কাব্যগ্রন্থ 'প্রকৃত প্রেম', 'প্রকৃত সুখ', 'বিশ্বেশ্বরবিলাপ পদ্য' ইত্যাদি।

দ্বারকানাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা সম্পাদনা। ১৮৫৮ সালের নভেম্বরে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। মার্জিত রুচি, প্রাঞ্জল ভাষা ও

নির্ভীক সমালোচনা, এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের জন্য পত্রিকাটি বিশুদ্ধ রাজনীতি ও সুস্থ সাহিত্যের প্রসারে দীর্ঘকাল বাংলা সংবাদপত্র জগতে শীর্ষস্থানে আসীন ছিল।

কোম্পানি আমলের অবসানের পর বাংলা ও বাঙ্গালীর জীবনে পরিবর্তনের ত্রিধারা স্পষ্ট রূপ পেতে শুরু করে। সমাজ সংস্কার আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকায় আবির্ভূত হলেন বিদ্যাসাগরের মতো অসামান্য ব্যক্তিত্ব, এবং পরে যুক্ত হল 'তত্ত্ববোধিনী সভা' এবং পুনরুজ্জীবিত ব্রাহ্মসমাজ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের প্রবর্তন করে। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটতে শুরু করলো এবং তার অনিবার্য ফলশ্রুতি রূপে নতুন রাজনৈতিক কর্মজীবনের সূচনা হল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, একদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, অন্য দিকে রেলপথের বিস্তার, যানবাহন চলাচলের উন্নতি, আধুনিক কারখানা শিল্পের প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি বিচিত্র ঘটনার আবর্তের মধ্যে বাংলার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ভাঙ্গা-গড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই আন্দোলন, আলোড়ন, ভাঙ্গা-গড়া স্বভাবতই সমকালের সাহিত্যের সঙ্গে সাময়িকপত্রকেও গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। সমাজের পক্ষে কল্যাণকর পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতে এবং অকল্যাণকর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমালোচনামুখর হতে সাময়িকপত্রসমূহের মধ্যে 'সোমপ্রকাশ' শুধু অগ্রগণ্য ছিল না, বলা যেতে পারে, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি, প্রতিটি বিষয়ে 'সোমপ্রকাশ'-এর আলোচনার সুর ও ভাষা পূর্বেকার ধারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রাজনৈতিক প্রশ্নে অবস্থানের ক্ষেত্রে নির্ভীকতা এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রশ্নে অবস্থানের ক্ষেত্রে উদারতা হচ্ছে 'সোমপ্রকাশ'-এর বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই তা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের উদারপন্থী বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের অন্যতম মুখপত্র হবার গৌরব অর্জন করতে পেরেছিল।

লর্ড লিটনের আফগান নীতির সমালোচনা এবং পাঞ্জাবে শিক্ষার অব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করায় ব্রিটিশ সরকার পত্রিকার কাছে এক হাজার টাকা জামানত ও মুচলেকা দাবি করে (মার্চ ১৮৭৯)। ১৮৭৮ সালের মার্চ মাসে 'ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ হলে তার ছোবল থেকে বাঁচবার জন্য অমৃতবাজার পত্রিকা রাতারাতি ইংরেজি পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। এদিকে দ্বারকানাথ সদ্য প্রণীত অবমাননাকর আইনের কাছে নতি স্বীকার না করে 'সোমপ্রকাশ'-এর প্রকাশ-ই বন্ধ করে দিলেন। পরে এই গর্হিত আইন রদ হলে 'সোমপ্রকাশ' পুনঃপ্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের পরামর্শে ও প্রেরণায় দ্বারকানাথ 'সোমপ্রকাশ' প্রেস ও পত্রিকা চাংড়িপোতায় স্থানান্তরিত করেন এবং আদর্শনিষ্ঠ সম্পাদকরূপে সাংবাদিকতা বৃত্তিতে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে ১৮৫৮ সালে

'সোমপ্রকাশ'-এর আত্মপ্রকাশ। প্রায় তিন দশক ধরে জাতীয় জীবনের বিচিত্র পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জনমত গঠনে এ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সময়ের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্ট নতুন পরিবেশের সঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' তার স্বচ্ছ উদার দৃষ্টির সাহায্যে সহজেই 'বোঝাপড়া'র সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হয়।

অর্থনৈতিক সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণে 'সোমপ্রকাশ' যে বিজ্ঞানসম্মত, বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে তা উল্লেখের দাবি রাখে। দেশের আর্থিক উন্নতি যে শ্রমশিল্পের বিকাশ ছাড়া সম্ভব নয়, 'সোমপ্রকাশ' সঠিকভাবেই তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতার ফলে কীভাবে দেশীয় শিল্পের বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে ও তার ধ্বংসপ্রাপ্তি হচ্ছে তার বিশদ বিবরণ এর পৃষ্ঠায় রয়েছে।

স্ত্রী স্বাধীনতা, বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, গ্রামীণ ও নাগরিক সমাজের পরিবর্তনের ধারা ইত্যাদি নানা বিষয় 'সোমপ্রকাশ'-এর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'সোমপ্রকাশ' বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের ঘোরতর বিরোধী। বিধবা বিবাহের অন্ধ সমর্থক না হলেও উদার যুক্তিবাদী মানদণ্ডে তার সামাজিক ফলাফল বিচারের পক্ষপাতী।

'সোমপ্রকাশ'-এর বড় সম্পদ হল তার প্রখর রাজনৈতিক চেতনা। ব্রিটিশ সরকারের কর্মনীতির নির্ভীক ও কখনো কখনো নির্মম সমালোচনা পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় দেখা যেত। সাম্প্রদায়িক উদারতা এবং জাতীয় সংহতি চেতনা 'সোমপ্রকাশ'-এর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে একটা বিশিষ্টতা দান করেছে। গভীর বিশ্লেষণ দক্ষতা, এবং সমালোচনার নির্ভীকতা—এ দুই গুণের জন্যই 'সোমপ্রকাশ' সমকালীন সাময়িকপত্রের জগতে বিরল স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

দীনবন্ধু মিত্র-র নাটক যেমন বাংলা সাহিত্যে নব ভাব ও বাঙ্গালীর মনে নব শক্তির সঞ্চার করেছিল, তেমনি মাইকেলের কাব্য ও বঙ্কিমের উপন্যাস বাংলা সাহিত্যকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে 'নব চিন্তা, নব আকাঙ্ক্ষা'র উন্মেষ ঘটিয়েছিল।

নাটক, কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই বিপ্লব সমকালীন বাংলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব গুণগত পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করেছিল।

একই সময়ে সাহিত্যের আঙ্গিনায় 'সোমপ্রকাশ'-এর আবির্ভাব এই পরিবর্তনে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করে তাকে আরও অর্থবহ করে তুলেছিল।

রাজা রামমোহন রায় বঙ্গ ভাষাভাষীদের দ্বারা প্রকাশিত বাংলা সংবাদপত্রের পথ-প্রদর্শক। তিনিই প্রথম 'সংবাদ কৌমুদী' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে সমৃদ্ধ এই সাপ্তাহিকী লোকশিক্ষার প্রধান উপায় রূপে গণ্য হোত। সতীদাহ প্রশ্নে রামমোহনের সঙ্গে হিন্দু সমাজের বিবাদ দেখা দিলে সমাজপতিরা তাঁদের নিজস্ব পত্রিকা,

'চন্দ্রিকা' প্রকাশ করেন। অল্পকাল পরেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'প্রভাকর' প্রকাশিত হয়। ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মসমাজ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশ করে। ধর্মতত্ত্বের আলোচনা ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। দৈনিক সংবাদ পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল 'প্রভাকর', 'ভাস্কর' ইত্যাদি পত্রিকা। 'সোমপ্রকাশ'-এর আবির্ভাবের প্রাক্কালেই প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি তথ্যসমৃদ্ধ হলেও এর ভাষাগত ত্রুটি ছিল, কারণ এটা আলালী ভাষায় লেখা হোত। এই ঐতিহ্যাসিক পটভূমিতে 'সোমপ্রকাশ'-এর আত্মপ্রকাশ। বিষয়ের সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা এবং ভাষার সাবলীলতা উভয় দিক থেকেই 'সোমপ্রকাশ' সংবাদপত্রের জগতে এক বিরল নজির স্থাপন করেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী যথার্থ মন্তব্যই করেছেন, 'যেমন ভাষার লালিত্য, তেমনি বিষয়ের গাম্ভীর্য। সংবাদপত্রের এক নতুন পথ, বঙ্গসাহিত্যের বড় এক নতুন যুগ প্রকাশ পেল।'

'সোমপ্রকাশ'-এর পর আরো অনেক বাংলা সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয়েছে। ভাষার চটক ও রচনার নিপুণতা আরও বেড়েছে, কিন্তু সোমপ্রকাশ-এর স্থান কেউ-ই অধিকার করতে পারেনি। জনমানসে কোনো সংবাদপত্রের প্রভাবের বিস্তার শুধুমাত্র তার রচনা-শৈলীর ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার সামগ্রিক চরিত্রের ওপর—তথ্যনিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা, মানবিক উদারতা, নির্ভীকতা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামী মানসিকতা ইত্যাদির ওপর। বলা বাহুল্য, 'সোমপ্রকাশ' এই কঠিন পরীক্ষায় সহজেই উত্তীর্ণ হয়েছিল।

'প্রভাকর' ও 'ভাস্কর' জাতীয় পত্রিকা সমাজের নৈতিক পরিবেশকে দূষিত করে ফেলেছিল। 'সোমপ্রকাশ'-এর সুস্থ নীতিবোধের মুক্ত হাওয়া ধীরে ধীরে এই পরিবেশকে দূষণমুক্ত করে তাকে অনেকটা নির্মল করতে সক্ষম হয়েছিল। ভাষার ঋজুতা, মতের যুক্তিযুক্ততা ও নীতির উৎকর্ষ—এরই মধ্যে রয়েছে এই সাফল্যের চাবিকাঠি। সম্পাদক হিসেবে দ্বারকানাথের চরিত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, 'হৃদয়-মনে অভিন্ন, এই মানুষটি কারুর মন জয় করার উদ্দেশ্যে একটি পঙক্তিও লিখতেন না। আবার পাঠকসমাজে সমাদৃত হবার লোভে তাদের রুচি ও সংস্কার মাফিক কিছু বলতেন না। যা হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করতেন, তা-ই হৃদয়ের অকপট ভাষায় ব্যক্ত করতেন। এটাই ছিল 'সোমপ্রকাশ'-এর প্রধান আকর্ষণ।

দ্বারকানাথ ছিলেন প্রগতিশীল সংস্কারপন্থী। 'সোমপ্রকাশে'র বিভিন্ন সংখ্যায় তিনি সমাজ সংস্কারের পক্ষে বহু মূল্যবান রচনাও লিখেছেন। শেষ জীবনে বহু বিবাহ নিবারণ আন্দোলন নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য দেখা দিয়েছিল। সামাজিক প্রথা হিসেবে দ্বারকানাথ কখনো বহুবিবাহ সমর্থন করেন নি। তবে তিনি বহুবিবাহ সহ যে কোনো শাস্ত্রসম্মত সামাজিক প্রথার ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটলে সামাজিক কুপ্রথা-

গুলি এমনিতেই ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাবে, সরকারি আইনের হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন হবে না।

দ্বারকানাথের এই অবস্থান কতটা বস্তুনিষ্ঠ ও বিচারসম্মত, কতটা সমাজে সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া-সঞ্জাত, সে সম্পর্কে অবশ্যই বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ, সতীদাহ-এর মতো সামাজিক প্রথার মূলে আঘাত করতে চেয়েছিলেন। এর পেছনে শাস্ত্রের অনুমোদন থাক বা না থাক, তা তাঁর কাছে বড় প্রশ্ন নয়। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে এ সব কুপ্রথাকে উচ্ছেদ করাই তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এবং এই লক্ষ্য পূরণে তিনি আইনের আশ্রয় নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি। এ প্রশ্নেই বিদ্যাভূষণের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের অবস্থানগত পার্থক্য। বিদ্যাসাগর রচিত 'বহুবিবাহ' নামক পুস্তক আলোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশে' সরকারি হস্তক্ষেপের প্রশ্ন উত্থাপন করে মন্তব্য করেছেন, "সামাজিক বিষয়ে গবর্নমেন্টের হস্তক্ষেপ বিধেয় কিনা, ইহার বিবেচনা করা আবশ্যক। যদি গবর্নমেন্টের সাহায্য লইয়া আমাদের সমাজ সংস্কার আবশ্যক হয়, অসংখ্য বার তাহাদের শরণ লইতে হইবে। প্রতি পদক্ষেপে দাদাকে ডাকা সুখের নয়। তাহা হইলে গবর্নমেণ্ট দ্বারা সমুদয় আচার ও ধর্মের সংস্কার করা আবশ্যক হইয়া উঠে। অত উতলা হইলে চলে না।······ইংরাজী শিক্ষা বলে আমাদিগের দেশের লোকেরা অন্যদীয় সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ংই সমাজ সংস্কারে সমর্থ হইবে।" সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কার উচ্ছেদের আন্দোলনে সরকারের বিশেষ কোনো ভূমিকা থাকতে পারে বলে বিদ্যাভূষণ স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, এই দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে আধুনিক শিক্ষায় উদ্দীপিত আগামী দিনের তরুণেরাই যথোচিত ভূমিকা পালন করবে। তাই সামাজিক ব্যাধি যতই প্রকট হোক না কেন, গোটা সমাজের পক্ষে তা যতই মারাত্মক হোক না কেন, আশু প্রতিকারের চেষ্টা করে বোধ হয় কোনো লাভ হবে না। শিক্ষার প্রসারের মধ্য দিয়ে সংস্কারের মুক্তির ফলে এই ব্যাধি নাকি আপনা আপনি দূর হবে। সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের পক্ষে জনমত সৃষ্টির আন্তরিক প্রয়াস এবং একই সঙ্গে পরিপূরক ব্যবস্থা রূপে আইনের সাহায্য গ্রহণ—বিদ্যাসাগরের এই অসামান্য রণকৌশলের গুরুত্ব, মনে হয়, বিদ্যাভূষণ বুঝতে পারেননি। অনুকূল জনমত সৃষ্টির আশায় অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করে থাকা সমস্যাকে যে আরো জটিল করে তুলবে, সে উপলব্ধিও এক্ষেত্রে ছিল অনুপস্থিত। মজার কথা, যে বিদ্যাভূষণ সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইংরেজী শিক্ষার ইতিবাচক ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তিনিই শেষ জীবনে আক্ষেপ করে বলেছেন, 'ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু-সমাজে ধর্মের শাসন ও ধর্মের উপদেশ রহিত হইতেছে।'

বিদ্যাভূষণ-চরিত্রে এই দ্বিধা ও বৈপরীত্যে তাঁর যুগের দ্বন্দ্ব-সংঘাতেরই স্বাভাবিক প্রতিফলন। একদিকে অনড়, রুদ্ধগতি সমাজের ধর্ম-সংস্কার-প্রথাসহ যাবতীয় মূল্য-বোধের পিছুটান ও তর্জনী এবং অন্য দিকে আবেগ-অনুপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত তরুণ শক্তির

জীর্ণ পুরাতন মূল্যবোধকে ভেঙে গুঁড়িয়ে এগিয়ে চলার আহ্বান—এই স্ববিরোধ ও টানাপোড়েনের মধ্যে বিদ্যাভূষণের চরিত্র গড়ে উঠেছে। বিদ্যাভূষণ কোনো পক্ষকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করেননি, আবার কোনো পক্ষকেই সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেন-নি। এদিক থেকে বিদ্যাভূষণ অনন্য, স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা-বিশিষ্ট এক চরিত্র। 'সোমপ্রকাশ'-এর অসংখ্য রচনায় তাঁর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক স্পষ্ট ধরা পড়েছে। সম্পাদক বিদ্যাভূষণের কর্মকাণ্ডের মধ্যে মানুষ বিদ্যাভূষণ সম্পূর্ণ বিধৃত। 'সোমপ্রকাশ'-এর মধ্যেই তাঁর যথার্থ আত্মপ্রকাশ। তাই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও গত শতকের এই বিরাট ব্যক্তিত্ব আজও মানুষের স্মৃতিতে অমলিন, উজ্জ্বল।

শংকর দাশগুপ্ত

বিস্মৃত রাধানাথ শিকদার : একটি আলোকবর্তিকা

একবিংশ শতাব্দীর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কাল নিরবধি, অনিশ্চিত। ভবিষ্যৎ কথা বলবে কোন ভাষায়—তা ঠিক করে দেবে সম্মিলিত মানুষের কর্ম-যাত্রা ও শুভ বোধ, না মুষ্টিমেয়র মানবতাবিরোধী বিকার ও নষ্টচারিতা? ঊনবিংশ শতকের বাংলার কোনো এক বিস্মৃতপ্রায় মনীষার ওপর আলোকসম্পাতের পূর্বে একটুখানি দেখে নেওয়া যাক, কেন হঠাৎ প্রয়োজন হয়ে পড়লো সেই সব দূর নক্ষত্রের আশু অন্বেষণ। বিংশ শতাব্দীর ঊষালগ্নে যে শিশুরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বর্ণসম্ভাবনা আকাঙ্ক্ষা করেছিল—রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার যন্ত্রণা, সভ্যতার সংকট: আশা-নিরাশার দোদুল্যমানতায় বিষণ্ণ-অবসন্ন বন্ধ্যা সময়ের বেদনা, সংশয়-দীর্ণ বিধ্বস্ত-মানস নিয়ে আগত শতাব্দীর অস্পষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে তারা। আজও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। বহমান জীবনধারার পরিপুষ্টি ও উত্তর প্রজন্মের গতিমুখে বিশল্যকরণী রস সিঞ্চনের মাধ্যমে যোগ্য হয়ে ওঠার উপাদান সংগ্রহ করতেই ঐতিহ্যের পাঠ জরুরী। 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।'

কী সময় আমরা পেরিয়ে এলাম? এ শতাব্দীর পৃথিবীর মানুষ তো বিশাল স্বপ্ন দেখেছিল—বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে তিমির বিদার উদার-অভ্যুদয়ের। বর্ণময়, ছন্দগন্ধময়, চিরমধুময় ঋদ্ধ-সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের। বুকের গভীরে লালন করেছিল যা সযত্নে—তা সাম্যবাদী সমাজ স্থাপনের—মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ঘুচিয়ে, বর্ণ-ধর্ম-ধন-বৈষম্য ঝেঁটিয়ে নিকিয়ে। কুসংস্কার, দারিদ্র্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, অস্বাস্থ্য নিশ্চিহ্ন করে, লোভ হিংসা মুনাফা-প্রবৃত্তি লোপাট করে এক বহু প্রতীক্ষিত নবজন্মের। মানুষ ভেবেছিল—ধ্বংস নয়, শান্তির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হবে বিজ্ঞান। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে সুলভ এবং বিনামূল্যে হবে চিকিৎসা, কৃষিবিজ্ঞানের অগ্রগতিতে পৃথিবীর দেশে দেশে শস্যভাণ্ডারগুলি ভরে উঠবে সকল মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তির সোনার ফসলে। সঞ্চিত আহৃত ধনসম্পদ নিয়োজিত হবে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে।

দূর যত নিকট হবে—মৈত্রী-সম্প্রীতি তত গাঢ় হবে। সম্ভাবনার কুঁড়িগুলোও একে একে ফুটেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা, কোরিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিল। পরিমাণ মতো খাদ্য বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং জীবন্ত সংস্কৃতিচর্চায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল মানুষের মুখ। নিটোল জীবনপ্রবাহের অভূতপূর্ব দ্রুত অগ্রগমন অপরাপর অংশের মানুষের কাছে পূর্ণ জীবনের আশ্বাস নিয়ে এসেছিল। সাম্রাজ্যবাদী বিষক্রিয়ায়, ভ্রান্ত প্রয়োগে, চলনে

পরিপূর্ণ বিকশিত হওয়ার আগেই সমাজতন্ত্র বিপন্ন হল সোভিয়েতে, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে। মানবতার শত্রুরা আরো তৎপর এখন।

হে আমার বিংশ শতাব্দীর ধর্ষিতা ধরিত্রী, হে আমার বিংশ শতাব্দীর নিঃস্ব ভারত —অক্রান্তরোদসী তোমরা প্রত্যক্ষ করেছো দুটি মহাযুদ্ধ, পারমাণবিক বোমার বীভৎসতা, বিশ্বব্যাপী শোষণ, নিপীড়ন-মন্দা, বর্ণ-বিদ্বেষ, প্রাণী-পরিবেশ-ভূ-সম্পদের নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা, ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়া-লাওসের ওপর সাম্রাজ্যবাদী জানোয়ারদের ঘৃণ্য অত্যাচার। পশ্চাদগামিতা-নৃশংসতার অন্ধকার পার হয়ে আগামী শতাব্দীতে তোমাদের কল্যাণমুখী জীবনমুখী পুনরুদ্বোধনের জন্যই আমাদের এই আলোকবর্তিকা নিবেদন। এরই আলোয় আলোকিত হয়ে উঠুক ভবিষ্যতের অন্ধকার সরণির একটি দুটি ধাপ। নবপ্রজন্ম পা রাখুক আলোকিত প্রত্যয়ে।

রাধানাথ শিকদার কলকাতার জোড়াসাঁকোর শিকদারপাড়ায় ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে জন্মেছিলেন। পিতার নাম তিতুরাম শিকদার। মুসলমান নবাবদের রাজত্বকালে শিকদাররা পুলিশ কমিশনার হিসাবে কাজ করতেন। তাঁদের অধীনে ছিল বিশাল লাঠিয়াল পাইক বরকন্দাজ সেনাবাহিনী। এই বাহিনীর সাহায্যে তাঁরা পাষণ্ড দুর্বৃত্ত ব্যক্তিদের ধরতেন। কয়েদ করে শাস্তি দিতেন। কখনো কখনো তাঁদের এই জনবল সাধারণ মানুষের পীড়নেও ব্যবহৃত হোত। লোকহিতের রাজশক্তি লোকপীড়নে নিয়োজিত হওয়ার এ ইতিহাস সর্বত্র ছড়ানো আছে। বিশেষত ধনিক জমিদার শ্রেণীর ক্ষেত্রে। তবে এখানে উল্লেখ্য, রাধানাথের জন্মের বহু আগেই তাঁর পরিবারের পূর্বপুরুষেরা শিকদারী চাকরি বর্জন করেছিলেন। যা-ই হোক, যে মানুষটি ৩৯ বছর বয়সে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা পরিমাপ করেন, কালের বাধা পেরিয়ে কালান্তরের অভিযাত্রী দিগদিশারী হন, তাঁর শৈশবাবস্থা থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে অন্তিম সময় পর্যন্ত পরিপুষ্টি পরিণতি সমকাল-বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। যে কোনো মহাবৃক্ষের চারা যেমন তার সুদূরপ্রসারী আঙুলে আঁকড়ে ধরে পৃথিবীর শরীর, আহরণ করে ব্যাপ্তির বৃদ্ধির জীবনাগ্নিসুধারস, ফুলে ফলে রঙে গন্ধে দশ দিক আলোড়িত করে সঞ্জীবিত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় আকাশে—তেমনি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রাধানাথের কালাঙ্ককে একটু সংক্ষেপে পরিক্রমণ করে আসা যাক—হয়তো স্মৃতির মতো ছুঁয়ে আসা যাবে তদানীন্তন সময়ের দুর্লভ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তাপশোষী তাপমোচী ধাত্রী মুহূর্তগুলোর কয়েকটা। বিস্মৃত অতীতের উজ্জ্বল উচ্চারণ, পুনরধ্যয়ন, নেশাগ্রস্ত, ঘুমন্ত, আলসবিলাসী বোধকোষগুলির উদ্বোধনের নগণ্য অরণি যদি হয়—না হলেও আশাবাদী হতে ক্ষতি কী?

ফিরিঙ্গী কমল বসুর স্কুলে তাঁর বিদ্যারম্ভ হয়। কিন্তু ১৮২৪ থেকে ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাধানাথ হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। অত্যন্ত মেধাবী। সংস্কৃত, ইংরেজী, গ্রীক ও ল্যাটিন চারটি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সময়ে হিন্দু

কলেজের গণিত শিক্ষক ছিলেন প্রখ্যাত পদার্থবিদ্যাবিদ ড. টাইটলার। উচ্চতর গণিতে পারদর্শী বিজ্ঞানমনস্ক তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ড. টাইটলারের কাছে স্যার আইজাক নিউটন রচিত 'প্রিন্সিপিয়া' পুস্তকটি অধ্যয়ন করেন। তিনি বৈজ্ঞানিক, আবিষ্কারক হিসেবে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার অন্যতম কৃতী সন্তান। রাধানাথ শিকদারের একটি স্মরণযোগ্য অত্যুৎকৃষ্ট অভ্যাস ছিল—তিনি দৈনিক লিপি লিখতেন। সুতরাং সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ঘটনা তাঁর নজর এড়ায়নি।

১। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের ২০ আগস্ট রামমোহন রায় 'ব্রাহ্ম সভা' স্থাপন করেন। ওই বছরই ৪ ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কর্তৃক 'সতীদাহ প্রথা নিবারণ' আইন জারী হয়। এ সময়ে রাধানাথের বয়স ১৫ বছর।

২। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারী কলকাতার রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ দলবদ্ধ হয়ে 'অশাস্ত্রীয় সমাজ সংস্কারের' বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার জন্য 'ধর্মসভার' প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত এই সভার কর্মই ছিল রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মানবদরদী দেশবরেণ্য মহাপুরুষদের চরিত্রহনন।

১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারী জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নবনির্মিত বাড়িতে ব্রাহ্মসভার উদ্বোধন।

১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের ২৭ মে আলেকজান্ডার ডাফ সাহেব স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় আসেন।

এই বছরের ১৯ নভেম্বর বহির্বিশ্বের জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে রামমোহন রায় বিলাতযাত্রা করেন। এ সময়ে রাধানাথের বয়স ১৭ বছর। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং ডিরোজিওর শিষ্য। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে—ডিরোজিও যখন একাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করলেন তখন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের মতো রাধানাথও তাতে যোগ দিলেন এবং ডিরোজিও শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তাঁর সুগঠিত দেহে যেমন শক্তির অভাব ছিল না, তেমনি মনেও দুর্জয় সাহসের অভিপ্রকাশের ঘাটতি ছিল না। ধীর, স্থির এককথার মানুষ ছিলেন তিনি। ভয় কী-জিনিস জানতেন না। পরমুখাপেক্ষী ছিলেন না। মুখে যা বলতেন কাজে তা-ই করতেন। নিজের শক্তির ওপর ছিল তাঁর অগাধ আস্থা। অটল আত্মবিশ্বাসে ঋজু যুবক রাধানাথ তখন ডিরোজিওর অতি প্রিয়পাত্র।

৩। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী থেকে মার্চ—এই তিন মাস হিন্দু কলেজের ডিরোজিও-শিষ্য তরুণ ছাত্রদের পাশ্চাত্যমুখী নীতি ও জীবনাদর্শের বিরোধিতায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল হিন্দু সমাজ।

প্রতিবাদে ডিরোজিও হিন্দু কলেজের অধ্যাপকের পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন এবং ইয়ংবেঙ্গল দলের তরুণদের উৎসাহ দান করতে থাকেন।

প্রগতিবিরোধী রক্ষণশীল বিত্তশালী সামন্ত হিন্দু সমাজের ডিরোজিওর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ ছিল, সেগুলি হল : (১) ছাত্রদের মধ্যে তিনি নির্বিচারে হিন্দু-ধর্মবিরোধী মতামত প্রচার করছেন। (২) নাস্তিক্যবাদ প্রচার করে ছাত্রদের মধ্যে শুধু ঈশ্বরবিদ্বেষই নয়—ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতায় বিশ্বাস জাগিয়ে তুলছেন। কী সাংঘাতিক কান্ড! কৃষ্ণমোহন, রাধানাথেরা জাতপাতের মাথা মুড়িয়ে হিন্দুধর্মের যে বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে।

সুতরাং হিন্দু কলেজের শিক্ষিত তরুণ ছাত্রদের আচার আচরণ এবং ডিরোজিওর পদচ্যুতিকে কেন্দ্র করে নবজাগরণপন্থী নবীনদের এবং গোঁড়া রক্ষণশীল প্রবীণ হিন্দু-ধর্মের ধ্বজাধারীদের মধ্যে তুলকালাম বাদ প্রতিবাদে চতুর্দিক অশান্ত ও উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। এই সময়ে পাদ্রী ডাফ্ সাহেব এবং তাঁর সহযোগী মিশনারীগণ বাংলার তরুণদের ধর্মান্তরিত করার কাজে তৎপর হয়ে উঠলেন। এই প্রসঙ্গে আলেকজান্ডার ডাফের সরল স্বীকারোক্তি প্রণিধানযোগ্য—

(ক) উচ্চবিত্ত নয়, সম্ভ্রান্ত ও অবস্থাপন্ন হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষানুরাগী সন্তানরাই সে সময়ে হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন।

(খ) নিম্নবিত্ত নিম্নবর্ণ দরিদ্র হিন্দুদের শয়ে শয়ে ধর্মান্তরিত করার চেয়ে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবর্ণের একজনকে ধর্মান্তরিত করার সামাজিক সুফল বহু গুন কার্যকরী।

(গ) উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্ত সন্তানরাই নয়, বর্ণবিত্ত প্রভেদ নিরপেক্ষ হিন্দুসন্তানগণ এই সময়ে পাশ্চাত্য জীবনধারা ও জীবনাদর্শের প্রেরণায় কিছুটা উদভ্রান্ত ও বিভ্রান্ত (কারণ, এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ধর্মান্তর কুসংস্কার-মুক্তি নয়, এক অন্ধকার আচার থেকে অন্য অন্ধকারের অতলে আছড়ে পড়া। কিন্তু ক্রমাগত পরিবর্তন না হলে, মানবমনের জড়তা ও অন্ধত্ব মুক্তি ঘটে না)। পারিবারিক এবং সামাজিক অপশাসনে ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ যুবকদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখকে তিনি (আলেকজান্ডার ডাফ) রাতারাতি খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করে ফেললেন (মনে রাখতে হবে, এই শেকল ছেঁড়ার অভিজ্ঞতাই পরবর্তী সময়ে সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা এইসব হিন্দু সন্তানদের ধর্মমত-নিরপেক্ষ নাস্তিক্যবাদ এবং মানবতাবাদের কাছাকাছি নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল।

৪। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে রাধানাথ প্রথম ভারতীয় হিসেবে কর্ণেল জর্জ এভারেস্টের অধীনে ত্রিকোণমিতিভিত্তিক জরিপ বিভাগে কম্পিউটারের চাকরি পান। ভূমির উচ্চতা জরিপের কাজে জর্জ এভারেস্ট আবিষ্কৃত 'এক্সরে পদ্ধতি'-র প্রথম প্রযোক্তা ছিলেন তিনিই। কম্পিউটারের কাজে যোগদান করার পর রাধানাথ ইংরেজী ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থগুলির সংস্কৃতে অনুবাদ করার প্রবল আগ্রহে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। উদ্দেশ্য ছিল দেশের মানুষের কাছে বিজ্ঞানের চেতনাকে প্রসারিত করা। কিন্তু সে কাজ আরম্ভ করার কিছু দিনের মধ্যেই তাঁকে কর্মসূত্রে

কলকাতা ত্যাগ করে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চলে যেতে হয়। সে সময়ে তরুণ রাধানাথের জ্ঞান, কর্মদক্ষতা, তেজস্বিতা, আত্মমর্যাদাবোধ প্রত্যক্ষ করে ইংরেজরা তাঁকে সমকক্ষের ন্যায় শ্রদ্ধা করতেন।

১৮৩২ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ২০ বছর রাধানাথ কলকাতার সাথে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন, একথা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ ডিরোজিওর অন্য শিষ্যরা তখন কলকাতায় নবজাগরণের আন্দোলনে পুরোমাত্রায় শামিল। সেই ঢেউ যত প্রচ্ছন্নই হোক, রাধানাথ অবধি ছড়িয়েছিল ঠিকই—তা না হলে ৫২-পরবর্তী রাধানাথের দ্বিতীয় জন্ম সম্ভব নয়। কেউ দ্বিমত পোষণ করলেও, এটা মিথ্যা নয় যে, কুড়ি বছরে বাংলা ভুলে যাওয়া সম্পূর্ণ সাহেব একজন মানুষ—ফিরে আসার কয়েক বছরের মধ্যেই এমন বাংলা লিখতে শুরু করলেন যা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের তৎসম শব্দ-সমৃদ্ধ বাংলা ভাষাকে ছাড়িয়ে তৎকালীন সাধারণ মানুষের কথ্যভাষার কাছে পেঁছে গেল! সোজাসুজি রাধানাথ বললেন, যে ভাষা স্ত্রীলোক বুঝিবে না, তাহা আবার বাংলা কি?

এই প্রসঙ্গে ১৮৩৩ থেকে ১৮৫২ পর্যন্ত কিছু ঘটনায় চোখ বুলিয়ে নেওয়াটা বাংলার সংস্কৃতি আন্দোলনের ধারাবাহিকতাকে বোঝার জন্য একান্ত জরুরী।

৫। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩, বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন ব্রিস্টলে প্রয়াত হন।

৬। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে সংবাদ প্রভাকরের পর্বান্তর হতে থাকে। এই সময়ে ঈশ্বর গুপ্তও তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্পর্শে আসেন এবং এর প্রগতিশীল উদার মতের দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৮৩৯-এর ৬ অক্টোবর 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপিত হয়। এখানেই ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে রাধানাথের সহপাঠী ডিরোজিও-শিষ্য অক্ষয় দত্তের সাথে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে।

৭। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের 'সংবাদ প্রভাকর' নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করে সংবাদ পরিবেশন করে। 'নীলকর সাহেবরা প্রজাদের উৎপীড়ন করেন। যে সব কৃষক দাদন গ্রহণ করে, তাহাদের রক্ষা থাকে না। ম্যাজিস্ট্রেটদের নিকট বিচার প্রার্থনা করিয়া কোনো ফল পাওয়া যায় না। তাঁহারা ১৫ দিনের জন্য কারাবাস এবং পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করিতে পারেন। বিরুদ্ধে কোনো আপীল করা চলে না। এই আইনের প্রতিবাদ করা হইয়াছে।'

৮। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে 'সংবাদ প্রভাকর' 'স্ত্রীবিদ্যা' প্রবন্ধে জনসাধারণের কাছে এইভাবে আবেদন রাখে, 'হে শুভাদৃষ্ট, তুমি শীঘ্র আগমন কর, হে কুসংস্কার, তুমি আর এদেশে অবস্থান করিও না, ত্বরায় প্রস্থান কর, দেশীয় পুরুষসকল—স্ত্রীজাতির দুরবস্থা দূর করিতে যত্ন লউন।' এই আবেদন বিফল হয়নি—ভারতবর্ষের সুদূর উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রবাসী রাধানাথ পর্যন্ত সে বার্তা পেঁছেছিল নিশ্চিত।

৯। রেভারেন্ড জে. লঙ সাহেব এদেশের ভাষা ও শিক্ষার উন্নতি কল্পে নিজ সুখ ত্যাগ করে দিনরাত পরিশ্রম করছেন বলে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন, 'যৎকালীন আমরা ভিন্নদেশীয় কোনো ধার্মিক ব্যক্তিকে ভিন্নদেশের কোনো উপকারের কার্যে বিশেষ উৎসুক দেখিতে পাই, আহা! তৎকালীন আমারদিগের অন্তঃকরণ কি এক অদ্ভুত আহ্লাদ মিশ্রিত কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইতে থাকে।' সুতরাং নিঃসন্দেহে বোঝা যায়—শুভাশুভ ও শত্রুমিত্র চেনার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল তখনই। সব দেশীয় মানুষও যেমন খারাপ নয়, তেমনি সব বিদেশীয় মানুষও অত্যাচারী, অচ্ছুৎ নয়। উল্লেখ্য ১৮৫১-তেই রাধানাথ Auxiliary Table এবং Manual of Surveying নিবন্ধ দুটি লেখেন। এগুলি ভারতীয় সার্ভের অপরিহার্য ও মূল্যবান দলিল।

১০। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয় থেকে জানা যায়—'জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট নীলকর সাহেবদের পক্ষভুক্ত হইয়া প্রজাদের প্রতি সুবিচার না করায় চার-পাঁচ শত কৃষক লাঙল কাঁধে করিয়া 'গবর্নমেন্ট হৌস'-এর এবং দেওয়ানী আদালতের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে।' এই বছরেই বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর গৌরব—রাধানাথ হিমালয় পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরের উচ্চতা (২৯০০২ ফুট) মাপেন। কিন্তু তৎকালীন সার্ভে অধিকর্তা কর্নেল জর্জ এভারেস্ট সাহেবের নাম অনুসারে পৃথিবীর এই সর্বোচ্চ শিখরের নামকরণ করা হয় 'মাউন্ট এভারেস্ট'।

১৮৫২ খ্রীস্টাব্দেই রাধানাথ চীফ কম্পিউটার পদের সাথে কলকাতার সরকারী আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডেটের পদে বৃত হয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন।

রাধানাথ শিকদারের কুড়ি বছরের বাংলার বাইরের জীবনের একটি ঘটনা বর্ণনা না করলে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধিই অপূর্ণ থাকবে বলে মনে করি। ঘটনাটি এই রকম :

একবার তিনি সার্ভে কাজের দায়িত্ব নিয়ে দেরাদুনে আছেন। সেই সময়ে একদিন একটি সংবাদ এল তাঁর কাছে। সেই জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ভ্যান্সিটার্ট, তাঁরই সার্ভে অফিসের কয়েক জন কুলিকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে ভারি ভারি মালপত্র বহন করার আদেশ দিয়েছিল। এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ খবরে রাধানাথ খুবই বিরক্ত হলেন এবং ভাবলেন—এ তো ঠিক কথা নয়, কুলির প্রয়োজন থাকলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্ট্রেট তাঁকে লিখতে পারতেন, কিন্তু লিখলেন না কেন ? তবে কি তিনি কালা আদমী বলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চিঠি লিখে অনুমতি নেওয়া উপযুক্ত বিবেচনা করলেন না ? তিনি তৎক্ষণাৎ ম্যাজিস্ট্রেটের জিনিসপত্রগুলো সঙ্গে নিয়ে কুলিদেরকে তাঁর অফিসে ফিরে আসতে আদেশ করলেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আর্দালিকে বললেন, 'যাও, ম্যাজিস্ট্রেটকে বল, তাঁর পরওয়ানা ছাড়া আমার কুলি দিব না'। এই কথা শুনে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তো রেগে

আগুন। কালো আদমীর এত বড় আস্পর্ধা! রাজকার্যের অবরোধ! ভ্যান্সিটার্ট আদালতে রাধানাথের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। বিচার হবে রাধানাথের গর্হিত কর্মের। শ্বেতাঙ্গ সাহেব, তাও যে সে সাহেব নয়। অঞ্চলের ম্যাজিস্ট্রেট বলে কথা! রাধানাথের অনেক শুভানুধ্যায়ী তাঁকে ম্যাজিস্ট্রেট-এর কাছে করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে পরামর্শ দিলেন। দৃঢ়চেতা রাধানাথ কিছুতেই মাথা নিচু করতে রাজী হলেন না। সিভিলিয়ানের বিচারে ২০০ টাকা জরিমানা ধার্য হল। তিনি কোনো কিছু গ্রাহ্য না করে ২০০ টাকা অর্থ দণ্ড দিলেন। কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হল, তাতে বলপূর্বক গরীব কুলি-মজুরদের শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত করার অন্যায় অমানবিক প্রথা বন্ধ হয়ে গেল।

১১। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে রাধানাথের পিতার মৃত্যু হয়। এই বছরের একটি বিশেষ ঘটনা ভারতবর্ষ জুড়ে লবন আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন।

১২। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে শিল্প প্রশিক্ষণে উৎসাহী রাধানাথ কলকাতা আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট্‌ সোসাইটি স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই বছরেই বাংলা ভাষায় মহিলাদের জন্য প্যারীচাঁদ মিত্রের সহযোগিতায় তিনি 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ করেন। আগেই বলেছি, রাধানাথ সম্বন্ধে কথিত 'তাঁর আচার-ব্যবহার অনেকটা ইংরেজ সাহেবদের মতো হয়ে গিয়েছিল', একথা যদিও বা খানিকটা মেনে নেওয়া যায়, 'তিনি বাংলা ভাষা ভুলে গিয়েছিলেন', এ অপবাদ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। যা-ই হোক, বাংলায় পুনঃপ্রতিষ্ঠ হবার পর তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু প্যারীচাঁদকে সরল সহজ বাংলা লেখার জন্য উৎসাহিত করতে থাকেন এবং তারই ফলস্বরূপ সেই পত্রিকা প্রকাশনা, যাতে প্যারীচাঁদের বিখ্যাত উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়।

এই সময়ে নারীশিক্ষানুরাগী রাধানাথের মেয়েদের পঠন-পাঠনের উপযুক্ত সোজা ভাষায় বাংলা গদ্য লেখা প্রায় বাতিকের মতো হয়ে উঠলো। 'মাসিক পত্রিকা'য় গল্প ও প্রবন্ধ লিখে তিনি পরিবারের স্বল্পশিক্ষিতা রমণীদের পাঠ করে শোনাতেন এবং বুঝতে চাইতেন তাঁর লেখা সত্যিই সহজবোধ্য হয়েছে কিনা, কিংবা কোথাও কাঠিন্য বা অস্পষ্টতা রয়েছে কিনা। অকৃতদার রাধানাথ একদিন ভোর হওয়ার আগেই প্যারীচাঁদ মিত্রের বাড়ি গিয়ে হাজির হয়ে বন্ধুকে জোর গলায় ডাকতে শুরু করলেন 'প্যারী, প্যারী, ওঠ ওঠ, এবারকার পত্রিকা পড়িয়া তোমার স্ত্রী কি বললেন?'

যে পত্রিকাটির যে লেখাটির বিষয়ে তিনি উদ্বেল হয়েছিলেন, পত্রিকার ঘোষণা-পত্রের সঙ্গে সেই লেখাটি পাঠকের জ্ঞাতার্থে সংলগ্ন হল :

মাসিক পত্রিকা / কলম ২/নং ৭।

বাং তাং ১ ফাল্গুন, সাল ১২৬২। ইং তাং ১২ ফেব্রুয়ারি, সাল ১৮৫৬।

Calcutta : Printed by P. S. D. ROZARIO & Co.

এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের জন্যে ছাপা হইতেছে। যে ভাষায়

আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। প্রতি মাসে এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক, তাহার মূল্য এক আনা মাত্র।

লালদীঘির পূর্বাংশে রোজারিও কোম্পানীর অফিসে এই পত্রিকা পাওয়া যাইবে।

হিন্দুদিগের বিধবা বিবাহের কথা শুনিয়া ইংরাজদিগের বিবীরা যাহা বলে।

যে দিবস ব্রজনাথবাবুর বিবাহের কথা লইয়া মাষ্টার হাকিমেতে ও বীরহরি মুখোপাধ্যায়েতে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহার পরদিবস মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে কর্ম উপলক্ষে হাকিম সাহেবের বাড়ীতে যাইতে হয়। সে-সময় হাকিম সাহেব বাড়ী ছিলেন না। এই জন্যে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে হাকিম সাহেবের বিবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইল। তাঁহাদিগের মধ্যে হিন্দুদিগের বিধবা বিবাহ লইয়া যে কথাবার্তা হয়, তাহা নীচে দেওয়া যাইতেছে।

বিবী হাকিম—কাল রাত্রে কর্তার ঠাঁই শুনিলাম ব্রজনাথের বিবাহ হইবে, তাহা শুনিয়া আমি বড় আহ্লাদিত হইয়াছি, ব্রজনাথ বড় ভদ্রলোক। পরমেশ্বর করেন যেন তিনি বিবাহ করে সুখী হন।

বীরহরি—মেম্ সাহেব, আমারও বড় ইচ্ছা ব্রজনাথ যেন বিবাহ করে। সে বিবাহ করিলে, এক বড় ভদ্র ব্রাহ্মণের বংশ রক্ষা পায়। কিন্তু ইংরাজি লেখাপড়া করিয়া ইংরাজদিগের মতন ব্রজনাথের বুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। সে বলছে আমি বিধবা মেয়ে বিবাহ করিব। সম্বন্ধও স্থির করিয়াছে। ইহা দেখে শুনে আমি আশ্চর্য হইয়াছি। বিবাহ হইলে কি করিব বলা যায় না।

বিবী হাকিম—ব্রজনাথ যেন বিধবা মেয়ে বিবাহ করিলেন, তাহাতে দোষ কি। আমার মায়ের দুইবার বিবাহ হইয়াছিল। প্রথম বিবাহে এক পুত্র, এক কন্যা হয়। তাহারা উভয়ই বর্তমান। চিন দেশে ভাই সওদাগরী কর্ম করেন। বোন একজন ধনী জমীদারের ছেলেকে বিবাহ করিয়া ইংলণ্ডে আছেন, এদেশে কখনও আইসেন নাই। মায়ের দ্বিতীয় বিবাহে আমি হই।

বীরহরি—আপনাদিগের শাস্ত্রে বিধবা বিবাহের বিধি আছে। এই জন্যে আপনাদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ হয়। আমাদিগের শাস্ত্রে বিধবা বিবাহের বিধি নাই। সেই নিমিত্তে আমাদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ হয় না।

বিবী হাকিম—আপনাদিগের শাস্ত্র তবে মিথ্যা বলিতে হইবেক।

বীরহরি—আমাদিগের শাস্ত্র কেমন করে মিথ্যা বলিব। পরমেশ্বর আপনাদিগকে এক শাস্ত্র দিয়াছেন, আমাদিগকে এক শাস্ত্র দিয়াছেন, মুসলমানদিগকে আর এক শাস্ত্র দিয়াছেন। যে যাহার আপনার শাস্ত্র মতে চলা উচিত। স্বর্গের তো এক দরজা

নয়, অনেক দরজা। আপনারা এক দরজা দিয়া স্বর্গে গমন করেন, আমরা এক দরজা দিয়া যাই মুসলমানেরা আর এক দরজা দিয়া যায়।

বিবী হাকিম—না বাবু, স্বর্গে এক বই দরজা নাই। সে দরজা দিয়া কেবল ধার্মিকেরা স্বর্গে গমন করেন, সেখানে আর কেহ যাইতে পারে না। আমরা যে পর্যন্ত বেঁচে থাকি, জাত-টাত লইয়া ধুমধাম করি, মরিলে জাত-টাত কিছুই থাকে না। যেমন ইংরাজ, তেমনি কাফ্রি, তেমনি ব্রাহ্মণ, তেমনি শূদ্র, মরিলে পর ইহাদিগের মধ্যে কিছু মাত্র প্রভেদ থাকে না, সকলি সমান হয়। ধর্ম এ জাত থেকে, কি ও জাত থেকে হয় না। জাত থাকুক বা না থাকুক, যিনি অনভিমানী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও পরোপকারী, তিনিই ধার্মিক, তিনিই স্বর্গ প্রাপ্ত হন। আমি যে কথা বলিলাম সে সুযুক্তির কথা। আপনি বলুন দেখি, হিন্দু শাস্ত্রে বিধবা বিবাহ কেন নিষেধ হইল।

বীরহরি—আমরা বলি বিবাহ হইলে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যে সম্পর্ক হয়, তাহা যে কেবল এ জন্মের জন্যে হইল তাহা নয়, সম্পর্কটা পরকালেও থাকে। এখানে যেমন স্ত্রী-স্বামী একত্রে বাস করে, মৃত্যুর পরেও তাহারা সেইরূপ একত্রে বাস করিবে। এই নিমিত্তে আমরা বলি, বিধবা মেয়ে বিবাহ করিলে তাহার পরকাল নষ্ট হয়, কারণ সে সময়ে সে দুই স্বামী প্রাপ্ত হয়, একজন মেয়ে দুই স্বামী লইয়া কেমন করে ঘর করবে, তাহা তো হয় না।

বিবী হাকিম—আপনি যে কথা বলিলেন তাহা কখনই সত্য নয়। স্বামী যদি ভালমানুষ ভদ্রলোক হয়, পরকালে তাহাকে পত্নীতে পাইলে, হানি নাই। কিন্তু সকল স্বামী ভালো মানুষ ভদ্রলোক নয়, কেহ কেহ বড় বজ্জাৎ দুষ্ট হয়। প্রত্যহ রাত্রে নেশা করে পত্নীকে মারধর করে, কখন ২ নেশার ঘোরে পত্নীকে মেরে ফেলে। ইহকালে এমন স্বামী ভোগা দুঃখের শেষ বলিতে হইবেক। আবার পরকালে এমন স্বামী লইয়া পত্নী কি করিবে, ইহকালে যে দুঃখ ভুগিয়া ছিল, আবার পরকালে সেই দুঃখ ভুগিবে। এ কেন হবে, পত্নীর অপরাধ কি। না, না, তাহা কখনও হবে না। তাহা হইলে পরমেশ্বর অবিচারক হইবেন। কিন্তু পরমেশ্বর অবিচারক নন, তিনি সুবিচারক। যে যেমন করে, তিনি তাহাকে তেমনি ফল দেন। তিনি কখন অনপরাধ অবলা নারীকে মিছামিছি দোষী বলিয়া দুঃখ দিবেন না। ইহা আমি বেশ জানি। আরো আপনার কথাক্রমে যদি এ জন্মে সতীন হয়, আবার পরকালেও সতীন হবে। আমাদিগের মধ্যে সতীন হয় না, আপনাদিগের মধ্যে সতীন হইয়া থাকে। সতীনের জ্বালা কি তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারি। ইহকালে সতীনের জ্বালা ভুগিয়া আবার পরকালে সে জ্বালা ভুগিতে হইলে স্ত্রীলোকের দুঃখের সীমা নাই বলিতে হইবেক। না, না, বাবু, আপনার কথা কখনই সত্য নয়। ইহকালে বিবাহ হইলে যে স্ত্রী স্বামী সম্পর্ক হয়, তাহা পরকালে থাকে না, তাহার কারণ,—সেখানে আমরা এ দেহ লইয়া যাইনে। যেখানে এ দেহ নাই, সেখানে স্ত্রী-পুরুষেরও প্রভেদ নাই, সুতরাং এমন স্থানে বিবাহ দেওয়া থোওয়া হয় না।

এই জন্যে ইহকালে স্ত্রীলোকের দুই তিন বার বিবাহ হইলে তাহার পরকালের ক্ষতি হয় না।

১৩। ৩০ বছর চাকরির পর রাধানাথ ১৮৬২-তে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর প্রকৃত ডিরোজিয়ান রূপে প্যারীচাঁদ মিত্রের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। কিছুকাল পরে জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশনে অঙ্কের অধ্যাপনা করেন।

গ্রীক ল্যাটিন ও ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তির সাহায্যে রাধানাথ 'মাসিক পত্রিকা'য় প্লুটার্ক, জেনোফোন প্রমুখের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে খুবই উচ্চমানের প্রবন্ধ লিখতেন। তিনি ব্যাভেরিয়ার প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক সোসাইটির লেখক ও সদস্য ছিলেন। সমাজসংস্কারক হিসেবে বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহের ঘোরতর বিরোধী রাধানাথ বালবিধবাদের পুনরায় বিবাহের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিলেন। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে যে তিনি ছিলেন চিরকুমার। কেউ তাঁকে দেশীয় প্রথা মেনে অল্পবয়সী কোনো বালিকার পাণিগ্রহণ করাতে পারেননি। আজীবন মাতৃভক্ত রাধানাথ এক্ষেত্রে মায়ের অনুরোধ উপরোধে সাড়া দিয়ে তথাকথিত বাধ্য ছেলেদের মতো 'গৌরী' গ্রহণে সম্মত হননি। আমৃত্যু তিনি যুক্তিবাদী বস্তুবাদী এবং বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন।

চিরতরুণ সহৃদয়, বন্ধুবৎসল মানবপ্রেমী এই মানুষটি সব শিশুদেরই ভালোবাসতেন। শিশুদের সাথে হাসি গল্প খেলাধুলা করতে পছন্দ করতেন। শেষ জীবনে চন্দননগরের গোঁদলপাড়ায় গঙ্গাতীরে একটি বাগানবাড়ি কিনে বসবাস করেন। ১৮৭০ সালের ১৭·মে বাংলার এই উজ্জ্বল মনীষা এখানেই প্রয়াত হন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবজাগরণকালে জন ও জগৎ সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা, মুক্ত-চেতনাসমৃদ্ধ যে শিক্ষা ও বীক্ষণের প্রবল অভিঘাত, তা কেবলমাত্র বাঙ্গালীর জীবন-জীবিকার বহিরঙ্গেই নয়—মৌলিক চিন্তাভাবনা, তত্ত্বাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির গভীরে এসে আছড়ে পড়েছিল। নিউটন, ডলটন, ডারউইন, স্পেন্সার, হাক্সলে, মার্ক্স, এঙ্গেলস, উইলার প্রমুখ বস্তুবাদী মনস্বীদের দর্শন, আবিষ্কার ও উদ্ভাবিত তত্ত্ব-প্রকল্প—জীবন সৃষ্টির রহস্যে আলোকপাত করেছিল এবং প্রাণসৃজনের মূলে 'কোনো এক সর্বশক্তিধরের অস্তিত্ব' সম্পর্কেই অনাস্থা প্রকাশ করেছিল। শক্তির বিবর্তন, ক্রিয়াবিক্রিয়া কার্যকারণ সম্বন্ধ-সূত্রাবলীর মধ্যেই যে জীবসৃষ্টির জটিল ও গূঢ় রহস্য অন্বিত ও ধৃত রয়েছে—এইসব বৈজ্ঞানিক সেকথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা ও প্রমাণ করেছিলেন। ফলে—দৈবশক্তি, অসুরশক্তি, কুসংস্কার এবং অলৌকিক অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান রাধানাথ এবং তাঁর সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙ্গালী সন্তানগণ—সংশ্লিষ্ট জড় জগৎ ও সন্নিহিত জীবন বিষয়ে আগ্রহী এবং বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে—সকল প্রকার কুশ্রীতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। এইসব নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব, তথ্য ও মতবাদের শিক্ষা, সদ্য জাগ্রত শিক্ষিত বাঙ্গালীহৃদয়

থেকে—পৌরাণিক ধর্মবিশ্বাস, আদিম মায়াবাদ এবং মধ্যযুগীয় দৈবনির্ভরতার কুসংস্কার মুক্তির পথ দেখিয়েছিল। নবদৃষ্টিলাভের ফলস্বরূপ 'ঈশ্বরপালিত অথবা শয়তান করায়ত্ত' এইরূপ মধ্যযুগীয় অন্ধবোধে আচ্ছন্ন মানুষেরা ক্রমেই নিজেদেরকে মানুষরূপে চিনতে শিখলো—আর এই পরমজ্ঞান-প্রাপ্তিই ছিল বিগত শতকের পরিশ্রুত মানবতার অন্যতম প্রধান ফসল।

সেদিন মুক্তচেতনালব্ধ সমৃদ্ধ মানুষ বুঝতে পেরেছিল—সুস্থ বিশুদ্ধ সংস্কৃতিই মানবসভ্যতার শুচিশোভন রুচিশীল বহিঃপ্রকাশ। অশন-বসন আচার-আচরণ সৃজন-পরিবেশন, সুকথন, সুচিন্তন, উত্তরণমুখী সঙ্গত শুভ্র প্রকাশবিকাশই মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর। রুচিহীন উত্তেজনা, সাময়িক আত্মসুখ, চটুল দৌরাত্ম্য—চরম লজ্জাজনক এবং প্রভূত ক্ষতিকর। বর্তমান সময়ে এদেশে সেই ঘৃণিত কুটস্রাবী বিকৃত রুচিহীন ভাবভঙ্গিসমূহই মহামারীর আকারে ক্রমশ সংক্রামিত। সর্বস্তরের মূল্যবোধ পরিকল্পিত আক্রমণে ধ্বসে পড়ছে। নিরাশা নৈরাজ্য হতাশা ও উদ্‌ভ্রান্তির করাল ছায়া প্রবল দ্রুততায় ব্যাপ্ত হচ্ছে সমাজ রাষ্ট্র ও জীবনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। যৌন উত্তেজক পোশাক-আশাক, মাদকাসক্তি, কুৎসিত হাবভাব সমন্বিত নৃত্যগীতি, আহারবিহার লীলালাস্যের ক্ষণসুখের বিষাক্তস্রোতে ভাসমান যুবশক্তি আজ অবক্ষয়ী বিপথগামী। দেশের সভ্যতা স্বাধীনতা, সংহতি-সংস্কৃতি সব কিছুই নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিপন্ন। এই অন্ধকারের নেশা দূর করে অন্তরের বিশল্যকরণী গুণাবলী বিকশিত করতেই হবে।

স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও মুক্তিচেতনার সাথে সাথে অতীতে অনিবার্যভাবে যে দুর্দম-পৌরুষ এবং অনিরুদ্ধ শক্তিমত্তার স্ফুরণ ঘটেছিল. আজ—বিশ-শতকের শেষ লগ্নে—সন্ত্রস্ত জীবন, শঙ্কিত বিপর্যস্ত পদক্ষেপ, ব্যক্তিত্বহীন মেরুদণ্ড, মনুষ্যত্বহীন উদ্যম, পরাশ্রয়ী হীন মনোভাব এবং গ্লানিকর শতভঙ্গদীর্ণ অস্তিত্ব নিয়ে যে উত্তর প্রজন্ম ধাবমান—তা কি ক্ষণকালের জন্যও আমাদের মাথা নত করে দেয় না ভবিষ্যতের উত্তরদায়ী হিসেবে?

রামতনু লাহিড়ী ছিলেন একাধারে হেয়ার-শিষ্য এবং ডিরোজিওর ঘনিষ্ঠ সহচর। ডিরোজিওর জীবনীকার টমাস এডওয়ার্ডস্ যে আঠারো জন উল্লেখযোগ্য ডিরোজিয়ানকে চিহ্নিত করেছিলেন, রামতনু তাঁদের অন্যতম। প্যারীচাঁদ মিত্র এঁদের নাম দিয়েছিলেন 'Young Calcuttans'। তবে এঁদের মধ্যে চারজন ছিলেন প্যারীচাঁদেরই ভাষায় firebrands বা আগুনখেকো। এঁরা হলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং রামগোপাল ঘোষ। রামতনু কিন্তু এই 'আগুন-খেকো' গোষ্ঠীর লোক নন। লোকদেখানো চমকপ্রদ ঘটনা ঘটানোতে তিনি তেমন আগ্রহী ছিলেন না। কৃষ্ণমোহনের মতো তিনি খ্রীস্টান পাদ্রী হননি, দক্ষিণারঞ্জনের মতো চরম নাস্তিক তিনি ছিলেন না, রসিককৃষ্ণ মল্লিকের মতো আদালতে দাঁড়িয়ে গঙ্গাজলের পবিত্রতাও তিনি অস্বীকার করেননি, আবার রামগোপাল ঘোষের মতো তিনি দুর্ধর্ষ বক্তাও নন। কিন্তু সারা জীবন তিনি নিজের আদর্শে অবিচলিত থাকার চেষ্টা করে গেছেন। গুরু ডিরোজিওর কাছ থেকে রামতনু একদিকে পেয়েছিলেন সত্যনিষ্ঠা, অপর দিকে নিরহঙ্কার ও বিনীত মানসিকতা। স্বীয় বিদ্যাবত্তা বা পাণ্ডিত্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার প্রকাশেও ডিরোজিওর ঘোরতর আপত্তি ছিল। হিন্দু কলেজ থেকে তাঁর পদত্যাগ প্রসঙ্গে ড. উইলসনের কাছে লেখা দ্বিতীয় চিঠিটিতে ডিরোজিও লিখে-ছিলেন, 'humility becomes the highest wisdom—for the highest wisdom assures man of his ignorance.'

রামতনু এই জীবনদর্শনকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর জীবনীকার শিবনাথ শাস্ত্রী এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। রামতনু তখন সেখানকার শিক্ষক। ক্লাসের ছাত্রদের কাছে কোনো একটি বিষয় ইংরেজিতে বোঝানোর সময়ে একজন ছাত্র তাঁর ব্যাখ্যা মেনে নিতে অস্বীকার করে। বারবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হওয়ার পর রামতনু শেষ পর্যন্ত উমেশচন্দ্র দত্ত নামক একজন খ্যাতিমান শিক্ষককে নিজের ক্লাসে ডেকে নিয়ে যান। উমেশের ব্যাখ্যায় ছাত্ররা সন্তুষ্ট হলে রামতনু অনায়াসেই ছেলেদের সামনে বলতে পেরেছিলেন, 'দেখিলে, আমি ঠিক ব্যাখ্যাই দিয়াছিলাম, তবে ওঁর মত আমার ইংরাজীতে বিদ্যা নাই, তাই অমন সুন্দর করে বুঝাতে পারি নাই। ওঁর মত কয়টা মানুষ বাঙ্গালা দেশে ইংরাজী জানে?' এই সরল স্বীকারোক্তি যে কোনো যুগেই বিস্ময়কর।

এটা রামতনুর অজ্ঞতার পরিচায়ক নয়, এই যথার্থ শিক্ষকসুলভ বিনয় তাঁর 'highest wisdom'-এরই প্রমাণ। ছাত্ররা কিন্তু এই জ্ঞানী শিক্ষকটিকে ঠিকই চিনতে পেরেছিলেন। তাঁর উত্তরপাড়া হাইস্কুলের ছাত্র ক্ষেত্রমোহন বসু পরিণত বয়সে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন, 'রামতনুবাবুর অধ্যাপনা শ্রেষ্ঠ হইবার আর একটি কারণ ছিল। ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনাকে সর্বদা শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি চিরজীবন ছাত্র ছিলেন।' মাঝে মাঝে মনে হয়, রামতনুর শিক্ষকসত্তাই বোধ হয় সকলের থেকে বড় হয়ে উঠেছিল। এ ব্যাপারে তাঁর দুই প্রথিতযশা শিক্ষাব্রতী গুরু সম্ভবত তাঁকে প্রভাবিত করেছিলেন সবচেয়ে বেশি। হেয়ার এবং ডিরোজিওর মতোই তিনিও ছাত্রদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার হয়ে উঠেছিলেন।

অথচ সমসাময়িককালে অসাধারণ পণ্ডিত বা বুদ্ধিজীবী হিসেবে রামতনু তেমনভাবে স্বীকৃত হননি। তাঁর অত্যন্ত অনুগত ছাত্র ক্ষেত্রমোহন বসুও লিখেছেন যে, বারাসতে প্যারীচরণ সরকার, হুগলীতে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বোয়ালিয়াতে হরগোবিন্দ সেন এবং হাওড়ায় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রধান শিক্ষকদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল রামতনুর থেকে বেশি। শিবনাথ শাস্ত্রীও স্বীকার করেছেন, 'তিনি প্রতিভাবলে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা রামগোপাল ঘোষের সমকক্ষ ছিলেন না, বরং অনেক বিষয়ে ইঁহাদিগকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও উপদেষ্টার ন্যায় জ্ঞান করিতেন।' বুদ্ধির ধারালো তরবারির আঘাতে প্রতিপক্ষকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলায় তিনি তেমন আগ্রহী ছিলেন না, সে ক্ষমতা তাঁর কতটুকু ছিল তা-ও বলা শক্ত। অন্যান্য বিদ্রোহী ইয়ং বেঙ্গলদের মতো নিছক বুদ্ধি ও যুক্তির চর্চা তাঁর সহজাত ছিল না, তিনি মুখ্যত মননধর্মী নন, হৃদয়ধর্মী মানুষ। তাঁর মধ্যে উদারতা ও মানবতাবোধের সার্থক সমন্বয় লক্ষ্য করা গেছে। সমসাময়িক প্যারীচাঁদ মিত্র সঠিকভাবেই লিখেছিলেন, 'Ramtunoo Lahiri is known more as a moral than an intellectual man. There are few persons in whom the milk of human kindness flows so abundantly.' এই স্নিগ্ধ মানবতাবোধের গুণেই রামতনু অন্যান্য ইয়ং বেঙ্গল থেকে যেন কিছুটা আলাদা। ব্যক্তিগত শোক ও দুঃখকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অন্যকে সান্ত্বনা দেওয়ার যে ক্ষমতা তাঁর মধ্যে দেখা গেছে, তা-ও রীতিমতো বিস্ময়কর। পুত্র নবকুমারের মৃত্যুতে তাঁর গৃহে আয়োজিত ধর্মসভা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি বন্ধুদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে অনায়াসে বলতে পারেন, 'অল্পকাল পূর্বে নবকুমারের মৃত্যু হয়েছে, তার মৃতদেহ ঐ ঘরে পড়ে আছে, তোমরা যেওনা, দেখলে কষ্ট হবে।' এখানে তাঁকে গীতোক্ত নিষ্কামধর্মের সার্থক উপাসক বলেই মনে হবে। তিনি যথার্থই 'সুখে বিগতস্পৃহ ও দুঃখে নিরুদ্বিগ্নমনা'।

তথাপি রামতনুও ইয়ংবেঙ্গলের স্ব-বিরোধিতা থেকে একেবারে মুক্ত ছিলেন না। নিজের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে তাঁর মধ্যে দ্বিধা এবং সংশয়ও ছিল। প্রকাশ্যে উপবীত পরিত্যাগ করে তিনি যেমন চরম সামাজিক লাঞ্ছনা সহ্য করেছিলেন, তেমনি আবার গৃহিণীর খাতিরে বাড়িতে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতের পাচক রাখতে রাজী হননি। বড় মেয়ের বিয়ে তিনি সম্পূর্ণ জাত মেনেই দিয়েছিলেন। বন্ধু রামগোপাল ঘোষের বাড়ির আড্ডায় মদ্যপানের আসরে তিনি নিয়মিতই যোগ দিতেন, আবার সেখানে গুরুগম্ভীর আলোচনায়ও অংশ নিতেন, 'মধ্যে মধ্যে শেরী শ্যাম্পেন চলিত বটে কিন্তু সদগ্রন্থ পাঠ ও সৎপ্রসঙ্গেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত।' যত সহজে জীবনীকার এই দুটি দিককে মিলিয়ে দিয়েছেন, তত সহজে কিন্তু তা মেলানো যায় না। রামতনু সারা জীবন ধরেই এই দুটি দিককে মেলানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। তাই রামগোপালের বাড়িতে বসে একদিকে যেমন মদ্যপান করেছেন, তেমনি বন্ধুর এক নিকট আত্মীয়কে মদ খেয়ে বাড়াবাড়ি করতে দেখে অনুতপ্ত হয়ে বলেছেন, "রামগোপাল, আমাদের সুরাপান দেখিয়া বাড়ির ছেলেরা খারাপ হইয়া যাইতেছে। …এস আমরা সুরাপান পরিত্যাগ করি।" মনে হয় ইয়ং বেঙ্গলের অনেকের অনেক আচরণ সম্পর্কেই তাঁর এই ধরনের মনোভাব ছিল। এমন কি তাঁর উপবীত ত্যাগের ঘটনাটিও স্বতঃস্ফূর্ত বলে মনে হয় না। শিবনাথ শাস্ত্রী এ সম্পর্কে প্রচলিত দুটি কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। দুটি ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে মুখে নাস্তিকতার কথা বলে কাজের বেলায় পৈতে ঝুলিয়ে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে বসাটা যে ভণ্ডামি, সেটা অন্যরা তাঁকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তবে একথাও ঠিক যে, একবার উপবীত ত্যাগ করে প্রচণ্ড চাপের মুখেও তিনি পুনর্বার তা আর গ্রহণ করেননি। 'ফায়ারব্র্যাণ্ড' দক্ষিণারঞ্জন শেষ জীবনে অযোধ্যায় বাসকালীন 'টিকি রাখিয়া পরম হিন্দুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন।' রামগোপালের জীবনীকার সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে, শেষ বয়সে তিনি আবার হিন্দুধর্মের আচার-আচরণ মেনে চলতেন। তাঁর বাড়ির দালানে দোল, দুর্গোৎসব সবই হোত, কথকতা মহাভারত পাঠ এসবও বাদ যেত না। তাঁর মা এবং প্রথমা স্ত্রীর শ্রাদ্ধ তিনি সম্পূর্ণ হিন্দু মতেই করেছিলেন। গঙ্গাজলের পবিত্রতায় অবিশ্বাসী রসিককৃষ্ণ মল্লিক শেষ জীবনে মনে করতেন যে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করা মোটেই উচিত নয়।

উদাহরণের এখানেই শেষ নয়। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন প্রথম যৌবনে নাস্তিকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার অভিযোগে গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে তীব্র হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন। যে ডেভিড হেয়ারের সাহায্য ছাড়া তাঁর পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভই সম্ভবপর হোত না—সেই হেয়ারের স্মরণসভায় পর্যন্ত তিনি যাননি, কারণ হেয়ার নাকি ততটা হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না। অথচ রাজনারায়ণ বসুর একটি চিঠিতে জানা যায় যে, শেষ জীবনে এই কৃষ্ণমোহন নিজেকে 'ব্রাহ্মণ খ্রীস্টান' বলে মনে করতে আরম্ভ করে-

ছিলেন। গলায় খোল বেঁধে তিনি দেশীয় খ্রীস্টানদের সঙ্গে নগর সংকীর্তনে বেরোতেন এবং 'he made it a point not to marry his daughters except to Brahmin converts or to English Reverend gentlemen who are the Brahmins of their community'. কৃষ্ণমোহন সম্পর্কে এর চেয়েও মজার ঘটনার উল্লেখ রাজনারায়ণের উক্ত চিঠিতেই আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে বিদ্বজ্জন সমাগম-এর এক অনুষ্ঠানে তিনি রেভারেন্ড লালবিহারী দে-কে তাঁর হুঁকো দিতে চাননি। কারণ, একজন 'সোনার বেনে' কখনো একজন ব্রাহ্মণের হুঁকোয় মুখ দিতে পারে না। রামতনু লাহিড়ী অবশ্যই এ ধরনের 'বিদ্রোহী' ইয়ংবেঙ্গল ছিলেন না। তাঁর দ্বিধা ও সংশয় তিনি কখনো গোপন করেননি। পাণ্ডিত্যের অহমিকাও তাঁর ছিল না, অন্যের কাছে শিক্ষাগ্রহণে তাঁর সর্বদাই ছিল পরম আগ্রহ। কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাসের গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতেও তিনি রাজী ছিলেন না। নিজের হৃদয়ের নির্দেশে তিনি সর্বদা পরিচালিত হতেন এবং তাঁর অনুসন্ধানের একমাত্র বিষয় ছিল সত্য। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের অনেকেই ব্রাহ্ম ছিলেন, ব্রাহ্মধর্মের প্রবক্তাদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল, তাঁদের উদার মতাদর্শেও তিনি আস্থাশীল ছিলেন, কিন্তু নিজে কখনো দীক্ষিত ব্রাহ্ম হননি। তাঁর প্রাক্তন ছাত্র ক্ষেত্রমোহন সঠিকভাবেই লিখেছেন, 'রামতনুবাবু কোন প্রচলিত ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল এবং জীবনের প্রত্যেক কার্য তাঁহারই কার্য মনে করিয়া সম্পাদিত করিতেন। উপাসনার কোন নির্দিষ্ট স্থান অথবা সময় ছিল না।' শিবনাথ শাস্ত্রীর History of the Brahma Samaj গ্রন্থেও এই তথ্যের সরকারী স্বীকৃতি পাওয়া যাবে : 'He did not formally join any of the Samajas, as far as I know, but as early as 1856 he publicly discarded his sacred Brahminical Thread, the badge of caste and gave up idolatry, to be true to his convictions'.

রামতনুর জীবন সাধনার ক্ষেত্রে এই 'true to his convictions' কথাটি মূল্যবান। তিনি সর্বদা হৃদয়ের বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হতেন, সেখানে কোনো ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা চালিত হতে তিনি রাজী ছিলেন না। তাঁর সরাসরি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত না হবার অন্যতম কারণও বোধ হয় তাই। ব্রাহ্মরা বেদান্তধর্মে কতটা বিশ্বাসী সে সম্পর্কে তাঁর মনে গভীর সন্দেহ ছিল। রাজনারায়ণকে লেখা একটি চিঠিতে রামতনু তাঁর মনের এই সন্দেহের কথা প্রকাশ করেছিলেন, 'we should never preach doctrines as true in which we have no faith. Our desire should be to see truth triumph.' এই সত্যনিষ্ঠা এবং উদার মতাদর্শ রামতনুকে অন্যান্য অনেক ইয়ংবেঙ্গলের থেকে আলাদা করে রেখেছিল। ব্রাহ্মদের সঙ্গে সরকারী সম্পর্ক বজায় রাখাও এই কারণেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ব্রাহ্মদের

খ্রীস্টধর্মের নিন্দা বা সমালোচনাও তাঁর কাছে সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয়নি—'I feel that there is a spirit of hostility entertained by the society against christianity which is not creditable'. তাঁর মধ্যে যেমন কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না, তেমনি কেবল ভাঙ্গনের প্রবক্তাও তিনি ছিলেন না। মৌখিক বাদপ্রতিবাদেও তাঁর আগ্রহ ছিল কম। বন্ধুরাও তাঁর এই নীরব থাকার প্রবণতাটি যে লক্ষ্য করেছিলেন, রামগোপাল ঘোষের দিনলিপিতে তার প্রমাণ আছে। তাঁর বাড়িতে একদিন সন্ধ্যায় 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সেখানে 'Everybody spoke freely on the subject, with the exception of Tonoo who was silent'—এই মৌনের প্রাথমিক কারণ হয়তো রামতনুর স্বভাব-সুলভ বিনয়। তা ছাড়া তাঁর মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা সংকোচ লুকিয়ে থাকতো, 'তাহার স্বভাব এই ছিল যে তিনি অধিক কথা কহিতেন না, সর্বদা বিনয়ে মৌনী থাকিতেন, নিজের বয়স্যদিগকে অনেক বিষয়ে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন এবং সকলের মধ্যে মৌনী থাকিয়া তাঁহাদের কথোপকথনের মধ্যে যাহা ভাল লাগিত তাহাই গ্রহণ করিতেন।' তাঁর লক্ষ্যই ছিল যেন নিজেকে প্রস্তুত করা, বন্ধুদের সমকক্ষ হয়ে ওঠা।

রামতনুর ব্যক্তিগত জীবন তাঁর এই অন্তর্মুখিনতার জন্য কতটা দায়ী তাও আলোচনার বিষয়। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁকে পুরোপুরি 'সাধুপুরুষ' বানাতে গিয়ে এদিকটি সম্পূর্ণ উপেক্ষাই করে গেছেন। তবে এ সম্পর্কে রামগোপাল ঘোষের দিনপঞ্জীর কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করায় শিবনাথ আবার আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজনও বটেন। বন্ধুদের একদিনের আড্ডায় সকলেই যখন নিজেদের স্ত্রী সম্পর্কে সরব ও সরস আলোচনায় নিমগ্ন, তখন রামতনুই একমাত্র চুপ, 'Poor Ramtonoo appeared to be worried by his wife. But I should not indulge in writing the secrets of my friends in this book.' রামতনুর জীবনের এই 'secrets'-এর বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় না। তাঁর প্রথম স্ত্রী বিবাহের চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যেই মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় বিবাহও সুখের হয়নি। সম্ভবত, 'বিধর্মীদের' সঙ্গে রামতনুর যোগাযোগ থাকার অপরাধে শ্বশুরমশাই তাঁর কন্যাকে পতিগৃহে আর পাঠাননি। বাধ্য হয়েই রামতনুকে তৃতীয় বার বিবাহ করতে হয়। এই মানসিক অশান্তি এবং ব্যাপক পারিবারিক শোকই বোধ হয় তাঁকে অধিকাংশ সময় নীরব ও বিষণ্ণ করে রাখতো।

ইতিহাসের খাতিরে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করতেই হয়। ডিরোজিওর ওই শিষ্য কিন্তু গুরুর দেশপ্রেম এবং সমাজসচেতনতার উত্তরাধিকারী ছিলেন না। ইয়ংবেঙ্গল সম্ভবত স্বাদেশিকতার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিল ডিরোজিওর কাছ থেকেই। তিনি তাঁর স্বদেশ ভারতবর্ষের বন্দনা করে কবিতা লেখেন, To India, My

Native Land. ডিরোজিওর অন্যতম শিষ্য রামগোপাল ঘোষের Some Remarks on Black Act (1849) প্রকাশিত হলে ইউরোপীয়রা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে 'এগ্রি-হর্টিকালচার সোসাইটি' থেকে অপসারিত করে। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র অধিবেশনে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসননীতির তীব্র সমালোচনা করে ইংরেজদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। কিন্তু রামতনুর প্রকাশ্য বা পরোক্ষ ইংরেজ-বিরোধিতার কোনো নিদর্শন নেই। বরং অকারণ ইংরেজ ভজনার একটি উদাহরণ রয়েছে। রামতনু যখন বর্ধমানে শিক্ষকতা করতেন, তখন সেখানকার জেলাশাসক ছিলেন ই. ড্রুমণ্ড। রামতনুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। পরে ড্রুমণ্ড সাহেব উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহের লেফ্‌ট্যানান্ট গভর্নর হয়ে লক্ষ্ণৌ চলে যান। একই সময়ে রামতনুও লক্ষ্ণৌতে নীলকমল মিত্রের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। ড্রুমণ্ডের সঙ্গে দেখা করবার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সচিবকে কাকুতি মিনতি করে চিঠি লিখে তিনি সাক্ষাতের অনুমতি পান। কিন্তু লাটসাহেব পর্যন্ত পেঁাছোতে তাঁকে পদে পদে অসম্মানিত হতে হয়। এত অসম্মান সহ্য করে দেখা করার কোনো কারণই ছিল না, কেবল রামতনুর অবিচল রাজভক্তি প্রদর্শনই ছিল মূল উদ্দেশ্য। ঘটনাটি ঘটে ১৮৬৫ সালে। শিবনাথ শাস্ত্রী রামতনুর জীবনীতে এই ঘটনাটি বোধ হয় ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছেন।

আসলে এই সমস্ত দ্বিধা, সংশয় এবং স্ব-বিরোধিতা নিয়েই রামতনু লাহিড়ীরা নিজেদের গড়ে তুলেছিলেন। এই পটভূমিকা থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁদের বিচার করা যাবে না। এত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রামতনু উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের দৃষ্টিতেও হয়ে উঠেছিলেন, 'a truly pious and good man, a revered personage in educated Bengali Society' তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর সত্যনিষ্ঠ, নির্লোভ এবং উদারনৈতিক সত্তাটিই ইতিহাসে স্বীকৃতি পায়। ডিরোজিওর শিষ্যদের একদল একেবারেই পেছনে না তাকিয়ে দ্রুতবেগে সামনে এগিয়ে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। আর একদল ছিলেন এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে সাবধানে পা ফেলার পক্ষপাতী। পেছনের দিকে একেবারে না তাকানোটাও তাঁদের মনঃপূত ছিল না। রামতনু ছিলেন এই দ্বিতীয় দলের প্রতিনিধি। সামাজিক এবং রাজনৈতিক অন্যায় ও বৈষম্য যখন তাঁর সতীর্থদের ক্রমাগত ক্রুদ্ধ ও বিচলিত করে তোলে, তখন প্রশান্তচিত্ত স্থিতধী রামতনু যেন তাঁদের মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। 'সুরধনী' কাব্যে দীনবন্ধু মিত্র রামতনু সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'একদিন তাঁর কাছে করিলে যাপন / দশদিন থাকে ভাল দুর্বিনীত মন।' এটাই বোধ হয় রামতনু সম্পর্কে শেষ কথা।

□ বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

এক যুগস্রষ্টা ঃ রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ব আজ বিংশ শতাব্দীর অন্তিম পর্বে, একবিংশ শতাব্দীর দ্বারদেশে। এ শতাব্দী কর্মব্যস্ততার শতাব্দী, সমাজ-সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, শিক্ষায়, প্রযুক্তির ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ। অথচ এ সমৃদ্ধির সূচনাকাল মূলত ঊনবিংশ শতাব্দী। ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলার নবজাগরণের শতাব্দী। সেই সময়ে তাই সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজ-সংস্কারের কাজে স্ব-স্ব ক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন তদানীন্তন বহু ব্যক্তিত্ব। সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের পাশাপাশি সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন একদল তরুণ, যাঁরা 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে পরিচিত। এঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যুবক ডিরোজিও, যিনি ছিলেন তরুণদলের শিক্ষক ও গুরু। তাঁরই প্রেরণায় সেদিনের তরুণদল সংগঠিত হয়েছিলেন, এ দেশের গলিত ক্ষয়িত কুসংস্কারের প্রতিবাদে সোচ্চার হবার উদ্দেশ্যে। ইয়ংবেঙ্গলের এই সব তরুণদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর ইনিই ডিরোজিওর আদর্শ 'সত্যের বন্ধু ও মিথ্যার শত্রু'-কে অনুসরণ করে গুরুর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন ডিরোজিওর প্রখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। সেদিনের হিন্দুধর্মের কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণের মধ্য দিয়ে বঙ্গসমাজকে নবজীবন লাভে সাহায্য করেছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অবস্থার যে চিত্র পাওয়া যায়, তা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, এ শতকে বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই আলোড়নের সূত্র ধরেই বাঙ্গালী সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে—রক্ষণশীল, মধ্যপন্থী এবং সংস্কারবাদী নব্য-তরুণদলে। এই তিন দলের প্রভাবই এ শতাব্দীতে বেশ ভালোভাবেই পড়েছিল। 'ইয়ংবেঙ্গল' হল সংস্কারবাদী নব্য তরুণদল। সমগ্র সমাজে এঁরা একটা বিপুল আলোড়ন এনেছিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তিত্বই তাঁদের জীবনের মূল্যবান সময় অতিবাহিত করেছেন সমাজের সংস্কারমূলক কাজে। ইয়ংবেঙ্গলের অন্যতম নায়ক ডিরোজিওর প্রিয় শিষ্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে, নানান কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন সোচ্চার কণ্ঠে। এমন কি এর জন্য তাঁকে ধর্মত্যাগ, গৃহত্যাগ করতেও হয়েছে। তবুও সেই মহান ব্যক্তিত্ব অবিচলিত থেকেছেন তাঁর কর্মধারায়। সমাজ-সংস্কারের এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা আজ অত্যন্ত প্রয়োজন।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের সময়কাল ১৮১৩—১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ। সময়ের স্বাভাবিক নিয়মেই শৈশব, কৈশোর, অতিবাহিত করে তিনি প্রবেশ করেছেন কর্মজীবনে। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মজীবনের সূচনা হয় মূলত হিন্দু কলেজে থাকাকালীন শিক্ষক ডিরোজিওর সংস্পর্শে আসবার পর থেকে, অর্থাৎ ইয়ংবেঙ্গলের শুরুর সময়েই।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় প্রহরে হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষক ডিরোজিও নবযুগের বাংলার সামাজিক আদর্শের ভিত গড়বার জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সঙ্গে নিয়েছিলেন কয়েকজন বাঙ্গালী যুবককে। এ সময়ে বাংলার সমাজে এক আলোড়নের সঞ্চার করেছিলেন তরুণ ডিরোজিয়ানরা। লোকচৈতন্যের মূল পর্যন্ত সজোরে নাড়া দেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন তাঁরা নির্ভয়ে। কিন্তু বহুকালের নিদ্রাচ্ছন্ন মগ্নচৈতন্য মানুষ সেই ঝাঁকুনির ফলে কতটা চৈতন্যলাভ করেছিল তা ঠিক বলা যায় না। তবে সমাজতরীর ভরাডুবির আশঙ্কায় স্থিতস্বার্থ প্রাজ্ঞ ও প্রবীণেরা সেদিন যে শঙ্কিত শোরগোলের সৃষ্টি করেছিলেন তা সত্যিই অভাবনীয়। তাঁদের হল্লা শুনে মনে হয়েছিল সমাজে এমন একদল হঠকারীর আবির্ভাব হয়েছে, যাঁদের কাণ্ডজ্ঞানহীন অনৈতিক উৎপাতে দেশের ঐতিহ্যবন্ধন একেবারে ছিন্ন হয়ে যাবে। নীতিবোধ, ধর্মবোধ, আস্থা-ভক্তি ইত্যাদির অস্তিত্ব পর্যন্ত থাকবে না। কিন্তু নবযুগের তরুণদল প্রবীণদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে দৃঢ় পদে অগ্রসর হয়েছিলেন সত্যাসত্য নির্ণয়ের সংগ্রামে। ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাত করে ডিরোজিয়ানরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন বাংলার সমাজকে সজাগ ও স্বনির্ভর করার ঐতিহাসিক গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন। প্রবীণ-নবীনের দ্বন্দ্বও তাই নির্দয়রূপ ধারণ করেছিল সেদিন। একদিকে সংরক্ষণের সংশয়, ভয়জড়িত আর্তনাদ, অন্য দিকে ভাঙ্গনের নিঃশঙ্ক কোলাহল, এই দুয়ের এক বিচিত্র ঐকতান রচিত হয়েছিল 'ইয়ংবেঙ্গল'-এর যুগে। আর ডিরোজিও ছিলেন এই ঐকতানের প্রধান নায়ক।

ডিরোজিওর সাহায্যেই হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্ররা বেকন, লক, বার্কলে, হিউম, রীড, স্টুয়ার্ট প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। এই পরিচিতির ফলে এইসব ছাত্রের গতানুগতিক চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক আলোড়নের সূত্রপাত হতে থাকে। প্রত্যেক বিষয়ে তাঁরা প্রশ্ন ও তর্ক করতে শুরু করলেন। এর ফলে তাঁদের মধ্যে বদ্ধমূল বহুপ্রচলিত ধারণার মূল নড়ে ওঠে। দীর্ঘ-কালের পুঞ্জীভূত সমস্ত অচল অবস্থার স্তম্ভ টলমল করে ওঠে। স্বাধীন মতামত প্রকাশের পক্ষে ক্লাসরুম যথেষ্ট নয় মনে করেই এই তরুণদল মানিকতলার শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়ির একটি ঘরে নিয়মিত বৈঠক বসাবার কাজ শুরু করেন। এই সভার নাম 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'—সময়টা ছিল ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দ। ১৮২৮ থেকে ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের' খ্যাতি ও প্রভাব বাইরে বেশ ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। বাগানবাড়ির নিভৃত গৃহকোণ থেকে বাইরের বৃহত্তর সমাজের মুক্ত প্রাঙ্গণে রীতিমতো শোরগোল তুলে দিয়েছিল তরুণ ছাত্রদের এই বিদ্বৎসভা।

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে লিখেছেন—

"In this grove of Academics, and the debating society had a garden attached to it, it being held on premises none occupied by the Word's Institution, did the choice spirit of young Calcutta hold forth, week after week, on the social, moral and religious questions of the day. The general tone of the discussions was a decided revolt against existing religious institutions......the young lions of the Academy roared out, week after week—Down, with Hinduism! Down with Orthodoxy......"

অর্থাৎ বাংলার তরুণদের কণ্ঠ সোচ্চার হয়েছিল সমাজের বিভিন্ন গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, বিচারবুদ্ধিহীন শাস্ত্রবচনের বিরুদ্ধে, প্রাণহীন চিরাচরিত আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে, জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ও মানসিক জড়ত্বের বিরুদ্ধে, নির্বিকার নিয়তিবাদের বিরুদ্ধে, এমনকি দেবতাবাদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধেও।

ডিরোজিও ছিলেন সভার সভাপতি, সম্পাদক ছিলেন উমাচরণ বসু। সদস্য ও বক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছাত্ররা।

তরুণদের কণ্ঠ যখন সোচ্চার, ঠিক তখনই ১৮২৯-এর ৪ ডিসেম্বর বহু প্রচেষ্টার পর উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা আইনত নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। এর ফলে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ প্রচণ্ড বিক্ষোভে সমাজের পাঁজর কাঁপিয়ে তোলেন। সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলনের উদ্দেশ্যে ১৮৩০-এর ২৭ জানুয়ারী এই বিক্ষুব্ধ সমাজপতিরা ধর্মসভা স্থাপন করেন—ধর্মধ্বজীরা ধর্ম গেল, জাত গেল চিৎকারে কলকাতার আকাশ বিদীর্ণ করে তোলেন।

এই একই সময়ে পাদ্রী আলেকজান্ডার ডাফ খ্রীস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় এলেন। তাঁর নজর ছিল নব্য তরুণদলের ওপর, এদের সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণেও তিনি পিছপা হননি।

একদিকে বেন্টিঙ্কের সতীদাহ নিবারণ আইন, আর একদিকে ডাফের খ্রীস্টধর্ম প্রচারাভিযান—দুয়ের আঘাতের প্রচণ্ড সামাজিক প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়েছিল এই তরুণদলকে। ফলস্বরূপ তরুণদলের শিক্ষক ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে পদত্যাগ করতে একরকম বাধ্য করা হল।

এরপর ডিরোজিও তাঁর প্রিয় ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করলেন, ছাত্রেরাও এরই মধ্যে হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করেছেন। ছাত্রদের মধ্যে অগ্রগণ্য কৃষ্ণমোহন ছিলেন,

"*the readiest and most effective speaker, uneffected in manner,* **calm and unimpassioned, though sometimes bursting forth in** vehemence".

গুরুর কাছে সমবেত হলেন শিষ্যরা। বিদ্বৎসভার আবেষ্টনীর মধ্যে বাকযুদ্ধ নয়, তরবারির চেয়েও শত গুন শক্তিশালী লেখনীধারণ করে প্রকাশ্য জনসমাজে অন্ধ গোঁড়ামি ও জ্ঞানহীনতার বিরুদ্ধে নির্ভীক সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। আঠারো বছরের তরুণ কৃষ্ণমোহনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল ইংরেজী পত্রিকা 'দি এনকোয়েরার' (১৮৩১ খ্রীস্টাব্দ)। 'এনকোয়েরার' পত্রিকার উদ্দেশ্য ঘোষণা করে প্রথম সংখ্যায় কৃষ্ণমোহন লেখেন, 'Having thus lunched our bark under the denomination of Enquirer, we set sail in quest of truth and happiness.'

প্রতিপক্ষও থেমে থাকেনি, তাই 'সংবাদ প্রভাকর', 'সমাচার-দর্পণ', 'সমাচার-চন্দ্রিকা' প্রভৃতি পত্রিকায় তরুণদের বিদ্রূপ করে বিভিন্ন লেখা প্রকাশিত হতে লাগল।

এত সমালোচনার ঘন ঘন কামান গর্জনে বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন তরুণের দল। ১৮৩১-এ জুলাই মাসে কৃষ্ণমোহন তাঁর 'এনকোয়েরারে' লিখলেন—

'The range of persecution is still vehement. The bigots are up with their thunders of fulmination. The heat of the Gurum-Shabha is violent, and they know not what why they are doing. Excommunication is the cry of the fanatic. We hope perseverence will be liberal's answer. The Gurum Shabha is high ; let it ascend to the boiling point. The orthodox are in a range ; let them burst forth into a flame......'

'এনকোয়েরার' পত্রিকায় এইভাবে আবেগপূর্ণ ভাষায় কৃষ্ণমোহন তরুণদের উৎসাহিত করেছিলেন। প্রতি সপ্তাহে পত্রিকার পৃষ্ঠায় তাঁর কলম দিয়ে অনর্গল বিদ্রোহের অগ্নিবর্ষণ হচ্ছিলো। বিদ্রোহী তরুণদের নেতা হয়ে উঠেছিলেন কৃষ্ণমোহন। তাঁর গৃহে তরুণদের সভা বসতো। নানান বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলতো, পাশাপাশি সংগ্রামের কৌশল এবং পথও ঠিক করা হোত অবস্থা বুঝে। কারণ তরুণরা তাঁদের শিক্ষক ডিরোজিওর পদচ্যুতির অপমান কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। কৃষ্ণমোহনের গৃহে মিলিত হয়ে তাঁরা এই অন্যায়ের প্রতিকার সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করতেন—'জ্ঞানান্বেষণ' (দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত পত্রিকা) এবং 'এনকোয়েরার' পত্রিকাতে তাঁরা তাঁদের আলোচনার ফলাফল প্রকাশ করতেন।

এ সময়ে একদিন একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটে যাওয়ায় কৃষ্ণমোহনকে পৈত্রিক বাড়ি ত্যাগ করতে বাধ্য করা হল। দিনটি ১৮৩১-এর ২৩ আগস্ট। কৃষ্ণমোহনের অনুপস্থিতিতে

তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা তাঁর বাড়ির বৈঠকখানায় বসে হিন্দুদের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গরম গরম কথাবার্তা বলছিলেন। ক্রমশ তাঁরা উত্তেজিত ও উল্লসিত হয়ে ওঠেন। উত্তেজনার বশে তাঁরা মেছুয়াবাজারের এক দোকান থেকে রুটি ও গোমাংস নিয়ে এসে বাড়িতেই ভক্ষণ করতে আরম্ভ করেন। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না, ভক্ষণ শেষ হলে তাঁরা মাংসের হাড়গুলি উল্লাসধ্বনি দিতে দিতে পাশের চক্রবর্তীদের বাড়ির ভেতরে নিক্ষেপ করতে থাকেন। ছেলেদের এরকম কীর্তিকলাপে কৃষ্ণমোহনের বাড়ির লোকেরা অত্যন্ত ক্ষেপে যান এবং ফলস্বরূপ কৃষ্ণমোহনকে বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য করেন। কৃষ্ণমোহন সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করলেও কোনো ফল হল না। বরং তাঁকে নানান বিপদের মধ্যে পড়তে হল।

গৃহত্যাগের অল্প দিনের মধ্যেই ১৮৩১-এর নভেম্বর মাসে কৃষ্ণমোহন 'The Persecuted' নামে একখানা পঞ্চাঙ্ক নাটক লিখে প্রকাশ করেন। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ, গুরু-পুরোহিত এবং তথাকথিত পণ্ডিতদের দৌরাত্ম্য ও ভণ্ডামি এবং নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের দুর্নীতি, ব্যভিচার প্রভৃতিতে আসক্তির বিষয় এই নাটকে বর্ণিত হয়। পুস্তকটি তদানীন্তন বিভিন্ন সংবাদপত্রের আলোচনায় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে।

যদিও পরবর্তী সময়ে তিনি খ্রীস্টীয় ধর্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে কোনো রকমের গোঁড়ামি, অন্ধ কুসংস্কার তাঁকে স্পর্শ করেনি কখনো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একবার তিনি কয়েকজন খ্রীস্টান বন্ধুর সঙ্গে সমুদ্রপারে ভ্রমণ করবার সময়ে সমুদ্রের আবহাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। এতে তিনি খুব ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর খ্রীস্টান অফিসার বন্ধু মনে সাহস জোগাবার জন্য তাঁকে একটি ধর্মগ্রন্থ দিয়ে সেটি পড়বার জন্য অনুরোধ করে বললেন, এই ধর্মগ্রন্থটি পড়লে মনে শান্তি আসবে। এ কথার উত্তরে সেদিন কৃষ্ণমোহন বলেছিলেন, 'Not a few laymen of the Episcopal Church had stepped forward to lead me on, under God, to the truth'— কৃষ্ণমোহনের এই উক্তির কোনো জবাব সেই খ্রীস্টান অফিসার দিতে পারেন নি।

প্রগতিশীল সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে কৃষ্ণমোহন সমাজকে চেতনার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর লেখনীই তাঁর পরিচয়। 'এনকোয়েরার' পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর শুরু হয়। এছাড়া তাঁর সম্পাদনায় 'হিন্দু ইউথ' (১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে প্রকাশিত), সংবাদ সুধাংশু (১৮৫০ এর ৭ সেপ্টেম্বর), 'গভর্ণমেন্ট গেজেট' প্রভৃতি পত্রিকায় সতীদাহ প্রথা, ব্রাহ্মণ্য কৌলীন্য, হিন্দুজাতির শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, সাহিত্য, স্বাদেশিকতা, ইতিহাসে জনগণের ভূমিকা সম্পর্কে যুক্তিনিষ্ঠ বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রভৃতি নানান বিষয়ের ওপর বহু প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন, যা তাঁর প্রগতিশীল মনেরই অভিব্যক্তি। খ্রীস্টধর্ম

গ্রহণ করলেও স্বাজাত্যবোধ তাঁর ছিল, সব রকমের ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারকে তিনি আঘাত করেছিলেন দৃঢ়ভাবেই। তাঁর লেখনীই তদানীন্তন ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন। এগুলির মধ্যে কয়েকটি ধর্মবিষয়ক। কিন্তু হিন্দু দর্শনের ওপর লেখা Dialogues on the Hindu Philosophy (১৯৬৭), প্রশ্ন চতুষ্টয় (১৮৪৭), বিদ্যাকল্পদ্রুম (১৩ খণ্ড) (১৮৪৬-১৮৫১) বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ।

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনী ধরতে গিয়ে কৃষ্ণমোহন বলেছেন,

'The bigots are violent because we obey not the call of superstition, our conscience is satisfied, we are right, we must preserve in our carrier.'

এদেশে ব্যাপক শিক্ষা প্রসারে তাঁর অদম্য ইচ্ছাও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লেখনীতে,

'If Mohammad can not go to mountain, mountain must go to Mohammad. If children can not go to education, education must go to children.'

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ের ওপর ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে তাঁর 'A Prize Essay on Native Female Education'—প্রবন্ধটি প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বিজয়ীর পুরস্কার পায়। ১৮৪৯-এ ডেভিড হেয়ারের স্মৃতি বার্ষিকীতে তিনি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বলেন :

'Are we to hear in 1849 objections which were so ably refuted as early as 1824 [?] by the President of the Dhurm Shabha himself ? Has the progress of opinion in our community been in the wrong direction for the last quarter of a century ? ...

The successful essay now before us proves what the Rajah Radhakanta had demonstrated long before ; that female education was not uncommon in India in the days of Yore and that the present state of things is one of degeneracy from the former.'

খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণের পর খ্রীস্টধর্ম প্রচারকার্যে সর্বদা ব্যস্ত থাকলেও কৃষ্ণমোহন শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতির নানান বিষয়ের আলোচনা এবং কর্মকাণ্ডেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৮৩৪-৩৫ খ্রীস্টাব্দে শিক্ষার বাহন বিষয়ের ওপর বিতর্কে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এ সম্পর্কে ডক্টর টাইটলারের সঙ্গে তাঁর ঘোরতর বাদ-

প্রতিবাদ হয়। এই বিতর্কে কৃষ্ণমোহনের বক্তব্যের মূল সুর ছিল—'বাংলা একদিন শিক্ষার বাহন হইবে।'

কৃষ্ণমোহন সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করবার পক্ষপাতী ছিলেন, সেই কারণে ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ২৩ মে, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিত সভার প্রথম অধিবেশনে ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করা হয় তার উদ্যোক্তা এবং প্রবন্ধ-পাঠক ছিলেন তিনিই।

বেথুন সোসাইটিতে যুক্ত থাকাকালীন তিনি নানান বিষয়ের ওপর বক্তব্য রেখেছিলেন। দেশীয় সাহিত্য বিষয়ে কৃষ্ণমোহনের অভিমত উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

'Academic education for native must for years to come, comprise both English and oriental literature; the one for introducing, the other for naturalising the enlightenment of Europe in Asia.'

'It should not be exclusively English, must have Sanskrit or Arabic by its side for even the subtleties of which the late Ram Mohan Ray spoke are worth our study with a view to arrive at an accurate knowledge of the mind of our ancestors. The Sanskrit language and Grammer have also an intrinsic value in a Philological point of view and throw much light on the origin of the human species and human language. The purity of the vernacular again depends in a great measure on the proper cultivation of Sanskrit. No scheme of education would be of much value that excludes the oriental elements from its higher offices.'

—The Proceedings and Transaction of the Bethune Society from Nov. 10th 1859 to April 20th 1869: The proper Place of Oriental Literature in Indian Collegiate Education.

অর্ধ শতাব্দীর এই কর্মমুখর মহান জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ১১ মে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কৃষ্ণমোহন সমাজ সংস্কারের, সাহিত্য কর্মের পাশাপাশি নানান কর্মকাণ্ডে যুক্ত রেখেছেন নিজেকে। দেড়শ বছর পূর্বে বাংলার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষজনকে গাঢ় অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আলোর পথে নিয়ে যাবার দিশারী এই মহান ব্যক্তিত্বের সমস্ত দিক তুলে ধরা স্বল্প পরিসরে কোনোমতেই সম্ভব নয়। কিন্তু পর্যায়ক্রমে স্বল্প আলোচনার ফলে এ-কথাটা স্পষ্ট হতে পেরেছে যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, অশিক্ষার অন্ধকারে

নিমজ্জিত, ধর্মান্ধ সমাজকে মুক্ত করার কাজে ব্রতী ডিরোজিওর এই প্রিয় ছাত্র যে যে ভূমিকা নিয়েছেন তা কি একজন শ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারকের ভূমিকা নয়? জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে স্ব-লেখনী এবং বক্তব্যের দ্বারা বাংলার সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি স্মরণীয় হবার দাবী রাখেন। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন আমাদের নবজাগৃতির কালের এক মহৎ সন্তান। আজ তাই বিংশ শতাব্দীর মানুষজন তাঁর কাছে ঋণী একথা স্বীকার করতে বোধ হয় দ্বিধাবোধ করবে না।

□ কৃষ্ণকলি বিশ্বাস

"He was a link of union between European and Native Society which will be regretted now as a "missing link" by both those communities. No one was more fitted for the highest position open to native ambition than he was, and yet despising worldly ambition and indifferent to self-interest he adhered to the interests of his country and laboured indefatigably for those interests."

প্যারীচাঁদ মিত্রের মহৎ কর্মময় জীবনের অবসানের পর রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই উক্তি করেছিলেন। নতুন চিন্তা, যুক্তিবিদ্যা আর আধুনিক বিশ্ব সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক সচেতনতার ক্ষেত্রে বিগত শতাব্দীতে বাংলাদেশের স্থান ছিল সারা দেশের মধ্যে সর্বাধিক অগ্রগণ্য। প্রায় সমগ্র অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে এই বঙ্গভূমিতে জন্মেছিলেন অসংখ্য বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, বরেণ্য মানুষ। উজ্জ্বল কর্মসাধনায় তাঁরা নিজেদের মহিমান্বিত করেছেন, স্বদেশ ও সময়কে করেছেন গৌরবান্বিত। এই কালে নিহিত হয়ে আছে আমাদের বিপুল ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। নানামুখী সামাজিক, ধর্মীয়, সাহিত্যগত মূল্যবোধ এবং আদর্শগত ও রাজনৈতিক কর্মপ্রবাহের বিপুল সমৃদ্ধি আমাদের পরবর্তী কালের ইতিহাসের ভিত্তিভূমিকে রচনা করেছে। এই সময়ের যাঁরা বরণীয় মানুষ, আলো আঁধারির মতো তাঁদের চরিত্রের বিচিত্র সংশয়, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, অতীত ও ভবিষ্যতের টানাপোড়েনের বিহ্বলতা ইতিহাসগতভাবেই আমরা লক্ষ্য করেছি।

মহাত্মা রামমোহন নানা দেশ পরিক্রমার পর স্থায়ীভাবে কলকাতায় এসে বাস করতে শুরু করেছিলেন ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে। তার এক বছর আগে ১৮১৪ সালে (২২ জুলাই) কলকাতার নিমতলাঘাট স্ট্রীটে প্যারীচাঁদের জন্ম। বঙ্গ সংস্কৃতির ইতিহাস, সমাজ-সংস্কার আর যুক্তিভিত্তিক চিন্তার স্ফুরণ ও প্রসারের গতিময়তায় বিগত শতাব্দীর শুরুর দিকের বছরগুলি গভীর তাৎপর্যবাহী। পূর্বসূরীদের মধ্যে রামমোহন, রামতনু লাহিড়ী, ডেভিড হেয়ার, দ্বারকানাথ ঠাকুরের কর্মজীবন এই কাল জুড়েই। এই সময়েই জন্ম ডিরোজিও-র, আর তাঁরই আশ্চর্য বীক্ষণের আলোয় উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলেন

নব্যচিন্তার কিছু উজ্জ্বল যুবক। তাঁরা ইয়ংবেঙ্গল, তাঁরাই ডিরোজিও-পন্থী। এই সময়কালের মধ্যেই বঙ্গীয় চিন্তা চেতনা ও জ্ঞানচর্চার জগতে ঘটে গিয়েছিল অনেকগুলি তাৎপর্যবাহী ঘটনা।

রামমোহনই তার পথিকৃৎ। উদারনীতিবাদী আত্মীয়সভা স্থাপনের মধ্য দিয়ে এই নবযুগের পথে যাত্রা শুরু। পুরনো কালের যুক্তিহীন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রথম রুখে দাঁড়ালেন তিনি। অনুবাদ করলেন বেদান্ত আর কয়েকটি উপনিষদ। নতুন হাওয়া উঠল, সূচিত হল ঝড়ের ইঙ্গিত, প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে চলতে থাকে তুমুল বিতর্ক। যুগ যুগ-সঞ্চিত কুশ্রীতাকে, সমস্ত অশুভ শক্তিকে অন্ধকারেই বাঁচিয়ে রাখতে চাইছিল গোঁড়া ব্রাহ্মণ সমাজ আর সমাজপতিরা। মূর্তিপূজা, পুরোহিততন্ত্র আর নির্বিচার দাসত্ব থেকে বেরিয়ে দাঁড়াতে হবে যুক্তির জমির ওপর -- এই স্বপ্নময় উজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষার বীজ এই সময়েই দেশের মাটিতে রোপিত হয়ে যায়। ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৮ সালে, আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে অমানবিক সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে। ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিংক যখন এই অমানবিক প্রথাকে নিষিদ্ধ করেন প্যারীচাঁদের বয়স তখন ১৫ বছর। প্রকৃতপক্ষে রামমোহন, ডেভিড হেয়ার, বেথুন প্রমুখের জীবন ও কর্ম এবং ডিরোজিও-র প্রত্যক্ষ প্রভাব পরবর্তী দশকগুলিতে কয়েকজন যুবকের নতুন কালের উপযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠার খানিকটা বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। শিক্ষাসংস্কার, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা, ডাফের কর্মোদ্যোগ, শিল্পনীতি প্রণয়নের ব্যাপারে লর্ড আমহার্স্টের সঙ্গে রামমোহনের মত বিনিময় আর বাংলা নতুন গদ্যের প্রবর্তন - সবই রামমোহনের সমসাময়িক ঘটনাবলী। এরই মধ্য দিয়ে নতুন কালের উন্মেষাভাস। ১৮০১ সালে উইলিয়াম কেরী যুক্ত হয়েছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সঙ্গে। তাঁরা বাংলাভাষা ও গদ্যচর্চার কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। ১৮১৫ থেকে এই দায়িত্ব নেন রামমোহন। জাতীয় চেতনা ও সংস্কারমুক্তির জন্য তাঁর সংগ্রাম আমাদের অবিনশ্বর ঐতিহ্য। সংবিধানগত প্রশ্নও প্রথম আলোচিত হয়েছিল তাঁর সময়েই। আন্তর্জাতিকতা-বোধ সম্পর্কে সচেতনতা জাগছিল। নারী শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের জন্য রামমোহনের সঙ্গে কেরী, ডেভিড হেয়ার, বেথুন, ডাফ, ডিরোজিও, রামতনু, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহনরা তো ছিলেনই, তাছাড়াও শহর ও মফঃস্বল জুড়ে নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তারিণীচরণ মিত্র, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, হট্টু বিদ্যালঙ্কার (রূপমঞ্জরী), রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল শীল, জন মার্শম্যান, নীলমণি বসাক প্রমুখ বিশিষ্টজন।

রামতনু লাহিড়ী তাঁর চেয়ে এক বছরের ছোট প্যারীচাঁদকে বলেছিলেন 'নব্যযুগের অন্যতম নেতা'। অনুজপ্রতিম প্যারীচাঁদের বহুমুখী প্রতিভাকে সমকালে দাঁড়িয়েও তাঁর চিনতে ভুল হয়নি। পাশ্চাত্য দেশগুলির শিক্ষার আলো, তাদের উন্নত জীবনাদর্শ আর মুক্ত চেতনার কিছুটা সান্নিধ্য, আরো অনেকের মতো প্যারীচাঁদকেও উদ্বুদ্ধ

করেছিল মধ্যযুগের বাঙ্গালীকে কয়েক শতাব্দীর সুপ্তি থেকে হাত ধরে টেনে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করার ব্যাপারে। পৃথিবীর ব্যাপ্তি আর নিজেদের নতুন পরিচয় একটু একটু করে সেই যুগে মানুষের সামনে উদ্ভাসিত হচ্ছিল। ছোট আকারের শিল্প-কারখানা, প্রায় অসংগঠিত কিন্তু নতুনকালের শ্রমজীবী মানুষের জন্ম হচ্ছিল—রেলপথের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রপার থেকে কার্ল মার্কস বুঝেছিলেন পুরনো ভারতবর্ষ ভেঙ্গে যাওয়ার ক্রান্তি মুহূর্ত এসে যাচ্ছে। জন্মের প্রায় ৫০ বছর আগে থেকে এবং সমকাল জুড়ে তিলে তিলে প্রস্তুত হয়ে ওঠা একটি সামাজিক প্রেক্ষাপটের ওপরেই প্যারীচাঁদের জন্ম ও কর্মজীবন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সময়ের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বৈপরীত্য, নতুন ও পুরাতনের অন্তহীন টানাপোড়েনের মধ্যেই প্যারীচাঁদের গুরুত্বটি অনুধাবন করতে হবে আমাদের। মিল, বেনথাম, স্পেনসারের আধুনিকতার পাশাপাশি আমাদের সমাজের বোধের সঙ্গে মিশেছিল দাশু রায়ের পাঁচালি, যাত্রা বা খেউড়। শেক্সপীয়ার বায়রন মিলটনকে এঁরা অধ্যবসায় আর জ্ঞানতৃষ্ণায় চিনেছিলেন আর নিজের চার পাশে তাকালে দেখতে পাচ্ছিলেন একদিকে বৈভবের বাগানবাড়ি, উৎকট-উল্লাস, ভোগ-বিলাস, বুলবুলির লড়াই—অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজ আর দক্ষিণেশ্বর। এই বিচিত্র বৈষম্য আর অসঙ্গতি গভীরভাবে ছায়াপাত ঘটিয়েছিল প্যারীচাঁদের কর্মমুখর জীবনে।

হিন্দু কলেজের ছাত্র, প্রথম সারির ডিরোজিয়ান, স্ত্রী শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষার একনিষ্ঠ উৎসাহী শিক্ষক-প্রচারক, মূলত জনহিতার্থে সাহিত্যসাধক, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, যুক্তিবাদের উদ্যমী পুরুষ, মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনের সংগঠক এবং কৃষিবিদ্যা প্রসার সম্পর্কে উৎসাহী প্যারীচাঁদ একই সঙ্গে মূর্তির উপাসক, একেশ্বর-বাদী, Theosophical Society-র অগ্রণী প্রতিষ্ঠাতা এবং যোগসাধক। সমস্ত কিছুরই গভীরতায় প্রবেশ করা এবং সব কিছুকেই তন্ন তন্ন করে জানার ইচ্ছা প্যারীচাঁদের চরিত্রের একটা আশ্চর্য দিক এবং নিঃসন্দেহে এটিও রেনেশাঁস যুগের অন্যতম প্রধান চারিত্র্য লক্ষণ।

১৮২৭ সালে হিন্দু কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র হিসাবে যোগ দেওয়ার পর প্যারীচাঁদ যখন ডিরোজিওর সান্নিধ্যে আসেন তখন তাঁর বয়স ১৩ বছর। অন্য অনেকের মতো তিনিও ছাত্রজীবনেই কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে নিজের বাড়িতে (বেনেভোলেন্ট ইনস্‌টিটিউশন) জনশিক্ষা প্রসারের জন্য অবৈতনিক স্কুল খুলেছিলেন। সেখানে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছেন তাঁর শিক্ষাগুরু ডিরোজিও আর জাতির শিক্ষক মহাত্মা ডেভিড হেয়ার।

কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর 'On the Progress of Education in Bengali' গ্রন্থে অগ্রজের এই ভূমিকার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। শতাব্দীব্যাপী নিদ্রা থেকে এই

পশ্চাদপদ জনসমাজকে ডেকে তোলবার জন্য রুদ্ধ দুয়ারের মধ্যে নবশিক্ষার আলোক-সিঞ্চন করার কোনো বিকল্প নেই—সারাজীবন ধরে প্যারীচাঁদ এই সত্যকে মনে রেখেছেন। একদিন যে বাংলা গদ্যের জন্ম হয়েছিল নিতান্তই প্রয়োজনের তাগিদে, তা কয়েকজন মানুষের সাধনা ও চর্চায় যুগের রূপান্তর ঘটাতে এবং অনড় জড়ত্বের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে অন্য অনেক দেশের মতো এখানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বাংলা গদ্য বঙ্গদেশে নবযুগের উজ্জীবন মন্ত্র হিসাবে কাজ করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা গদ্য যে দৃঢ়তা অর্জন করেছিল, সেখানে প্যারীচাঁদের আলালের ঘরের দুলালের একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে (টেকচাঁদ ঠাকুর নামে লেখা)। নিজেদের পত্রিকায় (মাসিক) ১৮৫৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী থেকে জুন ১৮৫৭ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এই গ্রন্থের ২০টি অধ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৫৮ সালে আরো তিনটি অধ্যায় যুক্ত করে রোজারিও কোম্পানী থেকে এ বই প্রকাশিত হয়েছিল। নিছক সাহিত্য রসের প্রতি প্যারীচাঁদ আকৃষ্ট ছিলেন না। তাঁর Art কোনো সময়েই 'for art's sake' ছিল না। মানুষের চারিত্রিক উন্নতি বিধানই ছিল মুখ্য। প্রচারধর্মিতায় কুণ্ঠিত নন প্যারীচাঁদ। এই উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি বলেছেন: It chiefly treats of the pernicious effects of allowing children to be improperly brought up, with remarks on the existing seytem of education, on self-formation and religious culture and partly of the state of things in the Moffussil'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লণ্ডন থেকে প্রকাশিত Journal of the National Indian Association পত্রিকায় (১৮৬৫-৬৬) আলাল 'The Spoilt Child', নামে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদ করেছিলেন প্যারীচাঁদ নিজেই। ১৮৯৩ সালে এর আর একটি অনুবাদও বেরিয়েছিল।

এই একটিমাত্র গ্রন্থের জন্যই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সমাচার দর্পণে প্রকাশিত বাবুর উপাখ্যান (১৮২১), ভবানীচরণের নববাবুবিলাস (১৮২৫), নববিবিবিলাস বা দূতীবিলাস গ্রন্থগুলিকে অনেকে আলালের পূর্বসূরী বলতে চেয়েছেন, কিন্তু এ-সবে যা ছিল তা শুধুই রঙ্গকৌতুক—এগুলি কোনো সময়েই আখ্যানের রূপ পায়নি। প্যারীচাঁদের মধ্যম পুত্র চুণিলালও 'কলকাতার নুকোচুরি' নামে একটি বই লিখেছিলেন। গত শতকের প্রথম থেকে প্রায় ৭০/৮০ বছর পর্যন্ত সামাজিক অনৈতিকতা, লাম্পট্য, মদ্যপান, স্বেচ্ছাচারী বোহেমিয়া-নিজম, অপকর্ম, নীতিভ্রষ্টতা গোঁড়া হিন্দুয়ানি প্রভৃতিকে ব্যঙ্গ করে লেখা এইসব স্যাটায়ারধর্মী আখ্যান রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমাজসংস্কার, চারিত্রিক উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটানো।

প্যারীচাঁদের সাহিত্য সাধনার যে দুটি রীতির কথা সমালোচকরা উল্লেখ করেছেন,

তা সামাজিক কারণেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কৌতুকাশ্রয়ী লেখাগুলির পাশাপাশি গম্ভীর ধরনের প্রয়োজনভিত্তিক প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা—সব কিছুরই লক্ষ্য ছিল মানুষ ও সমাজ। 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকায় কি উপায়' (১৮৫৯), মুখ্যত মহিলা-পাঠ্য 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০), কৃষিবিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১), ব্রহ্মসংগীত সংকলন 'গীতাংকুর' (১৮৬১), যৎকিঞ্চিত (১৮৬৫), 'অভেদী' (১৮৭১), ডেভিড হেয়ার-এর 'জীবনচরিত' (১৮৭৮), 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদের পূর্ববস্থা' (১৮৭৯), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০), 'বামাতোষিণী' (১৮৮১)। 'A Biographical sketch of David Hare' (১৮৭৭), 'Life of Dewan Ramkamal Sen' (১৮৮০), 'Life of Golesworthy Grant' (১৮৮১)—প্রভৃতি গ্রন্থে প্যারীচাঁদের জীবনদর্শন, মানুষের জন্য তাঁর অকৃত্রিম দরদ কখনো কৌতুকে কখনো বা গম্ভীর তত্ত্বকথায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে। এছাড়াও ছড়ানো ছেটানো লেখা যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি, তার সংখ্যাও কম নয়। অধ্যাত্মবিষয়ক রচনাগুলিতেও প্যারীচাঁদের ভাষা ও মানুষের জন্য সীমাহীন দরদ লক্ষ্য করার মতো।

বাইশ বছর বয়সে (১৮৩৬) প্যারীচাঁদ 'কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী'র সহকারী গ্রন্থাগারিক হিসাবে যোগ দেন। এই চাকরি প্যারীচাঁদের জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অর্থ উপার্জন গ্রন্থাগারিক প্যারীচাঁদের জীবনে নিতান্তই গৌণ লক্ষ্য ছিল। তাঁর স্বভাবধর্ম অনুযায়ী সামান্য সময়ের মধ্যেই তিনি এ প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে শ্রেষ্ঠ কর্মী এবং অপরিহার্য মানুষ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত (১৮৮৩, ২৩ নভেম্বর)—এই প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি নিজেকে কখনো সরিয়ে নেননি। ১৮৬০ সালে প্রথমে (১২ মার্চ) প্যারীচাঁদের ছোট ভাই নবীনচন্দ্রের, কিছুদিন পরে (২ জুলাই) বড় মেয়ে বিন্দুবাসিনীর এবং বছরের শেষে (৪ নভেম্বর) তাঁর স্ত্রী বামাকালীর মৃত্যু হয়। উপর্যুপরি এই আঘাত এবং বিশেষ করে পত্নীবিয়োগ প্যারীচাঁদের জীবনের নানা দিক ওলট পালট করে দেয়। কিন্তু এর আগে পর্যন্ত (১৮৩৬-১৮৫৯) প্যারীচাঁদের কর্মজীবনের সুবর্ণময় যুগ। এই সময়েই তিনি সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষা ও বিধবা-বিবাহের সংগঠক। নানা পত্রিকার প্রকাশনায় সাহায্যকারী, সম্পাদনা, বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞানতৃষ্ণা এবং কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে আগ্রহী এক কর্মযোগী পুরুষ। Calcutta Public Library-তে তিনি যোগ দেওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ১৮৩৬ সালে ৮ জুলাই স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট লিখেছেন: 'He is already mu h better informed than most young men of his age and nation'.

কর্মস্থলের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন প্যারীচাঁদ। সমস্ত বিষয়ে জানবার তাঁর

অদম্য ইচ্ছা এবং এই তৃষ্ণা নিবারণের অফুরন্ত সুযোগ তাঁর হাতের সামনে এসে গিয়েছিল। এই পর্বেই রাজনৈতিক, সমাজ-আর্থনীতিক নানা বিষয় নিয়ে সমকালীন পত্র-পত্রিকাগুলিতে বাংলা এবং ইংরাজীতে নিরলসভাবে তিনি একের পর এক প্রবন্ধ লিখেছেন। মুখ্যত ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র জ্ঞানান্বেষণ (১৮৩১-১৮৪০), Bengal Spectator' (১৮৪২-১৮৪৩)-এ তিনি এইসব প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহনের বিদ্যাকল্পদ্রুমের পঞ্চম খণ্ডে (১৮৪৭) তাঁর তিনটি লেখা ছাপা হয়েছিল। এসবই আলালের আগের লেখা। এবং শেষ পর্যন্ত অনেক উঁচু থেকে মাটির কাছাকাছি নেমে এসে একেবারেই সাধারণ মেয়েদের জন্য বন্ধু রাধানাথ শিকদার-এর সহযোগিতায় বের করেছেন 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪-১৮৫৮)। আলালের ঘরের দুলাল প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকাতেই। মেয়েদের মানসিক, নৈতিক ও পারিবারিক উৎকর্ষের জন্যই দুই বন্ধু এই ছোট মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন।

এই সময়েই একের পর এক যুক্ত হয়েছেন অসংখ্য সংগঠনের সঙ্গে। সমসাময়িক সমস্যাগুলি সম্পর্কে সেইসব সংগঠনের বিভিন্ন সভায় পাঠ করেছেন মননশীল প্রবন্ধ। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (১৮৩৮), জ্ঞানান্বেষণী সভা, Academic Association, Bengal British India Society (১৮৪৩), British Indian Society (পরে Association) (১৮৫১), Bethune Society (১৮৫১), The Calcutta Society for the preservation of cruelty to Animals (পশু ক্লেশ নিবারণী সভা), Bengal Social Service Association (১৮৬৭)। ওই সময়ের মধ্যেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য হয়েছিলেন। ১৮৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলা অনুবাদ সমিতি। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ভাষার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অনুবাদ ছিল এদের প্রধান কাজ। এরও প্রধান সংগঠক এবং অনুবাদক প্যারীচাঁদ। এঁরাই প্রকাশ করতেন প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত The Agricultural Miscellany পত্রিকাটি।

উনবিংশ শতকের ৪০-এর দশকেই যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পূর্ণ উদ্যমে তাঁর কাজ করে চলেছেন, জোড়াসাঁকোর সিংহ বাড়ির পুরুষসিংহ কালীপ্রসন্ন যখন নিতান্তই শিশু, সেই সময়েই বিভিন্ন সভার ভাষণে এবং বিভিন্ন পত্রিকার লেখায় প্যারীচাঁদ নিশ্ছিদ্র যুক্তিজাল বিস্তার করে দেশ জুড়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দাবী জানিয়েছিলেন। গরীব চাষী, কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষ এবং কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের বা এমনকি অধিক ফসল ফলনের বিষয়েও তিনি গভীর আগ্রহী ছিলেন। পঞ্চায়েতকে গরীব চাষীর রক্ষাকবচ মনে করেছেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই। আমাদের দেশে চাষী আন্দোলন তখন পর্যন্ত চরম অসংগঠিত। নীলকর সাহেবদের দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছিল আরো কয়েক বছর পর। কৃষকদের সংগঠিত আন্দোলনের কোনো কর্মসূচী বা রূপরেখা প্যারীচাঁদ

রচনা করেননি, কিন্তু দেশ বাঁচাতে গেলে কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষিকে বাঁচাতে হবে—এই যুগসত্যটি বুঝে নিতে তাঁর অসুবিধা হয় নি। তাই চাষীদের জন্যে তাঁর ভাবনা এবং তাদের স্বার্থরক্ষাকারী পঞ্চায়েত গঠনের জন্য তাঁর যুক্তি বিস্তার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তীব্র সমালোচনা করে প্যারীচাঁদ লর্ড কর্নওয়ালিসের কূটনৈতিক চালটিকে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে শুধু একটি মাত্র প্রবন্ধ, "The Zamindar and Ryots" (১৮৪৬-এ Calcutta Review পত্রিকায় প্রকাশিত) সমকালে দেশে, এমনকি বিদেশেও আলোড়ন তুলেছিল।

এই সময়েই দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রকাশিত অনেকগুলি ইংরাজী পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক। Bengal Harkara, Englishman, Indian Field, The Calcutta Review, হরিশের বিখ্যাত Hindu Patriot, Friends of India এবং আরো অনেকগুলি পত্রিকায় তিনি যেসব প্রবন্ধ লিখেছেন তার অনেকগুলি এখনো পর্যন্ত সংকলিত হয় নি।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক এবং বাংলাভাষার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী উইলিয়াম কেরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন Agricultural & Horticultural Society of India. স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই কৃষি বিষয়ক ওই সংগঠনটিতে প্যারীচাঁদ নিজেকে যুক্ত করেছিলেন (১৮৪৭)। The Calcutta Review পত্রিকায় তাঁর কৃষি বিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত Agricultural Society of India & Court Amlas in Lower Bengal, কৃষি-বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ Agriculture in Bengal (বাংলায়, কৃষিপাঠ) এবং The Agricultural Miscellany (Agri-Horticultural Society of India থেকে প্রকাশিত)।

প্যারীচাঁদের জীবনের অন্য একটি অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত দিক তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যে যোগদান। কালাচাঁদ শেঠ এন্ড কোম্পানিতে অংশীদার হিসাবে প্যারীচাঁদ যখন যুক্ত হয়েছিলেন তখন অনেকেই সেটাকে তাঁর বিলাসিতা এবং খেয়াল হিসাবে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত 'প্যারীচাঁদ মিত্র এন্ড সন্স' (১৮৫৬) নামক যে প্রতিষ্ঠানটি তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, দেশীয় আমদানি-রপ্তানির ব্যবসার জন্য সেটি দীর্ঘদিন আমাদের শিল্প-ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল।

সব যুগেই কিছু মানুষ থাকেন যাঁরা যুগের হাওয়ার ব্যতিক্রম। একটি সমগ্র যুগকে পরিবর্তনমুখী করার দুঃসাধ্য সাধনায় আমৃত্যু ব্রতী থাকার জন্যই এঁদের জীবন উৎসর্গীকৃত। সেই অলস মন্থর কাল শহরের তথাকথিত অভিজাত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে যখন প্রধানত একটি অসার ভোগবিলাসী প্রজন্মে পরিণত করেছিল, সেই সময়েই প্যারীচাঁদ এক বিরল ব্যতিক্রমী চরিত্র। ঢিলেমি এবং অলসতার কোনো স্থান প্যারীচাঁদের

জীবনে ছিল না। সীমাহীন পরিশ্রম, সততা এবং নিষ্ঠা তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল সমাজের ওপরের সারিতে।

গত শতাব্দীর শেষ দিকে দেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনতা আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক চেতনার যে অংকুরোদ্গম ঘটেছিল, তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন এই মানুষেরাই। শুধু লেখালেখির মধ্যেই প্যারীচাঁদ নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। দরিদ্র কৃষক এবং অসংগঠিত মানুষের ওপরে ব্রিটিশ পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ আন্দোলনে নামতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। দেশীয় সমাজ এবং ইউরোপীয় অভিজাত সম্প্রদায় উভয়ের মধ্যেই অবাধ গতিবিধিসম্পন্ন, এমন মানুষ বিদ্যাসাগরকে বাদ দিলে খুব বেশি সে সময়ে ছিল না।

যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি তিনিই আবার এ দেশের Theosophical আন্দোলনের প্রধান মানুষ। এককালের ডিরোজিয়ান, যুক্তিবাদী প্যারীচাঁদ ক্রমে সংশয়বাদ থেকে শেষপর্যন্ত অদ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাসী। দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শবাদের দিক থেকে প্যারীচাঁদের জীবন স্পষ্টতই দুটি সুনির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত এবং এই দুই ভাগের মধ্যবর্তী সীমানায় রয়েছে তাঁর স্ত্রীর জীবনাবসান। নিজের আদর্শ দাম্পত্য জীবনের কথা প্যারীচাঁদ বন্ধুমহলে গর্বের সঙ্গে গল্প করতেন। স্ত্রী-বিয়োগ-ব্যথা তাঁর পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। ১৮৮১ সালে লেখা "On the soul : Its Nature & Development" গ্রন্থে তাঁর স্বীকারোক্তি : In 1860 I lost my wife which convulsed me much. I took to the study of spiritualism which, I confess, I would have not thought of otherwise nor relished its charms." জীবনের শেষ পর্বে দ্রুত প্রেততত্ত্ব থেকে ঈশ্বরতত্ত্বে পেঁছে গিয়েছিলেন প্যারীচাঁদ। সংস্কার-বিরোধিতা, যুক্তি, গণতন্ত্র, শিক্ষা আর স্বাধীনতার প্রাজ্ঞ মনীষী Theosophical Society প্রতিষ্ঠা এবং অদ্বৈততত্ত্বের প্রচারে আত্মনিয়োগ করার এই অনিবার্য যুগ-বাস্তবতা প্রসন্ন চিত্তেই আমাদের মেনে নিতে হবে।

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন প্যারীচাঁদ প্রতিষ্ঠিত Theosophical Society যে স্বদেশী আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সেকথা উল্লেখ করেছেন। সারা জীবনের কর্মমুখরতায় দেশের মানুষের কাছে প্যারীচাঁদ এক প্রগাঢ় শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, অবৈতনিক বিচারক, হাইকোর্টের জুরি, আইন সভার সদস্য—এইসব দায়িত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। যুগনায়ক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন নিজের শক্তির জোরেই।

যুগ যুগ সঞ্চিত অন্ধকারে আচ্ছন্ন বন্দী স্বদেশের মাটিতে কিছু মানুষ জন্মভূমির হাহাকার শুনেছেন। জীর্ণ জীবন, অবলুপ্ত স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গে ব্যথিত হয়েছেন এবং

একই সঙ্গে তাঁদের দুই চোখে এই বন্দীশালার বাইরের সূর্যালোকের স্পর্শ লেগেছে। অসীম দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধে, বঞ্চিত মানুষের প্রতি সীমাহীন দরদে 'অসংগঠিত' এই অসীম প্রতিভাধর মানুষেরা নিজের নিজের মাটিতে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের দেওয়ালকে দু হাতে প্রাণপণে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করেছেন। বন্দীশালা ভাঙেনি, কিন্তু পাথরে চিড় ধরেছিল শুধু এবং সেই সামান্য ছিদ্রপথে জ্ঞান ও চিত্তের বন্ধনমুক্তির রশ্মি অনিবার্যভাবে প্রবেশ করেছিল এই অন্ধকারের পাতালপুরীতে। উত্তরকালকে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাই যথাযোগ্য মর্যাদায় চিনতে হবে সময়ের পূর্বসূরীদের।

প্যারীচাঁদ সম্পর্কে সে যুগে কয়েকটি পত্রিকা ও সমালোচকের অভিমত

" ইহসংসারে তাঁহার প্রধান গৌরব, প্রধান যশ—তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল'। যখন বাঙ্গালা ভাষায় উপন্যাসের জন্ম হয় নাই, লোকে যখন সহজ কথায় সাধারণের ভাষায়, গদ্য লিখিতে শিখে নাই—প্যারীচাঁদ চুট্‌কি সুরে, সাধারণের বোধগম্য ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক উপন্যাস রচনা করেন। বঙ্কিমবাবু এখন যে সুরে গাইতেছেন,—সেই সুরের প্রথম জন্মদাতা – প্যারীচাঁদ। তবে বঙ্কিমবাবুর সুর মার্জিত, বিশদ,—শিশির-বিধৌত চম্পকবৎ, – প্যারীচাঁদের সুর খনির তিমির গর্ভস্থ হীরক, পাঁশে ঢাকা আগুন। প্যারীবাবু সংস্কৃতী গদ্যের স্রোত ফিরাইলেন,—সেইজন্য বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। …'রামারঞ্জিকা'—এখানি স্ত্রীলোকের পাঠ্য। …তৎকৃত ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত সুখপাঠ্য।"

(বঙ্গবাসী / ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১২৯০ সাল)

"প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন সিংহ বাঙ্গালা ভাষায় তরল সাহিত্যের প্রথম প্রবর্ত্তক। তাঁহার (প্যারীচাঁদের) 'আলালের ঘরের দুলাল' এক দিকে দূষিত রীতিনীতির উপর তীব্র বিদ্রূপ, অন্যদিকে মহামূল্য উপদেশে পূর্ণ। 'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গালা ভাষার প্রথম উপন্যাস। তিনি মদ্যপান ও জাতি ভেদ আক্রমণ করিয়া 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' নামক এক সুন্দর পুস্তিকা লেখেন। স্ত্রী শিক্ষার জন্য নীতি উপদেশ ও আদর্শ স্ত্রী জীবনী সম্বলিত 'রামারঞ্জিকা' নামক এক গ্রন্থ বাহির করেন।"

(সঞ্জীবনী / ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১২৯০ সাল)

"বাঙ্গালা ভাষার প্রথম উপন্যাস, আলালের ঘরের দুলাল, ইঁহার লেখনীসম্ভূত। রামারঞ্জিকা, যৎকিঞ্চিৎ, অভেদী, আধ্যাত্মিকা, গীতাঙ্কুর, বামাতোষিণী, কৃষিপাঠ প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালা ভাষা, স্ত্রীশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।"

(সময় / ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১২৯০ সাল)

□

"তাঁহার লিখিত বাঙ্গালা গ্রন্থ এখনও সাদরে পঠিত হইয়া থাকে। 'আলালের ঘরের দুলাল' বহুদিন তাঁহার যশ রক্ষা করিবে।"

(চারুবার্ত্তা / ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১২৯০ সাল)

□

"বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের রচিত বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে 'আলালের ঘরের দুলাল' একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক।"

(এডুকেশন গেজেট / ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৯০ সাল)

□

"...মাতৃভাষাকে পুষ্ট করিবার জন্য তিনি যে বিশেষ প্রয়াস পাইতেন—'আলালের ঘরের দুলাল' তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত...।"

(প্রভাতী / ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১২৯০ সাল)

□

আলালের ইংরাজী সংস্করণ

(*ALLALER GHARER DULAL*)

সম্পর্কে

The 'Allaler Gharer Dulal'...may be called a truly indigenous novel, in which some of the reigning vices and follies of the time are held up to scorn and derision. A deep vein of moral earnestness runs through all the writings of Peary Chand Mittra

and he takes the opportunity to interweave with the incidents of his story disquisitions of virtue and vice, truthfulness and deceit, charity and niggardliness, hypocrisy and straight forwardness. Not only general vices, such as drinking and debauchery, but particular customs, such as a Kulin marrying a dozen wives and living at their expense, are condemned in no measured terms. The book is written in a plain colloquial style, which, combined with a quiet humour, procured for it considerable degree of popularity. Towards the latter end of his life Peary Chand Mittra gave up novel writing and wrote several pamphlets on religious subjects and short memoirs of eminent men, of which the "Life of David Hare" (first written in English and then translated into Bengali) is best known.

Babu Peary Chand Mittra, who writes under the *nom de plume* of Tekchand Thakur, has produced the best novel in the language, *Allaler Gharer Dulal*, or "The spoilt Child of the House of Allal". He has had many imitators, and certainly stands high as a novelist. His story might fairly claim to be ranked with some of the best comic novels in our own language, for wit, spirit, and clever touches of nature.

He puts into the mouth of each of his characters the appropriate method of talking, and thus exhibits to the full the extensive range of vulgar idioms which his language possesses.

The literature of a nation to be of any value must be a vigorous spontaneous growth, not a hot-house plant. Translations of Goody Children's Stories, of Histories of India, Dialogues on Agriculture, Robinson Crusoe and the like, though useful for school boys, do not form a national literature. No Tekchand Thakur appears yet to have arisen in Gujarat.

—John Beams' Modern Aryan Languages of India.

□ অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

রামগোপাল ঘোষের জন্ম ১৮১৫ সালের অক্টোবরে। (কারো কারো মতে ১৮১৪ তে)। তাঁর জন্মের ৫৮ বছর আগে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ হয়ে গেছে। আর তাঁর জন্মের ৪২ বছর পরে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটেছে।

এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে এবং রাজানুগত্য প্রকাশের জন্য কলকাতায় তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের এক শোভাযাত্রা বের হয় ১৮৫৭ সালের ২৭ মে। রামগোপাল ৪২ বছর বয়স সেই শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। তাতে আরও ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ তরুণেরা। এই সময়ে সরকারী তরফে দুর্গতদের জন্য একটি ত্রাণ কমিটি গঠিত হয়। তাতে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রমাপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে রামগোপাল ঘোষও ছিলেন এক সক্রিয় কর্মী। রামগোপাল ততদিনে তাঁর বাগ্মিতার জন্য প্রভূত যশ অর্জন করেছেন। ইংরেজি ভাষায় উৎকৃষ্ট দখলের স্বীকৃতি তখন তাঁর করায়ত্ত। রামগোপাল ঘোষ তাঁর অনেক বিখ্যাত বক্তৃতার জন্য সুপ্রশংসিত হন ইঙ্গ-বঙ্গ মহলে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভারতেশ্বরী হিসেবে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতরাজ্যগ্রহণ উপলক্ষে উদ্‌যাপিত উৎসবে তাঁর স্বাগত ও প্রশস্তিমূলক ভাষণটি। সময় ১৮৫৮ সাল।

আমরা অনেকে সঙ্গত কারণেই বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হতে পারি, প্রশ্ন তুলতে পারি—এই ভদ্রমহোদয় সম্পর্কে আবার আলোচনা কেন? কেননা ইতোমধ্যে আমরা অনেকেই সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করেছি। একে মহাবিদ্রোহ আখ্যা দিয়েছি এবং এই বিদ্রোহের সেনানীদের আমরা জাতীয় বীরের শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত। ফলে তাঁদের বিরোধিতা যাঁরা করেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে কি আমরা বিরূপ মনোভাব পোষণ করবো না?

এই প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হলেই হয়তো আমরা খুশি হই। কিন্তু আজ থেকে একশো চৌত্রিশ বছর আগেকার সেই সময়টাকে চিনতে, বুঝতে গেলে আমরা তাকে শুধু কালো আর শাদা, স্পষ্ট দুভাগে ভাগ করতে পারি না। বস্তুত গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী—যে সময়কাল আমাদের আলোচ্য—তার চরিত্রে বিচিত্র টানাপোড়েন, স্ববিরোধিতা, সীমাবদ্ধতা, সেসব সুদ্ধই আমাদের বিচার্য। কেননা এসবই তার চারিত্র্য-বাস্তবতা। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে পেঁছে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর বয়স্ক কণ্ঠে শুনতে পাই—ভারতকে সাতচল্লিশ সালে স্বাধীনতা দিয়ে ইংরেজ ভুল করেছে, ভারত-

বর্ষকে স্বাধীনতা অর্জনের যোগ্য করার জন্য ইংরেজদের আরও অনেক বছর এদেশ শাসন করা উচিত ছিল। এই বক্তব্যে স্বভাবতই আমরা শুধু ক্রুদ্ধ হই, লজ্জিত, অপমানিত বোধ করি। আমরা তাঁর এই মনোভাবে মোটা দাগে ইংরেজ ভক্তি প্রকাশিত হতে দেখি। তার নিন্দাও করি। বিংশ শতাব্দীর শেষ সীমায় এমন ব্যক্তি হয়তো ব্যতিক্রম, কিন্তু এই 'ব্যতিক্রম' উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর সনিষ্ঠ প্রতিনিধি। সেই সময়ের বহু বরেণ্য মণীষীই ইংরেজ শাসনের পক্ষে ছিলেন। প্রবলভাবে। তার কার্যকারণ সম্পর্কের প্রেক্ষিতটি আর ততটা অন্ধকারে নেই, আলোচনা-গবেষণা-বিতর্কের আলোয় তা এখন অনেকটা স্পষ্ট। তবু কিছু মত-পার্থক্য তো রয়েই যাচ্ছে। যায়। অন্তত, কোনো কোনো বিষয়ে। বা কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যায়। স্বাভাবিক। সব বিষয়ে সকলের একমত হওয়া মুশকিল। হয়তো সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয়। কেননা সবার দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টিকোণ এক নয়। কাজেই রামগোপাল ঘোষ সম্পর্কে আলোচনায় প্রবেশের পূর্ব মুহূর্তে দু-একটি বিষয়ের আখ্যাব্যাখ্যার কথা হওয়া দরকার। যেমন? ধরা যাক—এ বিষয়ে প্রায় কেউ দ্বিমত নন যে, উনবিংশ শতাব্দী আমাদের জাতীয়-জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে জন্ম—রাজা রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রমুখের। এঁদের কর্মকাণ্ড মুখ্যত পরের শতাব্দীর প্রথমার্ধে। আর গোটা উনবিংশ শতাব্দীতে জন্ম কর্ম—যার প্রবাহ বিশ শতকেও অব্যাহত—এমন অগণ্য প্রতিভাবান বাঙ্গালীর সমারোহ ইতিহাসে প্রায় তুলনাহীন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ঈশ্বর গুপ্ত, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আবদুল লতিফ, দীনবন্ধু মিত্র, মহেন্দ্রলাল সরকার, রামকৃষ্ণ পরমহংস, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালী প্রসন্ন সিংহ, শিবনাথ শাস্ত্রী, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ—কীসব যুগ পুরুষ! সমাজ-ধর্ম-শিক্ষা-দেশপ্রেম-শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতি কোন বিষয়ে এঁদের প্রতিভার কিরণ বিচ্ছুরিত হয়নি?

এজন্য উনবিংশ শতককে কেউ বলেছেন নবযুগ, কেউ স্বর্ণযুগ, কেউ বলেছেন নবজাগরণের যুগ, কেউ কেউ আখ্যা দিয়েছেন রেনেশাঁস। নতুন ভাবভাবনামননে এ-শতাব্দীর ভূমিকা অসাধারণ সন্দেহ নেই। কিন্তু কেউ কেউ একে যে ইউরোপীয় রেনেশাঁসের তুল্য মর্যাদা দিয়েছেন, তার ভ্রান্তি নিয়ে সংশয় থাকা উচিত নয়। ইউরোপীয় রেনেশাঁস সমাজে যে মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল তা এখানে উনবিংশ শতাব্দীতে ঘটেনি। এ বিষয়ে বিতর্ক হয়েছে বিস্তর, তবু যে সময়-সমাজে রামগোপালের জন্মকর্ম তার চিত্রচরিত্র জেনে নিলে মন্দ কী।

ইউরোপীয় রেনেশাঁসের মর্মবস্তু ছিল যুক্তিবাদ, যা মধ্যযুগীয় ধর্মীয় মতান্ধতার

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। বাইবেল শাসিত সমাজে স্বাধীন চিন্তা আর যুক্তিবাদ ছিল শৃঙ্খলিত। সে শৃঙ্খল ভাঙ্গা হয়েছিল। মননের স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মানবিকতা। আর মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে শিক্ষায় কায়েমী স্বার্থের প্রভুদের একচ্ছত্র আধিপত্য ভেঙ্গে গিয়েছিল। শিক্ষার প্রবল জোয়ারে সাধারণ মানুষ উদ্দীপিত হয়েছিল। যুক্তিবাদের হাত ধরে এসেছিল বিজ্ঞান। আর সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বদলে মানুষ উঠে এসেছিল সমাজ-ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে। আর যদি সমাজের অর্থনৈতিক ভিতের কথায় আসা যায়—তবে বলতেই হবে ব্যবসায়ী-পুঁজিবাদীরা কৃষকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে—রেনেশাঁসের প্রভাবেই—সামন্ততন্ত্রের মৃত্যু পরোয়ানা জারী করেছিল। পুঁজিবাদের প্রাথমিক বিকাশে নবজাগ্রত বুর্জোয়াদের ইতিবাচক ভূমিকার কে না প্রশস্তি গেয়েছেন? মার্কসও সঙ্গতভাবেই।

কিন্তু এদেশে? রামমোহন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন বিধবা-বিবাহের বিরোধী। তিনি বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধতা করেছেন কিন্তু নিম্নবর্ণের মানুষের সঙ্গে একই পঙক্তিতে আহারে তাঁর নিজেরই প্রবল আপত্তি ছিল। রামমোহনের কঠিনতম যুদ্ধ ছিল হিন্দু ধর্মের বহুদেবতা এবং মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে, তিনি একেশ্বরবাদের প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু সারাজীবন তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণের উপবীত ধারণ করে গেছেন—ব্রিস্টলে তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিচ্ছেদও এই উপবীত উপলক্ষে। দক্ষিণ আমেরিকা যখন স্পেনের অধীনতা থেকে মুক্ত হয় তখন রামমোহন স্বগৃহে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করেন, উৎসব পালন করেন—নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ইংরেজ শাসকদের অনেকেই ছিলেন। তাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না, কেননা এদেশ ইংরেজের শাসনাধীন থাকলেও তিনি এই শাসনকে "an Aet of Divine Providence" বলে মনে করতেন। আর অষ্টাদশ শতাব্দীর রামমোহন দ্বারকানাথ থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিই, কেউ কম, কেউ বেশি, সামন্ততন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। অবশ্য দরিদ্র কৃষকদের জন্য অনেকেই কলম ধরেছেন, জ্বালাময়ী ভাষণও দিয়েছেন, এমন কি অনেকে মূর্খ' অলস ও অত্যাচারী জমিদারের সমালোচনাও করেছেন তীব্র ভাষায়—কিন্তু জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে তেমন কেউ ছিলেন না। তেমনভাবে ছিলেন না।

অনেকের পক্ষে থাকা সম্ভবও ছিল না। কেননা সেই কালে যাঁরা অর্থসম্পদ আহরণ করেছিলেন, তাঁরা তা করেছিলেন ইংরেজদের মুৎসুদ্দিগিরিতে, বড় জোর তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুক্ত-ব্যবসায়ে বা নিজস্ব ব্যবসায়ে। আর সে সম্পদ বা পুঁজি শিল্পস্থাপনে নিয়োজিত করতে তাঁরা চাননি। পারেননি বলাই ভালো, কেননা ইংরেজ দেয়নি। কারণ স্পষ্ট। ব্রিটিশ পুঁজিবাদ তখন এদেশে যতটুকু শিল্প-ঐতিহ্য ছিল, তার গলায় বুটসুদ্ধু পা চেপে ধরেছে আর নিজের দেশে মহাশিল্পবিপ্লব ঘটাচ্ছে। ইউরোপ গ্রেটব্রিটেন যথাসময়ে সেই সুবাদে এক নম্বর দেশ হয়ে গেল। আর এ দেশে?

একটি সুন্দর টোপ বিকল্প হিসেবে তারা ঝুলিয়ে দিল অর্থবানদের সামনে।

টাকা যার জমিদারি তার। পলাশীর যুদ্ধের পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইজারাদারী প্রথায় নব্য অর্থবানেরা অনেক জাত জমিদারের জমিদারি কিনে নিল। মহান লর্ড কর্নওয়ালিশ—১৭৮৬ সালে 'দশশালা বন্দোবস্ত' করলেন। নতুন পুঁজিপতিরা বেশি করে সামন্ততন্ত্রের ফাঁদে ঢুকে গেলেন। দশশালার দশটা বছরও তর সইলো না, মহত্তর কর্নওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে একটানে এনে ফেললেন 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'। সেই থেকে তো সামন্ততন্ত্র এখানে শাঁসেজলে রীতিমতো শক্তিধর। এতটাই, যে স্বাধীন ভারতে তথাকথিত জমিদারি উচ্ছেদের পরেও সে পুরোপুরি ক্ষয়ে যায়নি। বরং পুঁজিবাদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে দিব্যি বেঁচে আছে। আমাদের দেশে পুঁজিবাদও তো জন্মলগ্ন থেকেই পেঁচোয় পাওয়া ছেলে। পরাধীনতায় তার জন্ম, সে আর সাবালক হবে কী। সামন্ততন্ত্রের শেকড়বাকড় উল্টেপাল্টে দিয়ে সে স্বমহিমায় আজও আত্মপ্রকাশ করতে পারলো না। পুঁজিবাদের সুস্থ ও পূর্ণ বিকাশ অপূর্ণ রইলো। ফলে যাকে আমরা বলি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, কি জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, তা এখনো পর্যন্ত ভবিষ্যতের গর্ভেই থেকে গেল। তার রক্তাক্ত জন্ম এদেশের জড়তা আলস্যবর্ণ কর্ম জাতধর্মের ভেদাভেদ লাথিয়ে গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারলো না। ইউরোপে দিয়েছিল। তবে আর কোন পুনর্জন্ম ঘটেছিল এদেশের ঊনবিংশ শতাব্দীতে!

পুনর্জন্ম যদি না হয়, তবে কি নতুন করে জেগে উঠেছিল এদেশ? তেমন তো মনে হবে না ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনে। এদেশের সমাজহিতৈষীরা চেয়েছিলেন ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজরাও চেয়েছিল। কেন, কী প্রয়োজন ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থার? এদেশের মনীষীরা বলেছিলেন—এদেশের সংস্কৃত-ফার্সি-আরবি-চর্চিত টোলে মাদ্রাসায় আর আলো নেই। জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্যদর্শনের নতুন আলো দেবে ইংরাজি শিক্ষা। আর মেকলে মুচকি হেসে বললেন—ঠিক ঠিক, আমরা কালো মানুষদের মধ্যে সে আলো এমন ঠেসে দেব যে তাদের মনপ্রাণ জুড়ে থাকবে ইংরেজ, তবে গায়ের রংটা তো পাল্টানো যাবে না, সেটা কালোই থাকবে, তারা কালো সাহেব হবে। মেকলে সাহেবের কথা যে কদ্দুর ফলে গিয়েছে—সে তো আমরা এখনো হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার মণিহারটা কি এখনো আমরা গলা থেকে নামাতে পেরেছি? যদি এও বলা হয় যে সত্যিই সে শিক্ষায় আলো জ্বলে উঠেছিল, মুদ্রাযন্ত্র ইতিমধ্যে চালু হয়েছিল—তবু কি সেই আলো কলকাতার চৌহদ্দিটা ছাড়িয়ে খুব বেশি দূর এগিয়েছিল? শিক্ষা কি সমাজের বৃহত্তর অংশকে ব্যাপকভাবে উজ্জীবিত করেছিল?

ইউরোপের রেনেশাঁসের আর একটি সবল বৈশিষ্ট্য—পেছনে ফিরে দেখা এবং যা কিছু ধ্রুপদী তার পুনর্মূল্যায়ন, পুনর্ব্যবহার—সময়ের প্রয়োজনে। স্থাপত্যে চিত্রকলায় ভাস্কর্যে যার সূত্রপাত।

এদেশে এ বৈশিষ্ট্য কতটুকু বিকশিত হতে পেরেছিল? পরাধীন দেশে কতটা

স্বনির্ভর, স্বাবলম্বী ছিলেন তাঁরা যাঁরা এসবে উদ্যোগ নিয়েছিলেন? সূত্রপাত ঘটেছিল অনেকগুলি বিষয়েই। কিন্তু একটি পরাক্রান্ত পরশক্তির শৃঙ্খলবন্ধনের মধ্যে এই শুরুর দৌড় কতটা? যেমন ধর্মে—ঘটেছিল। পুনর্জাগরণ, পুনর্মূল্যায়ন। ব্রাহ্মধর্ম একটি সীমার মধ্যে খ্রীস্টধর্মের তীব্র স্রোত অনেকটাই রুখে দিতে পেরেছিল। নতুন ভাবনা-বিচারে যুক্তিনির্ভরতার দিকে দু-একটা পদক্ষেপ নিয়েছিল। কিন্তু তার অন্তর্গত শক্তিতে ঘাটতি ছিল—স্ববিরোধে, পিছুটানে। তেমনি তার প্রভাবক্ষেত্র ছিল ক্ষুদ্র পরিধিতে সীমাবদ্ধ। সমগ্র দেশ ছিল বহুযুগের অচলায়তনে রুদ্ধ। ফলে তুলনায় প্রগতিবাদী এই ধর্মবোধের নির্ঝর বড়জোর একটি হ্রদের জন্ম দিল। দেশব্যাপী এক কল্লোলিত স্রোতস্বিনীর নয়।

বরং এর খোঁচায় অনতিবিলম্বেই সনাতন হিন্দুধর্ম তার প্রবল পরাক্রম নিয়ে পুনর্জাগরিত হয়ে এই দুটি ধর্মকেই দাবিয়ে দিল। এদেশের ধর্মীয় ইতিহাসে, কে জানে কীভাবে বর্ণভেদের কঠিন কঠোর কাঠামোর ঘেরাটোপে এই ধর্ম কী এক নিশ্চল শক্তিকেই না লুকিয়ে রাখতে পারে আপাত-ইনফরম্যালিটির মধ্যে! যখনই বিপন্ন, তখনই সে রুদ্র! নয়তো যে-বৌদ্ধ ধর্ম একদা ব্যাপক ভারতবর্ষের অগণিত লাঞ্ছিত মানুষের প্রাণের ধর্ম হয়ে গেল—সে ধর্ম কী করে মুছে যায় তার নিজের জন্মভূমি থেকে—যাকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া বললেও অত্যুক্তি হয় না। আর তার রাজশক্তির দুর্বার স্রোত সত্ত্বেও ইসলাম এদেশে তেমন দূর অবধি পৌঁছোতে পারে না।

এই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে তাই প্রশ্ন জাগে—ঊনবিংশ শতকে অঙ্কুরিত আমাদের জাতীয়তাবাদের মধ্যে যে কেউ কেউ ধর্মের ছায়াপাত দর্শন করেন—তা কি নিতান্তই অলীক? অন্যদিকে একথাও সত্যি—এদেশের মুসলিম সমাজ গোড়াতে এখানকার আন্দোলনের থেকে দূরে ছিলেন। কিন্তু ভারতের উত্তরাঞ্চলে, আলিগড়-কেন্দ্রিক, মুসলিম প্রগতিবাদী আন্দোলনের স্রোত উৎসারিত হয়, প্রসারিত হয়। সে-ধারাতেও কি সনাতন ধর্ম-চেতনা এসে মেশেনি? আর ধূর্ত ব্রিটিশ কি ক্রমে ক্রমে এই দুটি স্রোতকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে—অগণ্য সাধারণ মানুষের রক্তধারা বইয়ে দিল না—এই বিরাট উপমহাদেশে? আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে অনেক মূল্য আমরা দিতে বাধ্য হয়েছি। তবু, হা ভারতবর্ষ, এখনো চৈতন্য হয় না—এই দেশ হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ শিখ খ্রীস্টান কারুর একার নয়, সবার। অর্বাচীন কালের রামরথযাত্রায় কি পুনর্বার সেই আত্মঘাতের সংকেত? কাশ্মীর-পাঞ্জাব-আসামে পুনশ্চ কি সেই প্রমাদের দুর্যোগ ঘনীভূত নয়?

তীক্ষ্ণ এই প্রশ্নগুলো কি আবার আমাদের ফিরে দেখতে প্রাণিত করছে? সেই ঊনবিংশ শতকের পুনর্মূল্যায়নে? কেননা প্রভূত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কি উনিশ শতকের একটি বিশেস ভূমিকা নেই এই ভঙ্গবঙ্গের এক চরিত্র সৃজনে, যা ব্যতিক্রমে সুস্পষ্ট? মধ্যযুগীয় যে বীভৎস ধর্মীয় পঙ্গুতার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল সতীদাহ প্রথা, গঙ্গাসাগরে

সন্তান বিসর্জন, বাল্য আর বহুবিবাহের পাশবিক লোকাচার, তার বিরুদ্ধে গর্জন করে ওঠেনি উনবিংশ শতক? বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ হয়নি? স্ববিরোধ সত্ত্বেও রামমোহনের বিশ্ববোধ কি অস্বীকার করবো? মানবো না সূত্রপাত হল বাংলা গদ্য সাহিত্যের? মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার রামমোহন বিদ্যাসাগর মাইকেল বঙ্কিম থেকে কী ক্ষিপ্র গতিতে শিল্প-সাহিত্যের এক দুরন্ত প্রাণ প্রবাহ রবীন্দ্রনাথে এসে বিস্তৃত ব্যাপকতায় এদেশের মধ্যবিত্ত মানসলোক বিশ্ববোধের মানবিক চেতনার ফসলে ফসলে ভরিয়ে দেয়! কর্নওয়ালিস আর মেকলে সাহেবের কফিনের মরচে-ধরা কাঁটা ফোটে তাঁদের নিজেদেরই কংকালে। আর এক সাহেব, দূরদৃষ্টিতে এ দৃশ্যের আভাস পেয়েই হয়তো হাতে ছুরি তুলে নিয়েছিলেন ১৯০৫ সালে। লর্ড সেই মক্কেলের নাম কার্জন। ভেবেছিলেন মানচিত্রে কোপ মারছেন, কিন্তু সবিস্ময়ে দেখলেন এক সিংহ শাবককে আঘাত করেছেন। সেই শুরু।

উনবিংশ শতকে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা-চেতনার যে ধারা সারা ভারতবর্ষে প্রবাহিত হতে লাগলো, সেই থেকেই হয়তো, বঙ্গের ধারা ভিন্নতর মাত্রা পেল। অন্তত বলা যায়, বিশ শতকের সর্বভারতীয় রাজনৈতিক মূল স্রোতে থেকেও বঙ্গীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি স্বতন্ত্রতায় চিহ্নিত। স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লববাদ আর সাম্যবাদী রাজনীতির সম্মিলন তার আরো গুণগত পরিবর্তন ঘটালো। বস্তুত শেষ অবধি বঙ্গ-বিভাজন সত্ত্বেও, বা তার আঘাতে বেদনায়—বিশ শতকের শেষ প্রান্তে এসে মানবিক পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতের এক আলোকবিন্দু। রামরথযাত্রা, রূপ কানোয়ারের অগ্নিশয্যা, বর্ণভেদের হিংস্র উল্লাস আর বিভেদ-বিচ্ছেদের প্রমাদে ভারতবর্ষে অন্ধকার ঘনীভূত। পশ্চিমবঙ্গ—এখানে প্রাদেশিকতা পরাস্ত বলেই—সারা ভারতের আগামীকালের দিক-চিহ্ন। এই মুহূর্তে আমাদের আরও একবার অতীত পর্যালোচনা করতেই হচ্ছে।

উনিশ শতকের বহু মনীষীর দীর্ঘ শোভাযাত্রায় একজন মানুষকে আমাদের বিশেষ-ভাবে নজর করতে হচ্ছে—তিনি হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১)। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক। মাত্র বাইশ বছরের জীবন। কারো কারো ক্ষেত্রে বাইশটি বছর নয়তো, বাইশটি তারা। মিলেমিশে এক অখণ্ড আলোকপুঞ্জ। রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-৯৮) এক ভাগ্যবান তরুণ, এই শিক্ষকের কাছে শিক্ষা লাভ করলেন। আর তাঁর সহপাঠীরা? প্যারীমোহন রায়, প্রেমচাঁদ বড়াল, রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-৯৮), দিগম্বর মিত্র (১৮১৭-৭৯), কৈলাসচন্দ্র বসু প্রমুখ। রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৭০) হিন্দু কলেজে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন ১৮২৪-এ। রামগোপাল তাঁর এক ক্লাস নিচে পড়তেন।

রামগোপাল ফোর্থ ক্লাসের পরীক্ষায় দ্বিতীয় হলেন। প্রথম প্যারীচাঁদ মিত্র। তৃতীয় চতুর্থ স্থানে যথাক্রমে রামতনু লাহিড়ী ও দিগম্বর মিত্র। অবশ্য রামগোপালকে কেউ পরাস্ত করতে পারেন নি দুটি বিষয়ে—ইতিহাস আর ভূগোল! তাঁর জীবন গঠনে এই দুটি বিষয় প্রভূত প্রাণরসের যোগান দিয়েছিল। আর সেই অগ্নিবর্ণ শিক্ষক—

ডিরোজিও—তিনি তো শুধু তাঁকে নয়, জন্ম দিয়েছিলেন গোটা যৌবনবঙ্গের (ইয়ং বেঙ্গল)। এই গুরুবাদী দেশের বুকের ওপর চেপে বসে সবল কণ্ঠে ছাত্রদের বলেছিলেন—প্রশ্ন কর।

দুটিমাত্র শব্দ বটে, কিন্তু কী তার প্রতাপ! গোটা একটা সনাতন সমাজের ভাবনা শিক্ষা মনন প্রণালীর মূলসুদ্ধ টান মারা! তাঁর আগেই কি হাওয়ায় এ-শব্দ ঘুরছিল? অর্থাৎ যুক্তিবাদের হাওয়া? তবে সে হাওয়া কি তোলেন নি রামমোহন, ডেভিড হেয়ার? শিক্ষায় যে ব্রাহ্মণদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নেই, সে কথাও তো তত দিনে রটনা হয়ে গেছে। কায়স্থ রামগোপাল, প্যারীচাঁদ, দিগম্বরেরা—যদিও কুলীন একথা স্মরণ করে কি রোমাঞ্চিত হন নি?

রামগোপালের জন্ম তেমন উচ্চ স্তরের পরিবারে নয়। পিতা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের চীনাবাজারে এক কাপড়ের দোকান ছিল। পিতামহ কলকাতার কিং হ্যারিংটন কোম্পানীতে চাকরি করতেন। তবে তাঁর মাতামহ ছিলেন দেওয়ান রামপ্রসাদ সিংহ। রামগোপালের জন্ম '১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার বর্তমান বেচু চ্যাটুর্যের স্ট্রীট নামক গলিতে' ······(পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী)। গোবিন্দচন্দ্র এই বাড়িটি যৌতুক হিসেবে পান। কিন্তু রামগোপালের পিতৃভূমি ছিল হুগলী জেলায়। ত্রিবেণীর কাছে বাগারটি গ্রামে।

তাঁর শিক্ষাও কলকাতায়। প্রাথমিক শিক্ষা শেরবোর্ণ সাহেবের ইংরেজি স্কুলে। এই স্কুলে একদা দ্বারকানাথ ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর পড়াশোনা করেছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র হরচন্দ্র ঘোষ তাঁকে হিন্দু কলেজে পড়তে অনুপ্রাণিত করেন। কিন্তু তখন গোবিন্দচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা বিপর্যস্ত। পাঁচটি কন্যা ছিল তাঁর। সেকালে তাদের পাত্রস্থ করতে তিনি প্রায় ফতুর হন। তবু যে রামগোপালের হিন্দু স্কুলে প্রবেশ সম্ভব হল, সে তাঁর মেধা আর কিং হ্যামিলটন অ্যাণ্ড কোম্পানীর কর্মচারী জনৈক রজার্সের অর্থানুকূল্যের জন্য। তাঁর মেধায় চমৎকৃত হয়ে অবশ্য ডেভিড হেয়ার সাহেব পরে গোপালকে তাঁর অবৈতনিক ছাত্রদের দলভুক্ত করে নেন।

হিন্দু কলেজে ভর্তির আগে তাঁর নাম ছিল গোপালচন্দ্র, তিনি নতুন নামে ভর্তি হলেন—রামগোপাল। ক্রমে রামগোপালের মেধা মনন বিতর্ক-প্রতিভার বিকাশ হতে থাকে। ডিরোজিও লক্, রিড, স্টুয়ার্ট প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের বই পড়তেন। ইংরাজি সাহিত্য ইতিহাস ভূগোলে ছিল রামগোপালের প্রাণের আগ্রহ।

ডিরোজিও শুধুমাত্র ক্লাসের পড়ানোর মধ্যে নিজেকে এবং ছাত্রদের বেঁধে রাখেন নি। ১৮২৮-এ তিনি শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়িতে—মানিকতলায় "অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন"-এর প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান বিপ্লবী-চিন্তাভাবনার সূতিকাগার নামে খ্যাত। সেখানে অনেক বিদ্বান, সমাজচেতনায় সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের যাতায়াত ছিল। এদেশি বিদেশি। যেমন ডেভিড হেয়ার, বিশপ্স কলেজের অধ্যক্ষ ড. মিল, সুপ্রীম-

কে টের বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, কর্নেল বেনসন, ডবলিউ বার্ড, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, মাধবচন্দ্র মল্লিক প্রমুখ। এখানে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন মত, সত্য, দেশপ্রেম বিষয়ে আলোচনা বিতর্ক উত্থাপিত হোত। এখানেই রামগোপাল শক্তিমান বাগ্মীরূপে প্রতিষ্ঠা পান।

প্রাচীন ধ্যানধারণা সমাজে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে রেখেছিল, ডিরোজিওর ভাবনাচিন্তা যেন তার দরজা-জানলায় প্রবল ঝড়ের দাপটে আছড়ে পড়লো। সমাজ-পতিরা শঙ্কিত হলেন। এবং বলাই বাহুল্য—তাঁদের কুচেষ্টায় কিছু ধোঁয়াটে কারণে অধ্যক্ষ ও পরিচালকদের নির্দেশক্রমে ডিরোজিও হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করলেন। রামগোপালের ছাত্রজীবনের ইতিও এ সময়েই। ১৮৩১-এ। উল্লেখ করা প্রয়োজন, এর দুবছর আগে ১৮২৯ সালে দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রতিবাদের ফলশ্রুতিতে এবং রামমোহনের অব্যবহিত আন্দোলনে, লর্ড বেন্টিঙ্ক-এর উদ্যোগে সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে আইন বিধিবদ্ধ হয়। সমাজে রামমোহন-বিরোধী হাওয়াও প্রবল হয়। কিন্তু সে-হাওয়ার পাখনাগুলো কি ডিরোজিয়ানরা বেশ খানিকটা ছেঁটে-কেটে ন্যাড়া করে দেন না?

সমাজের ঘাতকেরা ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ ত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। ডিরোজিও মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে। রামগোপাল কলেজ ছেড়ে মাত্র সতের বছর বয়সে এক ইহুদি বণিকের অফিসে কর্মী হয়ে প্রবেশ করলেন। এই হল তাঁর ব্যবসায়ী জীবনের সূত্রপাত। কিন্তু জ্ঞানের আলো লেগেছে যে চোখে, তার পুরো দৃষ্টি ব্যবসায়-বাণিজ্য হরণ করতে পারে না। অক্লান্ত কর্মী রামগোপাল শুধু ডিরোজিওর সঙ্গে তাঁর অকালমৃত্যু পর্যন্ত যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রাখলেন তাই নয় —তিনি ক্রমে সমাজমনস্ক নাগরিকে পরিণত হতে লাগলেন তাঁর কর্মে, চিন্তায়, বাগ্মিতায়। বহু চমকপ্রদ সংগ্রাম ও উত্থানে কম উজ্জ্বল নয় তাঁর জীবনবৃত্তান্ত।

রামগোপাল চূড়ান্ত দক্ষতার সঙ্গে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করতে থাকেন সেই 'ইহুদী ব্যবসায়ী' যোসেফের প্রতিষ্ঠানে। প্রস্তুত করে ফেলেন এদেশের উৎপন্ন ও শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভারের রপ্তানী সম্বন্ধে একটি বহু শ্রমসাধ্য তালিকা। এই তালিকা প্রস্তুতিতে এদেশের উৎপন্ন দ্রব্য সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান বিস্তৃত হয়, তার ব্যবসায়িক প্রয়োগ সম্ভাবনা বিষয়েও তাঁর পরিচ্ছন্ন ধারণা সৃষ্টি হয়। এভাবে তিনি জানতে পারেন দেশের অর্থনীতি ও তার সমস্যা। যার ফলে এ সময়ে দেশীয় বাণিজ্য ও রাজনীতি বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধাদি রচিত হতে থাকে। রামগোপালের সহযোগিতায় সতীর্থ রসিককৃষ্ণ মল্লিক "জ্ঞানান্বেষণ" নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার সামাজিক ভূমিকা সর্বজনবিদিত, স্বীকৃত। রামগোপালের প্রবন্ধাদি এর উৎকর্ষ আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। "জ্ঞানান্বেষণ" বন্ধ হয়ে গেলে টেকচাঁদ ঠাকুরের ভাই কিশোরীচাঁদ মিত্রের সম্পাদনায় "বঙ্গদর্শক" (Bengal Spectator) প্রকাশিত হয়। কেউ কেউ মনে করেন

এর সম্পাদনা ও প্রকাশের বিষয়ে রামগোপালের অবদান অশেষ।

এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। এক : ইংরেজশাসিত এ দেশের মানুষের মতামত প্রথম বিশেষভাবে প্রতিফলিত হতে থাকে এইসব পত্রিকাসমূহে। এগুলি দৈনিক পত্রিকা ছিল না, কোনোটি মাসিক, কোনোটি পাক্ষিক। বক্তব্য প্রকাশের এইসব উৎসমূল থেকেই কালক্রমে বঙ্গের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় চিন্তাভাবনার প্রকাশ হতে থাকে। সব চিন্তা সরকারের মনঃপূত হয় না। তাই সরকারকে সতর্ক হতে হয়। যেমন ভারতবর্ষের এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী-রপ্তানীতে তখন শুল্ক দিতে হোত। এর ফলে এই দরিদ্র দেশে অহেতুক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হোত। "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকায় রামগোপাল 'সিভিস' ছদ্মনামে নিয়মিত যে রচনাদি লিখতেন, তার কয়েকটি এই শুল্ক (Indian Transit Duties) তুলে দেবার পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি নিক্ষেপ করে। পরে ভারত সরকার এসব যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হয়। শুল্ক প্রত্যাহৃত হয়। "বঙ্গদর্শক" রক্ষণশীল ধর্মসভার বিরুদ্ধে, প্রজাপীড়ক জমিদারদের বিপক্ষে দাঁড়ায়। আমৃত্যু এই পত্রিকা শোষিত প্রজাদের স্বার্থের পক্ষে থেকে কৃষি ও শিল্পবাণিজ্যে স্বাবলম্বী হতে জনগণকে আহ্বান জানায়। ইয়ং বেঙ্গলের অনেকেই বাণিজ্যকে স্বাবলম্বনের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অনেকে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। যেমন রামগোপাল স্বয়ং।

এই অর্থ রামগোপাল প্রথমে উপার্জন করেন যোসেফের কর্মচারী হিসেবে। ১৮৩৫ সালে যোসেফের সঙ্গে ইংরেজ ব্যবসায়ী টি. এস. কেলসল যুক্ত হন। রামগোপাল নিজ দক্ষতাগুণে এই যুক্ত ব্যবসায়ের বেনিয়ান (মুৎসুদ্দি) পদে নিযুক্ত হন। পরে কেলসল এই যুক্ত প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়েন তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে—নাম কেলসল অ্যাণ্ড কোং। রামগোপাল এখানেও মুৎসুদ্দি। তবে পরে তাঁকেও এই কোম্পানীতে অংশীদার করে নেওয়া হয়। কেননা রামগোপাল তখন এতটা স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন যে, তিনি নিজেই কোম্পানী খুলতে সক্ষম।

তাঁর সেই সক্ষমতা বাস্তবরূপ পেল নিজস্ব প্রতিষ্ঠান স্থাপনে—রামগোপাল স্বাধীন ব্যবসায়ী হলেন ১৮৪৮ সালের কাছাকাছি। কোম্পানীর নাম হল আর সি. ঘোষ অ্যান্ড কোম্পানী। ১৮৫০ সালে রামগোপাল বণিকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। সততা ও নিষ্ঠা তাঁকে সফল ব্যবসায়ী করে তুলেছিল। কিন্তু মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি স্বেচ্ছায় ব্যবসায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলেন। তাঁর কর্মচারীরা সেই ব্যবসায়ের অংশীদার হলেন। তাঁদের স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতি তিনি অনুপ্রাণিত করলেন। আর তাঁর উইলে দেখা গেল—পত্নী ও অন্যান্যদের জন্য তিনি রেখেছেন এক লক্ষ টাকা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা, জেলা দাতব্য ভাণ্ডারের জন্য বিশ হাজার টাকা।

বাণিজ্যে এই কৃতিত্বের সঙ্গে রামগোপালের চরিত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হতে

থাকে। অবশ্যই ইংরেজ শাসককুলের তিনি ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ১৮৬২-৬৪ সালে তিনি ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন, অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ কমিটির সদস্য এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। ইংরেজ-প্রীতি বা রাজানুগত্য তাঁর ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেইসঙ্গে এমন কিছু কর্ম, বক্তৃতা এবং প্রবন্ধের তিনি স্রষ্টা ছিলেন যাতে তাঁকে সরকার-বিরোধী ভূমিকাতেও চিহ্নিত করা যায়। অবশ্যই একথা স্মরণীয়, ১৮৮৫ সালে এদেশে অক্টাভিয়ান হিউমের নেতৃত্বে যে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম—তার মূলকথাই ছিল নাকি 'আবেদন নিবেদন'। সেক্ষেত্রে বরং রামগোপালের নানা ভূমিকার প্রশংসা করতে হয়—যেমন ১৫ এপ্রিল ১৮৪৩ তারিখে 'কলিকাতা নগরবাসী কর-দায়কদিগের' যে সভা হয়েছিল তাতে তিনি সিটিজেন কমিটির "কার্যনির্বাহ নিয়ম" এবং রেমফ্রি-কৃত "নিয়মের" অন্ধ সমর্থন করেননি, এই বিতর্কে উদ্যোক্তারা তাঁর যুক্তি খণ্ডন করতে পারেননি। ফলে প্রস্তাব এক মাসের জন্য স্থগিত রাখতে হয়। ১৮৪৭ সালে টাউন হলে ২৪ ডিসেম্বরের এক সভায় লর্ড হার্ডিঞ্জকে অভিনন্দন জানাবার জন্য ব্যারিস্টার হিউম, জেমস উইলিয়ম কলভিল, টমাস টারটন একটি খসড়া রচনা করেছিলেন। কিন্তু এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানান রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য ছিল খসড়ায় ভারতে লর্ড হার্ডিঞ্জের শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের কোনো উল্লেখ নেই। এর উল্লেখ প্রয়োজন। শ্বেতাঙ্গরা এর বিরুদ্ধে গেলেন। রামগোপাল সেই সভায় তাঁর বাগ্মিতার গুণে প্রশংসাসূচক একটি অনুচ্ছেদ যুক্ত করতে বাধ্য করলেন প্রতিপক্ষকে। ডেভিড হেয়ারের মূর্তি প্রতিষ্ঠায় রামগোপালের সক্রিয় উদ্যোগও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শিক্ষাবিষয়ে তাঁর উৎসাহ উদ্যোগ সেই সময়ের প্রেক্ষিতে বিচার করলে অবশ্যই তাঁকে প্রশংসা করতে হয়। এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে রামগোপাল প্রতিষ্ঠিত "সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা" বা "এপিস্টোলারি অ্যাসোসিয়েশন" এবং ১৮৪৩ সালে স্থাপিত "বেঙ্গল ব্রিটিশ সোসাইটি"—একে অনেকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের সূতিকাগার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

ছোট আদালতে দ্বিতীয় জজের পদগ্রহণের জন্য তখনকার ব্রিটিশ সরকার তাঁকে অনুরোধ জানায়। এই পদের জন্য তাঁকে মাসে দু হাজার টাকা দেবার প্রস্তাবও করা হয়। তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। প্রথমত আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য, দ্বিতীয়ত সরকার সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। একথা বলা যাবে না যে, রামগোপাল সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আক্রমণ করেছেন, কিন্তু সমালোচনা থেকে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে বিরত থেকেছেন, একথাও বলা যাবে না। তাঁর মধ্যে সেই কালের দ্বন্দ্ব, স্ববিরোধ সক্রিয় ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই তার প্রকাশ ঘটেছে। যেমন ঘটেছে 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট'র ওপর মতামতে। "A Few Remarks on Certain Draft Acts, Commonly Called Black Acts" নামে পরিচিত তাঁর রচিত এই পুস্তিকাটি। ১৮৪৯-৫০ সালে জন এলিয়ট ড্রিংকওয়াটার বেথুন বড়লাটের শাসন পরিষদে চারটি

আইনের খসড়া উপস্থাপন করেন। এগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল বিচার-ব্যবস্থায় ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ এবং সরকারী কর্মচারীদের আইনসঙ্গতভাবে বেসরকারী ইউরোপীয়দের আক্রমণ থেকে রক্ষণ। এগুলিকে এ দেশীয় ক্রুদ্ধ ইংরেজরা ব্ল্যাক অ্যাক্ট আখ্যা দিয়ে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়।

রামগোপাল পুস্তিকার মাধ্যমে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। তিনি ইংরেজদের যে শত্রু জ্ঞান করেন না একথা যেমন বলেন, তেমনি তিনি বিচারব্যবস্থায় সাম্য আনার পক্ষে—একথাও জানান। ক্রুদ্ধ ব্রিটিশদের আন্দোলনকে স্তিমিত করার অভিপ্রায় যেমন তাঁর ছিল না, তেমনি এদেশের ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতিও তাঁর যে কর্তব্য আছে, তা তিনি ব্যক্ত না করে পারেন না : "So long as that cause does not interfere with the happiness and prosperity of my own Brethren of the soil." ব্ল্যাক অ্যাক্টের সমর্থন এবং স্বদেশের ভ্রাতৃগণের স্বার্থ রক্ষার সংকল্প রামগোপালকে সে সময়ে দেশপ্রেমিক হিসেবে সমুন্নত গৌরব দিয়েছিল।

মনে রাখতে হবে, ততদিনে ডিরোজিওর মতো আর এক দুরন্ত ব্যক্তিত্ব পৌঁছে গেছেন বঙ্গের উনিশ শতকের সমাজমঞ্চে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা পৌরুষ নির্ভীকতা বঙ্গসমাজকে দিয়েছে এক নতুন আত্মমর্যাদাবোধ। ১৮৫৬ সালে যাঁর সমর্থনে উদ্দীপিত হয়ে লর্ড ডালহৌসির অনুমোদন পায় "হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন।" আজকের দিনের ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে কি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর মনে হয় এই আইন? কিংবা ব্ল্যাক অ্যাক্টের ওপর ক্ষুদ্র পুস্তিকা? কে কী বলবেন জানি না, আমি বলতে চাই, গুজরাতের সোমনাথ মন্দির থেকে আটের দশকে এক রামরথ তার যাত্রা শুরু করে এই ভারতবর্ষে। আর সেই পথের দুধারে অসংখ্য জনপদ হয় অগ্নিদগ্ধ, মানুষের হাতে নিহত হয় শিশু নারী, যুবতীরা ধর্ষিতা হয়, অক্ষম পুরুষেরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে—সেই পথের প্রান্তে, সেইসব জনপদে উনিশ শতকের রামগোপাল ঘোষ বা ঈশ্বরচন্দ্র বা ডিরোজিওর মতো কিছু ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে দিলে, তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদের কোনো কথা কইবার কি মুখ থাকবে?

□ সমীর রক্ষিত

রেনেশাঁসের মানুষ পাদরি লং সাহেব

রেনেশাঁসের মানুষ ছিলেন রেভারেণ্ড জেমস্ লং। পাদরি লং হিসেবেই তিনি বাঙ্গালীর কাছে পরিচিত ছিলেন। জাতিতে তিনি ছিলেন আইরিশ। তাই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতবর্ষে এসেও তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গেই বেশি মিশতেন। ওপরওয়ালা সাহেবদের তিনি বিশেষ তোয়াক্কা করতেন না। তাঁর জন্ম ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে। ১৮৩৯ সালে তিনি ইংলন্ডের গির্জার অন্যতম যাজক নিযুক্ত হন। তখন তিনি ছিলেন ডিকন, পরে হন প্রিস্ট বা পুরোহিত। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে লং সাহেব ভারতে আসেন ১৮৪০ সালে। তিনি তখন রেভারেণ্ড জেমস্ লং। আর পাঁচজন পাদরির মতো তিনি যদি শুধুই পতিত উদ্ধারের জন্য প্রভু যীশুর বাণী প্রচারেই আত্মনিয়োগ করতেন, তাহলে আজ তাঁকে বিশেষভাবে স্মরণ করার কোনো প্রয়োজন হোত না। কিন্তু রেভারেন্ড লং ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া মানুষ। তিনি এদেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা বোঝবার যেমন চেষ্টা করেছিলেন, তেমনি তিনি বিশেষ আগ্রহ নিয়ে জনশিক্ষা প্রসার ও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে সচেষ্ট ছিলেন।

রেভারেণ্ড লং ছিলেন বহুভাষাবিদ। ইয়োরোপের অনেক ভাষা তিনি জানতেন। ভারতে আসার আগে তিনি কিছুদিন রাশিয়াতে ছিলেন। কলকাতায় এসে তিনি প্রথমে মির্জাপুর অঞ্চলে একটি স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে তিনি ঠাকুরপুকুরে গিয়ে তাঁর মিশনারির দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়েই তিনি বাংলার গ্রামাঞ্চলে ঘুরে জনসাধারণের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হন। ঔপনিবেশিক শাসনকর্তাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। শাসনের নামে শোষণ ও উৎপীড়নই ছিল তাদের লক্ষ্য। পাদরি লং অন্য দৃষ্টিতে দেখেন ভারতবর্ষকে। শিক্ষাদান করতে গিয়ে তিনি বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির নানাবিধ কর্মসূচীর সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন। লং সাহেব ভারতে ছিলেন প্রথমে ১৮৪০-১৮৬২ সাল এবং পরে ১৮৬৬-১৮৭২ সাল, এই মোট ২৮ বছর। এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে অনেক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে। তার মধ্যে প্রধান হল ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহ, যা ইতিহাসের দৃষ্টিতে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আর একটি ঘটনা হল নীলচাষীদের বিদ্রোহ। রেভারেণ্ড লং এই দুই ঘটনার সঙ্গেই জড়িত ছিলেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহিদের বিদ্রোহ দমনের নামে ইংরেজ সরকারের চরম বর্বরতায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন পাদরি লং। তিনি সাহস যুগিয়েছিলেন

হিন্দু পেট্রিয়টের হরিশ মুখার্জিকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলম চালাতে। সিপাহি বিদ্রোহকে উস্কানি দেবার অভিযোগে সংবাদপত্রের ওপর সেনসরশিপ চালু হয়। এর শিকার হয় ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি। বড়লাট ক্যানিং লং সাহেবকে ডেকে ভার দিলেন মহাবিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা নিয়ে একটা তদন্ত করে সরকারকে রিপোর্ট দিতে। ব্রিটিশ মালিকানার কাগজগুলি—ইংলিশম্যান, বেঙ্গল হরকরা অনবরত তখন গর্জন করছে, ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোকে শায়েস্তা করা হচ্ছে না কেন? সারাদেশে সামরিক আইন জারি করার পক্ষে তারা ওকালতি করছিল। ক্যানিং তাদের কথায় কান দেননি। পাদরি লং-এর বিচার-বিবেচনা ও অভিজ্ঞতার ওপর বিশ্বাস ছিল লর্ড ক্যানিং এর। লং সাহেব তাঁর রিপোর্টে পরিষ্কার বললেন, ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করা হয়েছে তা সত্য নয়। বিদ্রোহের উস্কানি দেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবে জনসাধারণের মধ্যে যে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিলো সে বিষয়ে সরকার অবহিত হতে পারতেন, যদি তাঁরা ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজগুলি, বিশেষ করে দিল্লি ও উত্তর ভারতের উর্দু, ফার্সি পত্রিকাগুলির প্রতিবেদন পাঠ করতেন। লং সাহেবের এই সুপারিশের পর থেকে ব্রিটিশ সরকার সংবাদপত্রের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলার নীতি গ্রহণ করে। সরকারী বিবৃতি সংবাদপত্রকে দেওয়া এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ ও মন্তব্যের সারাংশ সরকারি স্তরে পর্যালোচনার ব্যবস্থাও করা হয় লং সাহেবের সুপারিশ অনুযায়ী।

আর একটি ঘটনার জন্যও লং সাহেবের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। নীলচাষীদের ওপর নীলকরদের অবর্ণনীয় অত্যাচার তখন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। রেভারেন্ড লং জেলায় জেলায় ঘুরে তা নিজের চোখে দেখেছেন। উচ্চতম মহলে তার প্রতিকারের দাবি জানিয়েছেন। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক প্রকাশের পর একটা সাড়া পড়ে যায় চারদিকে। ঠিক হয় যে, নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ করে প্রচার করতে হবে যাতে এদেশে ও বিলেতে বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নীলচাষীদের দুর্দশার প্রতি। নাটকটির ইংরেজি তর্জমা করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। রেভারেন্ড লং নাটকটির জন্য একটি মুখবন্ধ রচনা করে তার বিষয়বস্তুর প্রতি সমর্থন জানান। এটি 'দি ইন্ডিগো মিরর' নামে ক্যালকাটা প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং প্রেস থেকে ছাপা হয়। মুদ্রাকরের নাম ছিল সি. এইচ. স্যামুয়েল। নাটকটি প্রকাশিত হবার পর রেভারেন্ড লং-এর নাম দেখেই বাংলা সরকারের সেক্রেটারি তার ৫০০ কপি কিনে সরকারী মহলে তা প্রচার করেন। স্বভাবতই নাটকে নীলকর সাহেবদের যে অত্যাচার ও নারী ধর্ষণের বর্ণনা আছে, তা পড়ে সাগরপারে এবং এদেশেও তুমুল হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। সাম্রাজ্যবাদীরা ক্ষিপ্ত হয়ে রেভারেন্ড লং এবং মুদ্রক স্যামুয়েলকে এর জন্য দায়ী করে তাঁদের বিরুদ্ধে মানহানি ও কুৎসা প্রচারের অভিযোগে মামলা করে।

বিচারে কী হবে তা আগেই আঁচ করা গিয়েছিল। কারণ বিচারক স্যার মর্ডান্ট লসন ওয়েলস্ ছিলেন স্পষ্টতই নীলকর সাহেবদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। রেভারেন্ড লং নাটক প্রকাশের সমস্ত দায় ও দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেন। মুদ্রক স্যামুয়েলের নামমাত্র জরিমানা হয়। লং সাহেবের একমাস কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। রায়ের দিন আদালত ছিল লোকারণ্য। কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎক্ষণাৎ হাজার টাকা জরিমানা জমা দিয়ে দেন। মামলার সমস্ত খরচ বহন করেছিলেন পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ।

বিচারটা ছিল প্রহসন। আসলে লং সাহেব তাঁর নির্ভীকতা ও ভারতীয়দের প্রতি ভালোবাসার জন্য ঔপনিবেশিক ইংরেজদের চক্ষুশূল হয়েছিলেন। তাই এই মামলা সাজিয়ে হয়রানি ও তাঁকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা। কিন্তু পক্ষপাতিত্বমূলক রায়ের বিরুদ্ধে সর্বত্র ধিক্কার ধ্বনিত হয়। ইংলন্ডের অনেক সংবাদপত্রও এই বিচারের তীব্র সমালোচনা করে। লং সাহেব যতদিন জেলে ছিলেন, তাঁকে দেখবার জন্য রোজই দলে দলে লোক আসতেন। লং সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য গ্রাম থেকে চাষীরাও আসতেন কলকাতায়। কিন্তু এই ঘটনার পর ব্রিটিশ শাসকদের টনক নড়ে যায়। লং সাহেবের বিচার ও কারাদণ্ড এবং হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশ মুখার্জীর অগ্নিগর্ভ সম্পাদকীয় ও প্রতিবেদন নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে জনমত জাগ্রত করে। সরকার বাধ্য হয় এ সম্পর্কে তদন্তের জন্য নীল কমিশন বসাতে। হরিশের অকালমৃত্যু (১৮৬১) এবং লং-এর কারাদণ্ড নিয়ে লিখিত ছড়ার পংক্তি লোকমুখে প্রচারিত হয়ে প্রবাদ-প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে :

> নীল বানরে সোনার বাংলা করলে এ যে ছারখার
> অসময়ে হরিশ ম'ল, লঙের হল কারাগার
> প্রজার এখন প্রাণ বাঁচানো ভার ॥

লং সাহেবের কাজের অন্য দিকটিও কম মূল্যবান নয়। তা হল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে তাঁর নিরলস প্রয়াস।

তিনি কলকাতায় এসেই বাংলাভাষায় প্রকাশিত বই সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করেন। এই অনুসন্ধানের ফলশ্রুতিতে ১৮৫২ সালে তিনি প্রথমে একটি বাংলা গ্রন্থের তালিকা প্রকাশ করেন। এটাই বাংলাভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থাদির প্রথম তালিকা। এটি ছিল পঁচিশ পৃষ্ঠার পুস্তিকা। তাতে ছিল গ্রন্থের নাম এবং বিষয়-নির্দেশ। এরপরেও তিনি কয়েকটি গ্রন্থ-তালিকা প্রকাশ করেন। তার একটি হল **Returns Relating to Native Printing Presses and Publications in Bengali 1853-54.**

১৮৫৫ সালে তিনি দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করেন, যার নাম : **A Return of the names and writings of 515 persons connected with Bengali**

literature, either as authors or translators of printed works, chiefly during the last fifty years.

এই তালিকার সঙ্গে ছিল ১৮১৮ থেকে ১৮৫৫ পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের বিবরণ ও তালিকা। এতেই পাওয়া যায় হানা ক্যাথেরিন ম্যালেন্স বিরচিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' গ্রন্থের উল্লেখ। ১৮৫৫ সালে লং সাহেব প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত বাংলা বইয়ের ক্যাটালগ : A Descriptive Catalogue of Bengali Works এতে ছিল পূর্ববর্তী ৬০ বছরে বাংলাভাষায় প্রকাশিত সমস্ত বইয়ের বিবরণ। গ্রন্থসংখ্যা ছিল ১৪০০। প্রথম মুদ্রিত বাংলা অক্ষর পাওয়া যায় হ্যালহেডের 'এ গ্রামার অভ্ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' বইয়ে। সেটি প্রকাশিত হয় ১৭৭৮ সালে। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পরই বাংলা বইয়ের মুদ্রণ প্রচলিত হয়। সে হিসেবে লং সাহেবের ক্যাটালগে বাংলা মুদ্রণের আদিযুগ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা পাওয়া যায়।

লং সাহেবের আর একটি স্মরণীয় কাজ বাংলা প্রবাদমালা সংকলন ও তার প্রকাশ। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালে। এতে ছিল তিন হাজার বাংলা প্রবাদ, লং-এর ভাষায় Three Thousand Bengali Proverbs and Proverbial Sayings illustrating Native Life and feeling among Ryots and Women.

একটি দেশকে জানতে হলে তার লোকায়ত জীবনের পরিচয় জানা এবং তার সাহিত্য-সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন, বিদগ্ধ পাদরি লং সাহেব তা জানতেন। আরও বহুবিধ কাজে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। তাঁর সব কাজেরই লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের মানুষকে জানা এবং তাদের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য যতদূর সম্ভব সহায়তা করা।

১৮৭২ সালে তিনি ভারত ছেড়ে ইংলন্ডে চলে যান। তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানায় বড়বাজার ফ্যামিলি লিটারেরি ক্লাব (২০ মার্চ, ১৮৭২)। প্রতিভাষণে লং সাহেব বলেছিলেন যে, বাংলা ভাষার অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পুরনো সংস্কৃত রচনাভঙ্গির বদলে কথ্য বাকভঙ্গিতে বাংলা লিখিত হচ্ছে। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁর বাঙ্গালী বন্ধুরা শুধু কথায় নয় কাজের মানুষ হবেন। দেশে ফিরে গিয়েও এই মনস্বী মানুষটি তাঁর কর্মধারা অব্যাহত রাখেন। ভারত সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ আজীবন ছিল অটুট। ভারতীয়রা লন্ডনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি আমাদের দেশের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন এবং এ বিষয়ে তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরামর্শ দিতেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৮৭ সালে ৭৩ বছর বয়সে, লন্ডনে। আমহার্স্ট স্ট্রীটে সেন্ট পলস্ কলেজ সংলগ্ন যে গির্জা আছে সেটিই লং সাহেবের গির্জা নামে পরিচিত। লং সাহেবের অনুরাগীরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে গির্জার অভ্যন্তরে

একটি মর্মর ফলক স্থাপনা করে রেখেছেন। এই পবিত্র ফলকের মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের কাজ।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে এ দেশের মাটিতে বেশ কয়েকজন মহৎ মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। নতুন যুগ গড়ে তোলবার সাধনায় ভক্তি ও বান্দিত্ব থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষের মনকে মুক্তি দেবার অক্লান্ত প্রয়াসে তাঁরা স্বদেশকে মহীয়ান করেছেন। এই সময় কালেই ইউরোপ ভূখণ্ড থেকেও নানা কারণে এদেশে এসেছেন অনেক বিদেশী মানুষ। সংকীর্ণ স্বার্থ ভুলে, বৃহত্তর মানব কল্যাণে এঁরা নিয়োজিত করেছিলেন নিজেদের। এঁদেরই মধ্যে একজন পাদরি লং।

তিনি সাগরপার থেকে এসে এই বাংলায় এবং কলকাতা শহরে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় অতিবাহিত করে বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং ভারতবর্ষের নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সংগ্রামের সহযাত্রী হয়েছেন। তাঁর জীবন, কর্ম-উদ্যম ও অনুসন্ধিৎসা রেনেশাঁসের যুগের মানুষকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

□ কৃষ্ণ ধর

অক্ষয়কুমার দত্ত—রেনেশাঁসের পূর্ণাঙ্গ মানুষ

শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে বাংলাদেশের উনিশ শতক রেনেশাঁসের কাল বলে চিহ্নিত। বহুকথিত এই শব্দটি আমাদের চেতনায় সার্বিক নবজাগৃতির একটি ভাবানুষঙ্গ বহন করে আনে। গোটা উনিশ শতক জুড়ে এই জাগৃতি কতখানি সমুচ্চতা লাভ করেছিল, এ প্রবন্ধে সে আলোচনার স্থান নেই। একশ বছরের ইতিহাস একই লয়ে চলেনি—উত্থান-পতনে তার চলার পথ বন্ধুর ছিল। তবু এই শতকেই শুরু হয়েছিল মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়ে আধুনিক যুগে প্রবেশের মানসিক ও বাস্তবিক প্রস্তুতিকরণ। এই প্রস্তুতিকরণকেই আমরা বাঙ্গালীর রেনেশাঁস বলে চিহ্নিত করতে পারি। প্রস্তুতির পর্বে যাঁরা ছিলেন রেনেশাঁসের প্রথম সারির স্থপতি অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁদের অন্যতম।

ইউরোপে পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতকে শিল্প-সাহিত্য রচনা, জ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞানী অনুসন্ধিৎসা, ধর্ম-জিজ্ঞাসা সর্বক্ষেত্রেই নবীকরণের যে সার্বিক প্রস্তুতি দেখা দিয়েছিল, তার মূলে ছিল ইহবাদী চেতনার অভ্যুদয়। সামাজিক সত্তার নির্মোক ভেঙ্গে গিয়ে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বাভাবিক চেহারাটি এই প্রথম দেখা গেল। সে আর নিজেকে পরভৃত করে রাখতে ইচ্ছুক নয়, শুরু হল ধর্মীয় ও সামাজিক কর্তৃত্বের বন্ধন মোচনের কাল। এ কাজে নবযুগের মানুষের সবচেয়ে বড় সহযোগী হল সদ্য আবিষ্কৃত মুদ্রণযন্ত্র। হাতে লেখা পুঁথির পরিবর্তে এল ছাপানো বই, গড়ে উঠলো পাঠকসম্প্রদায়। অবশ্য এইসঙ্গে বটতলার পড়ুয়ারাও ছিল, তবে ইতিহাস রচনায় এদের কোনো ভূমিকা ছিল না। ছাপাখানা ছাড়া নবজাগৃতির বাণীকে ছড়িয়ে দেবার বিকল্প কোনো পথ ছিল না।

ঔপনিবেশিক শাসন সত্ত্বেও পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীকাল থেকে বাংলাদেশে সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের পট-পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। বণিক, মুৎসুদ্দী, দালাল, জমি-ব্যবসায়ী এবং অল্প হলেও শিল্পোদ্যোগী পুঁজিপতি শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে। উদ্যোগী ব্যবসায়ীরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে 'এজেন্সি হাউস'-গুলির দেওয়ানি ও মুৎসুদ্দীগিরি করে এবং পরে ব্রিটিশ-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের বেনিয়ান ও এজেন্ট হিসেবে প্রভূত ধন সঞ্চয় করেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'তখন নিমকমহলের দেওয়ানি লইলেই লোকে দুইদিনে ধনী হইয়া উঠিত। এইরূপে শহরের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ধনী হইয়াছেন।' (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ) ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর ছায়াতলে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের পার্শ্বচর ও অনুচর হয়ে এদেশের

ধনিক-গোষ্ঠীর প্রাথমিক বিকাশ ঘটেছে। সেইসঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে অলস অত্যাচারী জমিদারশ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে। এ'রা সবাই ছিলেন বিলাসী সমাজের লোক— রেনেশাঁসের নতুন মানুষ নন।

নবজাগৃতির মূল ছিল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মানুষের নতুন ভাবনায় এবং কর্মোদ্যোগে। এ'রা ছিলেন বেশির ভাগ চাকুরিজীবী, কেউ বা কৃষিজীবী। এদের পুঁজি স্কুল-কলেজের শিক্ষা। এ'রা হলেন শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, কবিরাজ, জজ, ব্যারিস্টার, উকিল, এটর্নি, মুহুরি, সংবাদপত্রের সম্পাদক, গ্রন্থকার, সরকারী আমলা, কেরানি ইত্যাদি। এ'দেরই একটি অংশ শাস্ত্র, ধর্ম, দেশাচার, কুসংস্কার নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। এসবের হাত থেকে মুক্ত হয়ে আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পথ ধরে এ'রা চাইলেন সত্যকে আবিষ্কার করতে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইউরোপীয় রেনেশাঁসের ব্যাপকতা প্রত্যাশা করা না গেলেও তার গভীরতা এবং আন্তরিকতা কম ছিল না।

কলকাতা মহানগর হয়ে উঠলো রেনেশাঁসের প্রাণকেন্দ্র। এ শহরে একদিকে যেমন চলেছিল বিত্ত ও বিষয়ের প্রতিযোগিতা, অন্য দিকে এল চিত্ত ও মননের প্রসার। রেনেশাঁসের মানুষ অ-বৈষয়িক ছিলেন না। যুক্তি ও বুদ্ধির অভিযানের সঙ্গে বিষয়কর্মের বিরোধ দেখেননি তাঁরা। তাঁরা টাকার দাস ছিলেন না, ছিলেন 'প্র্যাকটিকাল ম্যান'। বিদ্যাসাগর তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

অক্ষয়কুমার দত্ত যখন জন্মালেন তখন কলকাতায় রেনেশাঁসের জমি কর্ষণ সবে শুরু হয়েছে, ফলন আরম্ভ হতে তখনো অনেক দেরি। হিন্দু স্কুল স্থাপিত হয়েছে মাত্র চার বছর। খ্রীস্টান মিশনারীদের ছাপানো 'সমাচার দর্পণ' ছাড়া কলকাতার মানুষ তখনো দ্বিতীয় কোনো সাময়িক পত্রের মুখ দেখেনি। সতীদাহ-প্রথা আইনত রদ হতে তখনো ন'বছর বাকি। কলকাতার সান্ধ্য আসর তখন কবিগান, খেউড়, হাফ আখড়াই-এর স্থূলরসে মশগুল থাকতো। কলকাতার এই পরিবেশ থেকে অনেক দূরে অক্ষয়কুমার জন্মেছিলেন বর্ধমান জেলার চুপি গ্রামে এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে।

এ প্রসঙ্গে নবজাগৃতির শ্রেষ্ঠ মানুষ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের জীবনের কয়েকটি সাদৃশ্যের কথা স্বতই মনে আসে। দুজনেই জন্মেছেন কলকাতা থেকে দূরে গ্রামবাংলায়, দুজনের জন্ম একই বছরে। শিক্ষালাভের জন্য দুজনকেই কলকাতা আসতে হয়েছে। দুজনকেই দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে হয়েছে। দুজনেরই জ্ঞান-পিপাসা এবং মনীষিতা ছিল অগাধ। কর্মসূত্রেও দুজন দুজনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের জন্য ন'বছর বয়সেই অক্ষয়কুমারের কলকাতা আসার সুযোগ ঘটেছিল। কয়েক বছর পর তিনি ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ভর্তি হয়েছিলেন। এ সময়ে ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, অঙ্ক, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ইংরেজি ও গ্রীক সাহিত্য নিয়ে

তাঁর বিদ্যাচর্চা স্কুলের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। এ যুগ হল জ্ঞানচর্চার যুগ, যুক্তিবোধের যুগ—অক্ষয়কুমার এ যুগেরই যুগপুরুষ।

উনিশ বছর বয়সে অক্ষয়কুমার তাঁর পিতাকে হারান। মায়ের নির্দেশে বিদ্যালয়ের পড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি বিষয়কর্মের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলেন। তখন তাঁর নিজেরও সংসার হয়েছে। কিন্তু বিষয়কর্মের সঙ্গে জ্ঞানোন্নতির সাধনা চললো পুরোদমে—সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে। এ সময়ে তিনি সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক কবি ঈশ্বর গুপ্তের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। এই পত্রিকার জন্য তিনি ইংরেজি কাগজ থেকে বাংলায় অনুবাদ করে দিতেন, স্বাধীন রচনাও লিখেছেন বেশ কয়েকটি।

উনিশ শতকের তিরিশের দশকে কলকাতার জনসমাজ একদিকে ইয়ং বেঙ্গলদের বিদ্রোহে সচকিত, অন্য দিকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসুর ঐতিহ্য সমন্বিত আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসায় সশ্রদ্ধ। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ নিজের বাড়িতে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুখ্যত 'জ্ঞানোন্নতি সাধন', 'তথ্যানুসন্ধান', 'শাস্ত্রালোচনা' ও রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মের মতাদর্শ ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে। কবি ঈশ্বর গুপ্তের প্রস্তাবে অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য মনোনীত হলেন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষকতাও করেছিলেন কয়েক বছর। এখানে পড়ানোর সময়ে তিনি তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ভূগোল' রচনা করেছিলেন।

অক্ষয়কুমার বুঝেছিলেন জ্ঞানচর্চা, যুক্তিচর্চা, বুদ্ধিচর্চা এসবের জন্য চাই সরল বাংলাভাষা এবং সাময়িক পত্রিকা। বাঁশবেড়িয়ায় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি প্রধানত বঙ্গভাষা অনুশীলনের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই একটি পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। 'বিদ্যাদর্শন' মাসিক পত্রিকাটি ছ'টি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। প্রথম সংখ্যায় তিনি বাংলার মৃতপ্রায় ভাষার উজ্জীবন কামনা করেছিলেন।

অক্ষয়কুমারের মনীষার পথ উন্মুক্ত হল ১৮৪৩ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশে। তিনি তার প্রথম সম্পাদক এবং প্রধান লেখক। বারো বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি এই পত্রিকা পরিচালনা করেছিলেন। একসময়ে সাতশো জন এর গ্রাহক হয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনী বাংলা সাময়িক পত্রের গতানুগতিক ধারাকে পরিবর্তিত করে দিল। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—'প্রভাকরের রাজত্ব যখন মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান তখন ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তত্ত্ববোধিনী বঙ্গীয় পাঠকগণকে গম্ভীর জ্ঞানের বিষয়সকলের আলোচনায় প্রবৃত্ত করে এবং তদ্বারা বঙ্গ সমাজে এক মহৎ পরিবর্তন আনয়ন করে। ··সেই সময় আরও অনেকগুলি সংবাদপত্র বাহির হইয়াছিল। ··ইহাদের অধিকাংশ পরস্পরের প্রতি অভদ্র গালাগালিতে পূর্ণ হইত। প্রভাকরে ও ভাস্করে এরূপ অভদ্র কটূক্তি চলিত যে তাহা শুনিলে কানে হাত দিতে হয়।' (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ)

নবজাগৃতির যুগে কলকাতায় ১৮৪৩ সালটি নানা কারণে স্মরণীয়। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপন করে এ বছর ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী মেতে উঠেছিলেন। এই বছর দেবেন্দ্রনাথ কুড়ি জনকে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন। হিন্দুর ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার এবং পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করে এক ঈশ্বরের উপাসনায় যাঁরা ব্রতী হলেন তাঁদের হৃদয়বল ও বুদ্ধিবল কোনোটাই কম ছিল না। অক্ষয়-কুমার এই দলে ছিলেন। এর চার মাস আগেই তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্বরচিত জীবন চরিতে' লিখেছেন, "সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। ...তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর। ...আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইঁহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব। ...আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয়কুমারকে ঐ কার্যে নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ পাতাল প্রভেদ।'

জীবনের এই নবতর জিজ্ঞাসাতেই অক্ষয়কুমার অনন্য। ১৮৫১-৫২তে অক্ষয়-কুমারের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "বাংলা গদ্যের এক নবযুগের অবতারণা হইল। (সে সময়ে বিদ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতি ছাড়া আর কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি) বিশেষত 'বাহ্যবস্তুর' প্রচার যুবক দলের মধ্যে এক নবভাবকে উদ্দীপ্ত করে। · সামাজিক নীতি ও চরিত্র সম্বন্ধে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন উপস্থিত হয়। বাস্তবিক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই সময় বঙ্গ সমাজের নেতৃগণের মধ্যে একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন।"

বাস্তবিক পক্ষে দেবেন্দ্রনাথকেই শেষ পর্যন্ত অক্ষয়কুমারের বহু যুক্তি এবং সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী ছিলেন। ১৮৫০-এ তিনি অক্ষয়কুমারের মতকে যুক্তিসিদ্ধ বলে স্বীকার করে নিয়ে বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততার ধারণা পরিত্যাগ করলেন। অসাধারণ যুক্তিবাদী ছিলেন অক্ষয়কুমার। ব্রাহ্ম হয়েও তিনি প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করেন নি। সমীকরণের সূত্র দিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন প্রার্থনা অনাবশ্যক। পরিশ্রম = শস্য, প্রার্থনা ও পরিশ্রম = শস্য, অতএব প্রার্থনার শক্তি = ০।

অক্ষয়কুমার মধ্য বয়সেই কঠিন শিরোরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি জ্ঞানচর্চার দরজা বন্ধ করেননি। বিদ্যাসাগরকে তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়ে তিনি অবসর নিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত নর্মাল স্কুলের প্রধান

শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেও শারীরিক কারণে তা তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়। শেষ পর্যন্ত গ্রন্থস্বত্ব থেকেই তাঁর সংসার চলতো। ১৮৮৬-তে রেনেশাঁসের অতন্দ্র সাধক অক্ষয়কুমারের মৃত্যু হয়।

রেনেশাঁস যে সব পূর্ণাঙ্গ মানুষের জন্ম দিয়েছিল, অক্ষয়কুমার ছিলেন তাঁদের একজন। বিদ্যাসাগরের মতো তিনি সংস্কর্তা ছিলেন না, ছিলেন মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদের প্রবর্তক। ইয়ং বেঙ্গলদের অসহিষ্ণুতা তাঁর মধ্যে ছিল না। ব্রাহ্ম সমাজের অনেক রীতিনীতিকেও তিনি মেনে নিতে পারেননি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর অজস্র প্রবন্ধ আজও সংকলিত হয়নি। তিনি চেয়েছিলেন বুদ্ধিজীবী মানুষ। চেয়েছিলেন বস্তুধর্মী মানবতাবাদী মানুষ, চেয়েছিলেন যুক্তিবাদী মানুষ। তাঁর সমস্ত রচনা সেই উদ্দেশ্যে রচিত। সমাজ সংস্কারে তাঁর যোগ ছিল—কিন্তু তাঁর সাধনার ক্ষেত্র ছিল লেখনী ধারণে। রেনেশাঁসের ভূমিতে ফলে একই বুদ্ধিজাত মানসিকতার দুটি ফসল—একদিকে জ্ঞানসাধনা, অন্যদিকে সংস্কার সাধন। কখনো কখনো একটি আর একটির পরিপূরক হয়ে ওঠে। যেমন ঘটেছিল বিদ্যাসাগরের জীবনে। অক্ষয়কুমার সমাজ শোধনে নামেন নি। তিনি খুঁজেছেন রেনেশাঁসের পূর্ণাঙ্গ মানুষ। 'চারুপাঠ', 'ধর্মনীতি', 'পদার্থ বিদ্যা', 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থসমূহে তাঁর মনীষিতা নবজাগৃতির নব্যবোধকেই শিক্ষিত বাঙ্গালীর মর্মে পৌঁছে দিতে চেয়েছে।

□ বিশ্বজীবন মজুমদার

শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনন্য পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

যে বলিষ্ঠ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজের ক্ষেত্রে আমাদের দৃপ্ত অভিযান, ঈশ্বরচন্দ্র তার অনন্য স্রষ্টা। তা ছাড়া, তাঁর কর্মকাণ্ডের যে দিকগুলি সযত্নে গোপন করার প্রয়াস আছে, তাও সজোরে উত্থাপন করা প্রয়োজন। সে দিকে লক্ষ্য রেখেই কয়েকটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করছি স্বল্প পরিসরে।

শুধুই বিদ্যার সাগর ও দয়ার সাগর হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখানোর মধ্যে যে অপকৌশল রয়েছে, তা ধরা পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের চোখে :

"আমাদের দেশের লোকেরা এক দিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না করে থাকতে পারেন নি বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের যে মহত্ত্বগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখতে চান। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড়ো পরিচয় সেইটিই তাঁর দেশবাসীরা তিরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন। ...যাঁরা অতীতের জড় বাধা লঙ্ঘন করে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করে নিয়ে যাবার সারথি-স্বরূপ, বিদ্যাসাগরমহাশয়, সেই মহারথীগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন, আমার মনে এই সত্যটিই সবচেয়ে বড়ো হয়ে লেগেছে।...

সেদিন সমস্ত সমাজ এই ব্রাহ্মণতনয়কে কিরূপে আঘাত ও অপমান করেছিল তার ইতিহাস আজকার দিনে ম্লান হয়ে গেছে; কিন্তু যাঁরা সেই সময়ের কথা জানেন তাঁরা জানেন যে, তিনি কত বড়ো সংগ্রামের মধ্যে একাকী সত্যের জোরে দাঁড়িয়েছিলেন। ..

এই ব্রাহ্মণতনয় যদি তাঁর মানসিক শক্তি নিয়ে কেবলমাত্র দেশের মনোরঞ্জন করতেন তা হলে অনায়াসে আজ তিনি অবতারের পদ পেয়ে বসতেন এবং যে নৈরাশ্যের আঘাত তিনি পেয়েছিলেন তা তাঁকে সহ্য করতে হত না।" (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৯)

তাই "দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।"

"আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ

কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায়—মানব-ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।" (চারিত্রপূজা)

কিন্তু মানুষ করবার ভারটা তো সহজসাধ্য নয়। সমাজে তখন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের প্রবল প্রতাপ। সাধারণ মানুষ ধর্মীয় কুসংস্কারের বেড়াজালে ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বন্ধজলায় আবদ্ধ। শিল্প শ্রমিকের তখন জন্মলগ্ন মাত্র। সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেনি তখনো। গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছিল অনুপস্থিত। এমনি এক পরিবেশে প্রসারিত হয়েছে বিদ্যাসাগরের বিপুল কর্মকাণ্ড।

ইয়ং বেঙ্গল ও বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রাবস্থায় হিন্দু কলেজ (বর্তমানের প্রেসিডেন্সি কলেজ) ছিল বড়লোকের ছেলেদের শিক্ষাকেন্দ্র। মধুসূদন দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দকৃষ্ণ বসু, নীলমাধব মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি সবাই ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। কিন্তু ছাত্রজীবনে কেউ ঈশ্বরচন্দ্রকে চিনতেন না। দরিদ্র ব্রাহ্মণতনয় সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু কলেজের ধনিক-নন্দনদের কাছে হয়তো উপেক্ষার পাত্রই ছিলেন। 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পাওয়ার পর, প্রতিষ্ঠা লাভের পর কর্মজীবনের পথেই তাঁদের সাথে ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয়।

ইংরেজি শিক্ষার কল্যাণে তখন মুষ্টিমেয় ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজে হয়েছিল 'ইয়ং বেঙ্গলে'র আবির্ভাব, চিন্তার জগতে এক নবযুগের সূচনা। বলা বাহুল্য, এই তথাকথিত নবজাগরণের নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার উৎস ছিল বিদেশে, শিকড় ছিল না দেশের মাটিতে—সীমাবদ্ধতা সেইখানেই। তবু এটা অনস্বীকার্য, পরবর্তীকালে সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, রাজনীতিতে তারই গতিবেগ অনিবার্যভাবে বিকাশের সমস্ত রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ মননশীল যুবকদের মাথায় প্রচণ্ড নাড়া দেয় তখন। যুক্তির আদালতে ধর্ম, সংস্কার, দেশাচার ইত্যাদি সব কিছুরই বিচার শুরু হয়ে গেল। ঈশ্বরচন্দ্র যখন ছাত্র, রামমোহনের তখন শেষ জীবন। সমাজ-সংস্কারে তখন প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে। একটা উল্কার মতো আবির্ভূত হলেন ডিরোজিও। হিন্দু কলেজে শিক্ষকের ভূমিকায় মাত্র দু-তিন বছরের মধ্যে ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজে ডিরোজিও বিদ্যুৎ বেগে নতুন চিন্তা, নতুন ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে দিলেন আর মারা গেলেন মাত্র বাইশ বছর বয়সে! চিন্তার এত খোরাক, যুক্তিবাদের এমন সর্বগ্রাসী অভিযান সে যুগে অনেক বলিষ্ঠ চরিত্রেরও সৃষ্টি করেছিল ইয়ং বেঙ্গল দলে। প্রকাশ্য আদালতে রসিককৃষ্ণ মল্লিক গঙ্গাজল ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বললেন, "আমি গঙ্গার পবিত্রতায় বিশ্বাস করি না।" ডিরোজিও ছাত্রদের বললেন, "নিজেরা চিন্তা

কর। বেকনের উল্লেখিত কোনো দেবতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ো না। সত্যকেই জীবন ও মৃত্যুর অবলম্বন ধরে নেও।" রামগোপাল ঘোষ বললেন, "যে তর্ক করে না সে অন্ধ গোঁড়ামীতে ভুগছে। যে তর্ক করতে পারে না, সে নির্বোধ এবং যে তর্ক করে না, সে ক্রীতদাস।" আবার কোনো কোনো ছাত্র কালী ঠাকুরকে প্রণাম করার বদলে "গুড মর্নিং, মাডাম" বলে নমস্কার জানাতো। পরিবেশটা বোঝাবার জন্য এগুলি নমুনা মাত্র।

পরবর্তীকালে এই ইয়ং বেঙ্গলেরই অনেকে ধর্মান্তর, ধর্ম-সংস্কার বা ধর্ম-আন্দোলনের মধ্যেই সমাজের মুক্তি খুঁজেছে অথবা ডিরোজিও ও ডেভিড হেয়ারের মতো অনাধ্যাত্মিক ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়ে গেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যে তিমিরে ছিল, সে তিমিরেই রয়ে গেল।

ওই সব যুক্তিবাদী ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে বিদ্যাসাগর অবহিত ছিলেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাঁর পথটা ছিল স্বতন্ত্র। উন্নত দেশ থেকে উন্নত চিন্তা অবশ্যই আসতে পারে, কিন্তু দেশের বা জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে না বুঝলে, না জানলে শুধু অনুকরণ আর ওপরের তলার আলোড়ন বেশি দূর যেতে পারে না। সমাজটাকে তিনি হাড়ে হাড়ে চিনতেন, কেননা তিনি এসেছেন নিচের তলা থেকে। তিনি জানতেন, শিল্প বিপ্লবের চেতনা ও মূল্যবোধ আমদানি করে মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় তা আরোপ করা যায় না। বহুমুখী সামাজিক সংগ্রামের ব্যাপক কর্মকাণ্ডে তাঁর এমন একক দক্ষতা বাংলা দেশের ইতিহাসে সত্যিই দুর্লভ ও বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "সেইজন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন।" 'বর্ণ পরিচয়ে'র মাধ্যমে গণশিক্ষার প্রস্তুতি, মাতৃভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত ও ইংরেজি শেখানোর প্রচেষ্টা, স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দেশময় 'জ্ঞানার্জনের' ভিত্তি রচনা, নারী-শিক্ষা প্রসারের ব্যাপক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নারী-মুক্তির অনলস প্রয়াস, সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে সামাজিক সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ, নিজস্ব রচনায় সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্যোগ, বিশ্বের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত রচনার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানধর্মী মননের প্রসার আর অতিবৃদ্ধদের বালিকা-বিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি মধ্যযুগীয় বিবাহ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম —এই ছিল তাঁর ব্যাপক কর্মকাণ্ডের পরিধি।

গণশিক্ষার কর্ণধার

যে দেশে নিরক্ষরতার কলঙ্ক আজও ঘোচে নি, যে দেশে প্রতি তিনজন লোকের মধ্যে দুজনের বর্ণ পরিচয় আজও ঘটে নি, সারা দুনিয়ার নিরক্ষরদের অর্ধেক বাস করে যে দেশে, সেই দেশের মানুষকে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগর লেখেন 'বর্ণ পরিচয়'। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও শিক্ষা লাভ করেছেন সেই বই পড়ে : "আমারও শিক্ষা সেই সময়ে শুরু হইল, কিন্তু সে-কথা আমার মনেও নাই। কেবল

মনে পড়ে 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। তখন 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা।" (জীবনস্মৃতি)

যুক্তিবাদ ও আধুনিকতার শ্রেষ্ঠ সারথি ছিলেন বিদ্যাসাগর, তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগারই তার প্রমাণ। শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষণের সে যুগের আধুনিকতম বইগুলি ছিল তাঁর গ্রন্থাগারে।

বিদ্যাসাগরের কাছে নারী শিক্ষার আন্দোলন ছিল সামাজিক কুসংস্কারের ঘাঁটিকেই আক্রমণ। তা ছাড়া সেটা নিছক আন্দোলনই ছিল না, ছিল একটা বিরাট অভিযান। ১৮৫৭ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাস—মাত্র এই সাত মাসের মধ্যে তিনি ৩৫টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন—হুগলী জেলায় ২০টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি আর নদীয়ায় ১টি। শুধু এই একটা ঘটনাই একজনের জীবনে অসাধারণ ঐতিহাসিক কীর্তি বলে গণ্য হতে পারে। যুগটাও স্মরণে রাখা প্রয়োজন। তখন মেয়েদের বাপেরা ভাবতো, স্কুলে গেলে মেয়ের বিয়ে দেওয়া কঠিন। আর আজকাল পাশ না করলে ভাল পাত্রে বিয়ে দেওয়াই কঠিন। বলা বাহুল্য, এই নিরক্ষরের দেশে এই ব্যাপারটা স্বভাবতই মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত ও সুবিধাভোগীদের মধ্যেই এখনো সীমাবদ্ধ। কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে বিয়ের সম্পর্কটা বিদ্যাসাগরকে চিন্তিত করেনি কখনো। শিক্ষার সুফল বলতে তিনি মূলত 'জ্ঞানার্জন'ই বুঝতেন। তাঁর গভীর বিশ্বাস, এই 'জ্ঞানার্জন'ই পারবে যুক্তিবাদী বিজ্ঞানধর্মী সমাজের গোড়াপত্তন করতে, ধর্মীয় কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করতে। তাই শিক্ষা প্রসারে সমস্ত উৎসাহীই তাঁর সাথী। ডেভিড হেয়ার, আলেকজাণ্ডার ডাফ, ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন, মেরি কার্পেণ্টার প্রমুখ শিক্ষানুরাগীরা ইংরেজ হলেও তাঁর প্রিয়জন। ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেব যখন 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' স্থাপন করলেন, তখন বেথুনের অনুরোধেই বিদ্যাসাগর অবৈতনিক সম্পাদকরূপে স্কুল পরিচালনার ভার নিলেন। ১৮৫১ সালে বেথুনের মৃত্যুর পর স্কুলটির নাম হল 'বেথুন স্কুল' আর সিসিল বিডনের সভাপতিত্বে নবগঠিত ম্যানেজিং কমিটির অবৈতনিক সম্পাদক হলেন বিদ্যাসাগর।

প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, যে বছরে বিদ্যাসাগর 'বর্ণ পরিচয়' লেখেন, সেই বছরেই শুরু হয় বিধবা-বিবাহ নিয়ে রচনা ও আন্দোলন। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে আন্দোলনের যোগসূত্রটি স্পষ্টই প্রতীয়মান।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে জাতের বালাই দূর করার কাজেও বিদ্যাসাগর ছিলেন আপসহীন। সংস্কৃত কলেজ ছিল শুধু ব্রাহ্মণদের জন্য কিন্তু নিজে অধ্যক্ষ হওয়ার পরেই তিনি কলেজের দরজা খুলে দিলেন জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সর্বসাধারণের জন্য।

অবৈতনিক গণ-শিক্ষার কথা সমগ্র ভারতের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই সম্ভবত প্রথম বলেন।

১৮৫৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তিনি ছোটলাটকে যে চিঠি লেখেন, তার একটি অংশে বলা হয়েছে : "...তা ছাড়া দেশের সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই যখন শিক্ষার সুফল (জ্ঞানার্জন) সম্বন্ধে তেমন সচেতন নয়, তখন শ্রমিক শ্রেণীর সে বোধ থাকতে পারে না। এই অবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর শিক্ষা বিষয়ে চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। সরকারের যদি সত্যই তাদের শিক্ষা দেবার সাধু উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে যেন তাঁরা অবৈতনিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন। প্রসঙ্গত বলছি, এ রকম ব্যবস্থা বেসরকারীভাবে যেটুকু করা হয়েছে, তাতে কোনো ফল হয়নি।" সরকারীভাবে অবৈতনিক শিক্ষা দেবার দাবি তিনি তুলেছিলেন আজ থেকে একশো তেত্রিশ বছর আগে। আজও তা অপূর্ণ রয়ে গেছে। এমন কি, স্বাধীন ভারতের সংবিধানকেও সংশোধন করতে হয়েছে শিক্ষার সময়সূচি বদলানোর জন্য।

সমাজ-সচেতন সাংবাদিক

বিদ্যাসাগরের বহুমুখী সংগ্রামে একটি বিশেষ হাতিয়ার ছিল পত্র-পত্রিকা এবং তা বাংলা দেশে সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। ১৮৫০ সালে 'কুরীতি ও কদাচার চিরদিনের নিমিত্ত' দূর করার জন্য বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালংকার 'সর্বশুভকরী' নামে পত্রিকা বের করেন। বিদ্যাসাগরকে অনেকে সংশয়বাদী বলে মনে করতেন, অনেকে তাঁকে নাস্তিক বলেই আখ্যা দিয়েছেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মতে, মদনমোহন তর্কালংকার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দুই বন্ধুই নাস্তিক ছিলেন। মদনমোহন প্রকাশ্যেই তা বলতেন, বিদ্যাসাগর বলতেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের নাস্তিকতা সম্বন্ধে কৃষ্ণকমলের কোনো সন্দেহ ছিল না।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বলে মনে করতেন এবং সেজন্যই 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার গ্রন্থাধ্যক্ষ পদ থেকে বিদ্যাসাগরকে বিদায় নিতে হয়। একবার রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে একটি বক্তৃতা দেন। 'তত্ত্ববোধিনী'র গ্রন্থাধ্যক্ষরা (প্রধানত, অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর) বক্তৃতাটি প্রকাশযোগ্য বলে মনে করেননি। দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে একখানি চিঠিতে লেখেন : "এ বক্তৃতা আমার বন্ধুদিগের মধ্যে যাঁহারা শুনিলেন, তাঁহারাই পরিতৃপ্ত হইলেন ; কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা ইহাকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য মনে করিলেন না। কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে. ইহাদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।" অবশেষে ১৮৫৯ সালের মে মাসে দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী সভা' তুলে দেন। লক্ষণীয়, সভার শেষ দিকে বিদ্যাসাগরই ছিলেন তার সম্পাদক।

অক্ষয়কুমার দত্ত সম্বন্ধেও দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে স্পষ্টই বলেছেন :

"আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়। আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির কি সম্বন্ধ; আকাশ-পাতাল প্রভেদ।" সত্যিই তো। বিদ্যাসাগরের বেলায়ও তাঁর এই কথা খাটে: "আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়!"

শিবনাথ শাস্ত্রীও উল্লেখ করেছেন: "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিতও দেবেন্দ্রনাথের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধর্মতত্ত্ব অপেক্ষা বিধবা বিবাহের প্রচারেই অধিক উৎসাহ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত অথচ রক্ষণশীল লোকদিগকে বিরক্ত করিয়া তোলেন।" এইখানেই বিদ্যাসাগরের সাথে দেবেন্দ্রনাথের মৌলিক তফাৎ। বাইরে বিরোধিতা না করলেও দেবেন্দ্রনাথ অন্তর দিয়ে বিধবা বিবাহ সমর্থন করতেন না।

বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাটিরও আদি পরিকল্পনা বিদ্যাসাগরের এবং পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন সংস্কৃত কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপক। ১৮৫৮ সালে এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ। একখানি বলিষ্ঠ প্রগতিশীল বাংলা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পত্রিকা হিসাবে বিদ্যাসাগরের সাহচর্যে সেটি বাংলাদেশে সে যুগে অনন্য হয়ে উঠেছিল। খেটে-খাওয়া মানুষের অবস্থা, সংগ্রাম ও ধর্মঘটের অজস্র ঘটনার ধারক-বাহক ছিল পত্রিকাটি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৮৬২ সালে আট ঘণ্টা দৈনিক কাজের দাবিতে হাওড়া স্টেশনে ১২০০ রেল শ্রমিক যে ধর্মঘট করেছিলেন, তার বিবরণী এই 'সোমপ্রকাশে'ই প্রকাশিত হয় এবং পত্রিকাটি সেই ধর্মঘট সমর্থন করে।

বিদ্যাসাগরের আর একটি কীর্তি বিখ্যাত 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'। ১৮৬১ সালে তার প্রথম প্রকাশ। বিদ্যাসাগর ছিলেন তার উৎসাহী সংগঠক ও পরিচালক। পত্রিকাটিকে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রামের মুখপত্র করতে চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর, আর কৃষ্ণদাস পাল চেয়েছিলেন তাকে রক্ষণশীল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার মুখপত্র করতে। তাই পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে'র সাথে সম্পর্ক ছেদ করেন।

ধর্ম নিরপেক্ষতার মূর্ত প্রতীক

'বিদ্যাসাগর চরিতে' রবীন্দ্রনাথ শুরুতেই বলেছেন: "বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ, যে গুণে তিনি পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালিজীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগপ্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া — হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে—করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।" এ কাজে জাতি বা ধর্ম কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। "কার্মাটাড়ে এক মেথর-জাতীয়া স্ত্রীলোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং

তাহার কুটীরে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে তাহার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বর্ধমান-বাস-কালে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমানগণকে আত্মীয়নির্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন।"

জাতি-বর্ণ-ধর্ম যে বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ ও স্বচ্ছ মানবিক বোধকে কখনো আচ্ছন্ন করতে পারেনি, তা ওপরের উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায়। ধর্ম বা ঈশ্বর নিয়ে মাথাব্যথা তাঁর কোনো দিনই ছিল না। তাঁর বিশ্বাস বা অবিশ্বাস নিয়ে সহসা কোনো প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিতেন: হাতে এত কাজ আছে যে ওই ব্যাপারে ভাবনার সময় নেই। তাঁর সমসাময়িক যুগে ধর্ম ও ঈশ্বর নিয়ে যে প্রবল বিতর্ক ও আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। শাস্ত্রজ্ঞানে ও সমসাময়িক ভাবধারায় তাঁর জ্ঞানও ছিল সুগভীর। তবু এই বিষয়ে তাঁর অসীম ঔদাসীন্য, চরম উপেক্ষা, কঠোর নীরবতা অনেকের কাছেই রহস্যজনক বলে মনে হয়েছে।

কোনো রকমের ধর্ম আন্দোলনেই বিদ্যাসাগরের সমর্থন ছিল না। কিন্তু কোনো ধর্ম বিদ্বেষও ছিল না। সে পথে যাঁরা গিয়েছেন তাঁদের তিনি বাধা দেননি। বরং সমাজ কল্যাণের দিকে প্রখর দৃষ্টি রেখেছেন সযত্নে। তিনি নিজে কখনোই ধর্মান্তর, ধর্ম-সংস্কার বা ধর্ম আন্দোলনের পথে যাননি। নিজেকে নাস্তিক বলে ঘোষণা করলে অনর্থক আলোচনায় জড়িয়ে পড়তে হয় বলেই হয়তো ওই বিষয়ে তাঁর সযত্ন নীরবতা। অথচ যে কোনো ধর্মের পথেই যেটুকু সমাজ কল্যাণ হয়, তা গ্রহণ করতে তাঁর কখনো বাধেনি। এমন কি, রাশি রাশি শাস্ত্রীয় বচন দিয়ে শাস্ত্রীমশায়দের ঘায়েল করতে কখনো তিনি দ্বিধা করেননি। সামাজিক অন্যায় অবিচার ও ধর্মীয় কুসংস্কারের হাত থেকে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের মনকে মুক্ত করার জন্য শাস্ত্রকেও ব্যবহার করেছেন বার বার, যদিও কোনো শাস্ত্রেই তাঁর অন্ধ বিশ্বাস ছিল না। শাস্ত্রকে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ধর্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্বের পথে পা বাড়িয়ে পথভ্রষ্ট হননি, ধর্মান্তর বা ধর্মসংস্কারের চিরন্তন অলীক পথে দিকভ্রান্ত হননি। যে শাস্ত্র-বচনে অন্ধ বিশ্বাসই সমাজের সাধারণ মানুষের মানসিকতা, সেই শাস্ত্রের উদ্ধৃতিই হল বিদ্যাসাগরের হাতের অস্ত্র। নিজের মনে সিদ্ধান্ত করতেন আগে, আর নিজের সিদ্ধান্তের সমর্থনে শাস্ত্রের বচন খুঁজে বার করতেন পরে। অজ্ঞ যুক্তিহীন লোকেরা চিরকালই কথামৃত ও উদ্ধৃতির উপাসক। তাই গঙ্গাজলে গঙ্গা পুজো, শাস্ত্র দিয়ে শাস্ত্র খণ্ডন, কথামৃত আর উদ্ধৃতি দিয়ে অন্যায় অবিচার ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন—এই পদ্ধতির অপূর্ব বিকাশ ঘটেছে বিদ্যাসাগরের হাতে। তা ছাড়া উপায়ও অবশ্য ছিল না। অভিজ্ঞতায়, বৈচিত্র্যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিদ্যাসাগরের এই পদ্ধতিটি একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

সে যুগের ধর্মান্তরের হিড়িক বিদ্যাসাগরকে বিচলিত করেনি। ন-দশ বছরের বালিকা বধূ বিন্দুবাসিনীকে সঙ্গে নিয়ে মাত্র উনিশ-কুড়ি বছরের যুবক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ধর্মান্তরিত হলেন, অর্থাৎ খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হলেন, তখন কলকাতা

শহরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণতনয় বিদ্যাসাগর রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাও হারাননি, তাঁর সাহচর্যও ত্যাগ করেননি। কৃষ্ণমোহনের মধ্যে সামাজিক ন্যায়বিচারের যে প্রবল ইচ্ছা ছিল, সেটাই বিদ্যাসাগরের আকর্ষণ।

১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি মধুসূদন খ্রীস্টান হলেন আর ওই বছরেই কয়েক মাস পরে অর্থাৎ ২১ ডিসেম্বর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দুজনের সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রন্থাধ্যক্ষ পদ নেওয়ায় কোনো বাধাও সৃষ্টি হয়নি ধর্মের নামে। কিন্তু সামাজিক লক্ষ্য সাধনে বিদ্যাসাগর ছিলেন একাগ্র।

মধুসূদন দত্তের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের চরিত্রটি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একজন বিলাসী, মদ্যপায়ী খ্রীস্টানকে সে যুগে একজন ব্রাহ্মণতনয় কী চোখে দেখতো, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন ব্যতিক্রম। যে বিদ্যাসাগরের "প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা" (রবীন্দ্রনাথ), মাইকেলের কাব্য প্রতিভা তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারে না! বাংলাভাষাকে সেই কাব্যে সিঞ্চিত করে, সমৃদ্ধ করে মাইকেল আজও বাঙ্গালীর গর্ব হয়ে আছেন, সেখানেই বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গির সার্থকতা।

কিন্তু খ্রীস্টান মাত্রেই বিদ্যাসাগরের স্নেহ লাভ করেনি। একবার এক বাঙ্গালী পাদ্রি কিছু যুবককে দেখে উৎসাহভরে খ্রীস্টধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কী চান বলুন?" পাদ্রি উত্তর দিলেন, "আপনাদের Salvation (মুক্তি) চাই।" বিদ্যাসাগর করজোড়ে বললেন, "রক্ষা করুন, এরা নিতান্তই বালক, সারাটা জীবন এদের পড়ে রয়েছে, এখনই এদের Salvation-এর কথা শোনাবেন না। আমি বুড়ো হয়েছি, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আমাকে শোনান, কাজ হবে।" পাদ্রিসাহেব বুড়োকে চিনতে না পেরে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চলে গেলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সাথেও বিদ্যাসাগরের খুব ভাব ছিল। বিধবা বিবাহে তিনি উৎসাহও দিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য বিদ্যাসাগরের অনুরোধ শুনে রমাপ্রসাদ বললেন, "আমি ভিতরে ভিতরে আছিই তো, সাহায্যও করিব, বিবাহস্থলে নাই গেলাম।" রামমোহনের পুত্র আর নিজের বন্ধু বলে বিদ্যাসাগর চুপ করে থাকার পাত্র নন। দেওয়ালে রামমোহন রায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন, "ওটা ফেলে দাও, ফেলে দাও।" এ কথা বলেই তাঁর প্রস্থান।

স্নেহের পাত্র শিবনাথ শাস্ত্রীও যখন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলেন, বিদ্যাসাগর ছিলেন নির্বিকার। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতা মনের দুঃখে কাশীবাসী হলেন। পরে তিনি যখন কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগরের সাথে দেখা করেন, তখনকার কথোপকথনটি

শাস্ত্রীমশায় নিজেই উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হারান, শুনলাম তুমি নাকি কাশীবাসী হয়েছ? গাঁজা খেতে শিখেছ কি?" হারানবাবু উত্তর দেন, "কাশীবাসী হওয়ার সঙ্গে গাঁজা খাওয়ার কি সম্পর্ক বুঝতে পারলাম না।" বিদ্যাসাগর বলেন, "এত সহজ ও সোজা সম্পর্কটা বুঝতে পারলে না? জান তো, লোকের বিশ্বাস কাশীতে যাঁর মৃত্যু হয় তিনি সাক্ষাৎ শিব হন। শিব হলেন পাঁড় গাঁজাখোর। কাশীতে মৃত্যুর পর যখন শিব হবে তখন তোমাকেও তো গাঁজা খেতে হবে। তাই বলছিলাম, মৃত্যুর আগেই যদি একটু প্র্যাকটিস করে রাখতে, তা হলে শিব হওয়ার সুবিধে হত।" ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি আর দুঃখ পাওয়াকে এমন সুন্দর পরিহাসের মাধ্যমে তিরস্কার করার ভঙ্গিটি বিদ্যাসাগর যে আয়ত্ত করেছিলেন, তার পরিচয় অনেক ঘটনাতেই পাওয়া যায়।

সে যুগের অনেক মহারথীই যেতেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে, কিন্তু বিদ্যাসাগর যাননি। রামকৃষ্ণই এসেছিলেন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে। কথোপকথনের একটি বিবরণীতে আছে: রামকৃষ্ণ বলেন, "আমি সাগরে এসেছি। ইচ্ছে আছে কিছু রত্ন সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাব।" মৃদু হেসে বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন, "আপনার ইচ্ছে পূর্ণ হবে বলে তো মনে হয় না, কারণ এ সাগরে কেবল শামুকই পাবেন।" রামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, "এমন না হলে আর সাগরকে দেখতে আসব কেন?" তারপর কিছু জলযোগ করে রামকৃষ্ণ বিদায় নিলেন।

অন্য আর একটি বিবরণীতে কথোপকথনটি ছিল এইরূপ: রামকৃষ্ণ বলেন, "এতদিন গেড়ে ডোবায় ছিলাম। আজ সাগরে এসে মিশলাম।" বিদ্যাসাগর সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "যখন সাগরে এসেছেন, তখন লোনা জল খেয়ে যান।" রামকৃষ্ণ প্রতিবাদ করে বলেন, "না গো, তুমি তো অবিদ্যাসাগর নও যে তোমাতে লোনা জল থাকবে। দেখছি, তুমি বিদ্যার সাগর। লোক দেখাবার জন্য হাতীর বাহিরে এক রকম দাঁত। লোকহিতকর কাজে বাহিরে তোমার উৎসাহ, কিন্তু অন্তরে তুমি বেদান্তজ্ঞানী। তুমি তো সিদ্ধ পুরুষ।" বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন, "কিরূপ?" রামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, "আলু পটল সিদ্ধ হলে নরম হয়। তা তুমি খুব নরম দেখছি।" এই বিবরণীর লেখককে রামকৃষ্ণ নাকি বলেছিলেন, "বিদ্যাসাগর মহাত্যাগী পুরুষ, আমার মতো কর্মনাশার সঙ্গে মিশলে পাছে তাঁর বিদ্যাদান কর্ম উচ্ছেদ হয় তাই আপন কল্যাণ মুক্তি পর্যন্ত তিনি উপেক্ষা করলেন।" সমাজ কল্যাণই যাঁর কাছে জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত, তাঁর কাছে ব্যক্তিগত কল্যাণ ও মুক্তি তো উপেক্ষণীয় বটেই।

এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন, বেদান্ত ও সাংখ্যকে ভ্রান্ত দর্শন বলে ঘোষণা করতে বিদ্যাসাগর কুণ্ঠিত হননি সেই যুগে। সুপারিশ করেছিলেন পাঠ্যক্রমে ভারতীয় দর্শন চর্চার পাশাপাশি পাশ্চাত্য দর্শনের অনুশীলন।

মাতৃভাষায় শিক্ষা, গণশিক্ষা, বিজ্ঞানশিক্ষা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, শিক্ষার প্রসার

ও মাধ্যম, নারী শিক্ষা, বিবাহ সমস্যা ইত্যাদি মৌলিক সামাজিক বিষয়ে বিদ্যাসাগরের কীর্তি আজ সমগ্র বাঙ্গালী জীবনের অঙ্গ, সুদৃঢ় বনিয়াদ ও অক্ষয় গৌরব। ধর্ম আন্দোলনের 'কর্মনাশা' পথে তা সম্ভব নয়।

বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ সৃষ্টিই তো সমাজজীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে আমাদের অজ্ঞাতসারেই। বাংলা ভাষা আজ সাহিত্যে, কাব্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, সঙ্গীতে বিশ্ব-গৌরবের স্থান দখল করেছে। শিক্ষা-প্রসারের অনুভূতি ও চেতনা আজ সমগ্র সমাজে ব্যাপ্ত। নারী-শিক্ষা আজ আর নিন্দনীয় নয়, বরং সম্মানিত। বহু বিবাহ লোপ পেয়েছে, বাল্যবিবাহ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এই অর্থেই বলা চলে, বিদ্যাসাগর এখন আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে আছেন, তাঁকে আলাদা করে স্মরণ করা তাই হয়তো আমাদের স্বাভাবিক চেতনার বাইরে।

তবু বিদ্যাসাগর-চর্চা আজও প্রাসঙ্গিক। কেননা, দেশের অধিকাংশ মানুষ এখনো নিরক্ষর। সারাটা সমাজ আজও বিজ্ঞানসম্মত জীবনবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেনি। সামন্ততন্ত্রের জোয়াল থেকে এখনো মানুষ মুক্তি পায়নি। ধর্মীয় কুসংস্কার এখনো রয়েছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। অবক্ষয়ী পুঁজিবাদ প্রতিনিয়ত জন্ম দিচ্ছে ও আমদানি করছে অপসংস্কৃতির বিষধর নাগিনী। ভাগ্যের পায়ে আত্মাহুতির বদলে বিশ্বজয়ী জীবনের জয়গান গাইতে এখনো শেখেনি সব সাধারণ মানুষ। তাই বিদ্যাসাগরের আরব্ধ কাজ এখনো অসমাপ্ত। বর্তমান জটিল যুগের উত্তাল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ও ব্যাপক সংগঠিত গণ-জাগরণে বিদ্যাসাগর আমাদের অনুকরণীয় ঐতিহ্য, আমাদের প্রেরণার উৎস, আমাদের বলিষ্ঠ হাতিয়ার।

কেদারনাথ ভট্টাচার্য

'নন্দন' পত্রিকা থেকে পরিমার্জিত ও সংযোজিত আকারে পুনর্মুদ্রিত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—এক শহুরে মধ্যবিত্ত

রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথের যুগটি এমন এক যুগ, যে সময়ে বাংলার সংস্কৃতি শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞানান্বেষণের জগতে, ভাবনায়-চিন্তায়-মননে বিরাট বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আসে। কালের হিসেবে সময়টার ব্যাপ্তি মোটামুটি এক শতক, কিন্তু এর মধ্যে বাঙ্গালীর ইতিহাসে যে পালাবদল শুরু হয়, সে পালাবদলের শেষ আজও হয়নি।

এই যুগে আরো অনেক মনস্বী এসেছিলেন—কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, শিল্পী। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজ জন্ম নিয়েছিল, বাঙ্গালীর মনোজগতের সামন্ততান্ত্রিক দেওয়াল ভেঙ্গে গিয়েছিল। এই সময়টুকুর মধ্যে বাংলাদেশের জীবনমঞ্চে এত আলো জ্বলেছিল যে আরো অনেকে যাঁরা সেই আলো জ্বালানোয় সাহায্য করেছিলেন, যা নিজেরা প্রদীপ হাতে নিয়েছিলেন, তাঁদের দীপগুলি সে আলোকিত পটভূমিকায় প্রায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, সেদিনও—আজ তো বটেই।

ঈশ্বর গুপ্ত তেমনই এক মানুষ। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে মানুষটি বঙ্গরঙ্গভূমি থেকে অবসৃত হলেন, তারপরে কিছুদিন অবশ্য তাঁর কথা বলেছিলেন মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংবাদ প্রভাকর আরো বছর কুড়ি চলেছিল, কিন্তু তারপর তিনি বিস্মৃত হলেন। অবশেষে প্রায় শতাব্দী শেষে, বিশ শতকের ষাটের দশকে, যখন আমরা বিগত শতকের লাভ-ক্ষতির হিসেব করতে বসলাম, তখন বিস্মৃতির ধূলি-ধূসর কক্ষ থেকে তাঁকে সামনে নিয়ে এসে তাঁর পর্যালোচনা শুরু হল। কিন্তু সে কাজও এত বিচ্ছিন্নভাবে, যে খুব মাঝে মধ্যে ছাড়া, তা প্রায়ই বন্ধ হয়ে থাকে।

আমাদের এই প্রচেষ্টাটি সেই মানুষটিকে আর একবার যাচাই করবার প্রয়াস।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা পেয়েছি, তা এসেছে সাহিত্যিক, সাহিত্য-কর্মী, সাহিত্য-সমালোচকের কাছ থেকে। সেই আলোচনা মূলত কবি-সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর মূল্যায়নে নিবিষ্ট থেকেছে। এঁদের তালিকাটি কিন্তু নক্ষত্র খচিত, শুরু বঙ্কিমচন্দ্র দিয়ে।

কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটা এই যে, ঈশ্বর গুপ্ত শুধুমাত্র কবি ও সাহিত্য-কর্মী ছিলেন না, অবশ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে যদি আমরা প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, উপন্যাস মাত্র ধরি। আর সংবাদ-সাহিত্য, যা তাঁর পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল, তার মূল্যায়নই বোধ হয় সাহিত্যিক ঈশ্বর গপ্তের পুরো ছবিটা আমাদের সামনে হাজির করবে।

এই প্রবন্ধের শিরোনামায় ঈশ্বর গুপ্তকে শহুরে মধ্যবিত্ত বলা হয়েছে। মধ্যবিত্ত শব্দের ইংরেজি পরিভাষায় বোঝায় এঁরা শ্রেণী পরম্পরায় মধ্যযুগে অবস্থান করেন, ফলে ঘড়ির দোলকের মতো এঁরা দোদুল্যমান, চিত্ত ও বিত্ত দুই-এর হিসেবেই। ভারতে মধ্যবিত্ত শব্দে শ্রেণী কথাটি ঠাঁই দিয়েছে বিত্তকে, কিন্তু তাতে চিত্তের কথা গৌণ হয়ে যায়নি। এঁরা সাধারণত বর্ণগত ভাবে উচ্চ সম্প্রদায়ের মানুষ, যদি দেশে জমি-জায়গা থাকে তবে তার থেকে উপার্জন প্রচুর নয়, আর যদি না থাকে তবে তো চুকেই গেল। যে বৃত্তি এঁরা গ্রহণ করেন তাতে মাথা বা কলমের দরকার হয়, কিন্তু কায়িক শ্রমের জন্য হাতের, কাঁধের বা পিঠের ব্যবহার করতে এঁরা সঙ্কুচিত। সাধারণভাবে এঁরা উচ্চবিত্তের দিকে তাকিয়ে স্বপ্ন দেখেন এবং নিম্নবিত্তকে ভয় করেন, কারণ এঁরা স্থিতিশীলতায় বিশ্বাসী। তবে তারই সঙ্গে এঁরা অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং ফলে গণতন্ত্রের পূজক। শিক্ষার সুযোগের এঁরা সদ্ব্যবহার করেন, কিন্তু প্রায়শই সমাজ এঁদের শিক্ষাকে প্রকৃত ব্যবহারের সুযোগ দেয় না, ফলে এঁরা অসন্তুষ্ট ও পরিপার্শ্বের ওপরে বিরক্ত।

গ্রামে অন্ন থাকলেও এঁদের অনেকেই বাড়তি আয়ের আশায় শহরাঞ্চলে ভিড় করেন ও সাধারণভাবে স্বাধীন বৃত্তির বদলে চাকরি, তবে হোয়াইট কলার-এর চাকরি খোঁজেন।

অবশ্য যেহেতু এঁরা প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্যকামী ও স্বতন্ত্রধর্মী, অতএব ওপরে বর্ণিত বাঁধা ছকের বাইরেও প্রত্যেকেরই বাঁচাতে নিজেদের ব্যক্তি নির্ভর রং-তুলির কাজ প্রয়োজন হয়।

আসুন, ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা এই ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করি। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে (১২১৮ বাংলা) কাঁচরাপাড়ার কাছে গরিফাতে তাঁর জন্ম, বংশগতভাবে বৈদ্য। একান্নবর্তী পরিবার, জমি, বাগান, পুষ্করিণী থেকে অন্নবস্ত্রের সংস্থান। ঈশ্বরচন্দ্রের বাবা কবিরাজী ছেড়ে জমিদারের কুঠিতে চাকরি নিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মা-এর মৃত্যুর পরে পিতা দ্বিতীয় বিবাহ করেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে মেনে নেননি।

বংশক্রমে গুপ্তেরা গান, পাঁচালী রচনা করতে পারতেন, ঈশ্বর গুপ্তেরও সেই গুণ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র শুনেছিলেন, একবার কলকাতায় মাতুলালয়ে বাসের সময়ে অসুস্থ অবস্থায় শিশু ঈশ্বর গুপ্ত মশামাছির উপদ্রবে রচনা করেন :

'রেতে মশা দিনে মাছি,
এই তাড়য়ে কল্‌কাতায় আছি।'

বঙ্কিমচন্দ্র একথা ঠিক বিশ্বাস করেননি, সত্যই বিশ্বাসযোগ্য কিনা সন্দেহ আছে। এটা ঠিকই যে, সাংবাদিক হিসেবে ভবিষ্যৎ ঈশ্বর গুপ্তের নিশ্চয় গুণ ছিল অল্প কথায় বিষয়কে ব্যক্ত করা, কারণ সীমিত স্থানে অনেক সংবাদ পরিবেশন করতে হয় সংবাদপত্রকে। কিন্তু মাত্র দুই পংক্তির রচনায় কলকাতার তখনকার পারিবেশিক অবস্থার সম্পূর্ণ বর্ণনা, এটি বাক্যচয়ন সম্বন্ধে অপূর্ব শৃঙ্খলাবোধের পরিচায়ক, তিন বৎসর বয়সে যেটা আয়ত্ত করা সম্ভব কিনা সন্দেহ।

মা-এর মৃত্যুর পর গরিফার গ্রাম্য জীবন আর ঈশ্বর গুপ্তকে বাঁধতে পারেনি, তিনি মাতুলালয়ে চলে এলেন। মাতুল বংশও ধনী ছিলেন না, চাকুরীজীবী ছিলেন।

লেখাপড়া আর বিশেষ হল না ঈশ্বরের। ১৫ বৎসর বয়সে বাবা কুলীন বৈদ্য বংশে তাঁর বিবাহ দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'স্ত্রী কুৎসিতা! হাবা। বোবার মত।' ঈশ্বর গুপ্ত তার সঙ্গে সংসার করেননি, তবে তার ভরণপোষণ করেছেন।

হয়তো স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করবার ব্যাপারে বাবার দ্বিতীয় বিবাহ ও নিজের অসম বিবাহ প্রভাবিত করে।

বাবার মৃত্যুর পরে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে ঈশ্বর গুপ্ত ভাইকে নিয়ে স্থায়ীভাবে মাতুলালয়ের ঠিকানায় বাসা বাঁধলেন, তবে তাঁর দায়িত্ব নিলেন পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার। সেকালে উচ্চবিত্ত কলকাতাবাসীদের অনেক পোষ্য ছিল। 'হরি ঘোষের গোয়াল তো প্রবাদ হয়ে গেছে।

ঠাকুর পরিবারের যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের অর্থে ১২৩৭ সালের মাঘ মাসে, অর্থাৎ ১৮৩০-এর শেষে সাপ্তাহিক প্রভাকর প্রকাশিত হল। ঈশ্বর গুপ্ত দায়িত্ব পেলেন এবং পায়ের নিচে মাটিও পেলেন।

সম্ভবত এই প্রথম একটি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হল, যার সম্পাদক হোল-টাইমার ও অন্য উপার্জনবিহীন। এর আগেও সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সেগুলির সম্পাদক নামে থাকলেও মূল দায়িত্ব অন্য ব্যক্তির, যেমন 'সম্বাদ কৌমুদী' বলতে আমরা রামমোহন রায়ের কাগজ বুঝি, তার সম্পাদক হারিয়ে গেছেন এবং রামমোহন বা সম্পাদক কেউই পত্রিকা বেচে খেতেন না।

সম্পাদকের নামে পত্রিকার খ্যাতিলাভ, এ ঘটনা বিরল। সংবাদ প্রভাকর তাদের মধ্যেও বিরলতর। প্রথম বাংলা পত্রিকা ও তার সম্পাদক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বিখ্যাত হয়ে আছেন প্রথম বলেই, কারণ বাঙ্গাল গেজেটের অকাল মৃত্যু হয়েছিল।

যে কোনো ভাবেই হোক, ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর পত্রিকার জন্য অনেক পৃষ্ঠপোষক জোগাড় করে ফেলেন। এঁদের মধ্যে রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, নীলরতন হালদার, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ছিলেন—সবাই মোটামুটি রক্ষণশীল গোষ্ঠীর।

যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুর পর ১২৩৯ সালে সাপ্তাহিক প্রভাকর উঠে গেল। কিছুদিন ঈশ্বর গুপ্ত আন্দুলের রাজা জগদীশ মল্লিকের আনুকুল্যে সংবাদ রত্নাবলী নামে একটি অতীব রক্ষণশীল পত্রিকা চালালেন। তারপর পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশেরই সহায়তায় ১২৪৩ সালে আবার সংবাদ প্রভাকর প্রকাশিত হল। ১২৪৬ সালে সেটি দৈনিক পত্রিকায়—বাংলার তো বটেই, সম্ভবত ভারতের প্রথম দেশীয় ভাষার দৈনিকে পরিণত হল। কাগজের ও তার সম্পাদকের জনপ্রিয়তা এত হয়েছিল যে ঈশ্বর গুপ্ত নিজের ও অন্যান্য সাহিত্য-খ্যাতি-পিপাসুদের রচনা প্রকাশে সাহায্যের জন্য ১২৬০ সাল

থেকে বাড়তি একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন — নাম হল প্রভাকর। এবার তাঁর রচনা মনের সুখে প্রকাশিত হতে লাগলো।

ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে তাঁর কর্মের বিভিন্ন দিকগুলি সামনে না আনলে সব আলোচনাই একপেশে হয়ে যায়। উনবিংশ শতকের কাল পরিবর্তনের যুগে সমাজের অগ্রণী মানুষেরা একই আধারে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেছিলেন। রামমোহন সমাজ-সংস্কার করতে গিয়ে ধর্ম-সংস্কারের দিকে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। নিজের বক্তব্য প্রকাশের জন্য তিনি কলম ধরেছিলেন — তাঁর বক্তব্য প্রবন্ধ ও কিছু ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিদ্যাসাগর ছিলেন সমাজ-সংস্কারক, কিন্তু তাঁর সমাজ-সংস্কারের হাতিয়ার ছিল নারীশিক্ষা। তিনি ছিলেন শিক্ষক, শিক্ষা-সংগঠক, কিন্তু তারও ওপরে তিনি ছিলেন সাহিত্যিক। তাঁর সাহিত্য প্রচেষ্টা শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য বর্ণপরিচয় কথামালা থেকে জনশিক্ষাদানের জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ পার হয়ে হাসি-কৌতুকে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, যেখানে তিনি নায়ককে দরজার কোণে দাঁড় করিয়ে রেখে তার লাঠিগাছাকে খাটে শুইয়ে ছেড়েছিলেন। এই যে বহু দিকে বিকাশের ধারা, এটি পূর্ণতা লাভ করে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। এঁদেরই মধ্যে পড়েছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। সমালোচক তাঁর সাহিত্য-কর্মকে কালজয়ী বলতে রাজী নন। কিন্তু সমাজে তাঁর ভূমিকা ছিল একমাত্র কবি-সাহিত্যিক হিসাবে নয়, সাংবাদিক হিসাবেও, যে দায়িত্ব গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তিনি ঘরে ঘরে সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন, জনমত সংগঠনে সহায়তা করেছেন। তাঁর সাংবাদিকতার গুণে সংবাদ প্রভাকর সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবাদ-বাহক হিসাবে গঠিত হয়েছিল। এই পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশনের গুণে ঈশ্বর গুপ্ত পত্রিকার সঙ্গে এত একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন যে লোকে তাঁকে ঈশ্বর গুপ্ত না বলে প্রভাকর বলতো। তাঁর বক্তব্য বা বক্তৃতা-আলোচনার উল্লেখ করার সময়ে বলা হয়েছে, "প্রভাকর বলিলেন"। তাঁর পত্রিকা শুধু তাঁর অনুরাগীরা মাত্র নয়, তাঁর বিরোধীরাও মনোযোগ দিয়ে পড়তেন।

এই পত্রিকার প্রকাশের প্রসঙ্গেই তাঁর সামাজিক ভূমিকা বিভিন্ন দিকে স্ফুরিত হল। তিনি নিজে পাশ্চাত্য বিদ্যালয়ে পড়েন নি, ইংরাজী জ্ঞান তাঁর ছিল সীমাবদ্ধ। সংস্কৃত তিনি নিজে শিখেছিলেন। কিন্তু তিনি ভবিষ্যতের বাঙ্গালীর জন্য যে গবেষণার কাজ রেখে গেলেন, সেটা যদি তিনি না করতেন, তবে রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, রামনিধি গুপ্ত, রাম বসু, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, হরু ঠাকুর, অজু গোঁসাই, গোঁজলা গুঁই, কৃষ্ণ মুদী, রাসু নৃসিংহ, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসকে, বিশেষত শেষ আটজনকে, আমরা বিংশ শতকের মধ্যেই সম্ভবত হারিয়ে ফেলতাম। সাংবাদিক-গবেষক হিসাবে এই যে দীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য কাজ, এটা ঐতিহ্যপ্রেমী বাঙ্গালীর কাছে তাঁকে ধন্যবাদার্হ করেছে এবং বাঙ্গালীর ভাষা ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচনায় সহায়তা করেছে। এ ছাড়াও তিনি হিতোপদেশের গল্প, প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনুবাদ, শকুন্তলার অনুবাদ (অসমাপ্ত) করেছিলেন। তাঁর শকুন্তলা হয়তো বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা হয়নি, কিন্তু গদ্য ও কবিতা মিলিয়ে তিনি তাঁর

অনুবাদকে অদ্বিতীয় একটি রূপ দিয়েছিলেন। যে অশ্লীলতার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠে, এই অনুবাদ-সাহিত্যের মধ্যে তাকে খুঁজতে গেলে বিদ্বেষের আতস কাচ লাগবে।

এ ছাড়া সাধারণভাবে তাঁর ভাষায় ছিল সাধারণ মানুষের মুখের কথা, ছড়া, শব্দচয়নের গন্ধ, সে যুগের শিক্ষিত পাশ্চাত্যবাদী মানুষেরা তাতে দুর্গন্ধ পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাতে সে যুগের কথন পদ্ধতিরই বাস্তব প্রকাশ ছিল। দীনবন্ধু মিত্র, টেকচাঁদ ঠাকুর এবং কিছুটা মাইকেল মধুসূদন তাঁদের বিদ্রূপাত্মক রচনাতে সেই সাধারণী ভাষাই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমের কলম থেকে সেই ভাষা বের হয়নি। লিখিত বক্তব্যকে সাধারণ মানুষের ভাষায় হাটে-বাজারে হাজির করার প্রথম কৃতিত্ব যাঁদের, ঈশ্বর গুপ্ত তাঁদের পূর্বসূরী।

আর শ্লীলতা-অশ্লীলতা! যে কালে ও যে সমাজে নারীকে স্বভাব-বারাঙ্গনা বলে মনে করা হোত, পাঁচ বৎসরের শিশু বালিকাকে বিদ্যালয়ে পাঠানো হোত না পাছে সে পুরুষের শিকার হয়, সেখানে শ্লীলতার মাপকাঠি কী? গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার তাঁর তৎকালীন বালিকা-বিদ্যালয়ের পাঠ্য "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" গ্রন্থে তো বলেইছেন, শিক্ষা পেলে মেয়েরা সংসারের হিসাব করবেন, স্বামীকে চিঠি লিখবেন, ফলে তাঁদের মনে কু-চিন্তার অবকাশ থাকবে না।

সাংবাদিক হিসাবে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের যে বর্ণনা ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ করেন, সেটিতে দৈনিক রোজনামচার ভিত্তিতে এক গবেষকের দৃষ্টি খুঁজে পাওয়া যায়। আরো একটি মজার ব্যাপার, এই প্রসঙ্গে তিনি ছদ্মনামের ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ছিল সম্পাদকের প্রতি "ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র।" একেবারে শেষে তিনি প্রকাশ করেন যে ভ্রমণকারী বন্ধুটি খোদ সম্পাদক। এও এক নতুন ঢং।

আগেই বলা হয়েছে, সে যুগে বড়লোকেরা বাড়িতে অনেককে আশ্রয় দিতেন, মানুষ করতেন। ঈশ্বর গুপ্তও তাঁর পত্রিকায় অনেক সাহিত্যে যশোপ্রার্থীর রচনাকে আশ্রয় দিয়েছেন, পরিণত হতে সাহায্য করেছেন।

রচনা প্রকাশে উৎসাহ দিয়ে তিনি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন:

"গদ্য হয়, পদ্য হয়, যাহা লয় মনে।
পরম প্রবন্ধ লেখ বিশেষ যতনে॥"

যাঁরা সাড়া দিয়েছিলেন, তাঁদের অনেককে আমরা চিনি—বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, মনমোহন বসু। তাঁর হাতেই প্রথম ছন্দোবন্ধ রচনা গানের বিষয় না হয়ে পাঠের বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। বাঁধা সুরের প্রয়োজনে রচিত না হয়ে কবিতা এবার নিজেকে মেলতে পারলো অসীম জিজ্ঞাসার আকাশে।

মধ্যবিত্ত মানুষ ঈশ্বর গুপ্ত সমাজের গতি-প্রগতির দিকে তীক্ষ্ন নজর রেখেছেন, নিজেকে সেই অনুসারে ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করেছেন। হয়তো সব সময়ে সফল হননি। তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, ভালো-মন্দ বিচার-বিবেচনা তাঁকে প্রভাবিত করেছে।

প্রথম যুগে তিনি সংরক্ষণপন্থী ছিলেন বটে, কিন্তু চল্লিশের দশকে তাঁর পরিবর্তন লক্ষণীয়। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্মগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসেছেন ও তত্ত্ববোধিনী সভার আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছেন, বক্তৃতাও করেছেন। কিন্তু সংরক্ষণপন্থীরা যেমন তাঁকে গ্রাস করতে পারেননি, ব্রাহ্মপন্থীরাও তাঁকে উদরসাৎ করতে পারেননি। তাঁর স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা তিনি বজায় রেখেছেন। এক বন্ধুকে নাকি তিনি বলেছিলেন, গোঁড়া হিন্দু ও গোঁড়া ব্রাহ্ম, উভয়কেই তিনি হীন মনে করেন।

সাংবাদিক হিসাবে তাঁকে সাধারণ পাঠকেরা নানা সমস্যা, অভিযোগ ইত্যাদির কথা লিখতেন। তাঁকে প্রশংসা করতেন, নিন্দাও করতেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি সমাজের নাড়ির গতি বুঝতে চেষ্টা করতেন।

বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর মতের ব্যাপারে কিছু রূপান্তর ঘটে কয়েক বৎসরে ও শেষে তিনি মত দেন যে অক্ষত-যোনী বিধবার বিবাহ সম্ভব। এই মত পরিবর্তন প্রসঙ্গে তাঁর প্রতি চিঠি-পত্রে নানা আক্রমণ চলেছিল এবং এই প্রসঙ্গে তিনি যে সম্পাদকীয় লেখেন, এমন 'অ্যা-ও হয় অ-ও হয়' গোছের প্রবন্ধ এখনো খুব কম সম্পাদকই লিখতে পারেন। (সম্পাদকীয় ১.১০ ১২৬৩)

আজ আমরা স্বীকার করি যে, কোনো ভাষা প্রাণবন্ত হতে গেলে তার বিদেশী শব্দকে আত্মসাৎ ও অর্থবহ করে তোলবার ক্ষমতা চাই। উঠতি বাঙ্গালী পড়ুয়া সমাজে তখন অহঙ্কারের মাপকাঠি ছিল ইংরাজী শব্দ সঞ্চয়। ঈশ্বর গুপ্ত ইংরাজী ভাষায় দক্ষ ছিলেন না। কিন্তু তাঁর রচনায়, গদ্যে ও পদ্যে বাঙ্গলা শব্দের পাশাপাশি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করে বক্তব্যকে তীক্ষ্ণ করেছেন বারবার। এ ধরনটি তাঁর সৃষ্ট এক অপূর্ব ধারা। ইংরেজী শব্দগুলিতে সামান্য রূপান্তর ঘটিয়ে সাধারণ পাঠকের কাছেও বোধগম্য করা হয়েছে এবং এই ব্যবহার রীতি ইংরাজীয়ানায় অভ্যস্ত বাঙ্গালীদের বিদ্রূপের কশাঘাত করেছে।

বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হল যখন, তখন তাঁর প্রতিক্রিয়া—

গ্রান্ট করি গ্রান্টের সকল্ অভিলাষ।
কালবিল কাল বিল করিলেন পাশ ॥

গ্রান্ট মানে চার্লস গ্রান্ট, যিনি বিলটি রচনা করেন, আর কালবিল হলেন বিচারপতি কল্‌ভিল।

আজ তো ব্যাপারটা কত সহজ, আমরা গ্লাসকে ভেঙ্গে বলি গেলাস ভাঙ্গলাম, টেব্‌ল্‌কে টেবিল বলা তো ঘরে ঘরে। সেদিন শুদ্ধ ইংরাজিয়ানার যুগে এই বিকৃতি ছিল রাজভাষাকে খুন করার প্রচেষ্টা।

একই শব্দকে বারবার অর্থান্তরে ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি প্রাচীন কবিয়াল ও পাঁচালীকারদের ধারাবাহী এবং এর জন্য তিনি বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের কাছে তিরস্কৃত হয়েছেন অনুপ্রাস-যমকের আতিশয্যে বক্তব্যকে লঘু করবার জন্য।

কিন্তু তাঁর ভাষা তো হাটে-বাজারের মানুষের ভাষা, যারা ইংরাজীর তোয়াক্কা করেনি, যারা কবিগান, পাঁচালি, রামায়ণ-মহাভারতের সংস্কৃতি-মাধুর্য উপলব্ধি করে এসেছে আসরে মেলায় আখড়ায়। এই ভাষাকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র পালটাতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসন্ন গোয়ালিনীও সাধুভাষায় কথা বলেছে, যেন সে মাধ্যমিক পাশ। খোদ রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের ভাষার কাছে নতজানু হয়েছেন। তাঁর অমিত রায় সাধারণ ভাষাতেই কথা বলেছে।

সতীদাহ-নিবারণ আইনের বিরোধিতা করে রক্ষণশীলেরা বিলাতে আপীল করলেন ও হেরে গেলেন। তাঁদের এজেন্ট ছিলেন 'বেথি' নামে এক সাহেব। ঈশ্বর গুপ্ত ব্যঙ্গ করে লিখলেন:

"ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়, জলে ফেলিলে বরং ভুরভুরি কাটিত, তাহা না হইয়া কেবল ধর্ম্মসভার ব্যথার ব্যথী, ব্যথী সাহেবের উদরায় স্বাহা হইল।" (সংবাদ প্রভাকর, ৪/২/১২৫৫)

নারী শিক্ষার ব্যাপারে ঈশ্বর গুপ্তের উৎসাহ ছিল প্রচুর। স্বয়ং বেথুন সাহেব তাঁকে চিঠি লিখলেন, তাঁর পত্রিকার সাহায্যে নারী-শিক্ষার জন্য জনসমর্থন জোগাড় করতে। এ কি সামান্য মানুষের দায়বদ্ধতার প্রতীক। আবার সাংবাদিক হিসাবে নারী-শিক্ষা নিয়ে বিদ্রূপও করেছেন তিনি। অর্থাৎ সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন, কিন্তু সাংবাদিক-ছড়াকার হিসাবে, অবশ্যই একান্ত লঘু করে ঘটনাটির গুরুত্ব বর্ণনার দায়িত্বও পালন করেছেন। এর ফলে তাঁর গোঁড়া পাঠকের মনের বিরোধিতাও হাস্য-রসের জারকে লঘু হয়ে গেছে।

এই মানুষটি যে যুগ-সন্ধিক্ষণে, যে পরিবেশে জন্ম নিয়েছেন, তাতে তাঁর কর্ত্তব্য ছিল মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতিভূ হিসেবে কাজ করা এবং তাই তিনি করেছেন। না-গোঁড়া, না-র‍্যাডিক্যাল, স্বাতন্ত্র্য-বিলাসী, অথচ সাংবাদিক হিসাবে গভীর অন্তদৃষ্টি ও নিরপেক্ষতা নিয়ে তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ হয়ে সমাজ-প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন ইংরাজশাসন এদেশকে নতুন পথে নিয়ে যাবে। তিনি সিপাহী-যুদ্ধ, সাঁওতাল বিদ্রোহে ইংরাজদের সমর্থন করেছিলেন, ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। অথচ স্বজাত্যভিমানে তিনি সাঁওতাল ও শিখদের স্বাধীনতাস্পৃহাকে, বীরত্বকে প্রশংসা করেছেন। ভাগ্যে তখনো ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট পাশ হয়নি, তা হলে হয়তো রাজদ্রোহের অভিযোগ আসতো তাঁর বিরুদ্ধে।

ঈশ্বর গুপ্ত স্থিতিশীলতায়, শান্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন, তাই ইংরাজ-শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার সহায়ক হিসাবে। কিন্তু বিদেশী শাসন যে এদেশ থেকে সম্পদ লুণ্ঠন করছে এটিও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এবং তা-ও বই-সংবাদপত্র পড়ে নয়, হয় নিজে ঘুরে, কিংবা তাঁর পত্রলেখকদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাতে পুষ্ট হয়েই তাঁর ধারণা দৃঢ় হয়েছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রভাকরে লিখলেন, "কি

চমৎকার এই দুঃসময়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট রাশি ২ নগদ টাকা জাহাজে পুরিয়া বিলাতে প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহারা এই সুবর্ণভূমি ভারতবর্ষের ধনদ্বারা নানা বিষয়েই স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিতেছেন··· ।" প্রায় অশিক্ষিত, হিন্দু কলেজীয় গোষ্ঠীতে অপাংক্তেয় একটি মানুষের অন্তদৃষ্টি। পাত্র পাত্রী সামান্য বদল করে দিলে এটি আজকের কোনো ঈশ্বর গুপ্তের রচনা বলে চালানো যায়।

নিজে তিনি ছিলেন ইংরাজভক্ত, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পরবশতার অন্ধকারে চাপা পড়েনি। অন্ধ ইংরাজ ভক্তদের মনের স্বাধীন চিন্তাহীনতার বেদনায় তিনি সেই ১৮৪৮ বাংলা সনের নববর্ষে দেশমাতাকে প্রণাম না জানিয়ে পাতাল প্রবেশের অনুরোধ করেন।

সাংবাদিক দায়িত্ব সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের সততা ও সচেতনতা উদাহরণ হবার মতো। যখন কট্টর সাম্রাজ্যবাদী বা ধর্মীয় গোঁড়া কোনো সংবাদপত্রের বক্তব্যকে তিনি আক্রমণ করেছেন, তখন তিনি সেই বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার পরে তার জবাব দিয়েছেন। আবার কোনো সংবাদপত্র যখন তাঁর মনোভাবকে সমর্থন করেছেন নিজের পত্রিকার পৃষ্ঠা খরচ করে সেই বক্তব্য বা সম্পাদকীয় পুরোটাই তিনি লিখে দিয়েছেন।

ঈশ্বর গুপ্ত সাহিত্যিক-সমালোচকদের দৃষ্টিতে লঘু, অশ্লীলতাদোষদুষ্ট সাহিত্যের অন্যতম জন্মদাতা। সাংবাদিক হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তকে যদি শুধুমাত্র ইংরাজী জানা পাঠকদের কাছে পত্রিকা বেচে পেট চালাতে হোত, তবে তাঁকে পত্রিকা তুলে দিতে হোত। তাঁর পাঠকদের অধিকাংশ ছিলেন সাধারণ, ইংরাজী-জ্ঞানশূন্য, দেশে-গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা সাধারণ বাঙ্গালী। তাদের কাছে পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য যে ভাষা, যে সরলতা দরকার তাই-ই তাঁর পত্রিকার ভাষা ও তাঁর সাহিত্যের ভাষা, যে সাহিত্য তাঁর পত্রিকাতেই প্রকাশিত হোত। সেই ভাষার নমুনা টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালের ঘরের দুলাল, দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ গ্রন্থে, অর্থাৎ সমকালীন একদল সাহিত্যিকের মধ্যে চালু হয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষার বেদনা তিনি যে ভাষায় প্রকাশ করেছেন, দীনবন্ধু মিত্র তাঁর ক্ষেত্রমণির বেদনা প্রকাশে অন্য ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাতে কি আয়েষার বেদনার গভীরতা ক্ষেত্রমণির বেদনার গভীরতার থেকে বেশি হয়ে ধরা পড়েছে। আসলে বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক, আদর্শবাদী, স্বর্গীয় প্রেমে ভরা রচনার যুগ সবে তখন পা ফেলেছে। রেভারেন্ড লঙের বর্ণনায় জানা যায় যে, ১৮১৮-৫৫ এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্য-জীবনের অধিকাংশ সময়ে যে সমস্ত বই প্রকাশিত হয়েছিল তাদের মধ্যে আদিরসাত্মক, অশ্লীল সাহিত্য ছিল বেশি। ধর্ম ও সংস্কারের সুকঠিন গণ্ডীর মধ্যে নারীদের, বিশেষত নিম্নবিত্ত অশিক্ষিত সমাজের নারীদের যে অবস্থান ছিল, তাতে সমানাধিকার, সমান দায়িত্বের ভিত্তিতে গঠিত নারীপুরুষ সম্পর্ক নিয়ে লেখার অবকাশ তখনও আসেনি। ঈশ্বর গুপ্ত সেই সময়ের কবি-সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক-বর্ণনাকার। কাজেই তাঁর পক্ষে সমাজের প্রকৃত চিত্র প্রকাশ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু এর বাইরে তাঁর জীবনীসাহিত্য, নাটক, ধর্মসঙ্গীত ইত্যাদিতে আদিরস আমদানি করেননি তিনি।

এমন কি শকুন্তলার প্রণয়কাহিনীতেও আদিরস নেই, কারণ বিষয়টির গুরুত্ব।

সংবাদপত্রের মালিক ও সম্পাদক হিসাবে প্রকৃত সামাজিক চিত্র প্রকাশ তাঁর ক্ষেত্রে বার-বার দেখা গেছে। নীলকরদের অত্যাচার প্রসঙ্গে তিনি দিনের পর দিন লিখেছেন, এদেশীয় লোকেদের বিচারকের আসনে বসালে নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ হোত, কারণ ম্যাজিস্ট্রেট যদি শ্বেতাঙ্গ হয়, তবে অবস্থা দাঁড়ায় "কোন কুটিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের শ্যালা, কেহ ভাই, কেহ ভগিনীপতি, কেহ পিস্যে, কেহ জ্ঞাতি, কেহ কুটুম্ব, কেহ গ্রামস্থ···তাহা না হইলেও সকলেই 'এক সান্‌কির ইয়ার'।" মহাজনদের অত্যাচারের প্রতিবাদে ঈশ্বর গুপ্তের পত্রিকা মুখর হয়েছে। দেশীয় ছেলেদের শিল্প শিক্ষার জন্য মেকানিক্যাল ইন্‌স্টিট্যুট প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানিয়েছে, আবার তেমনই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতে উল্লাস প্রকাশ করেও সাধারণ "কালেজ" ও "মেডিকাল কালেজ" বহিষ্কৃত (আমাদের ভাষায় পাশ) ছাত্রদের বেকারত্বে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছে।

স্বাধীন ও মোটামুটি উদার চিন্তার ওপর দাঁড়িয়ে বিভিন্ন ঘটনার বিষয়কে ইস্যুভিত্তিক পর্যালোচনা করা ও তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা, আবার নতুন তথ্যের ভিত্তিতে সেই সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করা, এই মধ্যবিত্ত মনের অধিকারী মানুষটিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উচ্চাসনে ঠাঁই না দিক, অন্তত মনের কোণ থেকে দূর করে দিতে পারবে না।

যুগে যুগে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী নানা ছাঁচে, নানা শৈলীতে অসংখ্য শিল্প রচনা করে গেছেন, কিন্তু সেগুলির মধ্যে স্বল্পসংখ্যকই রচয়িতার কালকে অতিক্রম করে কালজয়ী হতে পেরেছে। মানুষের চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাহস-ভীরুতা, প্রেম-বিরহকে, চেতনা-জড়তাকে স্থায়ী রূপ দিতে পারেন কতজন স্রষ্টা?

বঙ্কিমচন্দ্রকে আজকের আমরা কালজয়ী সাহিত্যিকের তালিকায় স্থান দিতে দ্বিধা করি না। স্বভাবতই বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার ছাঁকনিতে কবি-সাহিত্যিক হিসাবে ঈশ্বর গুপ্ত যখন কালজয়ীদের তালিকা থেকে খারিজ হয়ে গেছেন, তখন সেই মূল্যায়নকে গুরুত্ব দিতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছেন ও তাঁকে কাছের থেকেই দেখেছেন। সত্যিই ঈশ্বর গুপ্তের রচনা আমাদের মনকে সেই ডুবে যাওয়ার স্বাদ দেয় না, যা বঙ্কিমের রচনা দেয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লিখেছেন, "ঈশ্বর গুপ্ত সুশিক্ষিত হইলে তাঁহার যে প্রতিভা ছিল, তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে তাঁহার কবিত্ব, কাব্য এবং সমাজের উপর আধিপত্য অনেক বেশী হইত।" অর্থাৎ, বঙ্কিমের কাছে, ইংরাজী জানা না থাকলে প্রতিভার বিহিত প্রয়োগ হয় না এবং সমাজ অর্থে বুঝতে হবে কেবলমাত্র ইংরাজী জানা সমাজ।

কিন্তু মধ্যবিত্ত স্বাতন্ত্র্য-বিশিষ্ট সাংবাদিক হিসাবে ঈশ্বর গুপ্ত যে খবর আমাদের জন্য রেখে গেছেন, তার মূল্যায়ন শুধুমাত্র কবিত্বের মনোহারী শক্তি বা সাহিত্যের অনন্য সৌন্দর্য-রূপ দিয়ে হয় না। তাঁর সম্পাদকীয় থেকে আমরা জানতে পারি, সেই সুদূর ১২৫৭ সালে গরু ও মোষের গাড়ির গাড়োয়ানেরা ট্যাক্স রহিতের দাবিতে ধর্মঘট

করেছিলেন ও জিতেছিলেন। আরো জানতে পারি যে, এই ট্যাক্স রহিতের ফলে সরকার শহরের বাড়ি-ঘরের ট্যাক্স বাড়িয়ে দিয়েছিল, যেটা সম্পন্ন ও মধ্যবিত্ত বাড়িওয়ালাদের ঘাড়ে চেপেছিল ও যার ফলে মধ্যবিত্ত ঈশ্বর গুপ্ত ক্ষিপ্ত হয়ে লিখেছিলেন, যা দিনকাল পড়েছে তাতে এডিটরগিরির চেয়ে গাড়োয়ানী শ্রেয়।

তাঁর পত্রিকাতেই প্রকাশিত হবার ফলে আমরা জানতে পারি যে, বিধবা নারীরা যৌথভাবে রাধাকান্ত দেবের কাছে লিখিত আবেদন করেছিলেন যে, তিনি যেন বিধবা-বিবাহের সপক্ষে দাঁড়ান, যা রাধাকান্ত দেব করেননি, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত, আমরা দেখেছি, শর্তাধীনে করেছিলেন।

আজ সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জর সমাজের কাছে ১২৫৫ সালে লেখা তাঁর সম্পাদকীয় ব্যঙ্গ—"ধর্ম্ম সভা, এই শব্দ শুনিতে অতি উত্তম, কিন্তু ইহার ভিতরের ধর্ম্ম অন্বেষণ করিলে তন্মধ্যে কোন পদার্থই দৃষ্ট হয় না।"

চল্লিশের দশকে দু-একজন দেশীয় ব্যক্তি, যাঁদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর অগ্রগণ্য ছিলেন, দেশীয় মানুষের দ্বারা শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। জাহাজ কোম্পানী, রানীগঞ্জ কয়লা খনি, ইত্যাদি শিল্পে দ্বারকানাথ পুঁজি বিনিয়োগ শুরু করেন। ইতিহাসের ধারায় যে ভারতীয় পুঁজির উদ্ভব, এটাই বলা যায় তার শুরু। কিন্তু সাধারণভাবে শিক্ষিত বাঙ্গালী তখন বিদেশীয়ানার ঢেউ এ ডুবেছিলেন। চাকরি, দালালী, জমিদারী ইত্যাদির বাইরের জগতে তাঁদের মনোনিবেশ হয়নি। সেই সময়েই কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত স্থির করেছিলেন যে, গোলামীর চেয়ে স্বাধীন বৃত্তি অনেক ভালো এবং স্বাধীন বৃত্তির পথেই ক্রমে দেশের শিল্পোন্নয়ন ও অগ্রগমন হতে পারে। পরবশতার মনোভাবের বিরুদ্ধে তাই পরম বেদনায় লিখেছিলেন :

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

সমাজ-বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ধারণা নিশ্চয় তাঁর ছিল না, কিন্তু এ দেশের উন্নতির জন্য দেশজ শিল্প, সংস্কৃতি, উৎপাদনের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রয়োজন, তার আহ্বানই তিনি জানিয়েছেন। দেশবাসী এই আহ্বানের মর্ম তখন বুঝতে পারেনি। কিন্তু পঞ্চাশ বছর পরে এই স্বদেশীয়ানার দাবিতেই ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠেছিল।

আজও চূড়ান্ত সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে আবার সেই দাবিকেই প্রতিষ্ঠিত করার সময় হয়েছে।

দেড়শ বছর আগে এই সতর্কবাণী যে মানুষটি প্রচার করবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর নবমূল্যায়ন পূর্বসূরীদের কাছে আমাদের ঋণ পরিশোধ।

(সহায়ক গ্রন্থাবলীর তালিকা পরের পাতায়)

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙ্গালীর যাবতীয় সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষার আন্দোলন যেমন সময়ের সীমানায় বেষ্টিত, তেমনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্নতির লক্ষ্যেই নিয়োজিত। রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কোনো কোনো অর্থে, এই দুই সীমাকে অতিক্রম করেছিলেন। রামমোহন ইংরেজ বণিকদের সহযোগী হিসেবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন, আবার যেখানে জমিদারশ্রেণী ও ইংরেজ প্রশাসন রায়তস্বার্থের পরিপন্থী ভূমিকায়, সেখানে রামমোহন রায়ত স্বার্থের পক্ষে কথা বলেছেন। ইংরেজের উপনিবেশন সুফলদায়ী ভেবেছেন, অথচ রাজা চতুর্থ জর্জকে লেখা ৫৫ অনুচ্ছেদ-সম্বলিত পত্রে অত্যাচারী প্রশাসনের পতনের অনিবার্যতাও জানিয়েছেন। রামমোহন 'রাজা' সেজে বিলাত যান সামন্তপ্রভুর পেনশন বাড়াবার আর্জি নিয়ে। কিন্তু পার্লামেন্টে যেসব নথিপত্র পেশ করেন, সেগুলি ভারতের অর্থনীতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট। ঠিক এই ধরনের বৈপরীত্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বেও দুর্লভ নয়। গ্রাম-বাংলার এই মানুষটি পদব্রজে সেই যে কলকাতায় এলেন মাইলস্টোন গুনতে গুনতে, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর নবজাগরণের মাইলস্টোন পোঁতা হল তাঁর নামে ও কর্মে। গ্রাম থেকে এলেন তিনি রাজধানী শহরে, আর গ্রামীণতায় ফিরে যাননি। তিনি 'দীনবন্ধু', গরীবের ত্রাতা, কিন্তু শতকরা ৬০ জন কৃষক গ্রামবাসীর জন্য তাঁর কোনো কর্মসূচী নেই। কার্মাটারে তিনি গরীবদের জন্য কিছু খয়রাতি ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু মহাজনী-জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর কোনো ক্ষোভ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' (১৮৭২) ছাপা হবার পরেও বিদ্যাসাগর কুড়ি বছর জীবিত ছিলেন। আবার তাঁরই উদ্যোগে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সোমপ্রকাশে গ্রামের দুরবস্থার ছবি নিয়মিত স্থান পেত। এই ধরনের স্ববিরোধের পরেও কিছু হিসাব-নিকাশ থেকে যায়।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কার জনশিক্ষা বা একালের ভাষায় অনুবর্তনীশিক্ষার ধার ঘেঁষেও যায়নি। নর্মাল স্কুল, ভার্নাকুলার স্কুলও আসলে মধ্যবিত্তদের উন্নতিসাধনের প্রয়াস। তারা যেন উকিল, মাস্টার, কেরানী, ডাক্তার ইত্যাদি হতে পারে। সে প্রয়াস সার্থকও হয়েছিল। কারণ ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই সারা ভারতে ওই সব পদের জন্য লোকজন প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করেছিল। তেমনি তাঁর সমাজ-সংস্কারকেও দেখা চলে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ গ্রামের নিম্নবর্গের মানুষের জীবনে কোনো জটিল সমস্যা নয়। বাল্যকাল থেকেই যারা শ্রমজীবী, তাদের বিবাহ প্রয়োজনে

একাধিক বার হতে পারে। বিধবাবিবাহ বা নিকা মুসলমানদের মধ্যে, হিন্দু নিম্নবর্গে বরাবর প্রচলিত ছিল।

তাহলে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের স্থায়ী মূল্য কী?

রামমোহন সময়ের সীমাকে অতিক্রম করেছিলেন—

ক. কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুধর্মের সারবস্তু অন্বেষণে

খ. উপনিষদগুলির সম্প্রচারে—বজ্রসূচীর তাৎপর্য ব্যাখ্যায়

গ. মুক্তমনের ধর্মসংস্কৃতি চর্চায়—আইডেনটিটির খোঁজে

ঘ. অভ্যাসের স্থানে যুক্তি, বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহ, রাজনৈতিক অধিকারবোধ।

বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ইংরেজি শিখেছিল চাকরির জন্যে। রামমোহন আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার পরে নিজের চেষ্টায় ইংরেজি শিখেছিলেন বিশ্বকে বোঝবার জন্যে এবং নিজের ভাবনা-চিন্তা য়ুরোপীয়দের কাছে জানাবার জন্যে। এখানেই তিনি অনন্য।

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কথা স্মরণ করি: 'অনুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে; তাহাতে ছোট জিনিসকে বড় দেখায়; বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত…কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ।' তিনিও গড়পড়তা বাঙ্গালীর অনেক ঊর্ধ্বে। রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম হলেন। রামমোহনের সমাজসংস্কার আন্দোলনের সবচেয়ে সার্থক উত্তরসাধক বিদ্যাসাগর। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ বন্ধু, তত্ত্ববোধিনী পরিচালনার সহায়ক বিদ্যাসাগর ব্রাহ্ম হননি। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মতে, তিনি সংশয়বাদী (agnostic) ছিলেন, অথচ তাঁর চিঠির শিরোনামে থাকতো 'শ্রীহরি শরণং'। অনেক যোগ্য ব্যক্তিরও ইংরেজ-ভজনার হাতিয়ার ছিল ইংরেজি। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করতে করতেই ভালো ইংরেজি শিখেছিলেন। কাউকে ভজনা করার ধাত তাঁর ছিল না। আসলে রামমোহন 'এনলাইটেনমেন্ট' এবং বিদ্যাসাগর রেনেশাঁস আদর্শের মানুষ; দুজনেই প্রথমত যুক্তিবাদী মানবপন্থী, দ্বিতীয়ত শাস্ত্রবিদ। রেনেশাঁস-হিউম্যানিজম অংশত ঐতিহ্যবাদী। তাই উনিশের শতকে শাস্ত্রপুরাণ নিয়ে প্রচুর বিতর্ক দেখা দেয়। দুই যুগন্ধর ব্যক্তিরই বিশ্বাস ছিল 'যুক্তিহীন বিচারেন ধর্মহানি প্রজায়তে'।

এই সূত্রে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জীবনসাধনা বিচার্য। তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের সমকালীন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্ম ১৮২২, মৃত্যু ১৮৯১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেয়ে তিনি দু বছরের ছোট, দুজনের মৃত্যুবর্ষ একই। দুজনেই ভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, অধ্যক্ষ এবং শিক্ষাবিভাগের ইনস্পেকটর ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল কখনো সরাসরি শিক্ষকতা করেননি, তবে তখনকার সদ্য প্রবর্তিত (১৮৫৪-এর উড ডেস্প্যাচের ফলে) শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে, পাঠ্যপুস্তক রচনার সঙ্গে তাঁর

যথেষ্ট যোগ ছিল। বাংলায় স্কুলপাঠ্য বই লেখার জন্য স্কুলবুক সোসাইটি (১৮১৭) যে কর্মসূচী গ্রহণ করে, তার মধ্যে রাজেন্দ্রলালও অংশ নেন। কীথ সাহেবের ব্যাকরণ-সংস্কার তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ সাহেব মোটামুটি সংস্কৃত জানলেও বাংলা ব্যাকরণের সমস্যা বুঝতে পারেননি। তাই রামমোহনের গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণের পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'ব্যাকরণপ্রবেশ' (১৮৬২) উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা। মাত্র ৭০ পৃষ্ঠার পরিসরে রাজেন্দ্রলাল নিজের মতো করে ব্যাকরণের সমস্যাগুলি নিয়ে ভেবেছিলেন। মনে রাখতে হবে, আমাদের পঠন-পাঠনে ভাষাতত্ত্বের অন্তর্ভুক্তির অনেক আগের ব্যাপার এই বইটির পরিকল্পনা। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণের প্রথম উপদেশ' দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য ছিল। কাজটি এখনো সুসম্পন্ন করা যায়নি।

রাজেন্দ্রলালের 'প্রাকৃত ভূগোল' (১৮৫৪) বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। পরিবেশ, আবহাওয়া ইত্যাদির সঙ্গে মিলিয়ে ভূগোল রচনার চেষ্টা তাঁর আগে তত্ত্ববোধিনীর কর্ণধার অক্ষয়কুমার দত্ত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া যাক, তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার রচনা নির্বাচনের জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে 'কমিটি অফ পেপারস্' মনোনীত করেন, বিদ্যাসাগর ও রাজেন্দ্রলাল তার সদস্য ছিলেন। বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষাসংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মদের সমাজপ্রগতির আন্দোলনের যে রকম যোগ ছিল, রাজেন্দ্রলালের তা ছিল না। তবে প্যারীচাঁদের সহোদর, কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাড়িতে যে 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতি' (Association of Friends for the Promotion of Social Improvement) প্রতিষ্ঠিত (১৮৫৪) হয়, তার অন্যতম কার্যনির্বাহী সদস্য ছিলেন রাজেন্দ্রলাল। কলকাতা এবং তার চারপাশের শহরতলি এলাকায় এই সমিতির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ নিরোধ, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন ইত্যাদি এই সমিতির কাজের তালিকাভুক্ত। এছাড়া গঙ্গাসাগরে শিশু বিসর্জন, চড়ক পালনের নিষ্ঠুর নিগ্রহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা এই সমিতির লক্ষ্য ছিল। তাই বিদ্যাসাগর তাঁর বহুবিবাহ বিষয়ক বইয়ের ভূমিকায় এই সমিতির কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ১৮৫৭ সালের বার্ষিক সভার বিবরণে দেখা যাচ্ছে, সভাপতি রাজেন্দ্রলাল মিত্র বহুবিবাহ বন্ধ করার পক্ষে আইন করতে চাইছেন এবং পরিণীতা সব স্ত্রীর ভরণপোষণে কুলীন স্বামীকে আইনত বাধ্য করার প্রস্তাব দিচ্ছেন। বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের সমর্থনে ব্যবস্থাপক সভার কাছে যে পত্র পাঠানো হয়, তাতে রাজেন্দ্রলালও স্বাক্ষরকারী ছিলেন।

রাজেন্দ্রলালের আর একটি কাজকেও বিদ্যাসাগরের অনুবাদ-কর্মসূচীর সম্পূরক বলা যেতে পারে। বিদ্যাসাগর শাস্ত্রবাক্য সংকলন, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেন তাঁর সমাজসংস্কার কর্মকাণ্ডের সমর্থনে। রাজেন্দ্র রামমোহনের মতো উপনিষদ-পুরাণের Text অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। বিদ্যাসাগরের অনুবাদ সংস্কৃত থেকে বাংলায়, রাজেন্দ্রর সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে। সাধারণ মানুষ যাঁরা কন্যার দুঃখে দুঃখী, কিন্তু

শাস্ত্র ও পরলোকের ভয়ে নিষ্ঠুর পীড়ন সম্বন্ধে উদাসীন, বিদ্যাসাগরের অনুবাদ তাঁদের ভরসা দিয়েছে। যাঁরা যা কিছু পুরাতন এবং শাস্ত্রীয়, তার সম্বন্ধেই উন্নাসিক অবজ্ঞা পোষণ করেন, রাজেন্দ্রলালের ইংরেজি অনুবাদ তাঁদের প্রভাবিত করেছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ। পৃ. ৩৭+১৪৪, ১৮৬২

তৈত্তীরিয় ব্রাহ্মণ। পৃ. ৪+২৬৪, ১৮৫৯ / পৃ. ৪+৯৩৫, ১৮৬২

পৃ, ৭+৮৬৮, ১৮৯০

তৈত্তীরিয় আরণ্যক পৃ. ৫৬+৮১+৯২৮, ১৮৭২

অগ্নিপুরাণ। তিনখণ্ড। ১৮৭৩, ১৮৭৬, ১৮৭৮

গোপথব্রাহ্মণ। যুগ্মসম্পাদক। ১৮৭২

তৈত্তীরিয় প্রাতিশাখ্য। পৃ. ৩৯+১৮৩, ১৮৭২

ঐতরেয় আরণ্যক। পৃ. ৬+৪৭৯, ১৮৭৬

বায়ুপুরাণ / দুখণ্ড। ৫৪০+৬৫৯ / ১৮৮০, ১৮৮৮

পাতঞ্জলির যোগদর্শন। ১৮৮৩

বৃহৎ দেবতা / শৌনক, পৃ. ৩৩৩, ১৮৯২ (সম্পাদনার কাজ সম্পূর্ণ করার আগেই মৃত্যু)

এসব অনুবাদকর্ম খুবই পরিশ্রমসাধ্য, তাঁর এশিয়াটিক সোসাইটির চাকরির সঙ্গে এর অপরিহার্য কোনো সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু লর্ড মেকলের মতো মদগর্বী ইংরেজ রাজপুরুষদের কাছে, প্রতীচ্য মনীষীদের কাছে এসবের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের বিদ্যাচর্চার নানা নিদর্শন উপস্থিত করা গিয়েছিল। বিশ্ব-রেনেশাঁসের ইতিহাসে 'Revival of Antiquities' একটি সাধারণ লক্ষণ রূপে বিবেচিত। আত্ম-আবিষ্কারের তাগিদ। নিজেকে জানতে গেলে নিজের ঐতিহ্যভূমিকে জানতে হয়। সেখানেই প্রাচীন শাস্ত্র-পুরাণ-কাব্যকে জানার আবশ্যিকতা। বিদ্যাসাগর সামাজিক প্রয়োজনে শাস্ত্র অনুবাদ করেছেন। কিছু বর্জন, কিছু গ্রহণ করেছেন মানবিক মূল্যবোধের দিক থেকে। মনু পরাশর যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদির বচন উদ্ধার ও ব্যাখ্যার পরে—

একটি কুলীন মহিলার আক্ষেপোক্তির উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ঐ কুলীন মহিলা ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে জ্যেষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার নাকি বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা হইতেছে। আমি কহিলাম, কেবল চেষ্টা নয়, যদি তোমাদের কপালের জোর থাকে, আমরা এবারে কৃতকার্য হইতে পারিব। তিনি কহিলেন, যদি আর কোন জোর না থাকে, তবে তোমরা কৃতকার্য হইতে পারিবে না; কুলীনের মেয়ের নিতান্ত পোড়াকপাল; সেই পোড়া কপালের জোরে যত হবে, তা আমরা বিলক্ষণ জানি। এই বলিয়া মৌনাবলম্বন পূর্বক কিয়ৎক্ষণ ক্রোড়স্থিত শিশু কন্যাটির মুখ নিরীক্ষণ করিলেন;

অনন্তর সজল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, বহুবিবাহ নিবারণ হইলে আমাদের আর কোন লাভ নাই ; আমরা এখনও যে সুখভোগ করিতেছি, তখনও সেই সুখ ভোগ করিব।

শাস্ত্রবচনের চেয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে কুলীনকন্যার উক্তির জোর অনেক বেশি। কারণ তার মূলে আছে জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা, অনেক অবদমিত অশ্রু। এখানে বিদ্যাসাগরের 'হিউম্যানিস্ট' সত্তা। শাস্ত্রের অস্ত্রে লড়াই যেমন 'কৌশল', তেমনি কুয়াশা মোচন করে আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়াস—এই সূত্রে 'Revival of Antiquities'। রেনেশাঁসে পুরাবস্তুর পুনরাবর্তন মানেই 'পুনর্মূল্যায়ন'।

রাজেন্দ্রের অনুবাদ-কর্ম কেবল সমাজমনস্কতারই প্রতিচ্ছবি নয়। তাঁর মননশীলতা, বহুমুখী জীবনাগ্রহ ও জিজ্ঞাসারও পরিচয়বহ। রমেশচন্দ্র দত্ত ইংরেজিতে প্রাচ্য মহাকাব্যকথা লিখেছেন য়ুরোপীয়দের কথা মনে রেখে। রাজেন্দ্রলাল 'বঙ্গবাসী'-গোষ্ঠীর অর্থে 'রিভাইভ্যালিস্ট' নন। তিনি পুরাতত্ত্ব প্রত্নতত্ত্বের প্রমাণের সাহায্যে অতীত ইতিহাসের পটভূমিকে আবিষ্কার করেছেন। আবার কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও রসদ যোগাচ্ছেন—তিনি উনিশ শতকের নবজাগরণের মানুষ—রামমোহনের উত্তরসাধক, বিদ্যাসাগরের সহযোগী।

একটি ছোট পুস্তিকার কথা উল্লেখ করি। 'Beef in Ancient India' (১৮৭১)। গরু আমরা পুজো করি, 'গোধন' বলি। আবার গোমাংস উপাদেয় খাদ্য, যজ্ঞেও গোমাংস লাগে। রাজেন্দ্রলাল প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর বক্তব্য প্রতিপন্ন করেছেন। পারিবারিক সংস্কারে তিনি বৈষ্ণব, কৃষ্ণের লীলাসহচর গো-সমাজ। কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও মননশীলতা তাঁকে সত্য প্রতিষ্ঠায় দ্বিধামুক্ত রেখেছিল। রামায়ণ-মহাভারত আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সেকালে প্রচুর মদ্যপান করতেন। অনেক ধরনের সুরা সেকালে প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণের অগ্রজ বলরামের চোখ মদিরা সেবনে রক্তজবার মতো হয়ে থাকতো। সেকালে দুটি চরমপন্থা পেয়ে বসেছিল—অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের সব খারাপ, সবই বর্জনীয়। অন্যপক্ষে, সবই ভালো, এর চেয়ে ভালো আর হয় না। দুই বিপরীত কোটির মধ্যে বস্তুবাদী রমেশচন্দ্র ও রাজেন্দ্রলাল কখনোই ন্যায়বোধের মাত্রা হারাননি। বেদ-বেদান্ত, উত্তরচরিত, মহাবীরচরিত, স্মৃতি, মহাভারত, রামায়ণ, চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি থেকে প্রচুর উদ্ধৃতিযোগে নিজের বক্তব্য রাজেন্দ্রলাল প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্বামী ভূমানন্দ ১৯২৬ সালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার পটভূমিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সহায়ক হিসেবে Beef in Ancient India পুস্তিকাটি পুনর্মুদ্রিত করেন। ভূমিকায় স্বামী ভূমানন্দ লেখেন: 'This booklet can kindle a spirit of toleration among my Countrymen and can thereby, to some extent, solve the problem of the present Internecine Communal dissensions.'

তখন একেই কি বলে সভ্যতা, সধবার একাদশী, মদ খাওয়া বড় দায় প্রভৃতি অজস্র প্রহসনে মদ্যপান বিরোধী পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। রাজনারায়ণ বসুর আত্মজীবনী পড়ে জানতে পারি, সভ্যসমাজে সহবৎ শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে মদ্যপান প্রচলিত ছিল। হুতোমের নক্সায় বিচিত্র মাতালের চেহারা ধরা পড়েছে। প্যারীচাঁদ-কিশোরীচাঁদরা সুরাপান নিবারণী সভা করেছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র প্যারীচরণ সরকার এই সভার উৎসাহী সদস্য ছিলেন, কিন্তু সকলেই আজীবন সুরাপায়ী ছিলেন। তাই সধবার একাদশীতে মদের বিরুদ্ধে কথা বলে আবার সবাই মদ খেয়েছে। মধুসূদনকে প্রকাশ্য সম্বর্ধনা সভাতেই কালীপ্রসন্ন পানপাত্র উপহার দিয়েছিলেন। অভ্যাস এবং আন্দোলন, আচরণ এবং আলোচনায় স্ববিরোধ বাংলার নবজাগরণেরই বৈশিষ্ট্য—কলোনীয় সীমাবদ্ধতায় রেনেশাঁস বুদ্ধিজীবীর পাখার ঝটপটানি। এর চেয়ে বেশি শক্তি পাবে কী করে? সুরাসক্তি মুসলমান শাসনের প্রভাব বা ইংরেজ শাসনের প্রভাব নয়, এটাই রাজেন্দ্রলালের বক্তব্য। Spirituous Drinks in Ancient India (১৮৭৩) প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন, দেবপূজায় যজ্ঞে-হোমে মদ লাগতো, স্মৃতিগ্রন্থে মদ্যপায়ীকে 'মহাপাতক' বলা হয়েছে। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন সত্ত্বেও মদ্যপান কোনো দিন বন্ধ হয়নি।

চৈতন্যধর্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র মোটেই উৎসাহী ছিলেন না। রামমোহন যে কোনো রকম ভক্তিধর্মেরই বিরোধী, কারণ ভক্তি যুক্তির বিরোধী। তবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বেথুন সোসাইটিতে চৈতন্য সম্পর্কে দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন, রাজেন্দ্রলাল চৈতন্যের ধর্মের সামাজিক তাৎপর্য (জাতিভেদ, বর্ণভেদ লোপ) ব্যাখ্যা করেন। দুজন লেখকের কেউই ভক্ত হিসেবে নয়, ইতিহাসের দৃষ্টিতে চৈতন্যধর্মকে দেখেছেন।

এবার রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে নিয়ে আমরা কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে চাই। চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে ঋদানভ-রণদিভে-ভবানী সেনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী যখন আমরা ব্যক্তি-ভূমিকার মানদণ্ড নির্ণয়ে বিতর্কে লিপ্ত, তখন নীরেন্দ্রনাথ রায় সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যক্তির মূল্যায়নে কয়েকটি সূত্র উপস্থিত করেন। সেগুলি নিম্নরূপ :

১. সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে কী মনোভাব
২. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কী মনোভাব
৩. ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে কী মনোভাব

এই নিরিখে বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল ও বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ব্যক্তিরা কেউই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে দেখা যায়, কৃষক ও জমিদার সম্পর্ক এবং জমিদারী শোষণের স্বরূপ বঙ্কিম ঠিকই বুঝেছিলেন। তাঁর বন্ধুরা অনেকেই জমিদার-সভার সভ্য ছিলেন—তিনি কোনো সংস্রব রাখেননি, কিন্তু তবু জমিদারদের যে চিরস্থায়ী অধিকার দেওয়া হয়েছে, তা আর পালটানো যায় না, তাহলে শর্তভঙ্গ করা হয়, এই ছিল তাঁর মত। রাজেন্দ্রলাল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের একজন উদ্যোগী কর্মকর্তা

হিসেবে মধ্যবিত্ত প্রজাদের হয়ে অনেক প্রস্তাব পাশ করেছেন, কিন্তু কৃষকদের ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি নীরব, অথচ তত্ত্ববোধিনী পত্রে কৃষকদের দুর্দশা সম্বন্ধে প্রায়ই প্রতিবেদন বেরোচ্ছে। তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে নিবিড় সংযোগ সত্ত্বেও কৃষিজীবীদের সমস্যা তাঁকে উদ্বিগ্ন হতে দেয়নি। বরং তাঁর আন্তরিক সদিচ্ছা ছিল ওয়ার্ডস্ ইনস্টিটিউশনের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে—জমিদার-নন্দনদের চরিত্র গঠনের দিকে। তারা যেন বখে না যায়, ব্যভিচারী না হয়, তিনি চেষ্টা করেছেন। যা হওয়া উচিত ছিল, তা-ই হয়েছে। অর্থাৎ তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। মতিলালের দল যথারীতি উৎসন্নে গেছে। ওয়ার্ডস্ ইনস্টিটিউশনও বেশি দিন চলেনি। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে রাজেন্দ্রলাল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দেন, তাতেই তাঁর শ্রেণী-সান্নিধ্য ধরা পড়ে। তাঁর বক্তব্য: ইংরেজ ভালো উদ্দেশ্য নিয়েই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছে। নায়েব-গোমস্তা প্রমুখ কর্মচারীরা প্রজাদের অনুচিত পীড়ন করে, অনেক জমিদারও প্রজাদের ভালো-মন্দ সম্পর্কে উদাসীন, তবু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেশে একটা স্থিতাবস্থা এনেছে। বেঙ্গল টেনান্সি বিল প্রজাদের কিছু অধিকার দিচ্ছে—যতটা নামে ততটা কাজে নয়, বুঝেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। রাজেন্দ্রলাল টেনান্সি বিলেরও (চাষীও ইচ্ছা করলে জমি হস্তান্তর করতে পারবে) বিরোধী। কারণ জমিদাররা অসুবিধায় পড়বে, ইংরেজ শাসনের পক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের চুক্তিভঙ্গের দায় অর্শাবে। এই ছিল রাজেন্দ্রলালের যুক্তি।

ফার্গুসন বা কীথের সঙ্গে প্রাচ্যবিদ্যাবিদ রাজেন্দ্রলালের তর্কবিতর্ক তাঁর দেশাভিমানী ভারতীয় ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের দোষ তাঁর চোখে পড়েনি। কোনো কালে ইংরেজরা চলে যাবে, তিনি ভাবতে পারেননি। অথচ তিনি একজন যথার্থ দেশপ্রেমিকই ছিলেন। যে বেথুন সোসাইটির তিনিও সদস্য, সেখানেই একটি সভায় মিঃ ওয়াইনের আলোচনার প্রতিবাদে তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ইংরেজরা আমাদের দেশ জুড়ে থাকবে, আর আমাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হবে, এ ভাবনাটাও অযৌক্তিক। রাজেন্দ্র এই মনোভাবের অংশীদার হতে চাননি।

সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কেও বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পরিচ্ছন্ন নয়। প্রায় সকলেই বিদ্রোহের স্বরূপ—'প্রথম জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম'—এই তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। হরিশ্ মুখোপাধ্যায় এবং কয়েকজন ব্যতিক্রম। কারণ বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের সামনে জীবন-জীবিকার কোনো সংকট তখনো দেখা দেয়নি। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই অর্থাৎ ১৯০৫/১০ সালেই ইংরেজ প্রশাসনের সঙ্গে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর সহযোগিতার বাঁধন শিথিল হতে আরম্ভ করলো। একজন নরমপন্থী আপসকামী বুদ্ধিজীবী রাজেন্দ্রলালের সামাজিক অবস্থান কখনোই ব্রিটিশ-বিরোধী হয়ে ওঠেনি।

তবু দ্রুত একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর প্রবণতা ত্যাগ করা উচিত। হ্যাঁ কিংবা না,

কোনো ব্যক্তি, তার কর্মকাণ্ড ভাবনাচিন্তা প্রগতিশীল কিনা—তা নির্দ্বিধায় বলা অসম্ভব। কারণ কলোনীয় রেনেশাঁসে দ্বিধা-দ্বন্দ্বই ঐতিহাসিক সত্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘাত বাধছে, ব্যক্তির চিত্তে সংক্ষোভ জাগছে। কিন্তু শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুশোভন সরকার নির্দেশিত দুটি শব্দ Westernism এবং Orientalism দ্বারা উনিশ শতকীয় জাগৃতি অথবা রবীন্দ্রনাথ, কারো প্রতি সুবিচার করা যায় না। রাজেন্দ্রলাল এশিয়াটিক সোসাইটিকে আঁকড়ে ধরে পুরাতত্ত্ব চর্চা করেছেন, সুতরাং প্রাচ্যাভিমানই তাঁর জীবন ও কর্মের শেষ কথা? পাশ্চাত্যপ্রবণতারও যে অনেক উপাদান মিলে মিশে রয়ে গেছে সকলেরই চিন্তা ও কর্মে। বিদ্যাসাগরের বাইরের আকৃতি সংস্কৃতবিদ্যাচর্চার, অন্তরে উজ্জ্বল য়ুরোপীয় প্রকৃতি। তিনি বসতেন চেয়ারে, তাকিয়া ঠেস দিয়ে নয়। তাঁর শাস্ত্রের বইও বাঁধাই হয়ে আসতো মরক্কো চামড়ায় এবং সোনার জলে। জীবনের কতগুলি তথ্য জড়ো করলে তার যোগফলে রাজেন্দ্রলালকে প্রাচীনপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল মনে হতে পারে। আবার এমন কিছু ঘটনা বা ভাবনার সাক্ষ্য আছে তাঁর জীবনে, যা থেকে তাঁকে অনায়াসেই প্রগতিশীল, বিজ্ঞানমনস্ক, আধুনিক অর্থে রেনেশাঁস-মানুষ বলা যায়। বস্তুত 'সরু-মোটা দুইটি তারে' সেকালের সব ব্যক্তিপুরুষের জীবনবীণা বাঁধা হয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তার ব্যতিক্রম নন।

বাঙ্গালীর প্রকৃত ইতিহাস পাল-সেন আমল থেকে শুরু হয়েছে। এই দুই পর্বের ইতিহাসকে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে আবিষ্কারের কৃতিত্ব রাজেন্দ্রলালেরই প্রাপ্য। তাঁর 'নেপালে বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য' গ্রন্থ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পূর্ববর্তী সারস্বত সম্মিলনের কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলে গেছেন। রাজেন্দ্রলালের পর রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামদাস সেন, প্রাণনাথ পণ্ডিত প্রমুখ ব্যক্তি প্রাচীন বাংলার ইতিহাস নিয়ে ভেবেছেন। রাজেন্দ্রর 'রহস্যসন্দর্ভ' তাঁর ভাবশিষ্য রামদাস সেনকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, তাঁর সব বই রহস্য-নামাঙ্কিত [যেমন ঐতিহাসিক রহস্য, ভারত রহস্য, সংস্কার রহস্য]।

সন্ধ্যাকর নন্দী, জয়দেব গোবর্ধন, শরণ ধোয়ী প্রমুখের রচনা যে বাঙ্গালীরই সংস্কৃতি সাধনার পরিচায়ক, রাজেন্দ্রলালই তা ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর গোচরে এনেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, প্রথম বাঙ্গালী কবি জয়দেব, তারপরে শ্রীমধুসূদন। এই দুই কবি, জয়দেব এবং মধুসূদনের প্রতিভা সম্বন্ধে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের পূর্বসূরী রাজেন্দ্রলাল। আবার পরিভাষা নির্মাণের উদ্যোগে তিনি হরপ্রসাদ, রামেন্দ্র-সুন্দরের পথপ্রদর্শক—এ কাজে আধুনিক য়ুরোপের দিকে তিনি মনের দরজা-জানলা খোলা রেখেছিলেন। বাংলার উনিশ শতকীয় জাগৃতির মিশ্র চরিত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলেই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একটি যথার্থ ভাবমূর্তি নির্মিত হতে পারে।

□ রবীন্দ্র গুপ্ত

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রাক্‌কথন

বঙ্গদেশে উনবিংশ শতাব্দী নবচেতনার দ্বারোন্মোচনের শতাব্দী। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক মিলন-সংঘাতের দ্বান্দ্বিক বাতাবরণে একদিকে যেমন ক্রমবর্ধমান এর ইতিহাস-চেতনা, যুক্তিবাদী প্রবণতা, মানবিকতা, বিজ্ঞান-মনস্কতা, গণতান্ত্রিক চেতনা, স্বাধিকার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, তেমনি অন্য দিকে গড়ে উঠেছে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার চিন্তাজাত নানা সভা-সমিতি, সংগঠন। বাংলার যুগসন্ধির এমনি এক পটভূমিতে মধুসূদনের কলকাতা আগমন। এই নবযুগের সূচনাপর্বে একমাত্র ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপ থেকেই সেদিন এসেছেন রাধানাথ শিকদারের মতো বৈজ্ঞানিক, রামতনু লাহিড়ীর মতো দার্শনিক, তারাপদ চক্রবর্তী ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের মতো বুদ্ধিজীবী ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো এনসাইক্লোপিডিস্ট। এঁরা মূলত বিচরণ করেছেন কলকাতার ছোট্ট ভৌগোলিক সীমায়। কিন্তু দার্শনিক উত্তরাধিকার লাভ করেছেন পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ মানবদের কাছ থেকে। এঁদের শিক্ষক ছিলেন দেশপ্রেম ও প্রতিবাদী চেতনার ঐশ্বর্যে নন্দিত নবীন প্রতিভা, মুক্তচিন্তার অগ্রদূত ভিভিয়ান ডিরোজিও, যিনি হিন্দু নন, ভারতীয়। একাধারে শিক্ষক ও সুহৃদ, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রেরণার অগ্নিহোত্রী।

এই অগ্রজদের কর্ষিত জমিতে তথা 'এজ অব রিজনের' পটভূমিতে এসেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সাগরদাঁড়ি গ্রামের জাহ্নবী-পুত্র মধুসূদন, কপোতাক্ষের স্বচ্ছ সলিলে যাঁর নিত্য অবগাহন, ভারতীয় মহাকাব্যের ঐতিহ্যে যাঁর অন্তর-স্পন্দন। অন্য দিকে ইংরাজি সাহিত্যের বিদগ্ধ অধ্যাপক আর, রিচার্ডসনের ঈর্ষণীয় বাক্‌ভঙ্গিতে এবং আত্মজিজ্ঞাসার অফুরন্ত বাসনায় তাঁর কাছে উন্মুক্ত হয় পাশ্চাত্য মহাকাব্যের ঐশ্বর্যময় জগৎ। এ যেন স্বপ্নালু চোখে সৃষ্টির মহাসমুদ্রের দুর্লভ অতলান্ত সন্দর্শন।

মধুসূদনের জীবনের শৈশব-সবুজ ভূমিতে একদিন কল্পনার যে অবিনাশী বীজ বপন করা হয়েছিল, ধ্যানে-অনুধ্যানে, অধ্যয়নে, সাধনার নিত্য কর্ষণে সে জমি প্রস্তুত হয়েছে দিনে দিনে। আপাত দৃষ্টিতে আকস্মিক মনে হলেও সেই কল্পনাই মহাকাব্যিক মহীরুহে ব্যাপ্তি পেয়েছে সৃষ্টির উন্মুক্ত প্রবাহে, স্বল্পকালের সৃষ্টিসীমায়।

কিন্তু জীবন তো কেবল সূর্যস্নাত সুরম্য শরৎপ্রভাত নয়। নয় কোনো বসন্ত-

মালঞ্চের মন্দ্রিত দিনযাপন। তাই সেখানে দিনে দিনে সঞ্চিত হয় কঠিনে-কুটিলে বেদনা-জটিলে হতাশার, যন্ত্রণার দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা। জীবনের সে অংশে কল্পনার সমস্ত আকাশ বেদনার আঁধারে ঢাকা। যেন রঙিন সমস্ত স্বপ্নিল চিত্রের সলিল সমাধি হয় দারিদ্র্যের একটি কালো গহ্বরে। এমনি এক দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় বেদনাবিদ্ধ ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ব্যক্তিত্বের কবি মাইকেল মধুসূদন। উনবিংশ শতাব্দীর এই মহান কবি ও নাট্যকার বাংলা সাহিত্যের নবযুগের স্রষ্টা।

শিশুকাল

মধুসূদনের জন্ম ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারী, যশোর জেলার কপোতাক্ষ তীরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে। পিতা রাজনারায়ণ, মাতা জাহ্নবী দেবী। পিতা কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অর্থশালী উকিল। ফার্সী ভাষায় দক্ষ, তবে তিনি কোনোভাবেই তৎকালীন দেশীয় ও সামাজিক ভাব-আন্দোলনের শরিক নন। একান্তই বিষয়-চিন্তার মানুষ।

মাতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেই তাঁর শৈশব-শিক্ষা শুরু। রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে পরিচয় ও অন্তরের আকর্ষণের সূত্রপাত এই সময়েই। ১৮৩২ সালের শেষ ভাগে পিতার কর্মসূত্রে মায়ের সঙ্গে মধুসূদনের কলকাতা আগমন। যৌথ পরিবার ছেড়ে আসার ক্ষেত্রেও ছিল পিতার প্রতিবাদী ভূমিকা। খিদিরপুরের একটি দোতলা বাড়িতে তাঁদের নিজস্ব বাসস্থান। সাত বছরের গ্রাম্য শৈশব-স্মৃতি নিয়ে মধুসূদনের কলকাতা জীবনের শুরু। এখানে সংসারের কেন্দ্রবিন্দু এই কিশোর পিতা-মাতার চোখের মণি। সব মিলিয়ে মধুসূদনের কলকাতা আগমন যেন গ্রামের সরল সহজ জীবন থেকে এক বিলাস-বৈভবের জীবনে উৎক্ষেপণ।

শিক্ষাজীবন

কলকাতায় প্রথমে মধুকে ভর্তি করা হয় বিখ্যাত 'গ্রামার স্কুলে।' বোধ হয় এখানেই অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষার সঙ্গে। তার আগেই গ্রামের মৌলবী সাহেবের কাছে শিখেছেন ফার্সী। ১৮৩৭ সালে মধুসূদন ভর্তি হলেন কলকাতার হিন্দু কলেজে, তৎকালীন বাংলার এক চেতনা-সংঘাত-ক্ষেত্র যে কলেজ। এখানকার ছাত্রেরা সকল বিষয়েই যেন বিদ্রোহী। নতুন পাশ্চাত্য দর্শনে তাদের আসক্তি ও বিশ্বাস, বিদেশী সাহিত্যে তাদের উন্মাদ উচ্ছ্বাস, স্বদেশীয় সমস্ত কিছুর প্রতিই তাচ্ছিল্য ও অশ্রদ্ধা—এইসবই তাদের মননের সাধারণ লক্ষণ।

হিন্দু কলেজে মধুসূদন বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেছিলেন স্বমহিমায়। এখানেই তাঁর কাব্য-প্রতিভার প্রথম বহিঃপ্রকাশ। একটু লাজুক, আত্মকেন্দ্রিক হলেও মধুসূদনই প্রথম প্রকাশ করেন হাতে লেখা সাপ্তাহিক পত্রিকা। সবই ইংরাজিতে। কারণ তখন বাংলা চর্চার প্রচলন হিন্দু কলেজে প্রায় ছিল না। তিনি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৮৪১ সালে পরীক্ষায় বৃত্তিও পান। যদিও নিয়মিত ক্লাস করা, সব ক্লাসে থাকা তাঁর স্বভাবে ছিল না, কিন্তু রিচার্ডসন তাঁর প্রিয়তম শিক্ষক, আদর্শ মানুষ। সর্বত্র তাঁর অনুকরণ। নিত্যনতুন কবিতা লিখে, অনর্গল শেক্সপীয়ার, কীটস্, বার্নস্, মুর বা বায়রনের কবিতা আবৃত্তি করে, বিদেশী পোশাক পরে, গান গেয়ে, অজস্র খরচ করে বন্ধুদের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিলেন মধুসূদন। এই কলেজের বন্ধুদের মধ্যেই ছিলেন স্বনামখ্যাত ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক, ভোলানাথ চন্দ্র, বঙ্কুবিহারী দত্ত। গৌরদাস এই স্মৃতি উল্লেখ করে বলেছেন—"He was undeniably the Jupiter among the bright stars of the College."

এ সময়ে লেখা তাঁর কবিতাগুলি 'বেঙ্গল স্পেকটেটর', 'লিটারারি গ্লিনার', 'ক্যালকাটা লিটারারি গেজেট', 'কমেট', 'বেঙ্গল হেরাল্ড', 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন' সহ নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নিজের লেখা কবিতাগুলি প্রসঙ্গে তাঁর গর্বের অন্ত ছিল না। তাঁর দিবা-রাত্রের স্বপ্ন ছিল তিনি পৃথিবীবিখ্যাত কবি হবেন। বন্ধু গৌরদাস তাঁর জীবনী লিখবেন এবং বিলেত যেতে পারলেই সাহিত্যের গৌরব-মুকুট তাঁর মাথায় মানুষ পরাবেই।

ধর্মান্তর

তাই বিলেত যাবার ভাবনাই এ সময়ে তাঁর প্রধানতম স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ালো। আর এজন্য কোনো কাজেই তাঁর ভয় নেই, বাধা-বন্ধনকে কোনো তোয়াক্কাই আর নয়—এমন মানসিকতা তাঁর। প্রথম যৌবনের এই স্বভাব-ভাবনার সঙ্গে তাঁর চেতনায় সংযুক্ত হয়েছিল আর এক বোধ যে, হিন্দু থাকা মানেই যেন প্রাচীন যুগের আগলে বাঁধা থাকা। সে আগল ভাঙ্গতে হবে। এ দেওয়াল পেরোতে হবে। তাই ধর্মান্তর। এ কেবল হিন্দু থেকে খ্রীস্টান হওয়া নয়—এ যেন তাঁর কাছে কূপমণ্ডূকতা থেকে আধুনিক যুগে ও জীবনে পদার্পণ। ইতিহাসকাররা হয়তো আরো কিছু তথ্য উপস্থিত করতে পারবে।*

কিন্তু চেতনা-প্রবাহে তাঁর এই ভাবস্রোতই ছিল প্রবাহিনী। ১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী জাহ্নবীপুত্র মধুসূদন মাইকেল মধুসূদন হলেন।

ধর্মান্তর, তাই কলেজ পরিবর্তন

ধর্মান্তরের পর মধুসূদনকে হিন্দু কলেজ ছাড়তে হল। এরপর তিনি শ্রীরামপুরের বিশপস্ কলেজে ভর্তি হলেন। এখানে ভাষা-শিক্ষার সুযোগ আরো সম্প্রসারিত হল। বিশপস্ কলেজে তাঁর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ আর গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ। ইউরোপীয় ও ভারতীয় ছাত্রদের সহাবস্থানে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হোত তার প্রতিবাদে যেমন এগিয়ে আসতে দেখি তাঁকে, তেমনি তাঁর যে ধ্রুপদী রুচি, উন্নত জীবন-চেতনা, তারও গভীরতর ভিত্তি স্থাপিত হয় এই কলেজেই। কারণ ধ্রুপদী সাহিত্য পড়ানোর উপযুক্ত একাধিক শিক্ষক ছিলেন এখানে। ভবিষ্যতের মহাকবির প্রয়োজনীয় ভিত্তি তৈরি হল তাই সে সমৃদ্ধ শিক্ষায়।

এই সময়েই হঠাৎ পিতার অর্থ সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। ফলে চাকরির চেষ্টা করতে হল। কিন্তু সফল হলেন না। ফলে আত্মরক্ষার, সম্মানরক্ষার জন্যই হঠাৎ (১৮৪৭) তিনি মাদ্রাজ চলে গেলেন। পিতা বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করেছেন। মায়ের জীবনও দুঃখের। তাই সবার অজান্তেই এ পলায়ন। কলকাতা থেকে বিদায়।

মাদ্রাজ প্রবাস

১৮৪৭-এর ২৪ ডিসেম্বর প্রায় সম্বলহীন অবস্থায় মাদ্রাজে উপনীত হলেন মধুসূদন। অপরিচিত শহর। তার ওপর দারিদ্র্য। অবশেষে 'মাদ্রাজ মেল অরফ্যান এসাইলামে' সামান্য মাইনের শিক্ষক পদে চাকরি। এখানে তাঁর কর্মজীবন মোট আট বৎসর। হিন্দু কলেজে সাহিত্যের শিক্ষানবীশীর যে সূচনা মাদ্রাজে তারই বিকাশ। শিক্ষক, সাংবাদিক ও কবি হিসাবে তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল চোখে পড়ার মতো। ১৮৪৮ থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত অরফ্যান স্কুলে শিক্ষক ও ৯ মার্চ ১৮৫২ থেকে ১৭ আগস্ট ১৮৫৬

পর্যন্ত মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রামার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে মি. জর্জ নর্টনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এ ছাড়াও তিনি এখানে বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও অন্যান্যদের সাহায্য ও আনুকূল্য পান। এ সময়েই প্রখ্যাত পত্র-পত্রিকার ও সভা-সমিতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। এমন কি এক সময়ে *Hindu Chronicale* নামে একটি সাপ্তাহিকের সম্পাদকও হন (১৮৫২)। এ ছাড়া *Atbenaem*-এর সম্পাদকও ছিলেন কিছুকাল। এসব পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখাগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো এবং তা ছিল অন্যদের তুলনায় বিশিষ্ট ও বলিষ্ঠ। এখানে তাঁর প্রথম গ্রন্থ (*The Captive Lady* এবং *Visions of the Past* একত্রে সংকলিত) প্রকাশিত হয়। ক্যাপটিভ লেডী কলকাতায় সমাদৃত হয়নি। বাংলার শিক্ষা-সচিব বেথুন সাহেব মধুসূদনকে মাতৃভাষা চর্চার পরামর্শ দেন। জানা যায়, এ সময়েই গৌরদাসের কাছে তিনি রামায়ণ ও মহাভারত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। কবি মনে মনে ইউরোপীয় সাহিত্যের চর্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে বাংলা সাহিত্য সাধনায় লাগাবেন বলে স্থির করেন—যা ছিল বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এক অকল্পনীয় প্রাপ্তি, এক পরম সৌভাগ্য।

মধুসূদনের মাদ্রাজ প্রবাসকালে তাঁর মায়ের মৃত্যু ঘটে। ওই মানসিক শূন্যতার অস্থিরতার মধ্যেই তিনি বিয়ে করেন—তাঁরই অরফ্যান গার্লস স্কুলের ছাত্রী রেবেকা ম্যাকটাভিস্‌কে (১৮৪৮-এর ৩১ জুলাই)। যদিও রেবেকার গর্ভে কবির চারটি সন্তান জন্মেছিল, কিন্তু তিনি এ দাম্পত্য-জীবনে যে সুখী ছিলেন না, অথবা এই মানসিক দ্বন্দ্বময় সময়ে প্রশান্তির স্পর্শ তিনি পেয়েছিনেন হেনরিয়েটা নাম্নী এক নারীর সান্নিধ্যে, এসব কিছুই আমাদের জানা নেই। জানা নেই যে রেবেকার সঙ্গে কবির বিবাহ-বিচ্ছেদ বা হেনরিয়েটার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কোনো বিবাহ হয়েছিল কিনা। তবুও স্ত্রীর সম্মান পেয়েছিলেন হেনরিয়েটা। কবি মূলত এসব কারণেই হয়তো সেদিন মাদ্রাজ পরিত্যাগ করে পাড়ি দেন কলকাতার দিকে।

কলকাতা প্রত্যাবর্তন

মাদ্রাজ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের শিক্ষক জীবনেরও পরিসমাপ্তি ঘটল, যেখানে ছিল তাঁর বহু বিখ্যাত ছাত্র-রাজি (যাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত জজ স্যার টি. মুথুস্বামী আয়ার)। আর ছেড়ে এলেন চার সন্তান ও সুন্দরী স্ত্রী রেবেকাকে। ১৮৫৬ সালের ২ জানুয়ারী তিনি কলকাতা এসে পেঁছিলেন। আশ্রয় নিলেন বিশপস্ কলেজে। অর্থহীন অবস্থা। গৌরদাস দিলেন পঞ্চাশটি টাকা। পরে কয়েক দিন গৌরদাসের বাড়িতে, তারপর গেলেন কিশোরীচাঁদের বাগানবাড়িতে। ওই বছর জুলাই মাসে কাজ পেলেন কোর্টে। মাইনে খুবই কম, সেটাই বা তাঁকে কে দেবে? কিছু দিন পর

অবশ্য একটু সুদিন এল। মাইনে হল ১২০ টাকা। আর এখানে-ওখানে লেখার জন্য দু-দশ টাকা। এই চাকরিতেও ইস্তফা দেন বিলেত যাবার জন্য। এ সময়ে তিনি বেলগাছিয়া নাট্যশালার সঙ্গে যুক্ত হন। রত্নাবলীর ইংরাজি তর্জমা করে কিছু অর্থ-প্রাপ্তিও হল। বাসা নিলেন ৬নং চিৎপুরে। হেনরিয়েটাকে নিয়ে স্বতন্ত্র সংসার পাতলেন। ১৮৫৯ সালে কন্যা শর্মিষ্ঠার জন্ম। পুত্র মিল্টনের জন্ম ১৮৬১-র জুলাই মাসে। ডাকনাম মেঘনাদ।

জীবনাভিজ্ঞ মধুসূদন কলকাতায় এসে পিতৃসম্পত্তি পুনরুদ্ধারে প্রয়াসী হন। অবশেষে সামান্য সাফল্য এল ১৮৬০ সালে। ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টায় 'আইন' পরীক্ষাও দিয়ে গিয়েছেন বার বার। সংসারের আয় সামান্য বাড়লেও দশ হাজারী জীবন যাঁর কাম্য, তাঁর দেড়-দু'হাজারে কি চলে? তবু এই দারিদ্র্যের কঠিনতম দিনগুলিই তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সময় (১৮৫৮—১৮৬২ সাল)। সে প্রসঙ্গ পরে আলোচনা করছি। তার আগে তাঁর জীবনের শেষ কয়েকটি বছরের কথা।

কবির বিলেত যাত্রা

১৮৬২ সালের ৯ জুন বিলেত যাত্রা এবং আগস্ট ১৯ তারিখে গ্রেজ-ইনে ভর্তি। বার-এট-ল হবেন—এই স্বপ্ন। প্রথম পাঁচ মাস ঠিক মতো টাকা পেলেন কলকাতা থেকে। চুক্তিভঙ্গ করলো পিতৃসম্পত্তির পত্তনীদার। কলকাতায়ও টাকা বন্ধ। হেনরিয়েটাও কোনো রাস্তা না দেখে বিলেত চলে গেলেন। ওখানেও তখন প্রায় নিঃস্ব অবস্থা। কলকাতায় তাঁর সম্পত্তির অছি যাঁরা তাঁরাও চিঠির উত্তর পর্যন্ত দিচ্ছেন না।

লন্ডন ছেড়ে ফ্রান্সের ভার্সাই চলে গেলেন মধুসূদন। উদ্দেশ্য স্বল্প খরচে চলা। সংকট বাড়তেই লাগলো। ভয়ংকর বিপদ। এ সময়ে মনে পড়লো বাংলার শ্রেষ্ঠ পুরুষ বিদ্যাসাগরের কথা, যাঁর কর্মময় জীবনোপলব্ধি অনন্য ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে মধুসূদনের সৃষ্টি শতদলে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নানাভাবে তাঁকে অর্থকষ্ট থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও অপরের থেকে ধার সংগ্রহ করেও তিনি বিদেশে মধুসূদনের জীবন ও সম্মান রক্ষা করেন। ভার্সাই থেকে লেখা চিঠিতেও (২ জুন ১৮৬৪) মধুসূদন বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে নেওয়া ব্যক্তিগত ঋণের কথা স্বীকার করেছেন।

যাই হোক, মধুসূদন বিদেশে থেকে নিজেকে ইউরোপীয় বিভিন্ন (গ্রীক, ফরাসি, ল্যাটিন, হিব্রু) ভাষায় সুপণ্ডিত করে তুলেছিলেন। উদ্দেশ্য মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করা। তাঁর সাহিত্য ভাণ্ডারকে সম্পদশালী করে তোলা। কিন্তু দারিদ্র্যের নিষ্ঠুরতা তাঁকে পঙ্গু আর রোগগ্রস্ত করেছে। ভয়ংকর সে আক্রমণে প্রায় ভেঙ্গে যাওয়া এক মানুষ অবশেষে দেশে ফিরে এলেন। বাংলা সাহিত্যের এক বিশাল স্তম্ভ যেন অন্তর্দাহে

ভস্মীভূত হয়ে গেল। নতুন এক মধুসূদনকে পেলাম আমরা। যদিও ব্যারিস্টার উপাধি জুটেছে তাঁর, আর সংগৃহীত হয়েছে নানা জ্ঞান, ভাষার দখল আর অভিজ্ঞতা, তাতে স্বচ্ছতোয়া সলিলের চেয়ে মদির ফেনাই বেশি। কারণ নিজেকে তিনি কখনোই মধ্যবিত্ত ভাবতে পারেন না, তাই বিদ্যাসাগরের ঠিক করা মধ্যবিত্ত বাসায় নয়—উঠলেন স্পেনসেস হোটেলে। জীবনাচার ও অমিতব্যয়িতার ফলে বাড়ে ঋণ। বাড়ে অনিশ্চয়তা, আর খ্যাতি-কুখ্যাতি। এর ফলে বিদেশে প্রবাসী জীবন নিয়ে যেসব মিথ্যা কুৎসা প্রচার করেছিল কিছু মানুষ, তা যে মিথ্যা, একথা প্রতিষ্ঠার সুযোগ জুটলো কম। ফলে হাইকোর্টে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলেন। বাধা পেলেন অনেক ঈর্যাপরায়ণ উকিলেরও। যদিও একমাত্র স্বদেশী জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের চেষ্টায় (সাড়ে তিন মাস পরে) ১৮৬৭-এর ৩ মে তাঁকে হাইকোর্টের বারে প্রবেশাধিকার দেওয়া হল। জুনেই মারা গেলেন শম্ভুনাথ পণ্ডিত। এদিকে পসার না জমলেও জমছে মধুসূদনের ঋণের বোঝা।

ফলে হেনরিয়েটা দেশে ফেরার এক বছর আগেই বিক্রি করে দিতে হল পিতৃ-সম্পত্তি। পরে হোটেল ছেড়ে একটি ভাড়া বাড়িতে (৬ লাউডন স্ট্রীটে) এলেন মধুসূদন। কিন্তু সে-ও রাজপ্রাসাদ যেন—আর প্রভূত জাঁকজমকপূর্ণ সব আসবাব সাজ-সজ্জা। এতসব কি আর পোষায়—আবার চাকরি নিতে হল। ১৮৬৯-এর জুনে চাকরি নিলেন। অনুবাদ পরীক্ষকের কাজ। বেতন এক হাজার টাকা। ১৮৭১-এ আবার চাকরি ত্যাগ। ব্যারিস্টারী শুরু। এজন্য ঢাকা গিয়ে ম্যালেরিয়ার আক্রমণে অসুস্থতায় দশ দিন কাটলো। এই সময়েই পান ঢাকায় আন্তরিক সম্বর্ধনা। এভাবেই যান একবার পুরুলিয়া, সেখানেও সম্বর্ধনা। এই সূত্রেই একদিন রাজার চাকরি গ্রহণ। মাত্র ছ মাস করেছিলেন সেই চাকরি। এবং আবার অসুস্থতা। স্ত্রীরও স্বাস্থ্যহানি। ঋণের চাপ। এ সময়ে লেখেন 'মায়া কানন'। ঋণের চাপে কলকাতা থেকে প্রায় পালিয়ে গিয়ে ওঠেন উত্তরপাড়ায় জয়কৃষ্ণ মুখুজ্যের লাইব্রেরীতে। শরীর আরো খারাপ হল। বন্ধু গৌরদাস এসে বজরা করে কলকাতা নিয়ে গেলেন চিকিৎসার জন্য। এদিকে হেনরিয়েটাও দারুণ অসুস্থ। ১৮৭৩-এর জুন মাসে জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হলেন কবি। হেনরিয়েটার মৃত্যু হল জামাতার আশ্রয়ে, ২৬ জুন তারিখে। আর ২৯ জুন চিরনিদ্রা এল নেমে কবির চোখে।

স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টি বড়

এই বেদনা-নির্ঝর-উজ্জ্বল-কবি-ব্যক্তিত্ব বাংলার নবযুগের আলো-আঁধারির কালসীমার এক শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। তাঁর সৃষ্টির কাল খুবই সীমিত, যথাযথভাবে বললে মাত্র চার বছর। তারই মধ্যে শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ ইত্যাদি যুগান্তকারী ৯টি গ্রন্থ তিনি

রচনা করেন। এর মধ্যেই বেঁচে থাকবার নানা উপচার উপাদান—অনুবাদের কাজ, চাকরির দায়িত্ব ইত্যাদি-ইত্যাদি। মধুসূদনের সাহিত্যকীর্তি নিয়ে বেশি আলোচনার অবকাশ ও প্রয়োজন এ নিবন্ধে নেই। তবুও কয়েকটি কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাঁর সৃষ্টির সূচনা ১৮৪৯-এ 'ক্যাপটিভ লেডি' দিয়ে। এর পরেই তিনি অনুবাদ করেন রত্নাবলী ও শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)। কিন্তু কবির শ্রেষ্ঠত্ব ইউরোপীয় ভাষা-চর্চাকারী হিসেবে নয়—তিনি বিশ্বের ভাণ্ডার থেকে শ্রেষ্ঠতম রত্নরাজি সংগ্রহ করে সমৃদ্ধ করেছেন আপনার মাতৃভাণ্ডার। সেই মাতৃভাষার সাধনাই তাঁকে দিয়েছে অমরত্ব। ১৮৫৯ সালে তিনি পুরাণাশ্রয়ী নাটক 'শর্মিষ্ঠা' রচনা করেন বাগবাজার রাজবাড়ির জন্য। এই নাটক সেখানে অভিনীত হয় ও সমাদর লাভ করে। তারপর তিনি 'রিজিয়া' নামে একটি নাটক রচনার প্রস্তাব দিলে জমিদারবাবুরা তেমন আগ্রহ দেখাননি মুসলমানী বিষয় বলে। আর এর পরই দুটি প্রহসন তিনি লিখলেন 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। আক্রমণ করলেন জমিদার এবং সামন্ত শ্রেণীকে আর নিজে মদ্যপ হওয়া সত্ত্বেও নব্য মদ্যপ সমাজকে। বুড়ো সালিকের ভক্তপ্রসাদ কেবল সামন্ত শোষক মাত্র নয়—এই পাপিষ্ঠের কাছে নারী মাংসেরও কোনো জাত বিচার নেই। আর তারই সূত্রে উচ্চারিত এক ভিন্ন সত্য—শোষিতের কোনো জাত নেই। জোটবদ্ধ হয় বাচস্পতি ও হানিফরা। এ প্রহসন দুটির গদ্য, এর বিষয়ের তির্যকতার মতোই জীবন্ত, বলিষ্ঠ ও মাটির গন্ধমাখা। এর পর তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক (১৮৬১)। দেশপ্রেম আর নারী-ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল বাংলার প্রথম ট্রাজেডি।

কাব্যরচনার সূচনা পর্বেই পাই তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। এখানে আমরা দেখি এক মহাকবিপ্রতিভার উদ্বোধন, যার পরিণতিতে বাংলা সাহিত্য পেল 'মেঘনাদবধ কাব্য'। তিনিই বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে মিশিয়েছেন প্রাচ্য ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য ঐশ্বর্য। স্বর্ণসূত্রে সংযোজিত করেছেন হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো, মিল্টনের সঙ্গে ব্যাস-বাল্মীকি, কালিদাস-কৃত্তিবাসের। এই মিলন সাধনে তিনি যেন নব-ভগীরথ। তাই 'ওড' লেখার সময়ে তিনি পিণ্ডার, পত্রকাব্যে ওভিদ, সনেটে পেত্রার্কা, ছন্দে মিল্টন। তবে সমস্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মতোই তিনি জানতেন বিষয়বস্তু আন্তরিকভাবে আধুনিকতা-ঋদ্ধ না হলে কাব্য হয় রীতি-সর্বস্ব। সে নিপুণতাও অবিস্মরণীয়ভাবে তাঁর সৃষ্টিতে প্রতিফলিত। তাই মেঘনাদবধ কাব্যে ব্যক্তিসত্তার মানবিক বেদনার তীব্র ঘোষণা। দেবতা রাঘব এখানে প্রতিনিয়তই "ভিখারী রাঘব।" এসবের মধ্য দিয়ে নবজাগরণের যুগের বাংলাদেশ তার বুর্জোয়া অর্থনীতির ভিত্তিমূলেই মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল—তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়ে উঠলো মাইকেলের রচনা-সম্ভার। আর তার পাঠকও তৈরি হয়েছিল নব্যশিক্ষিতের মধ্যে ব্যাপকভাবে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের দীপ্তিময় ব্যবহার করেছেন মধুসূদন প্রাণভরে। পরাধীন দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাঁর সৃষ্টিতে প্রাণ পেয়েছে। চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে

সমকালের অজস্র প্রতীক আর ব্যঞ্জনায় ভাস্বর। এই নিহিত আধুনিকতা মধুকবির সৃষ্টি জুড়ে এক অসাধারণ তাৎপর্যে মণ্ডিত, মন্দ্রিত। রাবণ তাই পাঠকের শ্রদ্ধার পাত্র, দেশপ্রেমিক। পৌরাণিক চিত্রকল্প ভেঙ্গে রাম হয়ে উঠেছে পররাজ্যগ্রাসী। নেপথ্য শক্তির ক্রীড়নক। ঘৃণ্য এক কাপুরুষ চরিত্র। হীনতা আর ভিক্ষা যার মূলধন। যেন সাম্রাজ্যবাদী প্রশ্রয়ে কোনো সামন্তরাজার মতোই ক্লীব সম্প্রসারণবাদী। যদিও বিশ্বব্যাপী এমন বোবা সে অবস্থা, যেখানে পৌরুষ-ব্যক্তিত্ব-বীরত্ব-শৌর্য স্বাধীনভাবে বিকশিত হয় না। নিয়তিসৃষ্ট স্থানটি অন্ধকার করে নিয়ে আসা অক্টোপাস আক্রমণের মতোই অসহায় অবস্থা। দেবতাশক্তি যেন বিচিত্র সাম্রাজ্যবাদীদের মহাজোট, যারা মানবিক স্বাধীনতা ধ্বংস করে দেবে যে কোনো দেশে। তাই এক মহান ট্রাজিক বেদনা বিশ্বব্যাপ্তি পায় মেঘনাদবধ কাব্যে। রাবণের হাহাকারে। এমন সমুদ্রমন্থনজাত বিষামৃত, হলাহল, ভয়ংকর বিশাল বেদনা—এর আগে ভারতীয় সাহিত্য কখনো দেখেনি। আধুনিকতা কত গভীর অতলান্ত আর গগনচুম্বী হলে এই বোধের জাগরণ সম্ভব, তার বিরল দৃষ্টান্ত মধুসূদনই।

নারী স্বাতন্ত্র্য

নারী প্রগতির পতাকা হাতে আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দেখি এক অনন্য ভূমিকায়। নবযুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের বোধ আর জীবনাভিজ্ঞতা, বিশ্বদর্শনে অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বসাহিত্যে অগাধ বিচরণ তাঁকে যে ব্যাপ্তি দিয়েছে, তা যখন বিম্বিত হয়েছে কোনো কোনো চরিত্রে, আজ তা হয়ে ওঠে যুগসঞ্চিত এক মহামানবিক দলিল। চরিত্রগুলো ভারতীয়। কিন্তু সেই ভারতীয় নারী দেহে ইউরোপীয় চেতনার সম্মিলনে যে নবতর চেতনার উন্মীলন তা-ই প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রে। আর এই ভারতীয় নারীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় যেমন মহাকাব্যের পাতায় পাতায় - তেমনি একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়। যশোরে, খিদিরপুরে, হুগলীতে, পুরুলিয়ায়, মাদ্রাজে এবং কলকাতায়। এরা কেউই সত্য নয়—নবতর সত্য এসব চরিত্র। মধুসূদনের চেতনাভূমিতে গভীরতর মাত্রায় সৃজিত। তাই প্রমীলা বলে, 'আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে।' তাই ব্রজাঙ্গনা কাব্যের রাধাকে পর্যন্ত তিনি রূপায়িত করেন বেদনা-শৃঙ্খলিত নারীত্বের দিক থেকে। বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রতিটি চরিত্র যে তির্যকতা নিয়ে এসেছে—যে বক্তব্য তাদের মুখে তার কোনো তুলনা আমাদের ঐতিহ্যের চেতনা ভাণ্ডারে নেই। এসব ক্ষেত্রে মধুসূদন যেন বিংশ শতাব্দীকেও অতিক্রম করে গেছেন। এই উচ্চারণের অন্তর্নিহিত সত্য আজও অম্লান।

সায়াহ্নের অনুভূতি

মাতৃভাষা সাধনা আর দেশপ্রেম তাঁর কাছে কখন যে একাকার হয়ে গেছে তা পৃথক করা যায় না। যেমন সূর্যোদয়ের সঙ্গে দিনের আলো, এ যেন তেমনি এক সাযুজ্য-সাধনা। পৃথিবীর ভাষা রত্নভাণ্ডার থেকে মাতৃভাষাকে, দেশকে সমৃদ্ধ করার কী প্রবল বাসনা—এমন দ্বিতীয় কোনো প্রতিভার সন্ধান বাংলা কেন কোনো ভারতীয় ভাষা পেয়েছে বলে জানি না।

'রেখো মা দাসেরে মনে'-র যে আকুতি আর 'অধীন যে জন, কহ, স্বাধীনতা কোথা সে জনের? দাস সদা প্রভু আজ্ঞাকারী।'—এই কথার তীব্র দেশপ্রেম আর স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষার উজ্জ্বল উচ্চারণ—ঊনিশ শতক কেন, বিশ শতকের চেতনাতেও তার অঙ্গীকার দীপ্ত হচ্ছে কই?

কোনো আন্দোলনে অংশ নেননি মধুসূদন, কিন্তু বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেন বীরাঙ্গনা কাব্য। বাংলার পাঠকদের এর তাৎপর্য বলার অপেক্ষা রাখে না আশা করি।

উপসংহার

মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রাক্-রবীন্দ্র যুগের কেবল শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার নন, তিনি ভারতীয় সাহিত্যকে যে বিশ্ব সাহিত্যের পাশে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন—তা যত না রূপগত—তার থেকে শত সহস্র গুণে চেতনাগত। নবজাগরণ বাংলায় কতটা সফল তার বিচারক অনেকেই আছেন, কিন্তু অনাগত যুগের চিন্তা আর বিগত সহস্র বর্ষের সাধনার যদি কোনো স্বর্ণ-সম্মিলন হয়—এবং তিনি যদি বাংলা ভাষার সাহিত্যিক হয়ে থাকেন—তাঁকে ভিত্তি করে যদি একদিন রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দদের সম্ভাবিত হতে হয়—তাহলে সেই সমুদ্র-ব্যক্তিত্বের নাম মধুসূদন। সেই গগনচুম্বী প্রতিভা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মহান আর বেদনাদীর্ণ তাঁর ট্রাজিক জীবন—আর সুমহান তাঁর সৃষ্টি স্বর্ণশতদল।

□ নীতীশ বিশ্বাস

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার শিক্ষক অধ্যাপক অরুণকুমার বসু, ক্ষেত্র গুপ্ত ও সুরেশচন্দ্র মৈত্র

হরিশচন্দ্রকে ভুলে যাওয়া অপরাধ

"ওহে, কালা আদমী, দিনকে দিন তোমার বড় বাড় বাড়ছে। ভদ্রলোককে অপমান করে যাচ্ছ। তুমি যে বিজেতার দাস, ভুলেই গেছ বোধহয়। পলাশীর পর থেকে নিপীড়নই তো তোমাদের ভাগ্যলিপি। তোমার নোংরা কাগজখানার ভালো বিক্রি আর অবাঞ্ছিত প্রশংসা বোধহয় আমাদের মতো ভদ্রলোককে অপমান করার সাহস দিয়েছে। শয়তান, সতর্ক হোস্। কলম যদি বন্ধ না করিস তাহলে কপালে কষ্ট আছে। এরপর শহরে বা মফঃস্বলে যদি তোর সঙ্গে দেখা হয় তাহলে বেশ খানিকটা চাবকে দেবো।"

ইংরেজরা এদেশের মানুষকে কতটা ঘৃণা করতো, ওপরের চিঠিটা তার প্রমাণ। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে এক সাহেব নীলকর চিঠিটা লিখেছিলেন বেনামে। হরিশচন্দ্র চিঠিটা ছাপিয়েছিলেন তাঁর কাগজে এবং মুখের মতো জবাবও দিয়েছিলেন।

বাঙ্গালীর স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলে গিয়েছেন তার তুলনা নেই। এমন আত্মবিস্মৃত জাতি খুঁজে পাওয়া ভার। যখন যাকে নিয়ে হুজুগ চলে তাকে নিয়েই মত্ত হয় সবাই। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুশতবর্ষ নিয়ে মাতামাতি কম দেখতে হচ্ছে না। খণ্ড, অখণ্ড, বিখণ্ড যাই হোক, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ সম্পর্কে বাঙ্গালীর মনে কয়েকটি মাত্র নাম ঘোরাফেরা করে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের পর আর কারোর নাম খুব একটা বলতে শোনা যায় না।

সেইরকম এক অ-উচ্চারিত নাম হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গালী যখন বাঙ্গালী হিসেবে গর্ব করে, তখন তার কতটা পোষাকী আর কতটা আন্তরিক তা ভেবে দেখার বিষয়। বাঙ্গালীর গৌরব-সম্পদ সম্পর্কে বাঙ্গালীর জ্ঞান সীমাবদ্ধ। কয়েকজন গবেষক, পণ্ডিত তার সন্ধান জানলেও তাঁদের চর্চা-গবেষণায় সেটুকুই মর্যাদার স্থান পায় যেটুকু দিতে নিজেরা শ্লাঘা বোধ করেন। স্কুল, কলেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিলেবাস কারিকুলামে এইসব নাম এবং তাঁদের সম্পর্কে একপেশে, কখনো অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যান বেশি ঘোরাফেরা করে। শিক্ষক অধ্যাপকরা তার বাইরে যেতে প্রায়শই রাজি থাকেন না। ফল দাঁড়ায় এই, এমনিতেই বাংলার নবজাগরণের খণ্ডিত

অবয়ব, তার ওপর উক্ত শিক্ষাসূচী ও শিক্ষাদান ব্যবস্থার ফলে ছাত্র ও পাঠকসমাজ নবজাগরণের আরো আরো খণ্ডিত ইতিহাস বা পরিচয় পান। আমাদের ইতিহাস-চেতনায় যে সার্বিক দৈন্য তার মূলে এই মানসিকতা এবং ব্যবস্থা বহুলাংশে দায়ী।

আমরা যত উপেক্ষা করেছি, গ্রহণ করেছি অনেক কম। কতিপয় মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে বৃহত্তর জনসমাজকে জ্ঞানবিজ্ঞান থেকে আড়াল করার মহৎ (?) ব্রতকর্মে কম ঘাম ঝরাননি। এঁরাই হয়তো দেখা যাবে আগামী দিনের জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষালয়ে নব-অবধূত হিসেবে দেখা দেবেন। পাশে পড়ে থাকবে উপেক্ষার কালাপাহাড়।

তেমনি এক উপেক্ষিত ব্যক্তিত্ব হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

দুই

একটা ধারণা আমাদের সমাজমানসে প্রায় বদ্ধমূল আছে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের হোতা এবং অধিকর্তা কতিপয় চিন্তাশীল শিক্ষিত উচ্চবিত্ত এবং নবসৃষ্ট মধ্যবিত্ত মানুষ। তাঁরাই সেকালের সাহসী ব্যক্তিত্ব ও মনীষা। দেশজ ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য উন্নত চিন্তাদর্শের সমন্বয় ঘটিয়ে তাঁরাই বাংলার মাটিতে এনেছিলেন অন্ধতমসা থেকে মুক্তির অভয়মন্ত্র। বাঙ্গালী যে টিকে আছে এবং জগতে মর্যাদার স্থান পেয়েছে তার মূল কাণ্ডারী সেইসব প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি।

এই প্রসঙ্গে যে কয়েকটি নাম নিরন্তর উচ্চারিত হয় তাঁদের অবদান এবং ভূমিকাকে শ্রদ্ধা জানিয়েও বলতে হয় এটা ইতিহাসের একটা দিকের কিছু অধ্যায়। আরো অধ্যায় যুক্ত হবার দাবী রাখে, যার মধ্যে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একজন। এবং যুক্ত হবে বাংলার কৃষক সমাজের খণ্ড-বিখণ্ড জাগরণের ইতিহাস। ইতিহাসের এই যে অন্য আর এক দিক, তা হয়তো অনালোকিত থাকতো, যদি বিংশ শতাব্দীতে কিছু বস্তুবাদী ঐতিহাসিক আর সমাজবিজ্ঞানী সেদিকে আমাদের দৃষ্টি না ফেরাতেন।

তিন

সরাসরি ইংলণ্ডের রানীর শাসনে বাংলা বা ভারত ভূখণ্ড তখনো আসেনি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালেই এই পোড়া বাংলার মাটিতে ইংরেজ দস্যুদের সম্মুখ সমরে টেনে এনেছিলেন তিতুমীর তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে। তিনি ছিলেন কৃষক সমাজের মধ্যে নবজাগরণের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস। তারা ছিল হীনদরিদ্র, নিরক্ষর, ভাগ্যের কাছে আত্ম-সমর্পিত, বাবুদের সামনে সেলাম দিতে অভ্যস্ত এক কুণ্ঠিত সমাজ। কিন্তু ইংরেজ শাসনের মহানুভবতায় তুষ্ট থেকে এবং ইংরেজ শাসনের মধ্যেই সমাজ সংস্কারের উদার মতাদর্শে

তারা বিশ্বাসী থাকতে পারেনি। তেমন কথা শোনেওনি হয়তো। যে পীড়ন, যে অত্যাচার তাদের জীবনে ছিল প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা, যা অভিজাত বা মধ্যবিত্তদের ছিল না, সেই তাজা দগদগে অভিজ্ঞতায় তপ্ত শলাকার মতো তিতুমীরের দল বুঝেছিল শাসকের পীড়নের বিরুদ্ধে পীড়ন দিয়েই জবাব দিতে হয়। কৃষক সমাজ থেকে উঠে আসা সেপাই পল্টনের মধ্যেও ছিল সেই রক্তের স্রোত। সিপাহী বিদ্রোহের উত্থানকে তাই ঠেকানো যায়নি, যদিও তার পরিণতি ঘটেছিল দুঃখ বেদনা আর অগণিত প্রাণ সংহারে। তবু, স্বীকার করতেই হবে, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর এক অংশের সেই বিদ্রোহ ছিল নবজাগরণের আর এক উজ্জ্বল অধ্যায়। যদিও সেদিনকার শিক্ষিত সমাজ সিপাহী বিদ্রোহকে মেনে নিতে পারেননি। যেমন আজও অনেক বুদ্ধিজীবী পারেন না মজুর কৃষকের সচেতন আন্দোলন সহ্য করতে।

বিদ্রোহ অবদমিত হতে পারে, কিন্তু তার দীপ্তি মুছে যায় না। কালের গর্ভে চলে নতুন আর এক প্রস্তুতি। তাই আবার বাংলার চিত্তে জন্ম নিল সেই কৃষক সমাজের মধ্য থেকেই জাগরণের আরও তীক্ষ্ণ এক অধ্যায়—নীল আন্দোলন বা নীল বিদ্রোহ। সেটা ১৮৫৯-৬০ সাল।

এই নীল আন্দোলনের কালগর্ভে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অনন্য উদ্ভাস।

চার

মাত্র ৩৭ বছর বেঁচেছিলেন হরিশচন্দ্র। জীবনে পূর্ণতা অর্জনের সময় বা বয়স সেটা নয়। তবু আজ, তাঁর মৃত্যুর (১৮৬১, ১৪ জুন) ১৩৪ বছর পরে হরিশচন্দ্রকে নিয়ে যে লিখতে হচ্ছে তার কারণ ওই ৩৭টি বছরে তাঁর জীবনসংগ্রামের প্রতিটি পৃষ্ঠায় আছে দেশ আর দেশভাবনা।

হরিশচন্দ্রের জন্ম ১৮২৪ সালের এপ্রিল মাসে তৎকালীন ২৪ পরগনার অন্তর্গত ভবানীপুরে (এখন কলকাতা) মামার বাড়িতে। দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই। কুলীন বামুনের ঘরে জন্ম। হরিশচন্দ্রের বাবা রামধন বহু বিবাহ করেছিলেন। কটি, তা নিয়ে নানা মত আছে। এটুকু জানা যায়, শেষের স্ত্রী রুক্মিণীদেবীর শেষ সন্তান হরিশচন্দ্র। মামার বাড়িতে মানুষ বলেই নিজের পারিবারিক গন্ডির সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না, যদিও এ বিষয়ে খুব নির্ভরযোগ্য কিছু জানাও যায় না। এ নিয়ে আক্ষেপ করেও লাভ নেই। এদেশের বহু ইতিহাসই লিপিবদ্ধ নেই। যা হারিয়ে গিয়েছে তা খুঁজে পাওয়া ভার। স্কুলের লেখাপড়ার শেষ গন্ডি অতিক্রম করার আগেই হরিশচন্দ্রকে পড়া ছেড়ে অর্থ জোগাড়ে নামতে হয়েছিল। চাকরি পেলেন চিৎপুরের কাছে 'মেসার্স তুলা এ্যান্ড কোং'-তে। তখনকার সময়ে অনেক কিছু নিলাম হোত। এটা ছিল সেরকম এক নিলামদারি কোম্পানী। মাইনে পেতেন কেউ বলেছেন মাসে দশ

টাকা, কারুর মতে আট টাকা। পদ ছিল 'বিল-রাইটার'। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' থেকে জানা যায় ১৮৩৮ থেকে ১৮৫১, অর্থাৎ প্রায় তের চোদ্দ বছর হরিশচন্দ্র ওই পদে কাজ করে-ছিলেন। পরে প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৫১-তে যোগ দেন 'মিলিটারি অডিটর জেনারেল অফিসে'। সেই কেরানী বৃত্তিতেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কেটেছে। পদের উন্নতি অবশ্য হয়েছে তার মধ্যে। শেষমেশ 'অ্যাসিস্টেন্ট মিলিটারি অডিটর।' পঁচিশ টাকা থেকে ধাপে ধাপে মাইনে বেড়ে হয়েছিল চারশ টাকা।

না, হরিশচন্দ্রের জীবনী আলেখ্য লেখা এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। হরিশচন্দ্রের জীবনী, যতটুকু যা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তা পাওয়া যাবে রামগোপাল সান্যালের *Bengal Celebrities*, শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', সি. ই. বাকল্যান্ডের '*Lf. Governor-II*', গিরিশচন্দ্র ঘোষের *Mukherjee's Magazine*, যোগেশচন্দ্র বাগলের 'মুক্তির সন্ধানে ভারত', রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলাদেশের ইতিহাস', বিনয় ঘোষ ও সুপ্রকাশ রায়ের রচনা এবং বিশেষ করে তথ্যনিষ্ঠ গবেষণায় সমৃদ্ধ তপোবিজয় ঘোষের 'নীল আন্দোলন ও হরিশচন্দ্র', 'নীলবিদ্রোহের চরিত্র ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী' এবং দিলীপ মজুমদারের 'হরিশ মুখার্জী: জীবন ও ভাবনা' ইত্যাদি বই ও রচনায়।

যদি, যেটুকু রেখাচিত্র হরিশচন্দ্রের জীবন সম্পর্কে আগে উল্লেখ করা হয়েছে সেটুকুই একমাত্র হোত, তাহলে লেখাজোখার দরকার হোত না। এমন বাঙ্গালী বা ভারতীয় এদেশে কয়েক কোটি পাওয়া যাবে, শিক্ষিতদের মধ্যেই, যাঁদের জীবনটা অতিবাহিত হয় বাড়ি, অফিস, বাড়ি ফেরা, কিছু কেনাকাটা, চিত্তবিনোদনের জন্য অঙ্গসজ্জা, সাজ-সরঞ্জাম, মাঝে মধ্যে বাইরে ঘুরে আসার মধ্যে। পারিবারিক কিছু বন্ধন থাকলেও, নিজের প্রয়োজনের বাইরে সামাজিক বন্ধন তাঁদের প্রায় থাকে না বললেই চলে। মানুষেরও ভাবনা নেই তাঁদের নিয়ে। একসময়ে চিতার আগুন বা কবরের গহ্বরে শেষ হয় তাঁদের জীবন। এ জীবন, রবীন্দ্র দৃষ্টিতে 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা।'

এই আবর্জনাক্লিন্ন জীবনধারা থেকে মুক্ত হবার সাধনায় এক তন্নিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব—হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পাঁচ

ঊনিশ শতকের সেই কালগর্ভে, যখন বাঙ্গালীর নিজত্ব গড়ে তোলার প্রয়াস চলছিল চার দিক জুড়ে, তখনই হরিশচন্দ্রের আবির্ভাব। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ নতুন কোনো শব্দ নয়। কিন্তু সেই যুদ্ধে সৈনিকের বেশে যে মানুষ পারে জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, সাহসে, তেজে, দেশপ্রেমের গৌরবে নিজেকে বিকশিত করার দুর্দমনীয় ক্ষমতা অর্জন করতে, সে মানুষ নতুন শব্দের জন্ম দেয়, নতুন এক বার্তা ঘোষণা করে। হরিশচন্দ্রের সাফল্য

সেখানে। প্রতিষ্ঠানগত লেখাপড়া শেষ করা হয়নি, অথচ মনের ভেতরে রয়েছে দেশভাবনা আর সেই ভাবনাকে নিজের মতো করে প্রকাশ করার তীব্র বাসনা, অতএব যুদ্ধের যাবতীয় বেশ নিপুণভাবে সংগ্রহ করে গেঁথে তোলার যে চেষ্টা আমরা হরিশচন্দ্রে পাই, তার তুলনা তিনি নিজে। গ্যাসের আলোয় পড়ুয়া বিদ্যাসাগর, দামোদর ঝাঁপ দিয়ে পার হওয়া বিদ্যাসাগরের কাহিনী আমরা জানি। হরিশচন্দ্রের সেই কণ্টকঠিন জীবনসাধনা নিয়ে কিন্তু এমন কিছু প্রচার হয়নি যা বাঙ্গালীর মনকে নিষ্ঠায়, তেজে, সাহসে ভরপুর করতে সাহায্য করে।

স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন ছাড়া শিক্ষা বা জ্ঞানচর্চা হয় না, একথা যাঁরা মনে করেন তাঁদের বিরুদ্ধে মুখের মতো জবাব হরিশচন্দ্র। যেমন রবীন্দ্রনাথও।

চোদ্দ বছর বয়সে চাকরিতে ঢুকলেন। সঙ্গে চললো জ্ঞানচর্চা। ইচ্ছে থাকলে, লক্ষ্যের মধ্যে জোর থাকলে, উপায় বের করে নেয় মানুষ নিজে। তখনো ব-কলমে ইংরেজ শাসন চলছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নামে। বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীরা ইংরেজিতে সড়গড় হচ্ছেন বেশি মাত্রায়। ইংরেজদের সঙ্গে ঘরকন্না থেকে শুরু করে বিরুদ্ধ লড়াই চালাতেও ইংরেজির দরকার। বিশেষ করে বণিক ইংরেজরা এদেশের মানুষকে যখন 'নেটিভ' জ্ঞান করছে, 'কালা আদমী' বলে সম্বোধন করছে, তখন পাল্লা দিতে হলে ইংরেজি আয়ত্ত করা জরুরী। হরিশচন্দ্রের সেই চেষ্টা চললো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে, পাঠাগারে, ব্যক্তির লাইব্রেরীতে। দেশ বিদেশের সাহিত্য, তখন যতটুকু পাওয়া যেত, তা-ও পড়লেন। সংবাদপত্র পড়তে লাগলেন। যুক্তি দিয়ে কিছু বলতে হলে ইতিহাস পড়া দরকার। পড়লেন। পাঞ্জা কষে লড়াই চালাতে হলে আইনটাও জানা দরকার, অতএব সে অধ্যয়নও কম হল না। সব দিক থেকে নিজেকে সাজিয়ে তোলার সে এক মহা উদ্যোগ।

এই উদ্যোগের পেছনে দুটো কারণ কাজ করেছিল :

১. তখন বাঙ্গালী হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'। ইংরেজ বর্জিত প্রতিষ্ঠান তো বটেই, বাঙ্গালী মুসলমানরাও বর্জিত ছিলেন। ১৮৫১-তে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনে'র প্রতিষ্ঠা। ১৮৫৫-তে তৈরি হল মুসলিমদের প্রতিষ্ঠান 'মহামেডান এসোসিয়েশন'। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা 'ভারতবর্ষীয় সভা'-তে যুক্ত ছিলেন মূলত রাজা, অভিজাত, জমিদার, ভূস্বামী, শিক্ষিত বাঙ্গালীদের নানান মতের মানুষ। তপোবিজয় ঘোষ লিখেছেন, "ভারতবর্ষীয় সভায় সনাতনী রামমোহনপন্থী, ডিরোজিওপন্থী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মানুষের কি চমৎকার সহাবস্থান ঘটেছিল।" সভার উদ্দেশ্য ও কাজ সম্পর্কে তপোবিজয় লিখেছেন—"ভারতবর্ষীয় সভা দীর্ঘকাল ধরে ভারতবাসীর মুখপত্রস্বরূপ শিক্ষা, শাসন, বিচার, লবণ, নীলাম, পুলিশ, নীলচাষ

প্রভৃতি বহু বিষয় সম্পর্কে অভাব অভিযোগ ও নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনের নির্দেশ সরকারে নিবেদন করেন এবং কোনো কোনো বিষয়ে সফলকামও হন। রাজানুগত থেকে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষা ছিল সভার উদ্দেশ্য।"

এই সভায় যুক্ত হলেন দরিদ্র ঘরের সন্তান, অ-অভিজাত, অ-ডিগ্রিধারী হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তবু তিনিই একদিন হয়ে উঠলেন এ প্রতিষ্ঠানের অনিবার্য এক প্রাণশক্তি। লণ্ডন প্রভুদের কাছে দেশীয় স্বতন্ত্র শাসনতান্ত্রিক কাঠামো নিয়ে দাবীপত্র রচনার প্রধান ব্যক্তি হলেন হরিশচন্দ্র। এই অধিকার, ক্ষমতা এবং মর্যাদা ছিনিয়ে আনার জন্য কী অদম্য উদ্যোগে নিজেকে গড়েপিটে নিতে হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

২. আর ছিল নিজের চিন্তা ভাবনাকে লিপিবদ্ধ করে ছড়িয়ে দেবার আন্তরিক ইচ্ছা।

হরিশচন্দ্রের এই ইচ্ছাশক্তির অদম্য চাঞ্চল্য যে কোনো যুগে যে কোনো মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে।

ছয়

এইভাবে হরিশচন্দ্র যখন নিজেকে যুক্তি আর বুদ্ধিতে সাজিয়ে তুলছেন, ঠিক সেইসময়ে এসে গেল বড় সুযোগ। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার রূপকার মধুসূদন রায় ও গিরিশ ঘোষ এবং তাঁর দুই ভায়ের হাত থেকে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার যাবতীয় স্বত্ব হাতে পেলেন হরিশচন্দ্র। প্রকাশক হলেন বড় ভাই হারানচন্দ্র। সম্পাদক হরিশচন্দ্র।

মাত্র সাত বছরের কিছু বেশি সময় হিন্দু প্যাট্রিয়ট কাগজ ঘিরে হরিশচন্দ্রের কর্মকাণ্ডই তাঁর জীবন ইতিহাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল আখ্যান পর্ব। উনিশ শতকের নবজাগরণে হিন্দু প্যাট্রিয়ট এবং হরিশচন্দ্র এক অমূল্য দলিল। হরিশচন্দ্রর হাত ধরে এদেশে প্রথম জন্ম নিল মৌলিক চিন্তাসমৃদ্ধ সৎ ও সাহসী সাংবাদিকতা। বাংলার নবজাগরণের অন্যতম নায়ক বাংলার কৃষক সমাজ প্রথম তার সংগ্রামের স্বীকৃতিতে দীপ্ত হল হরিশচন্দ্রের 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে'-এ। নীল বিদ্রোহের ঐতিহাসিক দলিল হয়ে রইলো হিন্দু প্যাট্রিয়ট।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। উনিশ শতকে বুদ্ধিজীবীদের স্ববিরোধিতার কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। যাঁরা উল্লেখ করেছেন তাঁরা পরবর্তীকালের গবেষক পণ্ডিত। উনিশ শতকের বাস্তবতা আর বিশ শতকের বাস্তবতায় অনেক তফাৎ আছে। সামাজিক দ্বন্দ্বেরও রূপান্তর ঘটেছে। উনিশ শতকের বাস্তবতায় যাবতীয় ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেদিন শিক্ষিত বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী এবং সৃষ্টিশীল মানুষেরা যতটুকু যা করেছেন তার বাইরে আশা করা বৃথা। শ্রেণী বলে একটা কথা আছে এবং তার স্বার্থরক্ষার দিকটা থেকেই যায়। বিশ শতকে আরো কত অগ্রসর চিন্তা, জ্ঞান,

বিজ্ঞান, বিদ্রোহ, বিপ্লবের জ্বলন্ত স্বাক্ষর থাকা সত্ত্বেও স্ববিরোধিতার নমুনা তো কম দেখা যাচ্ছে না।

হরিশচন্দ্রকেও স্ব-বিরোধী আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। সিপাহী বিদ্রোহকে যিনি সমর্থন করেন না, অথচ নীলবিদ্রোহে নীলচাষীদের পরম বন্ধু যিনি এবং যিনি কখনোই ইংরেজ শাসকদের উচ্ছেদ করে স্বাধীন ভারতের রণধ্বনি দেন না—তাঁকে তো স্ববিরোধী আখ্যা দিতে আপত্তি হবার কথা নয়।

কিন্তু ভুললে চলবে না সামন্ততন্ত্রের পশ্চাদপদ নিগড়ে বাঁধা ভারতবর্ষ সেদিন ইওরোপের অগ্রচিন্তার ক্ষেত্র থেকে ছিল অনেক দূরে। ইংরেজ বণিকদের রাজত্ব। দেশীয় রাজন্য শক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অপরিসীম দুর্বলতা। বাইরের বাতাস যেটুকু আসে তা-ও ব্রিটিশ শাসকদের হাত ধরে, তাদের পছন্দমতো। ইংরেজি শিক্ষার দাপটে নেশায় আচ্ছন্ন নবসৃষ্ট মধ্যবিত্ত সমাজ। ভারতবর্ষের সামাজিক কাঠামোর শেকড় ধরে টানছে বিদেশী বণিক শাসক। দুর্বল হয়ে যাচ্ছে আত্মপরিচয়ের ভিত্। হতদরিদ্র, রুগ্ন, অশক্ত শ্রমজীবীদের ওপর অকথ্য শোষণ আর অত্যাচার। সমাজে ভাগাভাগি বাড়িয়ে দিল জমিদারী প্রথায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। প্রতিবাদকে পঙ্গু করতে কড়া সেন্সর বিধি,দশ আইন, এগারো আইন। ১৯৭৫-এ জরুরী অবস্থার সময়ে চাপানো সেন্সর ব্যবস্থার ধাক্কায় এদেশের নামীদামী সংবাদপত্র আর বুদ্ধিজীবীদের ওলোট পালট কাণ্ডকারখানা কম দেখিনি। যদিও দেশটা তখন স্বাধীন। সেদিন সেই পরাধীন এবং অতি পেছিয়ে থাকা দেশে সেন্সরের কড়া নিয়মের আওতায় থেকে হরিশচন্দ্র 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এ যে সাহস এবং প্রজ্ঞার পরিচয় রেখে গিয়েছেন, আজকের বহুল প্রচারিত কাগজের সম্পাদক আর সাংবাদিকরা তাঁর কাছে লজ্জায় মাথা নোয়াতে বাধ্য থাকবেন।

এমন কি, যে ঘটনা নিয়ে বিশেষভাবে তাঁকে স্ববিরোধী বলা হয়, অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের সম্পর্কে হরিশচন্দ্রের মতামত, সেখানেও অন্যান্য বুদ্ধিজীবী, এমন কি বিদ্যাসাগর থেকেও তাঁর তফাৎ খুব স্পষ্ট। সেই অসংগঠিত এবং অনিয়ন্ত্রিত বিদ্রোহের মধ্যেকার মহাসত্য কার্ল মার্কসের মতো তাঁর দেখতে পাবার কথা নয়। কিন্তু হিন্দু প্যাট্রিয়টের পাতায় পাতায় দেখা যাবে, যখন বুদ্ধিজীবীদের এবং জমিদার ভূস্বামীদের নানা মহল থেকে বিদ্রোহীদের কচুকাটা করার জন্য সরব চিৎকার উঠছে, তখন হরিশচন্দ্র তাঁর শাণিত ইংরেজিতে দু পক্ষকেই টেনে আনতে সচেষ্ট থাকছেন শান্তির সীমানায়। সেই মুহূর্তকালে ভারতবর্ষের মাটিতে একক এক বুদ্ধিজীবীর কাছে সেটাই ছিল ঘোরতর বাস্তবতা। এবং সেজন্যেই হরিশচন্দ্র পেরেছিলেন নীলচাষীদের মহা সংগ্রামে বন্ধুর মতো সামিল হতে—যে সংগ্রামকে অবশেষে বুদ্ধিজীবীদের এক অংশ সহানুভূতি দিয়ে দেখতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু কেউই হরিশচন্দ্রের মতো সাহসী ব্যক্তিত্ব নিয়ে ইংরেজ শাসকদের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেন নি।

সাত

হরিশচন্দ্রের স্মরণীয় কীর্তি নীলচাষীদের বিদ্রোহে ইতিবাচক ভূমিকা।

ছোটবেলায় পোড়ো নীলকুঠি দেখেছিলাম দক্ষিণ গোবিন্দপুরে গাঁয়ের মধ্যে। শুনতাম নীলকরদের গল্প। অনেক পরে হরিশচন্দ্রের জীবনী পড়তে গিয়ে সেই নীলকুঠির ছবিটা ভেসে উঠতো। জানি না, হয়তো বা মনে হোত, ছোটবেলায় নীলকুঠির যেখানে পা রেখেছি, সেই মাটি আর সুড়ঙ্গের গহ্বরে বাংলার কত নীলচাষীর রক্ত আর আর্তনাদই না মিশে আছে!

নরহরি কবিরাজ 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা' বইতে নীলচাষের শুরুর সন্ধানে লিখেছেন—"ইংলন্ডের শিল্প বিপ্লবের পরে বস্ত্র শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নীলের চাহিদা বেড়ে যায়। ইংরেজরা ভারতবর্ষে—বাংলাদেশে নীলচাষ শুরু করে এই চাহিদা থেকেই।"

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার 'বাংলাদেশের ইতিহাস' বইতে লিখেছেন—"বাংলার উর্বর ভূমিতে সুলভ চাষী এবং সুলভ মজুরীর সাহায্যে খাদ্য ফসলের পরিবর্তে বাণিজ্য ফসল উৎপাদিত হলে বিপুল লাভের সম্ভাবনা ইংরেজ বণিকদের এ বিষয়ে আকৃষ্ট করে এবং এর থেকে নীলচাষ শুরু হয়।" নীলচাষের যে পদ্ধতি চালু ছিল সে বিষয়ে তিনি লিখেছেন—"দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে নীলচাষ শুরু হয়। নিজ আবাদিপ্রথায় নীলকর সাহেবরা নিজেদের জমিতে আপনার খরচে ও আপন তত্ত্বাবধানে নীলচাষ করাতেন। দ্বিতীয়ত রায়তী প্রথায় নীলকরেরা চাষীদের চুক্তিতে আবদ্ধ করে তাদের দ্বারা জমিতে নীলচাষ করাতেন। চুক্তি অনুযায়ী চাষীকে দাদন অর্থাৎ অগ্রিম কিছু টাকা দেওয়া হ'ত এবং উৎপন্ন নীলের দাম কী হারে চাষী পাবে তারও উল্লেখ থাকতো। যে হারে চাষীদের নীলের মূল্য দেওয়া হ'ত তা বাজার দরের চেয়ে অনেক কম ছিল। এর থেকে আবার বীজের দাম, চুক্তিপত্রের স্ট্যাম্প-এর দাম, গাড়ী ভাড়া ইত্যাদি বাবদ টাকা কেটে রাখা হ'ত। নীলকুঠির নায়েব, গোমস্তা এবং পাইকরা চাষীদের কাছ থেকে বখশিস আদায় করতো। নীল ওজন করার সময়েও চাষীদের ঠকানো হ'ত। উৎকৃষ্ট জমিগুলিতে চাষীদের নীলচাষ করতে হ'ত। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী উৎপন্ন নীলের দাম থেকে দাদনের টাকা কেটে রাখার নির্দেশ ছিল। যেসব চাষীর উৎপন্ন নীলের মূল্য থেকে দাদনের টাকা শোধ হ'ত না তাদের আগামী প্রতি বৎসর নীলচাষ ক'রে সেই টাকা শোধ করতে হ'ত।"

মোট কথা, নীলকরদের নীলচাষ ছিল জোরজুলুম আর রাহাজানির কারবার। চাষী হয়তো চাইতো ধান বুনতে, পাট বুনতে, সবজি চাষ করতে, কিন্তু নীলকরদের অত্যাচার এমন সীমায় উঠেছিল যে, বাংলার মাটিতে বিশেষত দক্ষিণবঙ্গে ধান পাটের চাষ ছিল দুরূহ ব্যাপার। অত্যাচার চালাতো সাহেবরা এবং এদেশের বশংবদ নায়েব, গোমস্তা, পাইকরা। হরিশচন্দ্রের হিন্দু প্যাট্রিয়টে তার বর্ণনা আছে বাস্তব

এবং নিখুঁত।

বিদেশী নীলকরদের এই আগ্রাসী মনোভাব বাংলার কৃষককে যেমন ক্ষিপ্ত করছিল, তেমনি নীলকরদের সঙ্গে জমিদারদেরও সংঘর্ষ আর মনকষাকষি শুরু হয়েছিল। চাষীরা দাদন নিতে অস্বীকার করলে অত্যাচার নেমে আসতো ঃ খতম, খুন ছিল নিত্যকার ঘটনা। তার সঙ্গে চাবুকের ঘা, লোহার বেড়ি, জেলখানায় হাজতবাস। তবু অসন্তোষ জমাট বাঁধছিল। ১৮৫০-এর পর থেকে নীলচাষের উৎপাদন এবং মুনাফায় টান পড়লো। নীলকররা ক্ষিপ্ত হয়ে আরো অত্যাচারী হয়ে উঠলো। মেয়েরাও বাদ গেল না অত্যাচারের হাত থেকে। অপহরণ আর ধর্ষণ ছিল রোজকার ঘটনা।

অনেক সহ্যের পর একদিন ছাই চাপা আগুন থেকে স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে এসে গ্রাম বাংলা জুড়ে জ্বালিয়ে দিল বিদ্রোহের আগুন। সে বিদ্রোহের নায়ক বাংলার কৃষক। বাংলার নবজাগরণকে মেনে নিলে সেখানে এই কৃষকদের অবদান স্মরণীয় হওয়া উচিত।

হরিশচন্দ্র 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এ তার বর্ণনা দিয়ে লিখেছিলেন—"এই বিদ্রোহে রায়তেরা অপরিসীম কষ্ট সহ্য করেছে। তারা প্রহৃত, কারারুদ্ধ, অপমানিত, গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। তাদের সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, অনেকদিন অনশনে কেটেছে, কল্পনায় যতরকম অত্যাচার সম্ভব তা তাদের কপালে জুটেছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালানো হয়েছে, পুরুষদের ধরে নিয়ে গিয়েছে, নারীদের চরম লাঞ্ছনা করেছে, ঘরের সঞ্চিত শস্য নষ্ট করা হয়েছে।"

সীমাহীন অত্যাচার সত্ত্বেও কৃষকের সংগ্রাম চললো। ওদিকে হিন্দু প্যাট্রিয়ট এ চললো লেখনীর মাধ্যমে সত্য প্রকাশ এবং নীলকরদের বিরুদ্ধে দেশের মানুষের মনে ঘৃণা জাগিয়ে তোলার কাজ। সে এক সন্ধিমুহূর্তও বটে। বণিক রাজত্বের বদলে ভারতবর্ষের মাটিতে সবেমাত্র একচ্ছত্র ক্ষমতা হাতে তুলে নিয়েছে রাণী ভিক্টোরিয়া এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। নবনিযুক্ত লেফটেন্যান্ট গভর্নর জে. পি. গ্রান্ট বুঝেছিলেন ভারতে শোষণ এবং শাসন অব্যাহত রাখতে হলে সব কিছু সইয়ে করতে হবে, ভারতবাসীকে লাগামহীন অত্যাচারে ক্ষেপিয়ে তুললে কাজ হাসিল হবে না। নীলকরদের আচার আচরণে তিনি তাই সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। ওদিকে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, শ্রমের দাম বাড়ানোর দাবি উঠছে, কৃষকদের প্রতি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সহানুভূতির পাল্লা ভারি হচ্ছে, বংশবদ সংবাদপত্রের প্রভাব কমছে, হিন্দু প্যাট্রিয়ট নিয়ে দেশে তো বটেই, ইংলন্ডেও জল্পনা কল্পনা চলছে, সিপাহী বিদ্রোহের রাজনৈতিক উত্তেজনার ছোঁয়াচও রয়ে গিয়েছে—হরিশচন্দ্রের যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব এবং ক্ষুরধার লেখনীর কাছে মাথা নোয়ালেন জে. পি. গ্রান্ট। গঠিত হল 'ইন্ডিগো কমিশন' বা 'নীল কমিশন।'

নীলচাষীদের পাশে দাঁড়িয়ে হরিশচন্দ্রের সেদিনের সংগ্রামী চেহারা সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—"সে সময় যাঁহারা হরিশের দুরন্ত পরিশ্রম দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে রাত্রির কয়েকঘণ্টা কাল ব্যতীত হরিশের আর বিশ্রাম ছিল না। একে 'প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদনার কাজ, সেজন্য তাঁহাকে রাশি রাশি সংবাদপত্র পড়িতে হইত ও প্রবন্ধাদি লিখিতে হইত, তদুপরি দিবারাত্রি নীলকর প্রপীড়িত প্রজাবৃন্দের সমাগম। তাঁহার ভবন সর্বদা লোকারণ্য থাকিত। কাহারও দরখাস্ত লিখিয়া দিতে হইতেছে, কাহাকেও উকিলের নিকট সুপারিশ চিঠি লিখিয়া দিতে হইতেছে, কাহারও মোকদ্দমার হাল শুনিতে হইতেছে—বিশ্রাম নাই।'

সেদিন কৃষকদের সংগ্রামে বিনিদ্র বন্ধু ছিলেন হরিশচন্দ্র। যেখানে তিনি অতিক্রম করে যান রামমোহন বা বিদ্যাসাগরকে।

নীলবিদ্রোহকে কেন্দ্র করে জাগরণের সেই কালপর্বে হরিশচন্দ্রের অবদানকে এভাবে ভাগ করা যায় :

১. মৌলিক, সৎ ও সাহসী সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার প্রতিষ্ঠা।

২. শ্রেণীস্বার্থ অতিক্রমের আপ্রাণ চেষ্টা।

৩. নীলবিদ্রোহে চাষীদের পক্ষ অবলম্বন। বুদ্ধিদীপ্ত লড়াই। যার ফলে 'নীল কমিশনে'র পত্তন। ভূমিব্যবস্থা, রাজস্বব্যবস্থা, রায়তী ব্যবস্থায় বড় রকমের ওলোট পালট। ধান চাষের স্বাধীন অধিকার পেল বাংলার কৃষক। নয়তো পরবর্তীকালে এ উচ্চারণ কি সম্ভব হোত—'জান দেব তবু ধান দেব না'?

৪. সংগঠিত সাংবাদিক বাহিনী তৈরির প্রথম রূপকার। হরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত এই সাংবাদিক বাহিনী নীলবিদ্রোহের বাস্তব চিত্র রচনায় শুধু অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন তাই নয়, সাংবাদিকের অণুবীক্ষণী চরিত্রটিকেও সেই প্রথম তুলে ধরেছেন। এই বাহিনীর অন্যতম ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। হরিশচন্দ্রের সুপরিকল্পিত সাংবাদিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেই দীনবন্ধু পেয়েছিলেন 'নীলদর্পণ' নাটকের জীবন্ত বাস্তব প্রেক্ষাপট, প্রতিটি চরিত্র। বাংলা নাটকের গৌরব 'নীলদর্পণের' উদ্ভাবক—হরিশচন্দ্র, রূপকার—দীনবন্ধু।

৫. বাংলার নবজাগরণের খণ্ডিত আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে থেকেও জাগরণের মূল স্রোতশক্তির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করার আপ্রাণ প্রয়াস।

৬. আত্মশক্তি অর্জনের দৃষ্টান্ত স্থাপন।

উপসংহার

এসবই আজও প্রাসঙ্গিক। আত্মশক্তিতে জেগে ওঠার সাধনায় হরিশচন্দ্র আজও এক উজ্জ্বল

দীপশিখা। তাঁকে ভুলে যাওয়া হবে অপরাধ। পূর্ণ জাগরণ আজও বাকি আছে। কৃষকের জীবনধারায় পরিবর্তন এলেও তার দাবি এখনো একশ ভাগ পূরণ হয়নি। শ্রমিকের রক্ত শুষছে মালিক। স্বাধীনতার নয়া জমানায় বুদ্ধিজীবী সমাজের বৃহৎ অংশ হারিয়ে ফেলছে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সু-সম্পদ। ধনিক বণিকের সংবাদপত্র আর সাংবাদিকতা সাহস শক্তি সততা হারিয়ে লজ্জার পাহাড় গড়ে তুলছে। মধ্যবিত্ত সমাজে উৎকট গন্ধ ছড়াচ্ছে মূল্যবোধের অবক্ষয়। বামপন্থী প্রগতি শিবিরেও উঁকি মারছে সুবিধাবাদ আর সম্পদ তৈরির আকাঙ্ক্ষা। কথায় আর কাজে গরমিল ঘটছে বিস্তর। সমূলে এসবের বিনাশ ঘটিয়ে মানুষ হিসেবে সমগ্র জাতিকে অলংকৃত করার মহাযজ্ঞে হরিশচন্দ্র আজও দিতে পারেন আত্ম-উপলব্ধি আর সমাজ সচেতনতার কিছু স্ফুলিঙ্গ।

□ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক আপসহীন যোদ্ধা শশীচন্দ্র দত্ত

কোনো কোনো ব্যক্তিত্বের খ্যাতি হয়তো ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে না। হয়তো বা সময়ের আয়নায় স্বচ্ছভাবে বিম্বিত হয় না তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কিন্তু সমকালীন ভূমিকার গুরুত্ব, চারিত্রিক দৃঢ়তা ইতিহাসের গায়ে দাগ রেখেই দেয়।

শশীচন্দ্র দত্ত এ রকমই এক ব্যক্তিত্ব। খ্যাতির যে খুব শীর্ষে তাঁর অবস্থান ছিল তা নয়। কিন্তু যে মানসিকতা, যে ঋজুতা এবং স্বদেশ সম্পর্কে ভাবনাচিন্তার পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা স্মরণযোগ্য বলেই ইতিহাস দাবি করে।

১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার কাছে রামবাগানে শশীচন্দ্র দত্তের জন্ম। পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত। শশীচন্দ্র এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, যখন বাংলার আকাশে বেশ কয়েকটি উজ্জ্বল তারকা ঝক্‌মক্‌ করছে। তাঁর জন্মের সময়ে বাংলাদেশে দুটি বিবদমান দলের সৃষ্টি হয়েছিল। বিবাদটা ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষা নিয়ে। রামমোহন প্রমুখেরা ছিলেন ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার সপক্ষে। আর এ দেশীয় রাজপুরুষ ও বড়লোকেরা ছিলেন প্রাচ্য শিক্ষার একনিষ্ঠ সমর্থক। শশীচন্দ্রের আবির্ভাবের কালটি তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার প্রমুখের মতো ডিরোজিয়ান ইয়ংবেঙ্গলরা ছিলেন পাশ্চাত্যপন্থী। ওই সময়ের দীপ্ত উজ্জ্বলতা। আরো স্মরণীয় যে, মধুসূদন দত্তের জন্মও ওই একই সময়ে। অর্থাৎ ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে। যদিও মধুসূদনের চেয়ে শশীচন্দ্র আরো কিছু বেশি দিন ধরে অব্যাহত গতিতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যেতে পেরেছেন।

তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষা শেষ করে চাকরি জীবনে প্রবেশ করেন। সরকারী ট্রেজারীতে সামান্য একজন কেরানী হিসেবে তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত। জীবনের এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা হয়তো এখানে না এলে তাঁর ভাগ্যে জুটতো কিনা সন্দেহ। ইংরেজী ভাষায় তাঁর ছিল স্বতঃস্ফূর্ত দক্ষতা। খুবই নিষ্ঠাবান এবং সৎ কর্মী হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। যার ফলে অ্যাকাউন্টস বিভাগে যোগ্যতার সঙ্গে হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে উন্নীত হতে পেরেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি একজন 'নেটিভ', তাই সততা ও যোগ্যতার গুণাবলী সত্ত্বেও ইংরেজ আমলাদের সুনজরে আসতে পারেননি। উন্নতির সিঁড়িগুলো খুব মসৃণ ছিল না তাঁর। পদে পদে আমলাদের বিরোধিতার শিকার হতে হয়েছে শশীচন্দ্রকে। এই বিরোধিতা চরমে পৌঁছোয় যখন তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর

পদটির খুব সঙ্গত দাবিদার হিসেবে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করেন।

শিক্ষায় সভ্যতায় সৌজন্যে ইংরেজের অতুলনীয় খ্যাতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান শশীচন্দ্র আহত বিস্ময়ে উপলব্ধি করলেন ইংরেজ রাজপুরুষদের আচরণে ব্যবহারে তিলমাত্র শ্রদ্ধা জাগাবার মতো উপাদানও নেই! এঁরাই ইংরেজ জাতির প্রতিনিধিত্ব করেন!

ইংরেজ গভর্নর জর্জ ক্যাম্পবেল, শুধুমাত্র 'নেটিভ' এই অপরাধে তাঁর উন্নতির পথটির ওপর কাঁটা বিছিয়ে দিলেন। রক্তাক্ত শশীচন্দ্র ক্ষতবিক্ষত হয়েও স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠলেন ঘৃণায় অপমানে। তৎকালীন ইংরেজ আমলাদের চরিত্রে ঘোঁট পাকানোর এই ঘৃণ্য দিকটি তাঁকে যেমন ক্ষুব্ধ করে তেমনি বিস্মিত। নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস ছিল। ইংরেজী ভাষায় তাঁর সহজ বিচরণ এবং বাকশৈলীতে একজন ইংরেজের থেকে তিনি কম শক্তিশালী নন। এ রকমই তাঁর নিজের সম্পর্কে ছিল দৃঢ় আস্থা। তিনি সর্বার্থে ইয়ং বেঙ্গল দলভুক্ত ছিলেন না। কিন্তু কলেজের পড়ুয়া থাকাকালীন তাঁর মধ্যে স্বদেশপ্রীতির একটি সূক্ষ্ম অনুভূতির জন্ম হয়। তথাপি তিনি ইংরেজের অধীনে চাকরি করতে এলেও খুব সততার সঙ্গেই কাজ করবার মানসিকতা নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আমলাদের এমন সংকীর্ণ ব্যবহারে স্বকীয় মনোভাব যেন দ্বিগুণ বিদ্বেষে জ্বলে ওঠে। একজন খাঁটি ভারতবাসী হিসেবে এ অপমান সহ্য করার অর্থ কাপুরুষতা বলেই মনে করেছেন তিনি। তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন চাকরি থেকে স্বেচ্ছা-অবসর নিয়ে।

বেরিয়ে এলেও চুপ করে বসে থাকলেন না শশীচন্দ্র। তাঁর সততার সঙ্গে মিশেছিল চরিত্রের দৃঢ়তা। স্বদেশ প্রেমের যে বীজ মনের গভীরে সুপ্ত ছিল, এই ঘটনা তাকে উদ্দীপিত করেছিল। কলমের অস্ত্র হাতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তিনি রণক্ষেত্রে দাঁড়ালেন। যে বিদ্বেষ ছিল অস্ফুট অদৃশ্য, তাই-ই বিশাল মহীরুহ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

২

ব্রিটিশ রাজপুরুষদের সঙ্গে শশীচন্দ্র দীর্ঘ দিন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছেন। তাঁদের মধ্যে যেমন শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক আলোময় দিক দেখেছেন, তেমনি দেখেছেন রাজকর্মচারীদের হীনতা, নোংরামি। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্যই হয়তো যে, অন্তঃসারশূন্য দাম্ভিক নীচ ইংরেজের সংস্পর্শেই তাঁর জীবনের একটা মূল্যবান সময় কাটাতে হয়েছিল। যাই হোক, শশীচন্দ্র কেরানীর কলম ছেড়ে মসিযুদ্ধের কলম হাতে তুলে নিলেন।

'মুখার্জীস ম্যাগাজিন' পত্রিকায় তিনি এক এক করে ব্রিটিশ সরকারকে মারণাস্ত্র ছুঁড়ে মারতে শুরু করেন। 'রেমিনিসেন্স অফ এ কেরানীজ লাইফ'-এ তিনি দেখিয়েছেন কেমন করে একজন সৎ ও যোগ্য নেটিভ কর্মচারীকে ব্রিটিশের নোংরা পক্ষপাতিত্বের শিকার হতে হয়।

শুধু চাকরিজীবী ব্রিটিশ সম্পর্কে নয়, ব্রিটিশ সৈনিক সম্পর্কেও তাঁর কলম তীব্র হয়ে ওঠে। 'শঙ্কর—এ টেল অফ দি ইন্ডিয়ান মিউটিনি' গ্রন্থে তিনি খোলাখুলি ব্রিটিশ সৈনিকের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। ইংরেজের ন্যায়বিচার যে কত বড় ধাপ্পা, তা সিপাহী বিদ্রোহের সময়ের ব্রিটিশ সৈনিকের ভূমিকার এক ভয়াবহ চিত্র তুলে দেখিয়ে দিয়েছেন। সে গ্রন্থে তিনি অকপট ভাষায় বলেছেন, ব্রিটিশ সৈনিক ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা রাজদ্রোহী নাম দিয়ে বহু নিরীহ নারী-পুরুষকে নির্মমভাবে গুলি ও বেয়নেটের মুখে হত্যা করেছে। এতেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। ধর্ষণ করেছে বহু কিশোরী ও নারীকে। লুঠ করেছে ঘরে ঘরে। তাণ্ডব করেছে গ্রামের পর গ্রামে। আগুনের লেলিহান শিখায় নিভৃত গ্রামের আকাশ রক্তবর্ণ হয়ে গেছে। মানুষ, পশু আর পাখির আর্ত চিৎকারে ঘুমন্ত গ্রাম ভারাক্রান্ত হয়েছে। ব্রিটিশ সৈন্য নারীকে ধর্ষণ করে দক্ষিণা হিসেবে টেনে নিয়ে গেছে গহনা। কারো কান ছিঁড়ে, কারো বা নাক কেটে। আর সেইসব গহনা সরকারী দপ্তর থেকে নীলামে বিক্রি করেছেন মাননীয় ইংরেজ রাজপুরুষেরা।

শশীচন্দ্রের দক্ষ কলম এবং দৃষ্টির অনুবীক্ষণে ধরা এই বীভৎস ঘটনা জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। ভারতবাসী আঁৎকে উঠেছে এই বর্ণনা পড়ে। ইংরেজের ন্যায় বিচারের অহংকার নিতান্ত প্রহসন হিসাবে প্রতিভাত হল দেশবাসীর মনে। হরিশ মুখার্জী যেমন সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে বলেছেন, "The time is newly come when all Indian questions must be solved by Indians. The mutinies have made patent to the English public what must be the effects of politics in which the native is allowed no voice."

ঠিক সেরকমই শশীচন্দ্র সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে যে সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন, তাতে তিনি যথেষ্ট আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন।

৩

ভারতবাসীকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিলেন শশীচন্দ্র। তিনি চাইতেন ভারতবাসী যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠুক। যুদ্ধবিদ্যা শেখার সপক্ষে তিনি তাঁর মতামত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন। লিখেছেন, '...Some day a coalition might force England to leave India...তখন আধুনিক সমরবিদ্যায় শিক্ষিত ভারতীয়ের অতীব প্রয়োজন দেখা দেবে।'

শশীচন্দ্র দত্ত ভারতবাসীর কাছে শুধু যে একজন ব্রিটিশ-বিরোধী হিসেবে খ্যাত ছিলেন তা নয়। ব্রিটিশের চোখেও তিনি ছিলেন একজন ইংরেজী জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ 'ভয়ানক' পুরুষ। আগেই বলেছি ইংরেজী ভাষায় তাঁর ছিল স্বতঃস্ফূর্ত পটুত্ব। কলমে ছিল দুরন্ত তীক্ষ্ণতা। তিনি অনায়াসে আগুন ঝরাতেন কলমে। এতে ব্রিটিশ রাজশক্তির

একাংশ সন্ত্রস্ত ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তাঁর ওপর। অ্যাশলী ইডেন, এরস্কাইন প্যারী প্রমুখ ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা এবং সরকার ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। 'Vision of Sumerie' তাঁর অন্য একটি অসাধারণ গ্রন্থ।

কিন্তু তাঁর কলম কেবল প্রবন্ধ নিবন্ধে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সৃষ্টিশীল রচনায়ও তাঁর কলম ছিল সচল। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান সাহিত্যানুরাগী। তিনি উপন্যাসের স্রষ্টা হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে হরিশচন্দ্র কবিরত্নের উপন্যাসমালায় তাঁর 'Tales of Yore' উপন্যাসের অনুবাদ বার হয়।

ব্রিটিশের বিরোধিতা করেও, ব্রিটিশের কাছে 'ভয়ানক' পুরুষ হিসেবে গণ্য হয়েও, তাঁকে 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করতে বাধ্য হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া নয়, যোগ্য প্রাপ্তি বলেই ব্রিটিশকে ওই খেতাবটি দিতে বাধ্য করেছিল। ৩০ ডিসেম্বর ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে মাত্র ৬১ বছর বয়সে শশীচন্দ্রের জীবনাবসান হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে যে বিশিষ্ট মনীষীরা এই অন্ধকার দেশে মৃদু প্রদীপের আলো জ্বালানোর চেষ্টা করেছিলেন, নানা কারণে তাঁরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সমাজ সংস্কার, দেশপ্রেম, রাজনীতি ও ইতিহাস-চেতনার নানা দিকে তাঁদের যুক্তি-নির্ভর মনীষা নতুন কালের আলো ফেলেছিল। এই কালে সে সব নতুন নতুন দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল নির্ভীক সাংবাদিকতা তার অন্যতম। দেশের পেছিয়ে পড়া মানুষের চরিত্রগঠনে, সাহসের সঙ্গে সত্যকে তুলে ধরবার কাজে বিরামহীন চেষ্টা চালিয়েছিল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত লেখক ও সাংবাদিকরা। এই পথেই উঠে এসেছিলেন—অক্ষয় দত্ত, ঈশ্বর গুপ্ত, হরিশ মুখার্জী এবং শশীচন্দ্র দত্তরা। এঁরাই নতুন কালের বাংলার সাহসী সাংবাদিকতার অগ্রদূত। শশীচন্দ্র এঁদের মধ্যে একটি অত্যুজ্জ্বল নাম।

□ হীরালাল চক্রবর্তী

লোকজীবনের চিত্রকর : লালবিহারী দে

গণমুখিন সাহিত্যচর্চা বর্তমানে তার নিজের জায়গা বেশ সুদৃঢ় করে নিতে পেরেছে একাধিক গণচেতনাসম্পন্ন লেখকের আবির্ভাবে। কিন্তু যখন বাংলা সাহিত্য বঙ্কিম-দীনবন্ধুর স্তরে বিরাজ করছিল এবং তাঁদের রচনার মধ্যে একাধিক সাধারণ মানুষেরও দেখা পাওয়া যাচ্ছিল, তখনো বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে গণমুখিন হয়ে উঠতে পারে নি। অথচ তাঁদের রচিত চরিত্রগুলির মধ্যে সে সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। সে আলোচনায় পরে আসছি।

এমন একটি ধারণা প্রচলিত হয়ে আসছে যে, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গণনাট্য আন্দোলনই প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র নাটককেই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যকেই সাধারণ মানুষের প্রতি নিবেদিত করে তোলার পথ দেখিয়েছিল। একথা অস্বীকার না করেও বলা যায় যে, এরও বহু পূর্বে, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, ইংরেজ রাজত্বের শাসনাধীনে থেকেই একজন বাঙ্গালী দেখিয়েছিলেন কীভাবে সাধারণ মানুষের জীবন-যন্ত্রণাকে সাহিত্যের উপজীব্য করে তোলা যায়। তিনি হলেন রেভারেন্ড লালবিহারী দে। লোকবৃত্ত-সংগ্রাহক, ঔপন্যাসিক এবং সম্পাদক হিসেবে তাঁর যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। এবং একথাও অনস্বীকার্য যে, তাঁর নিজের সমকালে ইঙ্গ-বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের মধ্যে তরু দত্ত ব্যতিরেকে একমাত্র লালবিহারী দে-ই আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু এগুলিই শুধু মাত্র লালবিহারী দে-র মুখ্য পরিচয় নয়। নিজের সমকালে তিনি তাঁর বঙ্গমনস্কতার জন্যই অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন, লালবিহারীই সর্বপ্রথম একমাত্র বাংলাদেশের মনন এবং সংস্কৃতিকেই শুধু নয়, এই বাংলার সাধারণ জনজীবনকে এবং তার সংগ্রামকে সাহিত্যের আসরে ঠাঁই দিলেন। পরবর্তীকালে এর ধারা বেয়ে গণমুখী সাহিত্যের জোয়ার বয়েছে, কিন্তু লালবিহারীর প্রাথমিক প্রচেষ্টা আজও স্বমহিমায় বিরাজিত।

'ফোক টেলস অব বেঙ্গল' এবং 'গোবিন্দ সামন্ত, অর দি বেঙ্গল পেজ্যান্ট লাইফ'— এই দুটি বই লালবিহারী দে-কে শুধু আন্তর্জাতিক খ্যাতিই এনে দেয়নি, বরং তাঁকে বাংলার জনদরদী লেখক বলেও পরিচিত করে তুলেছে। এ দুটির মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের সুখ-দুঃখের চলমান জীবনসংগ্রামকে আমাদের সামনে হাজির করেছেন। পল্লীবাংলার সাদামাটা কৃষক জীবনের বহু বিচিত্র অনুভূতির নানা প্রতিভাসও যে সাহিত্যের মুখ্য উপজীব্য হতে পারে এবং তার মাধ্যমে যে রসোত্তীর্ণ উপন্যাস রচিত হতে পারে, তা এর আগে এমন পূর্ণাঙ্গভাবে কেউ প্রতিষ্ঠা

করে দেখাননি। শুধু তাই নয়, এমন সহজ সরল বিষয়, অথচ যার অভিব্যক্তি পাঠককে ভাবিয়ে তোলে, সে সম্পর্কে উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে লেখক স্বয়ং যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তার প্রমাণ তাঁর নিজের বক্তব্যে—"The reader is to expect here a plain and unvarnished tale of a plain peasant, living in this plain country of Bengal..." [L. B. Day : 'Govinda Samanta' 1934 Edition, Ch. I, p. 4]

লালবিহারীর দুই সমসাময়িক বঙ্কিমচন্দ্র, এবং তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনায় সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণা বা তথাকথিত নিচুতলার মানুষের শোষণ-নিপীড়নের চিত্র তেমন সার্থকভাবে আমরা পাই না। বঙ্কিমের রচনায় যে সমস্ত চরিত্র আমরা পাই, সেগুলি মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও একটু উঁচু স্তরের। কোথাও কোথাও নিম্নবিত্ত চরিত্রের দেখা মিললেও সেগুলিকে কাহিনীসূত্রে এমনভাবে পরিবর্তিত করা হয়েছে যে. তাদের আর তেমন করে চেনা যায় না। বক্তব্যটি বিশ্লেষণ সাপেক্ষ : 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রফুল্ল এমন সামাজিক স্তরের, যেখানে ঘরে দানা না থাকলে ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না। বঙ্কিম প্রফুল্ল এবং তার দরিদ্র মায়ের যে জীবন-সংগ্রামের ইঙ্গিতমাত্র দিয়েছেন, তার মাধ্যমে নিপীড়িত মানুষের জীবনযন্ত্রণার ঝলক অনুভব করা যায় মাত্র—কেননা সেই প্রফুল্লকেই পরে তিনি দেবী চৌধুরাণীতে উন্নীত করেছেন—যে সম্ভাবনা একে গণমুখী উপন্যাস করে তুলতে পারতো, তা বিনষ্ট হল।

অন্যত্র সমসাময়িক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসটি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। এর প্রথমাংশে গ্রামের 'ভদ্রলোকদের' দুঃখ-দারিদ্র্যের চিত্রাঙ্কণ থাকলেও লেখকের লেখনী মধ্যবিত্ত পরিমণ্ডলের নিচে নামেনি। 'স্বর্ণলতা' সম্পর্কে বলা যায় যে, বাংলার যৌথ পরিবারের অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলিকেই এখানে বড় করে দেখানো হয়েছে। জীবনসংগ্রামের প্রতিচ্ছবি এতে যে একেবারে পাই না, তা নয়। বিধুভূষণ যেভাবে পরিশ্রম ও সংগ্রাম করেছে, তাকে অমর্যাদা করা যায় না। কিন্তু তার সঙ্গে তথাকথিত নিচুতলার মানুষগুলির দু-মুঠো আহারের সংস্থানের সংগ্রামের কোনো তুলনাই চলে না। সর্বোপরি ব্রাহ্মণ সন্তান হওয়ায় সর্বত্রই সে বিশেষ সুবিধা না চাইতেই পেয়ে গেছে। এই সুযোগটুকু গোবিন্দ সামন্ত বা প্রধান সমান্দারের মতো লোকেরা পায় না। তাই তাদের অস্তিত্বের লড়াই আরো কঠিন।

এই জাতীয় আরো উদাহরণ দেওয়া চলে, যেখানে শুধুমাত্র আভাস পাওয়া গেলেও পূর্ণাঙ্গতরূপে গোবিন্দ সামন্তের মতো লড়াইয়ের চিত্র পাওয়া যায় না। রমেশচন্দ্রের 'সংসার ও সমাজ' বা মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' অথবা দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' জাতীয় রচনাগুলি এই শ্রেণীতে পড়ে। রমেশ দত্ত ও মধুসূদন—দুজনের কেউই মধ্যবিত্ত সমাজের নিচে নামতে পারেননি। তবে কোনো কোনো চরিত্রের হেরে যাওয়া জীবনের যন্ত্রণার যে আভাস তাঁরা দিয়েছেন, সেগুলি অগ্রাহ্য

করার মতো নয়। দীনবন্ধুর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য—তবে পূর্ব-উল্লিখিত দুজনের থেকে তাঁর একটু পার্থক্য আছে। তোরাপের মতো চরিত্রসৃষ্টি এবং সংগঠিত নীল কৃষক আন্দোলনের প্রতিভাস তাঁর রচনাকে অনেকাংশেই গণমুখী করে তুলেছে। নীল কৃষক আন্দোলনের যথার্থ প্রতিবাদী রূপ তোরাপ চরিত্রের মাধ্যমে দীনবন্ধু ফুটিয়ে তুলতে সার্থক হয়েছেন—তাঁর বিদ্রোহের ভাষাতে ভঙ্গিই শুধু নয়, অত্যাচারিতের যন্ত্রণাও তার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু এ সমস্তকেই নাট্যকার ব্যর্থ করে দিয়েছেন, নাটকটিকে একটি পারিবারিক মেলোড্রামায় পরিণত করে। তোরাপের সম্ভাবনারই যথার্থ রূপায়ণ দেখতে পাই গোবিন্দ সামন্তের মধ্যে। আরো একটি বিষয় স্মরণীয় যে, উল্লিখিত রচনাগুলিতে মেহনতী মানুষের মর্মস্পর্শী চিত্র এবং তাদের সোচ্চার বিদ্রোহের রূপায়ণ হলেও, তারাই সেখানে একমাত্র নয়, বা মুখ্য চরিত্র নয়। সেদিক দিয়ে লালবিহারীর গোবিন্দ সামন্ত ও তার পরিজনদের সামগ্রিক অস্তিত্বের লড়াইয়ে উপন্যাসটি যেভাবে গড়ে উঠেছে, তার ফলে একে আধুনিক কালের পূর্ণায়ত গণসাহিত্যের প্রথম যথার্থ পূর্বাভাস বলে গণ্য করতে পারি। লৌকিক জীবনের এই জীবন্ত দলিলেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে তাঁর 'ফোক টেলস্ অব বেঙ্গলকে' গণ্য করা যায়। কী ভাবে? সে কথায় যথাস্থানে আসছি।

যে 'গোবিন্দ সামন্ত'কে এতখানি মর্যাদার শিরোপা দেওয়া হল, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ মেহনতী মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে নিয়ে ইংরেজীতে একটি উপন্যাস প্রতিযোগিতার আহ্বান করেন উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—সময়টা ছিল ১৮৭১ সাল। এই উপলক্ষে ১৮৭২ সালে লালবিহারী দে 'গোবিন্দ সামন্ত' রচনা করেন। দু বছর পরে পুরস্কার ঘোষিত হয় এবং বইটিও প্রকাশিত হয়। গোবিন্দ সামন্তের জন্ম থেকে একেবারে মৃত্যু পর্যন্ত এই উপন্যাসে বর্ণিত। সে গ্রামের এক খেটে খাওয়া মানুষের সন্তান। গ্রামজীবনের উৎসব, সংস্কার, সংস্কৃতিকে সঙ্গী করেই তার বড় হয়ে ওঠা, বিবাহ করা এবং ক্রমে মাতাপিতার মৃত্যুর পর সংসারের সমস্ত দায়িত্ব মাথা পেতে নেওয়া। এই দায়িত্ব বহন করতে গিয়েই গোবিন্দের জীবনে আসে নানা ওঠাপড়া এবং তার মোকাবিলা করতে করতে সে ক্রমে জীবনের জটিলতর সংগ্রামের যোদ্ধা হয়ে ওঠে। একদিকে জমিদারের উৎপীড়ন, অন্য দিকে নীলকর সাহেবের অত্যাচার—এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে তৎকালীন সাধারণ মানুষের জীবন যে কতখানি দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, তার প্রত্যক্ষ দলিল যেন গোবিন্দ সামন্ত, মালতী, মাধবেরা। তবুও এই মানুষগুলি অস্তিত্বের লড়াইয়ে টিকে ছিল, এরই মধ্যে গ্রামজীবনের স্বাভাবিক আনন্দটুকু আহরণ করে নিতে পেরেছিল। কিন্তু মহামারী ও দুর্ভিক্ষের অন্নাভাব গ্রামের সরল কৃষক গোবিন্দকে পরিণত করলো বর্ধমান শহরের এক দিনমজুরে। সেই মজুর বস্তিতেই অবশেষে একদিন তার জীবনাবসান।

গোবিন্দ সামন্তের জীবন পাঁচালীতে দেখলাম, যত বারই সে আশায় বুক বেঁধে জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তত বারই সে আশাহত হয়েছে। কিন্তু সেখানেই সে থেমে থাকেনি, পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে - এটিই হল মেহনতী মানুষের জীবন-চিত্র, যা তাকে এক অতি বাস্তব সংগ্রামী চরিত্র করে তুলেছে। আর তাই লালবিহারীর এই বইটির মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের গণজীবনের পরিপূর্ণ চিত্র খুঁজে পেয়েছি। মেহনতী চাষী জনসাধারণ, তাদের আচার-সংস্কার, মান-অপমান, চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব এবং বিচিত্র সব চরিত্রের মিছিল এই উপন্যাসটিকে এক অনন্যসাধারণ মর্যাদা যে এনে দিয়েছে, সমকালীন রচনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, সেকথা অবশ্য স্বীকার্য। ক্ষয়িষ্ণু 'ফিউডাল' সমাজ যখন তার অস্তিত্বের শেষ সীমায় এসে পেঁছেছে, তখন কৃষিজীবী গোবিন্দ 'বুর্জোয়া' সমাজের প্রতীক হয়ে শহরে ছুটে চলেছে দিনমজুরি করে ভাগ্যকে ফেরাতে— চলমান ইতিহাসের এই নির্মম বাস্তব সত্যকে এত দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে লালবিহারী প্রকাশ করেছেন যে, এই উপন্যাসটিকে বর্তমানের যে-কোনো শ্রেষ্ঠ গণমুখী সাহিত্যের সমশ্রেণীভুক্ত করা চলে।

গোবিন্দ সামন্তের মধ্যে আরো একটি ব্যাপার তাকে সমসাময়িক রচনাগুলির মধ্যে অনন্যসাধারণ করে তুলেছে। এখানে আমরা প্রথম জমিদারের সঙ্গে প্রজার সরাসরি সংঘর্ষে প্রজাকে মাথা তুলে আন্দোলন করতে দেখি। এর পূর্বসূচনা নীলদর্পণে খুব অস্পষ্টভাবে হলেও হয়েছে এবং পরবর্তীকালে 'জমিদার দর্পণে' একেবারে সেই বিষয়কেই প্রধান করে তোলা হয়েছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গোবিন্দ সামন্তকে একাধিক সংগ্রামের শরিক হতে হয়েছে—তার মধ্যে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অন্যতম। যদিও শেষ পর্যন্ত জীবনযুদ্ধে তাকে পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে, তবু বলা চলে যে, জমিদারের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামই পরবর্তী 'জমিদার দর্পণে' গিয়ে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। সেদিক থেকেও লালবিহারী দে-র অনন্যতাকে স্বীকার করে নিতে হয়। কেননা তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, গণসাহিত্য অর্থে শুধুই সাধারণ মানুষের হেরে যাওয়ার কাহিনী নয়, সেই হেরে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে যে বিপুল আন্দোলন, প্রতিবাদী মনোভাব এবং বিদ্রোহের চেতনাও লুকিয়ে থাকে, অথচ যার সঠিক মূল্যায়ন হয় না—তাকেও চিনে নিতে হবে। একথা ঠিকই যে, সমসাময়িক কালে অনেক লেখকই পরোক্ষে এই জমিদারদেরই গুণগান করেছেন, কেননা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন যথেষ্টই ছিল। কিন্তু লালবিহারীর সেরকম কোনো দায় না থাকায়, তিনি স্পষ্টতই দেখাতে পেরেছেন যে, অত্যাচারিতেরা মাঝে মাঝে মাথা তুলে দাঁড়াতে জানে। তাই দেখি গোবিন্দ জমিদারের কর দিতে অসম্মত হয়, নানা উৎপীড়নের শিকার হয়েও সে থানায় জমিদারের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে ভীত হয় না। যদিও শেষ পর্যন্ত সুদখোর গোলোকের কাছেই হাত পেতে তাকে জীবনধারণ করতে হয়। কিন্তু পরিশ্রমের বিনিময়ে একদিন সে ঋণমুক্তও হয়। অর্থাৎ জমিদারের অত্যাচারের পরোয়া না করে সে নিজের

মতো জীবন কাটায়। এই যে রায়তদের জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, এই অভিনবত্বটুকুই হয়তো সমসাময়িক 'জমিদার দর্পণ' জাতীয় রচনার প্রেরণা জুগিয়েছিল। এর মাধ্যমে লালবিহারী দে-র প্রতিবাদী সত্তাটিকেও চিনে নেওয়া যায়।

গণসাহিত্যের প্রাথমিক পর্ব সৃষ্টিতে লালবিহারী যেমন পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি লোকবৃত্তের সংগ্রাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েও সমকালে এক অনন্যসাধারণ নজির সৃষ্টি করেছেন। লোকসংস্কৃতির চর্চা এবং চর্যা বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সূত্রে প্রায় ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে এবং একথাও অনেকে বলে থাকেন যে, রবীন্দ্রনাথই এই লোকসংস্কৃতির চর্চার প্রতি দেশবাসীকে আগ্রহী করে তোলেন। একথা স্বীকার করে নিয়েও বলা চলে যে, রবীন্দ্রনাথেরও বেশ কিছুকাল আগে লালবিহারী দে স্বদেশবাসীকে এই লোকবৃত্তের দিকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিলেন একটি সংকলিত গ্রন্থ প্রণয়ন করে, যার মধ্যে তাঁর বাল্যকালের বিভিন্ন সূত্রে শোনা লোককাহিনীগুলি স্থান পেয়েছে। বইটির নাম হল 'ফোক টেলস্ অব বেঙ্গল'। গ্রন্থটি সমকালে পাঠক-সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, যেমন করেছিল তাঁর 'গোবিন্দ সামন্ত' উপন্যাসখানা। জনদরদী যে মন তাঁকে গোবিন্দ সামন্তের মতো চরিত্রসৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, সেটিই যে তাঁকে বাংলাদেশে প্রচলিত লোককথাগুলি সংগ্রহ করতে প্রেরণা দিয়েছিল, একথা বলাই বাহুল্য। এ সম্পর্কে 'অরুণোদয়' পত্রিকায় তাঁর নিজের বক্তব্য : "প্রায় প্রত্যেক রজনীযোগে বঙ্গরাজ্যে উত্তমাধম পরিবার মাত্রেই প্রায় উপকথা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ···বঙ্গে যে সকল নীতিজনক উপকথা ব্যবহার হইয়া থাকে তাহার মধ্যে কতকগুলিন উপকথা সর্বসাধারণের গোচর জন্য এই পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম।" [অরুণোদয় : ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭]। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে, সাধারণ মানুষের চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখেই লালবিহারী নীতিকথাধর্মী লোককাহিনীগুলিকে সংকলন করেছিলেন।

মোট বাইশটি কাহিনী সংকলিত হয়েছে 'ফোক টেলস্ অব বেঙ্গল' (১৮৮৩) গ্রন্থে। এর উৎস অবশ্যই লালবিহারীর বাল্যকালে মৌখিক সূত্রে প্রাপ্ত বিভিন্ন কাহিনী। 'গোবিন্দ সামন্ত' উপন্যাসে 'শম্ভুর মা' নামে একটি চরিত্র আছে, যে রূপকথা শোনায়। এটি কোনো কল্পিত চরিত্র নয়—এর বাস্তব ভিত্তি রয়েছে লেখকের ব্যক্তি জীবনে। বাল্যকালে এই রকমই এক বৃদ্ধার মুখ থেকে তিনি যে হাজার হাজার কাহিনী শুনেছেন, তার প্রমাণ নিজেই দিয়েছেন। শুধু এই উৎসটুকুই নয়, ব্রাহ্মণ-খ্রীস্টান নির্বিশেষে, বালিকা-বৃদ্ধা, অথবা নাপিত-নোকর—যারই কাছে এই জাতীয় কাহিনী শুনেছেন, তাকেই এই সংগ্রহে ঠাঁই দিয়েছেন [L. B. Day : 'Folk Tales of Bengal' (1931 Ed.) Preface : pp. viii & ix]। তবে একথা তো আগেই বলেছি যে, নীতিকথাধর্মিতাকে মানদণ্ডে রেখেই তাঁর শোনা কাহিনীগুলির থেকে তিনি বাইশটি কাহিনী নির্বাচন করেছেন। শুধু তাই নয়, লৌকিক সাহিত্যের অবলীনে যে আন্তর্জাতিকতা থাকে, সে সম্পর্কেও

তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তার প্রমাণ হল এই যে, গ্রীম ভাইদের সংকলন বা ড্যাসেনট্-এর সংগ্রহের সঙ্গে তিনি বেশ পরিচিত ছিলেন এবং নিজে সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁদের অবলম্বিত পদ্ধতি দ্বারা যে প্রভাবিত হয়েছিলেন, একথা তো বলাই বাহুল্য। যদিও তার আগেই 'বিজয় বসন্ত' জাতীয় রূপকথা বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। তবে স্মরণীয় যে, সেসব প্রচেষ্টার পেছনে কোনো বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা পদ্ধতি ছিল না, যতখানি ছিল আবেগ। লালবিহারী কিন্তু নিজের আবেগকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে শুদ্ধ করে তবে প্রকাশ করেছেন। অতএব একথা খুবই স্পষ্ট যে, লোকসাহিত্যের যা জীবন্ত গতিপথ, সেই মৌখিক সাহিত্যের প্রতি এতটা বৈজ্ঞানিক সন্ধিৎসা দেখাতে পেরেছেন বলেই, লালবিহারীকেই বাংলাদেশের প্রথম লোকবৃত্তচর্চকের মর্যাদায় ভূষিত করতে হয়।

এই দুটি গ্রন্থের মাধ্যমেই লালবিহারী দে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। এ ছাড়াও তিনি বাংলাদেশের ধর্ম, সমাজব্যবস্থা, শিক্ষাধারা প্রভৃতি বিষয়ে বেশ কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে লিখেছিলেন। গ্রন্থ সমালোচনা, গ্রন্থ সম্পাদনা, এবং পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা বাঙ্গালী কোনো দিন বিস্মৃত হতে পারবে না। বিশেষ করে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' এবং 'অরুণোদয়' পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে তিনি একদিকে যেমন বাংলা ভাষার প্রকৃত মর্যাদার পুনরুদ্ধার করে তাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, অন্য দিকে তেমনি ফরাসী, জার্মান সাহিত্যিকদের রচনার অনুবাদ প্রকাশ করে এদেশে বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদের পথটি খুলে দিয়ে গেছেন।

লালবিহারীর অবদানের সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে গেলে বলা চলে যে, তাঁর বঙ্গমনস্কতাই তাঁকে যেমন জনদরদী গণসাহিত্যিক করে তুলেছে, তেমনি পত্রিকা পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সম্পাদকের মর্যাদাতেও ভূষিত করেছে। বাংলাদেশের প্রাণসত্তা যে তার নিজস্ব লৌকিক-সংস্কৃতির মধ্যেই সার্থকভাবে খুঁজে পাওয়া সম্ভব, এই বৈজ্ঞানিক সত্য তিনিই প্রথম সার্থকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করতে পেরেছিলেন, গ্রামের মেহনতী মানুষকে নিয়েই কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের মৌলিক পরিচয়, আর সেই বাংলাদেশের সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, আচার, সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কৃতি—গোটা ভারতবর্ষের পটপ্রেক্ষায় নয়—শুধু মাত্র বাংলার পটভূমিতেই যে বিচার্য ও মূল্যায়নযোগ্য—এই সত্যকেই তিনি বাঙ্গালীর মর্মে মর্মে অনুপ্রবেশ করানোর প্রয়াস পেয়েছেন। সেখানেই তাঁর অনন্যতা, সেখানেই তাঁর সার্থকতা।

□ রীতা ঘোষ

মনীষী রাজনারায়ণ

ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে আধুনিকতা এবং ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে সমৃদ্ধ এক বিরল ব্যক্তিত্ব রাজনারায়ণ বসু। ১৮২৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ২৪ পরগনা জেলার বোড়াল গ্রামে রাজনারায়ণের জন্ম। তাঁর পিতা নন্দকিশোর বসু রামমোহন রায়ের স্কুলে কিছু কাল ইংরাজি শিখেছিলেন এবং স্কুল ছাড়ার পর কিছু দিন রামমোহন রায়ের সেক্রেটারীর কাজও করেছিলেন।

সাত বছর বয়সে রাজনারায়ণকে তাঁর পিতা লেখাপড়ার জন্য কলকাতার এক গুরুমশায়ের পাঠশালায় পাঠান। কিছু দিন পর ইংরাজি শেখার জন্য তাঁকে বৌবাজারের 'শম্ভু মাস্টারের স্কুলে' ভর্তি করেন। এর পর তিনি হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন। ওই স্কুলের নাম ছিল School Society's School, কিন্তু সাধারণের কাছে সেটি হেয়ার সাহেবের স্কুল হিসেবেই পরিচিত ছিল। চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ওই স্কুলে পড়েন এবং সেখানে ডেভিড হেয়ারের প্রত্যক্ষ সাহচর্যও লাভ করেন। হেয়ার স্কুলে রাজনারায়ণ যে তিনজন বিশিষ্ট শিক্ষকের সান্নিধ্য পান, তাঁদের অন্যতম ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি পরে কলকাতার একজন বিশিষ্ট ডাক্তার হয়েছিলেন। তাঁর এই শিক্ষক সম্পর্কে রাজনারায়ণের উক্তি, "তিনিই আমাদিগের মনে জ্ঞানের ইচ্ছা ও অনুসন্ধানের ইচ্ছার উদ্রেক করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের মনোমুকুলকে প্রথম প্রস্ফুটিত করেন।"

১৮৪০ সালে রাজনারায়ণ হেয়ার সাহেবের স্কুল থেকে হিন্দু কলেজের থার্ড ক্লাসে অর্থাৎ স্কুল বিভাগের ফার্স্ট ক্লাসে ভর্তি হন। হিন্দু কলেজে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন: মাইকেল মধুসূদন, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বসু, জগদীশনাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রমুখ। প্যারীচরণ সরকার তাঁর ওপরের ক্লাসে পড়তেন।

রাজনারায়ণ বসুর জীবনকাহিনী এবং জীবনচর্চার বিস্তারিত তথ্যের প্রধান উৎস তাঁর 'আত্মচরিত'। 'আত্মচরিত' লেখার পর তিনি আরো প্রায় ২৫ বছর জীবিত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত যোগেশচন্দ্র বাগলের 'রাজনারায়ণ বসু' পুস্তকটি তাঁর জীবন সম্পর্কে জানার একটি মূল্যবান আকর গ্রন্থ। রাজনারায়ণ বসুর বিভিন্ন বক্তৃতা সংগ্রহ এবং ইংরাজি ও বাংলা ভাষায় রচিত প্রায় পঁচিশটি মূল্যবান

গ্রন্থ থেকেও তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা ও কর্মকাণ্ডের ইতিহাস এবং তাঁর জীবনদর্শন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়।

বাংলার নবজাগৃতির বৈচিত্র্যময় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উর্বর পটভূমিকা ছিল রাজনারায়ণের জীবনদর্শন এবং চরিত্রগঠনের ভিত্তিভূমি। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে আলোচনার সময়ে অবশ্যই সেই সময়কালের দ্রুত পরিবর্তনশীল বঙ্গদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং বৈপরীত্যে পূর্ণ চিন্তার বাতাবরণটি স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ওই বছরেই কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি এবং পরের বছরে কলকাতা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজ এবং সংস্কৃত কলেজ পটলডাঙ্গায় গোলদীঘির উত্তরে নব-নির্মিত গৃহে স্থানান্তরিত হয়। নব্যযুগের ন্যায়দর্শনে দীক্ষিত ও উদ্দীপ্ত ডিরোজিও ওই বছরেই হিন্দু কলেজের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং তৎকালীন ছাত্রদের মনে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটিয়ে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেন। কলেজের ভেতরে এবং কলেজের বাইরে তিনি নব্যযুগের পাশ্চাত্য মনীষীদের চিন্তাধারা ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করে তাদের মনে জ্ঞানের ও যুক্তির শক্ত ভিত্তি স্থাপন করতে প্রয়াসী হন। তাঁর ছাত্রেরাই বাংলা এবং ভারতের প্রগতি আন্দোলনের দিশারী হয়ে ওঠেন। ইতোমধ্যে একদিকে রামমোহন রায় এবং অন্য দিকে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ও উদ্যোগে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের দুটি স্বতন্ত্র ধারা। তৎকালীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সৃষ্ট অসংখ্য সংস্কার এবং বিধিনিষেধের নাগপাশ থেকে মুক্তির ও নব্যযুগ সৃষ্টির প্রয়াস তীব্রতর হচ্ছিল! উনিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরের মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে শাস্ত্র বনাম যুক্তি এবং সংস্কার ও আপ্তবাক্য বনাম মুক্তবুদ্ধি জ্ঞানের সংঘাত। শুরু হয়ে গেছে বাংলার স্মরণীয় মেধার বিকাশপর্ব। আপন কর্ম ও চিন্তায় দেশকে মহিমান্বিত করেছেন রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩৩), দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪—১৮৪৬), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩—৯৮), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—৯১), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২—৯১), মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—৭৩), প্যারীচরণ সরকার (১৮২৩—৭৫), ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৭—৯৪) প্রমুখ। রাজনারায়ণ বসু-ও (১৮২৬—৯৯) এই নবজাগৃতির অন্যতম মনীষী হিসেবেই ভাস্বর।

রাজনারায়ণের চরিত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় যুক্ত থেকেও এবং সে যুগের নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও তিনি তাঁর জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সর্বতোভাবে সচেষ্ট ছিলেন। তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিভ্রান্ত বাঙ্গালী সমাজের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হতে রাজনারায়ণ সমস্ত জীবন চেষ্টা করেছেন। নিজস্ব জাতীয় সত্তা বিসর্জন দিয়ে খাদ্যে ও পোষাকে সাহেব সাজার ভ্রান্ত পথ থেকে তৎকালীন শিক্ষিত বঙ্গ সন্তানদের নিবৃত্ত করার

প্রচেষ্টাকে, বলা যেতে পারে, তিনি সারাজীবনের সাধনা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। "জাতীয়তা-সৌধ গড়িতে হইলে স্বদেশীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা, সাহিত্য, খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, শিল্প-সম্পদ প্রভৃতির মূল ঠিক রাখিয়া প্রত্যেকটিরই উৎকর্ষ সাধন যে আবশ্যক, তাহা তিনি প্রতিনিয়ত স্বদেশবাসীর কর্ণকুহরে ধ্বনিত করিয়াছেন।" "A man blend of tradition and modernity"—বিদ্যাসাগর সম্পর্কে প্রচলিত এই উক্তিটি রাজনারায়ণ বসু সম্পর্কেও অনেকটাই প্রযোজ্য।

আগেই বলেছি, যে বাংলার মধ্যে স্বাদেশিকতা এবং স্বাজাত্যবোধ গড়ে তোলা ছিল রাজনারায়ণের জীবনের প্রধান দায়বদ্ধতা। জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভা বা জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা এবং সুরাপান-নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর সেই প্রচেষ্ঠা মূর্তরূপ পরিগ্রহ করে। জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার সভ্যবৃন্দ 'Good Night'-এর পরিবর্তে 'সুরজনী' বলতেন। পয়লা জানুয়ারীর বদলে পয়লা বৈশাখ তারিখেই পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় করতেন। বাংলাতে কথাবার্তা বলতে চেষ্টা করতেন। 'যে একটি ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিত, তাহার এক পয়সা জরিমানা হইত।'

রাজনারায়ণ এই সভার যে ঘোষণাপত্র (prospec us) রচনা করেন, সেটি ১৮৬৬ সালে প্রথমে 'National Paper'-এ এবং পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি তিনি স্বদেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন:

স্বদেশীয় ব্যায়াম, সঙ্গীত ও চিকিৎসাবিদ্যা, ইংরাজি শেখা শুরুর পূর্বেই মাতৃভাষা শিক্ষাদান, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অনুশীলন, কথোপকথন ও পত্রলেখায় বাংলাভাষা ব্যবহার, বাঙ্গালীদের সভায় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করা, বিদেশী পোষাক পরিচ্ছদ ও আহার বর্জন, নমস্কার প্রণামাদি স্বদেশীয় শিষ্টাচার পালন ইত্যাদি। জাতীয়তাবোধ নিজস্ব জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই সেটা সার্থক হবে—ঘোষণাপত্রটির ভিত্তি হিসেবে এই ধারণাটিই স্পষ্ট ছিল। National Paper-এর সম্পাদক নবগোপাল মিত্র এ থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু মেলার কার্যনির্বাহক সভার নাম ছিল জাতীয় সভা। ১৮৭৫ সালের হিন্দু মেলার সাম্বৎসরিক উৎসবের পৌরোহিত্য করেন রাজনারায়ণ।

ইংরাজি শিক্ষায় নব্যশিক্ষিতদের অনেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অঙ্গ হিসেবে মদ্যপানকে অপরিহার্য কর্মরূপে গ্রহণ করেন। এই প্রবণতা ক্রমে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এর বিষময় ফল সম্পর্কে সচেতন হলেও মদ্যপান অভ্যাস নিবারণকল্পে কোনো সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা রাজনারায়ণের পূর্বে কেউ শুরু করেন নি। ১৮৬৪ সালে প্যারীচরণ সরকার এই উদ্দেশ্যে কলকাতায় একটি সমিতি স্থাপন করেন। কিন্তু এর প্রায় তিন বছর আগেই রাজনারায়ণ বসুর উদ্যোগে মেদিনীপুরে সুরাপান-নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা পরিচালনার জন্য তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল।

শিক্ষাব্রতী হিসেবে রাজনারায়ণ বঙ্গদেশের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। ১৮৪৯ সালে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ইংরাজি বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে তিনি শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন। এই কলেজের ছাত্র ছাড়াও তৎকালীন যুগের অনেক কৃতবিদ্য সংস্কৃত পণ্ডিতও তাঁর কাছে ইংরাজি পড়েছেন। এঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সোমপ্রকাশের সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় দু বছর রাজনারায়ণ সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার কাজ করেন।

১৮৫১ সালে তিনি মেদিনীপুর সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। ঐ বিদ্যালয়ে ১৮ বছর শিক্ষকতা করার পর ১৮৬৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর তিনি অবসর গ্রহণ করলেন। শেষের দুবছর অসুস্থতার কারণে তিনি ছুটি নিতে বাধ্য হন। রাজনারায়ণের শিক্ষাব্রতী জীবন মেদিনীপুরেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁর খ্যাতি সমগ্র বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৩৪ সালে মেদিনীপুর স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনারায়ণ ছিলেন এর চতুর্থ প্রধান শিক্ষক। সিনক্লেয়ার সাহেবের মৃত্যুর পর তিনি এই পদে নিযুক্ত হন। এই বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান ছাত্র রসিকলাল সেন। রসিকলালের পর এফ. টীড প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন। টীড ও সিনক্লেয়ারের সময়ে (১৮৪৪ থেকে ১৮৪৮ সাল) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন।

টীড এবং সিনক্লেয়ারের সময়ে মেদিনীপুর স্কুল নিতান্ত গতানুগতিকভাবে চলেছিল। রাজনারায়ণ অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্যালয়টির স্বর্ণযুগের সূচনা করেন। তৎকালীন অনেক সরকারি রিপোর্টেও এই বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধানে রাজনারায়ণের অবদান সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। পঠন-পাঠন এবং বিদ্যালয়ের প্রচলিত কাজের উন্নতি করা ছাড়াও রাজনারায়ণ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ সংক্রান্ত নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম এই বিদ্যালয়ে প্রচলন করেছিলেন। এর মধ্যে বিতর্ক সভা প্রতিষ্ঠা, পাঠ্যপুস্তকের সাথে ছাত্রদের অন্য কোনো নির্দিষ্ট পুস্তক পাঠ করতে দেওয়া, বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে দরিদ্রভাণ্ডার খোলা, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে বঙ্গদেশের আধা শহর অঞ্চলের কোনো বিদ্যালয়ে এই ধরনের কাজকর্ম চালু করা অবশ্যই সপ্রশংস বিস্ময়ের উদ্রেক করে। "রাজনারায়ণের প্রযত্নে তখন মেদিনীপুর স্কুলের এত উন্নতি ও খ্যাতি হইয়াছিল যে, দরিদ্র ছাত্রগণ মিশনারী স্কুলে বিনা বেতনেও পড়িতে না গিয়া এখানে আসিয়া ভিড় জমাইত।"

শুধু বিদ্যালয়ের ভেতরে নয়, বিদ্যালয়ের বাইরের সমাজেও রাজনারায়ণ ছিলেন জনসাধারণের শিক্ষক। মেদিনীপুরের উন্নতিকল্পে তিনি যে কাজগুলি করেছিলেন, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, শ্রমজীবীদের

লেখাপড়ার জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন এবং ব্রাহ্মসমাজ গৃহ নির্মাণ। সুরাপান নিবারণী সভা এবং জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভা প্রতিষ্ঠার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ে মেদিনীপুরের সব শুভকর কাজে তিনি ছিলেন অগ্রণী পথপ্রদর্শক। এখানে তিনি সে সব জনহিতকর কর্মসূচী বহন করেছিলেন, তার দ্বারা বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানেও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ প্রভাবিত এবং অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। শিক্ষাব্রতী এবং সমাজসেবী হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি সমস্ত বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়ে। উধর্বতন কর্তৃপক্ষ তাঁকে একাধিকবার উচ্চতর পদে নিয়োগ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি সেই সব প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। নিজের পদোন্নতির থেকে শিক্ষা এবং সমাজকল্যাণকেই তিনি বেশি গুরুত্ব দিতেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে তাঁর অসামাম্য অবদান বঙ্গবাসী চিরদিন সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : রিচার্ডসনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরেজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। (জীবনস্মৃতি)

অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেছেন এবং স্বদেশের উন্নতিতে এটা যে অত্যাবশ্যক, এই বিশ্বাস তাঁর বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে দেশবাসীর মনে সঞ্চারিত করতে প্রয়াসী ছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন 'জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির উপর' জাতীয় উন্নতি বিলক্ষণ নির্ভর করে। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন আবার জাতীয় ভাষার অনুশীলন ব্যতীত কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না।'

মাতৃভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে সে সব আলোচনা করেছেন, আজও তার গুরুত্ব বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর প্রবন্ধ সঙ্কলন এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলী বাংলা ভাষা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান এবং অসীম মমত্বের পরিচয় বহন করে। মাইকেল মধুসূদনকে লেখা তাঁর চিঠিপত্রগুলিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মাইকেল তাঁর কাব্যগ্রন্থের খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রায়শ বন্ধু রাজনারায়ণকে মেদিনীপুরে তাঁর মতামতের জন্য পাঠাতেন। তাঁর পরামর্শ এবং সুপারিশের ওপর মাইকেলের অগাধ আস্থা ছিল।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে পুরোধা সংগঠন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর সাথে প্রায় শুরু থেকেই রাজনারায়ণ যুক্ত ছিলেন। স্মর্তব্য যে, ১৮৯৩ সালের ২৩ জুলাই শোভাবাজার রাজবাটিতে 'দি বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার' নামে যে সারস্বত প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়, রাজনারায়ণ বসু এবং উমেশচন্দ্র বটব্যালের প্রস্তাব অনুসারে সেটির নামকরণ করা হয় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'।

রাজনারায়ণ কথাবার্তায়, চিঠিপত্র এবং প্রবন্ধাদি লেখায় চমৎকার হাস্যকৌতুক পরিবেশন করতেন। শক্ত বিষয়গুলিও তাঁর সকৌতুক উপস্থাপনার গুণে সকলের

কাছেই সহজবোধ্য হোত। তাঁর হাস্য-কৌতুক, তাঁর পরিশীলিত প্রজ্ঞা এবং সজীব মনের পরিচয় বহন করে।

কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণের পর আমৃত্যু তিনি দেওঘরে বাস করেন। যত দিন রাজনারায়ণ দেওঘরে বসবাস করেন, তত দিন দেওঘর নব্যপন্থীদের তীর্থস্থান রূপে গণ্য হয়েছিল। সেখানে একটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠায় তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। দেওঘরেই ১৮৯৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর তিনি প্রয়াত হন।

ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক এবং দেবেন্দ্রনাথের কর্মকাণ্ডের সহায়ক রাজনারায়ণ বঙ্গবাসীর কাছে প্রকৃতপক্ষে একজন বিদগ্ধ শিক্ষাব্রতী, আদর্শ সমাজসেবী, বাংলাভাষার চর্চার তন্নিষ্ঠ সাধক এবং স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ সমাজসংস্কারক রূপেই প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন।

□ জ্যোতি দত্ত

গিরিশচন্দ্র ঘোষ : একটি মূল্যায়ন

উনিশ শতকে কেবল বাংলার নয়, সারা ভারতবর্ষের জাতীয়-জীবনের পটভূমিকায় নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। বিশ শতকের প্রথম দশকেও তিনি নাটক লিখেছেন, অভিনয়ও করেছেন—কিন্তু তাঁর মন এবং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল উনিশ শতকীয় চিন্তাভাবনার দ্বারাই। বর্তমান বাংলা নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চকে বোঝার জন্য গিরিশ-চর্চা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং অনিবার্য। শতবর্ষ পূর্বে গিরিশ-প্রতিভা কত অগ্রসরমান এবং আধুনিক তার প্রমাণ মেলে এই সত্যের মধ্যেই। এখনকার মঞ্চে যখন তাঁর অনূদিত 'ম্যাকবেথ', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'বিল্বমঙ্গল' কিম্বা 'বলিদান' নাটক বন্দিত হতে দেখি, তখন বোঝা যায় তাঁর সমকালীন অসংখ্য বিস্মৃত নাট্যকারদের থেকে তাঁর পার্থক্যটা কোথায়। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলাদেশে সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যেসব আন্দোলন চলছিল, বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-প্যারীচাঁদ-রাজনারায়ণ-বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্র-বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তাভাবনা নিয়ে যত ধরনের সমাজ-আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন বা সেসব বিষয়ে গ্রন্থাদি লিখেছিলেন, গিরিশচন্দ্র তার একনিষ্ঠ দর্শক ও পাঠক ছিলেন। তাঁর মধ্যে বিদ্রোহ ও সমঝোতা, নাস্তিকতা ও আস্তিকতা যুগপৎ এসে মিশেছিল। ১৮৯৭ সালে তাঁর সমাজাশ্রিত নাটক 'মায়াবসান' প্রথম অভিনীত হয় স্টার থিয়েটারে। এই নাটকে ত্রুটির ভাগ কম নয়। কিন্তু গিরিশচন্দ্র সমাজ আন্দোলন না করলেও তিনি কোন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চালিত ছিলেন, তা একটি সংলাপ থেকেই বোঝা যায় :

> "মুখে বলতেম—নিষ্কাম ধর্ম—নিষ্কাম ধর্ম ; কিন্তু অভিমান ফল-কামনা ছাড়ে না। সুখ আশায় পরহিত করেছি, ধর্ম উপার্জন করতে পরহিত করেছি—আত্মোন্নতির জন্য পরহিত করেছি, ফল-কামনায় পরহিত করেছি। আজ গঙ্গাজলে ফল বিসর্জন দিয়ে পর-কার্যে রইলেম ; রইলেম কি—জগতে মিশলেম।"
>
> [পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

এর প্রায় ৬ বছর পরে গিরিশচন্দ্র 'রাণাপ্রতাপ' নাটকটি লেখেন। এই নাটক লেখার আগে 'হলদিঘাটার যুদ্ধ' নামে লেখা কবিতা এবং তার পর 'রাণা-প্রতাপ'-এর নাট্য পরিকল্পনা থেকে দেখা যায় গিরিশচন্দ্রের নাটক কেবলই ভক্তিনির্ভর, এমন অভিযোগ ধোপে টেঁকে না। তিনি যে অশোক, সিরাজউদ্দৌলা এবং মীরকাশিমকে নিয়ে

নাটক লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন, তা তাঁর ভাবনাচিন্তা থেকে পরিষ্কার। একথা অনস্বীকার্য যে, পৌরাণিক নাটক রচনাতেই তিনি তাঁর চিন্তার সিংহভাগ ব্যয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর নাট্যমধ্যে যেখানে সুযোগ এসেছে, সেখানেই তিনি যেন আধুনিক প্রয়োগ অধিকর্তার ভূমিকা পালন করেছেন নিরপেক্ষভাবে। গিরিশচন্দ্রের যাবতীয় নাট্যকর্ম আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা শুধু এই বলতে চাই যে, যুক্তিবাদ বাদ দিয়ে ভক্তিবাদের দিকে গিরিশচন্দ্র সব সময়েই ঝুঁকে থাকেন নি।

গিরিশচন্দ্র রামায়ণ এবং মহাভারতের কাহিনীর একজন একনিষ্ঠ নাট্যরূপকার। তাঁর প্রথম যৌবনের কালাপাহাড়ী মনোভাব এবং নাস্তিক জীবনাচরণ ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকে এবং হিন্দুর পালাপার্বণ ও প্রবল ভক্তিরাগ তাঁর মধ্যে মিশতে থাকে। 'পৌরাণিক নাটক' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> "জাতীয় বৃত্তি পরিচালনা ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতির হিতকর হয় না।··· হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিত হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।"

ঠিক এইভাবে মধুসূদন চিন্তা করেন নি, কিন্তু গিরিশচন্দ্র করেছেন। তার কারণ মধুসূদন এবং গিরিশচন্দ্রের শতাব্দীগত না হলেও দশকগত পার্থক্য ঘটেছিলই। যে বিশেষ সন্ধিক্ষণে, ঊনিশ শতকের শেষ দুটি দশকে তাঁর পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকগুলি লেখা হয়, সেই কাল-পর্ব যুক্তিবাদ অপেক্ষা ভক্তিবাদের দিকে বেশি ঝুঁকেছিল। তৎকালীন হিন্দুর পুনরভ্যুত্থান আন্দোলন, থিওসফি আন্দোলন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নব্য বৈষ্ণব আন্দোলন, শ্রীরামকৃষ্ণের যুক্তি অপেক্ষা বিশ্বাস ও ভক্তির মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং কেশবচন্দ্রের রামকৃষ্ণ ভক্তি গিরিশচন্দ্রের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। তাই 'বিল্বমঙ্গলঠাকুর', 'চৈতন্যলীলা' প্রভৃতি নাটকে প্রেমভক্তির এমন বন্যাধারা।

কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হয় যে গিরিশচন্দ্রের প্রধান জীবন-নির্দেশক শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সাকার-নিরাকার ভেদ, শ্যাম-শ্যামার ভেদ সবই লুপ্ত হয়েছিল। এই ধরনের উদার ধর্মভাব ও ধর্মদর্শন সে যুগে আর কোথাও দেখা যায় নি। 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দেখতে গিয়ে রামকৃষ্ণ সমাজ পরিত্যক্তা বারবণিতা বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেছিলেন। পৌরাণিক আবহাওয়ায় সৃষ্ট 'বিল্বমঙ্গলঠাকুর' নাটকে ব্রাহ্মণ বিল্বমঙ্গলের সঙ্গে পতিতা চিন্তামণির যে প্রেমের আলেখ্য তুলা ধরা হয়েছে, তা সেকালে অকল্পনীয় ছিল।

> "চিন্তা। তুমি কি উন্মাদ?
> বিল্ব। যদি আজও না বুঝে থাকো, নিশ্চয় তুমি প্রেমিকা নও ; কিন্তু তুমি অতিসুন্দর—অতিসুন্দর!
> চিন্তা। কি ফ্যাল ফ্যাল দেখ্‌চ?

বিল্ব। দেখছি, তোমার কথা সত্য, কি মিছে। আমি যে উন্মাদ, এ পরিচয় কি
তুমি আগে পাওনি ?…”

গিরিশচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে সমাজ আন্দোলন করেন নি, কিন্তু সমাজের ব্রাত্যজনের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ মমতা। তাদের সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন তিনি ভেবেছিলেন এবং সে কাজ করেছিলেন পৌরাণিক নাটকের মধ্যে বসেই।

পুরাণাশ্রয়ী নাটকের আধারে গিরিশচন্দ্র রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রসঙ্গ এনেছেন এমন কথা ভাবা শক্ত, কিন্তু তা-ই সত্য। তাঁর 'শ্রীবৎসচিন্তা' নাটকের উপাখ্যান ব্যাসদেবের মহাভারতে নেই, তাঁর ঋণ কাশীরাম দাসের বাংলা মহাভারতের কাছে। কিন্তু আমরা অবাক হয়ে দেখি, এই পৌরাণিক নাটকে প্রজাসাধারণের সীমাহীন দারিদ্র্য, বিদ্রোহানল জ্বালিয়ে দেওয়া, এমনকি কারাগাব ভঙ্গের দৃশ্যরচনার মধ্যে তিনি ফরাসী বিপ্লবের ছায়া সঞ্চারিত করেছেন এবং এক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে স্বয়ং শনি।

“[বাতুলের প্রবেশ]

বাতুল। বলি, হ্যাঁগো হ্যাঁগো করে চলেছ কোথা ?

শনি। শুনিস্ নি, যা—নইলে না খেয়ে মারা যাবি ; ঘর জ্বালা, লুট কর—গোলাভরা ফসল আছে।

বাতুল। বলি ঠাকুর, আমি যে একখান ঘর বেঁধেছি, কি করে জানলে বল দেখি ?

শনি। তুই দাঁড়িয়ে কেন—যা লুট কর্‌গে।

বাতুল। বলি, তোমার ঐ মীড়পোড়া গঠন, তুমি কেন লুট করো না ? আর লুট করতে যে বলে দিচ্ছ, কোটালে যখন বেঁধে নিয়ে যাবে ?

শনি। কোটাল ক'জন, আর তোরা কতজন—মেরে তাড়াবি। যা যা, আগুন ধরা, লুট কর।

গিরিশচন্দ্র ফরাসী বিপ্লবকে সমর্থন করেননি সত্য, কিন্তু প্রজাদের সুখ-দুঃখে রাজা উদাসীন থাকলে তার ফল কী হতে পারে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। একজন অ-রাজনৈতিক নাট্যকারের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের এই সদর্থক ব্যবহার আমরা আর কোথাও দেখি না।

যাঁরা মনে করেন যে পৌরাণিক নাটকেই গিরিশচন্দ্রের যাবতীয় শক্তি ব্যয়িত হয়েছে, তাঁরা ভুল করেন। তিনি বিশ শতকের গোড়ায় যুগের দাবীতে ঐতিহাসিক নাটক রচনা শুরু করেন, একথা সত্য। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে যে আবেগ-প্রাধান্য, তা-ও যুগের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু তিনি ঊনিশ শতকের রক্ষণশীলদের মতো কেবল রাজপুত প্রাধান্য এবং হিন্দুর বাহুবল প্রদর্শন তুলে ধরেন নি। ১৯০৪ সালে 'সতনাম' নাটক লেথার ও অভিনয়ের পর উত্তেজিত মুসলমান জনতার আপত্তিতে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত নাটকটির অভিনয় বন্ধ করে দেন। নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণে তাই গিরিশচন্দ্র কিছু পরিবর্তনও করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা ভাল 'সতনামী সম্প্রদায় যে সত্যই কৃষকদের

একত্র করে ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং সামরিক সাফল্য লাভ করেছিল তা ইতিহাস-বহির্ভূত নয়। গিরিশচন্দ্র এলফিনস্টোনের 'হিসট্রি অফ্ ইন্ডিয়া' মন দিয়ে পড়েছিলেন এবং বর্তমান নাটকে তৎকালীন জাতীয়তাবাদী হিন্দুমানসকে উপস্থাপিত করেছিলেন। তিনি মুসলমান-বিরোধী ছিলেন না, আবার ইতিহাসের বিকৃতি পছন্দ করতেন না। তিনি লিখেছেন :

> "মুসলমানের প্রতি রচয়িতার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ; এবং মুসলমান যে সমস্ত গুণগ্রামে ভূষিত, তাহা হিন্দুর আদর্শ হওয়া উচিত, এইরূপ নাটককারের ধারণা। হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে আমরা এক হিন্দুস্থানবাসী—সুখ দুঃখের অংশী। অতএব পূর্বকালে হিন্দু-মুসলমানে যে সকল দ্বন্দ্ব হইয়া গিয়াছে, তাহার উল্লেখে কোন জাতির ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়। ইতিহাসদৃষ্টে উভয়-জাতির পূর্বভ্রম সংশোধিত হইতে পারে। ইংলন্ড ও স্কটলন্ডের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধীয় এবং রাউন্ডহেড ও ক্যাভেলিয়ারের দ্বন্ধ সম্বন্ধীয় স্যর ওয়ালটার স্কটের উপন্যাস ইহার প্রমাণ।"

গিরিশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতোই আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার সম্প্রীতি। ১৯০৬ সালে তিনি 'সিরাজদ্দৌলা' এবং 'মীরকাশিম' নামে দুটি ঐতিহাসিক নাটক লেখেন। এর আগের বছরে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হল মুসলিম লীগ। নাট্যকারের সাধের বাংলা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। নাট্যকারের মতোই সিরাজদ্দৌলা বলেছেন—

> "সিরাজ। ওহে হিন্দু-মুসলমান / এসো করি পরস্পর মার্জনা এখন। / সাবধান, নাহি দিও ফিরিঙ্গিরে সূচ্যাগ্র স্থান। / বাংলার সাধহ কল্যাণ / তোমা সবাকার যাহে বংশধরগণ, / নাহি হয় ফিরিঙ্গি নফল। শত্রু জ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার।"

সিরাজের মধ্যে Error of Judgement-জনিত ট্র্যাজেডির রস প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু মীরকাশিম লেখার সময়ে গিরিশচন্দ্র অনেক বেশি সচেতন। নানা দিক থেকে নায়ক সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে নায়ক মীরকাশিমের পার্থক্যটি গিরিশচন্দ্র সুন্দরভাবে এঁকেছেন। পাশাপাশি দুটি চরিত্র আলোচনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।

(ক) সিরাজ ছিলেন দুর্বলচিত্ত। জগৎশেঠ ও রায়দুর্লভ তাদের চক্রান্তের শাস্তি সিরাজের কাছে পায়নি। এমনকি নিষ্ঠুর মীরজাফরের কাছে তিনি কেবল সামান্য সমবেদনা কামনা করে বলেছেন, "আপনি রাজ্যের ভরসা। আপনি আমায় সাহস দিন, আমি বড়োই কাতর হয়েছি।"

কিন্তু মীরকাশিম তাঁদের সে সুযোগ দেননি। তিনি তাঁদের বন্দী করেছেন, গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে সৈন্যদের আদেশ দিয়েছেন।

"মীরকাশিম। স্বদেশদ্রোহিতা, বিজাতির পক্ষ হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা, দীন প্রজা ধ্বংস, আত্মীয় হত্যা—এসব মহাপাপ গঙ্গার মাহাত্ম্যে মোচন হবে। তোমাদের গঙ্গা-মৃত্যু প্রার্থনীয়—সেই প্রার্থনীয় মৃত্যুতে তোমাদের মত পাপীর শাস্তি হোক।"

(খ) সিরাজ অমাত্যদের বিশ্বাসঘাতকতা বুঝতে পেরেও তাঁদের কাছেই ছুটে গিয়েছেন, বলেছেন—

"সিরাজ। আমাকে ত্যাগ করুন ক্ষতি নেই, কিন্তু স্থির জানবেন ফিরিঙ্গি বাংলার দুষমন। আমি আপনাদের শত্রু—বাংলার নয়।"

কিন্তু মীরকাশিম সেই হতাশায় ভোগেন নি। গুরগিন খাঁকে তিনি পরিষ্কার বলেছেন—"ইংরেজ জয় করো। যে ইংরেজ জয় করবে আমি স্বহস্তে তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দোবো।—এই আমার প্রার্থনা।"

(গ) নাট্যশেষে সিরাজকে ছদ্মবেশে চলে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করে দেয় করিমচাচা। স্ত্রী ও কন্যাসহ গোপনে পলাতক সিরাজ ফকিরের আশ্রয় থেকে ধরা পড়ে। ফকিরের আশ্রয় গ্রহণ করে সিরাজকন্যা অনাহারে মারা যায়। আর মীরকাশিম ফকিরের বেশ ধরে পলায়ন করে। মৃত্যুর আগে জন্মভূমির উদ্দেশে মীরকাশিমের শেষ উক্তি—

"মীরকাশিম। আহা, অভাগিনী—ওহো পরাধীনা—ওহো স্বর্ণপ্রসূ জন্মভূমি—তোমার শীতল অঙ্কে অভাগাকে স্থান দাও। —হা জন্মভূমি। (মৃত্যু)।"

ব্রিটিশ সরকার 'মীরকাশিম'কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তার কারণ এ নাটকে সিরাজের মতো ইংরেজ-ভীতি মীরকাশিমের ছিল না। তিনি ভ্যান্সিটার্টকে জানিয়েছেন "প্রজার ক্ষতিবৃদ্ধিতে নবাবের ক্ষতিবৃদ্ধি। যদি প্রজারা উৎসন্নে যায়, তাহলে নবাবী কিসের—নবাবীর অর্থ প্রজা পালন। আমি প্রজা-পালন করবো।

(দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য)"

হেস্টিংস ও অমিয়টকে মীরকাশিম প্রায় ধমকের সুরে বলেছেন—"লবণ ও তামাকের উপর আপনাদের শতকরা নয় টাকা শুল্ক দিতেই হবে।" সেনাপতি তকি খাঁকে মীরকাশিমের আদেশ "যেখানে যত ইংরেজ কুঠি আছে—আক্রমণ করতে আদেশ দাও। কিরূপে বিদেশীর পীড়ন হতে বঙ্গমাতাকে রক্ষা করবো এই আমার চিন্তা।"

তৎকালীন গণ আন্দোলনের ধারাগুলির ওপর মীরকাশিম নাটক যে প্রবল প্রভাব সঞ্চার করতে পারে, এই কথা অনুমান করেই ব্রিটিশ সরকার নাটকটিকে নিষিদ্ধ করেছিল।

মুসলমান দেশপ্রেমিকের পাশাপাশি হিন্দু দেশপ্রেমিক শিবাজীকে তিনি নাটকের মধ্যে স্থান দিয়েছেন, তবে ধর্মীয় ব্যভিচারের প্রতিকার ও প্রতিরোধে কিছু কিছু ছবি

তুলে ধরায় শিবাজী কেবলই ধর্মীয় নায়করূপে শেষ হয়ে যান না। বৌদ্ধধর্মের অহিংস আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে গিরিশচন্দ্র লিখেছিলেন 'অশোক' নাটকটি। তবে অশোক ইতিহাসের চরিত্রের চেয়ে অলৌকিকত্তায় আচ্ছন্ন হয়েছে বেশি।

গিরিশচন্দ্র নিজেই সামাজিক নাটক রচনায় তাঁর অনীহার কথা ব্যক্ত করেছেন। হয়তো বাংলার উনিশ শতকীয় সমাজের ক্লেদ ও পঙ্কিলতা তিনি এত কাছ থেকে দেখেছিলেন যে, সেই সমাজের প্রতি তাঁর বীতস্পৃহা জন্মেছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখের মতো তদানীন্তন সমাজ আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর যুক্ত না হওয়াই এই অনীহার অন্যতম কারণ। কিন্তু গিরিশচন্দ্র দেখেছিলেন ব্যবসার অগ্রগতিতে অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে তখন কী ধরনের বিপর্যয় দেখা দিচ্ছিল, যৌথ পরিবারগুলি ক্রমশ ভেঙ্গে পড়ছিল। পারিবারিক জীবনে অশান্তি ও বিক্ষোভ তখন ছিল নিত্যকার ঘটনা। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংকীর্ণতার সুযোগে সমাজে দুর্নীতি ও অন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। মদ্যপান, নারীহরণ, হত্যা, জুয়াচুরি, পতিতাবৃত্তি, জালিয়াতি ইত্যাদির ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটে। গিরিশচন্দ্র শুধু এই সমাজকে দেখেনই নি, তাঁর বন্ধু অমৃতলাল বসুর 'অমৃতমদিরা' গ্রন্থটি পড়লে দেখা যাবে গিরিশচন্দ্র বারবণিতা ও সুরায় আসক্ত ছিলেন। সেজন্যই হয়তো সমাজ বিষয়কে নিয়ে নাটক রচনাকে তিনি 'নর্দমা ঘাঁটা' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তবু তো লিখতে হল 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'হারানিধি', 'শাস্তি কি শান্তি এবং 'মায়াবসান নাটক'। সামাজিক নাটকের মধ্যে তিনি রাজনীতিকে আনতে চান নি, কিন্তু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই নাটকগুলি যে তদানীন্তন সমাজ-দর্পণ হয়ে উঠতে পেরেছিল, সমকালীন রঙ্গমঞ্চগুলিতে এদের অভিনয় সাফল্যই তার প্রমাণ।

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকে নায়কের অভাব একটি স্বাভাবিক ও প্রায়দৃষ্ট বিষয়। তাঁর প্রফুল্ল নাটকের যোগেশের মধ্যে কোনো সংগ্রামী চেতনা দেখা যাবে না। যেমন যোগেশ, তেমনি 'বলিদান' নাটকে করুণাময় চরিত্র। সাধারণ চাকরিজীবী গৃহস্থ করুণাময় চেয়েছিল মেয়েদের সৎপাত্রস্থ করতে। কিন্তু তৎকালীন সামাজিক বৈষম্যে ক্ষতবিক্ষত করুণাময় বলে—

> "গিন্নী, বালিকার প্রতি এরকম অত্যাচার হয়। যদি অন্য জাত শোনে, বিশ্বাস করবে না।···মেয়ে আইবুড়ো রাখতে দোষ কি? জাত যাবে? কুচরিত্রা হবে? হলেই বা।"

তবু গিরিশচন্দ্র তাঁর সামাজিক নাটকগুলিতে সেকালের সমাজের বিভিন্ন দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ যেভাবে করেছেন, তাতে তাঁকে একজন সফল নাট্যকারই বলতে হবে। নাট্য আঙ্গিকের দিকে লক্ষ্য রেখেও, চরিত্রসৃষ্টি কিম্বা অন্যান্য নাট্য ত্রুটির কথা মনে রেখেও, আমরা একথা বলতে পারি।

নাটকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন, এমন কয়েকটি সামাজিক বিষয় নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হল :

(ক) উনিশ শতকের কলকাতার যৌথ পরিবারের বন্ধন শিথিল হবার ইতিহাস 'প্রফুল্ল' নাটকে বিধৃত।

(খ) বাঙ্গালী সমাজের পণপ্রথার যে নিষ্ঠুর বিষময় ফল শতাব্দীর পর শতাব্দী বহমান, 'বলিদান' নাটকে তারই উপস্থাপনা।

(গ) 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকে বাল্য বৈধব্য ও বিধবাবিবাহের সামাজিক আন্দোলন নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে।

(ঘ) 'মায়াবসান' নাটকে গিরিশচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ও কর্মযোগকে প্রতিফলিত করেছেন কালিকিঙ্কর চরিত্রের মধ্য দিয়ে। রঙ্গিনী চরিত্রের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতার ত্যাগপূত জীবনের আভাষ পাওয়া যায়।

(ঙ) 'গৃহলক্ষ্মী' নাটকটির মধ্য দিয়ে মামলা মোকদ্দমায় ধনী পরিবার কীভাবে উৎসন্নে যায় তা দেখানোই নাট্যকারের মূল লক্ষ্য।

গিরিশচন্দ্র নাট্যকার, নাট্যাভিনেতা ও নাট্যপ্রয়োগকর্তা। তিনি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বাঙ্গালী দর্শকদের নাট্যতৃষ্ণার পরিচয় উপলব্ধি করে নাট্যদর্শকদের আনন্দ দান করেছেন। তাঁর নাট্যাঙ্গিকে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতে পারে, নাটকে ভক্তি ও ভাবের সীমা কখনো কখনো লঙ্ঘিতও হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তার জন্য শতবর্ষ পরেও তাঁর অনেকগুলি নাটকের আবেদন বিন্দুমাত্র কমেনি। ভক্তিবাদ থেকে স্থির ও নির্দিষ্টভাবে তিনি উঠে এসেছিলেন যুক্তিবাদের আলোয়। সেই যুগ ও প্রেক্ষিতকে মনে রেখে এই উত্তরণকে ইতিহাসগতভাবে আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

□ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতকের বাংলা ও দীনবন্ধু মিত্র

আজও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা বিতর্কের ঝড় তোলে। সম্ভবত এই কারণে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক সমস্যা থেকে আমরা আজও মুক্ত নই। তাই সেদিনের সংগ্রামকেও আমরা ভুলতে পারি না। একদিকে মহাবিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, সাঁওতাল-বিদ্রোহ সহ উপর্যুপরি কৃষক সংগ্রাম, অন্য দিকে রামমোহন, ডিরোজিও ও বিদ্যাসাগরের আদর্শে প্রাণিত এক নবযুগের অভ্যুদয়—এই দুই ঘটনার মধ্যে নিহিত রয়েছে এমন সব ঐতিহাসিক তাৎপর্য, যা বহু দিন পরেও একালের মানুষকে ভাবায়, প্রেরণা দেয়। দুর্ভাগ্যবশত নানা বাস্তব কারণেই (কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির ইচ্ছায় নয়) এ-দুয়ের প্রয়োজনীয় সমন্বয় সেদিন সম্ভব হয়নি। দীনবন্ধু মিত্রই একবার সেই সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছিলেন, কিন্তু তাকে অবারিত রাখার প্রয়াস পরবর্তী বহু বছরের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়নি। দীনবন্ধু তাই শুধু বাংলা নাটকেই নয়, বঙ্গ ইতিহাসেও এক বিরল ব্যতিক্রমী চরিত্র।

১৮৩০ সালে দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম। বঙ্কিম ছিলেন দীনবন্ধুর একান্ত সুহৃদ। বঙ্কিম জানতেন, দীনবন্ধুর চরিত্র 'তাদৃশ তেজস্বী ছিল না', তাই নীলদর্পণের মতো নাটক লেখার দুঃসাহস তিনি কোথায় পেলেন—একথা ভেবে বঙ্কিম বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই দীনবন্ধু যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে এ ঘটনায় আমরা বিস্ময়ের কারণ দেখি না। পাঠশালায় পড়া শেষ না হতেই পিতা তাঁকে আট টাকা বেতনের সেরেস্তার কাজে লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু অচিরেই তিনি পিতার অমতে কলকাতায় চলে এলেন উচ্চশিক্ষা লাভের আশায়। নদীয়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে লালিত হয়ে একটি বালকের মনে কেমন করে এমনি এক স্বাধীন সত্তার জন্ম হয়েছিল এবং কী দুরন্ত আবেগে তিনি আধুনিক জ্ঞানের জগতে স্থান করে নেবার জন্য অনিশ্চিত পথে পাড়ি দিয়েছিলেন ভাবলে অবাক লাগে। বিদ্যাসাগর কলকাতায় এসেছিলেন ঠাকুরদাসের কাঁধে চড়ে। দীনবন্ধু এসেছিলেন কালাচাঁদ মিত্রের নিষেধ অগ্রাহ্য করে।

কলকাতায় দীনবন্ধু নিজেই নিজের অভিভাবক। স্কুলে ভর্তি হবার সময়ে পিতৃদত্ত 'গন্ধর্বনারায়ণ' নাম পরিত্যাগ করে নিজের পছন্দমতো নাম গ্রহণ করলেন দীনবন্ধু। কেন পছন্দ নয় পিতৃদত্ত নাম, কেন পছন্দ 'দীনবন্ধু' নামে—এসবের নানা ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু কৈশোরে পা না দিতেই যে তাঁর মনে নিজের বোধবুদ্ধির ওপর আস্থা গড়ে উঠেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অতঃপর নিদারুণ ক্লেশ স্বীকার করে অধ্যয়ন। প্রায় ভিক্ষাবৃত্তি করে স্কুল-কলেজে

তাঁকে পড়াশোনা করতে হয়, কিন্তু প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় বৃত্তি নিয়ে সসম্মানে তিনি উত্তীর্ণ হন। বাংলাভাষা ও সাহিত্যে তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেতেন। এত কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেও কেন যে তিনি শেষ পর্যন্ত কলেজে শেষ পরীক্ষা না দিয়েই দেড় শ টাকা বেতনে পাটনার পোস্টমাস্টারের পদ গ্রহণ করলেন তা-ও রহস্যময়।

চাকরি জীবনে দীনবন্ধু প্রভূত উন্নতিলাভ করেছিলেন। কাজে অবহেলা বোধ হয় তাঁর ধাতে সইতো না। কর্তৃপক্ষ তাই বোধ হয় খুশি হয়ে তাঁকে 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। যোগ্যতার তুলনায় এই সামান্য পুরস্কারে ক্ষুব্ধ বঙ্কিম সরকারকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। কিন্তু দীনবন্ধু আদৌ মর্মাহত হয়েছিলেন কিনা তা জানা যায়নি। চাকরির শেষ দু বছর কর্তৃপক্ষের অন্তর্দ্বন্দ্বের শিকার হতে হয় তাঁকে। "কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুর ব্যবস্থায় মানস অস্থৈর্য এবং দৈহিক পরিশ্রম রোগ বাড়িয়ে তুলল। বহুমূত্রের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়ায়—দেহে উপর্যুপরি বিস্ফোটক দেখা দিতে লাগল।···১৮৭৩ সালের ১লা নভেম্বর মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে দীনবন্ধু প্রাণত্যাগ করেন। অমৃতবাজার পত্রিকা জাতির হৃদয়দীর্ণ বেদনাকে ভাষা দিলেন এবং সরকারকে অভিযুক্ত করলেন ক্রোধতপ্ত কণ্ঠে—।" (ক্ষেত্র গুপ্ত: দীনবন্ধু রচনাবলীর ভূমিকা)।

প্রথমে লঙ সাহেবের স্কুলে, পরে হিন্দু কলেজে দীনবন্ধু শিক্ষালাভ করেন। হিন্দু কলেজ ছিল তৎকালীন আধুনিক শিক্ষার পীঠস্থান। ধর্ম-সমাজ-রাষ্ট্র—সর্ব বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার যে আদর্শ ডিরোজিও স্থাপন করেছিলেন এই কলেজে, সেই আলোয় দীনবন্ধুর চেতনাও যে আলোকিত হয়েছিল, তার প্রমাণ আমরা পাই তাঁর প্রত্যেকটি নাটকে। কিন্তু গ্রহণ-বর্জনের ক্ষমতাও যে তাঁর ছিল, সে প্রমাণও তিনি রেখে গেছেন 'সধবার একাদশী'-তে। চাকরিতে যোগদান করেও তিনি এক মুহূর্তের জন্যও এই আদর্শ বিস্মৃত হননি। বরং সমকালীন প্রতিটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা তাঁর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতো, না হলে তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না একই হাতে নীলদর্পণ ও সধবার একাদশীর মতো নাটক সৃষ্টি করা। দীনবন্ধু মিত্র একই সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর নবযুগের স্রষ্টা ও অন্যতম রূপকার।

চাকরির খাতিরে দীনবধুকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ক্রমাগত ঘুরে বেড়াতে হোত। তাই সাহিত্য সাধনার অবকাশ ছিল তাঁর খুবই কম। স্বভাবতই অন্য অনেক সমসাময়িক লেখকদের তুলনায় তাঁর রচনার পরিমাণ নগণ্যই বলা চলে। সাতটি নাটক, একটি কাব্যগ্রন্থ এবং দ্বাদশ কবিতা—এই ছিল তাঁর সমগ্র রচনা। স্থায়ী বসবাসের নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের সুখভোগ তাঁর জীবনে ঘটেনি। এ রকম যাযাবর জীবনে সাহিত্য-আসর বা সভাসমিতিতে যোগদানের সুযোগও কম। তাই দীনবন্ধুকে গ্রাম-নগরের পথে-প্রান্তরে বিচিত্র মানুষের আসর খুঁজে নিতে হোত। প্রয়োজনে তাদের নিয়ে তিনি নিজের মতো আসর সাজিয়ে নিতেন। তাঁর সাহিত্যে সমসাময়িক কালের এত বিচিত্র মানুষ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ রসের সমাবেশ সেই কারণেই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু দেখেন তো

অনেকেই, মনে রাখেন কজন ? জীবনপ্রেমী দীনবন্ধু ছিলেন যথার্থই একজন শিল্পী।

যদিও বাল্যকাল থেকেই কাব্যের প্রীতি ছিল দীনবন্ধুর অধিক আকর্ষণ, কাব্যরচনাতেই অধিকতর আসক্তি, তবু তাঁর সাহিত্য সাধনার অধিকাংশ সময় নাটক রচনাতেই ব্যয়িত হয়েছে। কিন্তু মাইকেলের মতো 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে'—এই ব্যথায় ব্যথিত হয়ে বঙ্গবাসীকে 'সুরসে প্রবৃত্ত' করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হননি। যোগ্যতার অভাবে তিনি বঙ্কিমের মতো উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হন নি, একথাও আমাদের মনে হয় না। নাটক রচনায় তিনি যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, চেষ্টা করলে সাহিত্যের অন্য ভূমিতেও যে, তিনি উৎকৃষ্ট ফসল উৎপাদন করতে পারতেন 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষই' তার প্রমাণ। তবু কেন তিনি নাটককেই প্রধানত বেছে নিলেন ? সম্ভবত এই কারণে যে, একজন সচেতন মানুষ হিসাবে সংস্কারাচ্ছন্ন আত্মসুখসর্বস্ব অধঃপতিত জীবনবিমুখ মানুষদের উন্নত সমাজচেতনায় ও মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করাকেই তিনি তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ ব্রত করতে চেয়েছিলেন আর এই চেতনার আলো সমাজের সর্বস্তরে পেঁছে দেবার উপায় হিসাবে নাটককেই সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম বলে বিবেচনা করেছিলেন। সন্দেহ নেই, সমাজচেতনার আদর্শ হিসাবে তিনি সমকালীন শ্রেষ্ঠ প্রাগ্রসর চিন্তাধারাকেই বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু নিপীড়িত শোষিত মানুষদের প্রতিরোধ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে তিনি যে আদর্শ 'নীলদর্পণ' নাটকে স্থাপন করেছেন, তা দীনবন্ধুর নিজস্ব কীর্তি।

দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভার বহু প্রমাণ অনেকেই হাজির করেছেন। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, অলৌকিক সমাজজ্ঞান, তীব্র সহানুভূতি, বাক্‌পটুত্ব ও রসিকতা, ব্যঙ্গ-প্রিয়তা, পাত্র-পাত্রীর আচার-বিচার হাবভাব প্রভৃতিতে বাস্তবিকতা। মোহিতলাল : 'দীনবন্ধু সেকালের হইলেও চিরকালের বাঙ্গাল, অতি উচ্চ-ভাবুকতা ও কল্পনা ব্যতিরেকেই রসসম্পৃক্ত জীবনের মুগ্ধ উপাসক। উৎকৃষ্ট নাটকীয় প্রতিভার লক্ষণ আমাদের সাহিত্যে অল্পই প্রকাশ পাইয়াছে—সেই অল্পের মধ্যে দীনবন্ধুর প্রতিভাই আমদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ; পরকায়-প্রবেশের মত প্রবেশ করিবার শক্তি—অনন্যসুলভ ; যে উৎকৃষ্ট হাস্য উৎকৃষ্ট কাব্যকল্পনার মতই দুর্লভ (কারণ উভয়ের মধ্যেই জগৎ ও জীবনকে গভীরভাবে দেখিবার শক্তি আছে), দীনবন্ধু সেই হিউমার রসের রসিক। এই হাস্যরসই দীনবন্ধুর প্রতিভার মূল প্রেরণা।'

কিন্তু এসব তো দীনবন্ধুর রচনাশৈলী প্রসঙ্গে মন্তব্য। 'নীলদর্পণ' নাটক সম্পর্কে আলোচনায় বঙ্কিম দীনবন্ধুর যে বিশিষ্টতার কথা উল্লেখ করেছেন, তা আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্কিম বলছেন, দুরাত্মা নীলকর সাহেবদের 'শত্রুতা করলে তারা যে তাঁর বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারুক না পারুক সর্বদা উদ্বিগ্ন করিতে পারে এসকল জানিয়াও দীনবন্ধু নীলদর্পণ প্রচারে পরাঙ্মুখ হন নাই। নীলদর্পণে গ্রন্থকারের নাম ছিল না বটে, কিন্তু গ্রন্থকারের নাম গোপন করিবার জন্য দীনবন্ধু অন্য কোন প্রকার যত্ন করেন নাই।'

তাঁর আরো মন্তব্য, "তিনি এই সময়ে 'নীলদর্পণ' প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় প্রজাগণকে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ করিলেন।" প্রায় অনুরূপ মন্তব্য 'ভারত সংস্কার' নামক তৎকালীন সাময়িক পত্রের।

অবশ্য নীলদর্পণ-প্রণেতা দীনবন্ধুর সাহস, সহানুভূতি ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের মতো গুণাবলীর কথা মেনে নিয়েও পরবর্তী যুগে কেউ কেউ তাঁর সম্পর্কে কিছু তির্যক উক্তি করতে ছাড়েন নি। যেমন, ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্যের মন্তব্য : "দীনবন্ধু তাঁহার নাট্যরচনার মাধ্যমে যেভাবে সমাজ ও জীবন সমালোচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে আমরা অবশ্যই প্রগতিপন্থী বলিতে পারি বটে, কিন্তু একথাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে দীনবন্ধু নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের রূপ তুলিয়া ধরিলেও, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে—পরাধীনতার বিরুদ্ধে কোন সচেতন প্রতিক্রিয়া দেখান নাই। বরং ভূমিকায় এমন সব কথা আছে যাহাতে ইংরাজ ভক্ত বলিয়াই তাঁহাকে মনে করা যাইতে পারে। ভূমিকার কথা মুখের কথা মাত্র – অর্থাৎ আত্মরক্ষার আবরণমাত্র হইতেও পারে।" মন্তব্যের শেষ দিকে এসে ড. ভট্টাচার্য আত্মসম্বরণ করেছেন, না হলে হয়তো দীনবন্ধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দালালরূপে চিহ্নিত হয়ে যেতেন, যেমন রামমোহন সম্পর্কে কিছু অতি-বিপ্লবী 'মার্কসবাদী' বলে থাকেন।

এই পর্যায়ে এসে আমাদের দীনবন্ধু প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর নবযুগ সম্পর্কে কিছু ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করতে হচ্ছে।

শুরুতেই আমরা বলেছি, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় দুটি ভিন্নমুখী ধারার সংগ্রাম সূচীত হয়। একটি উপর্যুপরি কৃষক অভ্যুত্থান, অন্যটি গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম। ইউরোপেও একদা এই দুটি সংগ্রামের সূচনা হয়, কিন্তু তারা পরস্পর-বিরোধী ছিল না, বরং ছিল পরস্পরের পরিপূরক। ভারতের ক্ষেত্রে এই দুই সংগ্রাম পরস্পর হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হবার সুযোগ পায় নি। পক্ষান্তরে মহাবিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহের মতো গরিব কৃষকদের সংগ্রামকে নবযুগের প্রবর্তকরা ভারতে গণতন্ত্র বিকাশের পথে অন্তরায় স্বরূপ বিবেচনা করেন। তার অর্থ এই নয় যে, কৃষক সমাজের প্রতি তাঁদের বিরূপতা ছিল, অর্থাৎ কৃষকদের তাঁরা শত্রু হিসেবে গণ্য করতেন। তা যদি হোত, তাহলে রামমোহন বিলাতে পার্লামেন্টারী কমিটির কাছে প্রেরিত তাঁর দাবিপত্রে লিখতেন না: 'ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হবার ফলে চল্লিশ বছরের মধ্যে জমিদার শ্রেণী সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু প্রজাদের কর-দান ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় তাদের কোন উপকারই হয় নি। প্রজা সাধারণের উপকারের জন্য জমিদারের করভার লাঘব করে তাদেরও দেয় খাজনা হ্রাস করে দেবার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।" নীলদর্পণ নাটক রচনা করে দীনবন্ধু মিত্র 'বঙ্গীয় প্রজাগণকে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ করিলেন'—বঙ্কিমও এইরকম প্রশস্তি লিখতেন না। হরিশচন্দ্র নীলবিদ্রোহীদের স্বার্থে কী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তা-ও কারো অবিদিত নয়। মধুসূদন 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরাজি অনুবাদ করেন।

এই নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে বাংলা পেশাদারী রঙ্গশালার উদ্বোধন হয়, যেখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রধানত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শিল্পীরা। এমনি আরো অনেক প্রমাণ হাজির করা যায়। আবার এ ঘটনাও সত্য—নব-আলোক-প্রাপ্ত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় পীড়িত কৃষকদের দুঃখে কাতর হয়েছেন, কখনো কখনো তাঁদের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছেন বটে, কিন্তু তাদের প্রতিবাদ-সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেননি। বরং অনেক সময়ে কৃষক সংগ্রামকে তাঁরা অবিবেচনা-প্রসূত মনে করেছেন, কেউ কেউ এদের সংগ্রামের প্রতি ঘৃণাও প্রকাশ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, শিমুয়েল পীরবক্সের নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি তাঁর 'বিধবা বিবাহ' নাটকে মহাবিদ্রোহকে নিন্দা করেছেন এইভাবে, "যখন বিধবা বিবাহের উদ্যোগ হতেছিল প্রায় সেইসময় দুষ্ট নিমকহারাম সিপাহীগণ যাহারা এত বছর অবধি সন্তান-সন্ততির ন্যায় রাজ্যেতে প্রতিপালিত হইল একেবারে রাজ্য নিবার আশায় রাজবিদ্রোহী হয়ে উঠল। ··এখন চিরদুঃখিনী বিধবা যে আমরা, আমাদের কর্তব্য এই যে, আমরা সতত ভগবানচন্দ্রের নিকট এই প্রার্থনা করি যেন আমাদের মহারাণীকে জয়ী করেন আর দুষ্ট সিপাইগণকে নিপাত করিয়া দেশে কুশল দেন।" এক্ষেত্রে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, একজন মুসলমান লেখক (পরে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করেন)। বাংলায় নবযুগ প্রবর্তক হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মতোই ইংরেজ শাসনকে আবাহন করছেন।

কেন এমন ঘটলো? তার উত্তর পেতে হলে আমাদের তৎকালীন ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে হবে।

ব্রিটিশ শাসকবর্গ ভারতে যে ভূমি-সংক্রান্ত নীতির পত্তন করলো, তার ফলে মধ্য-যুগীয় সামন্তবাদী ভূমি-ব্যবস্থার অবসান ঘটলো। জন্ম নিল একশ্রেণীর ধনবাদী জমিদার। এই ঘটনা শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব ফেললো তা-ই নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনকেও গুরুতরভাবে প্রভাবান্বিত করলো। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই সুদীর্ঘ কাল যাবৎ যে সামন্তবাদী ব্যবস্থাকে (বিশেষত শিক্ষা ও ধর্মীয় আচার আচরণের আদর্শে) লালন করছিল, এইভাবে তার মূলে কুঠারাঘাত পড়লো। কৃষক জনসাধারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভিশাপে জর্জরিত হচ্ছিলেন, তার ওপর তাঁদের ধর্মও খ্রীস্টান শাসকদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে, এই ধারণা ক্রমশ তাঁদের মধ্যে নানা ঘটনায় বদ্ধমূল হতে থাকে। অন্য দিকে সমাজের সনাতন প্রভাবশালী শিক্ষিত ও বিত্তশালী অংশের অনেকে নতুন ভূমি-ব্যবস্থার শিকার হতে থাকেন, সেই সঙ্গে তাঁদের সামাজিক প্রভুত্বও খর্ব হয়। এইভাবে হিন্দু-মুসলমান ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বিপুল-সংখ্যক ভারতবাসীর ক্ষোভ ও ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে ১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহে বিস্ফোরিত হয়।

পাশাপাশি আর এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা এই বিদ্রোহ থেকে (এবং অন্যান্য কৃষক সংগ্রাম থেকেও) নিজেদের বিচ্ছিন্ন

রাখেন। এঁদের একাংশ মনে করলেন যে, সিপাহী-বিদ্রোহ ও অন্যান্য কৃষক বিদ্রোহ 'রিভাইভালিজম্'-এর নামান্তর মাত্র, যা সমাজ অগ্রগতির পক্ষে ক্ষতিকারক। অতএব তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, প্রাচীন জীর্ণ সমাজ ব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক জীবনাচরণকে ধ্বংস করে এদেশে পাশ্চাত্য অনুসারী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং নারী-পুরুষ সকলের পক্ষে মঙ্গলদায়ক এক নতুন ব্যবস্থার পত্তন না করতে পারলে এদেশের মুক্তি নেই। এ কাজে ইংরেজি ভাষার প্রসার ও ইংলণ্ডের সহায়তা অপরিহার্য বলেই তাঁদের মনে হয়েছিল, যদিও ইংরেজ শাসকবর্গের কাছ থেকে প্রতিপদে তাঁদের তীব্র বাধাই পেতে হয়েছিল।

সন্দেহ নেই, দীনবন্ধু এই শেষোক্তদের আদর্শকেই মূলত বরণ করেছিলেন। কিন্তু যে মানুষটি বালক বয়সেই পিতৃদত্ত নাম পরিবর্তন করার এবং পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করে সেরেস্তার কাজ ছেড়ে উচ্চশিক্ষার জন্য অজানার উদ্দেশে পাড়ি দেবার প্রত্যয় দেখিয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে 'নবীন আদর্শের বাঁধা গণ্ডির মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ রাখা সম্ভব যে ছিল না, তার প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন 'নীলদর্পণ' নাটকে।

প্রসঙ্গত, বিনয় ঘোষের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। 'দীনবন্ধু মিত্রই তখনকার সমাজ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বাস্তব সত্যকে নাট্যাকারে রূপ দেন "নীলদর্পণ" নাটকের মধ্যে ১৮৬০ সালে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে—নাটকে, উপন্যাসে বা কাব্যে এই রূপায়ণের আর দ্বিতীয় কোন নিদর্শন নেই। "নীলদর্পণ" বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ও বাংলার সমাজ জীবনের ইতিহাসের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান থেকে যেত। "নীলদর্পণ"-শূন্য বাংলা সাহিত্য হত সমগ্র বাঙ্গালী জাতীর জীবনের একটা খণ্ডিত ইতিহাস। "নীলদর্পণ", "সধবার একাদশী"—এই দুয়ে মিলিয়ে তখনকার জীবনের 'টোটাল রিয়ালিটি', অর্থাৎ সমগ্রতার ছবি, এবং দীনবন্ধু মিত্র তার শিল্পী। বাংলার কৃষকশ্রেণী থেকে গ্রাম্য ও শহুরে মধ্যশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর সম্পূর্ণ পরিচয় এই দুটি মাত্র নাটকের মধ্যে পাওয়া যায়। দীনবন্ধু তাই শুধু প্রতিভাবান শিল্পী নন, মহৎ শিল্পী ও জাতীয় শিল্পী এবং "নীলদর্পণ" তাঁর সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও মহৎ ও জাতীয় সাহিত্য।'

এই কারণেই দীনবন্ধু ঊনবিংশ শতাব্দীর এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। যে দুই মহাশক্তির সমন্বয়-প্রচেষ্টা একদা দীনবন্ধুর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তাকে বিকশিত করতে পারলে ভারতের ইতিহাস হয়তো ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হোত। তা হয়নি বলেই অনেকের ক্ষোভ ও অভিমান। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এই বিক্ষোভ প্রকাশ করা যতটা সহজ, ঊনবিংশ শতকে তা ছিল অচিন্তনীয়। তবু দীনবন্ধুর মতো মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ সেই অভাবনীয় ভূমিকা আংশিকভাবে হলেও যে পালন করতে সক্ষম হয়েছেন, তার জন্য আমাদের গর্বের সীমা নেই।

শিশির সেন

কাঙ্গাল হরিনাথ : সমাজ ও সাহিত্য-ভাবনা

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার সুফল আর কুফল—দুটিকেই আত্মসাৎ করে উনিশ শতকের নবজাগরণ শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের চরিত্রে এক ধরনের প্রবল স্ববিরোধ তৈরি করেছিল। সমাজ-সংস্কার ও সমাজ-প্রগতিমূলক আন্দোলনে তার বিশেষ প্রভাব দেখা গেছে। রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বর গুপ্তের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এই স্ববিরোধের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। অন্য অনেকের সম্পর্কেই এই একই মন্তব্য আমরা করতে পারি। তাঁদেরই একজন হলেন কাঙ্গাল হরিনাথ। তাঁর সাহিত্য-সাধনা ও পত্রিকা-সম্পাদনা —দুইয়েরই লক্ষ্য ছিল সামাজিক প্রগতির সমর্থন আর দরিদ্র, অত্যাচারিত, কৃষিজীবী-গ্রামীণ মানুষের প্রতি জমিদার ও বৃহত্তর শাসক-শক্তির অবিচারের প্রতিবাদ।

কিন্তু হরিনাথ এই সমস্ত কাজের জন্য নগর কলকাতাকে আশ্রয় করেননি। গ্রামে থেকেই গ্রামীণ মানুষের সুখ-দঃখের অংশভাগী হয়েই তিনি উনিশ-শতকীয় নবজাগরণের মূল ধারার সঙ্গে নিজেকে অবিচ্ছিন্ন রেখেছিলেন। বিদ্যাসাগর অনেক বড় ব্যক্তিত্ব হলেও, হরিনাথ এখানে তাঁর তুলনায় স্বতন্ত্র। বিদ্যাসাগরের মতো কলকাতায় এসে শিক্ষালাভের সুযোগও তিনি করে উঠতে পারেননি। পিতৃমাতৃহীন অনাথ শৈশব আর কৈশোরে তীব্র দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তার সঙ্গে সংগ্রামের পর এই স্বশিক্ষিত, স্বগঠিত মানুষটি আলোক-বিভাসিত মহানগরীর বহু দূরে থেকে গ্রামীণ জীবনের গাঢ় অন্ধকারে নিজের প্রাগ্রসর চেতনার দীপশিখাটি অনির্বাণ রেখেছিলেন।

হরিনাথের জন্ম এখনকার কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে। তিনি মজুমদার বংশের এক দরিদ্র পরিবারে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হলধর মজুমদার আর জননী কমলিনী দেবীর তিনি ছিলেন একমাত্র সন্তান। শৈশবেই পিতা-মাতার মৃত্যু তাঁকে নিদারুণ দারিদ্র্য আর অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেয়। শুধু অন্নহীনতা নয়, বস্ত্রহীনতার জন্যও এক সময়ে তাঁকে রামমোহন রায়ের একটি বই আগাগোড়া নকল করে দিতে হয়েছিল। তারই বিনিময়ে তিনি একজন জমিদারের কাছ থেকে একটি কাপড় পেয়েছিলেন। অভিভাবকহীন হরিনাথ ছেলেবেলায় স্কুল-শিক্ষার বিশেষ সুযোগ পাননি। কুমারখালির কৃষ্ণধন মজুমদার প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি স্কুলে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু টাকাপয়সার অভাবে শেষ পর্যন্ত আর স্কুলে যেতে পারেননি। তা সত্ত্বেও হরিনাথের অদম্য জ্ঞানস্পৃহা স্তিমিত হয়নি। কলকাতায় লেখাপড়ার সুযোগ করে নেওয়ার জন্য বহু কষ্ট করে দশ-বারো দিন নদীপথে কাটিয়ে তিনি কলকাতায়

এসে পৌঁছন। কিন্তু এখানেও কোনো সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ায় আবার গ্রামে ফিরে যান। এই সময়ে কুমারখালি ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জমিদারীর অধীন। মহর্ষি কুমারখালিতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য পণ্ডিত দয়ালচাঁদ শিরোমণিকে পাঠান। তাঁরই কাছে হরিনাথ ভালভাবে বাংলাব্যাকরণ পড়েন। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা আর ব্রাহ্মধর্মের কিছু কিছু বই পড়ে তিনি বাংলাভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করেন। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকাও হরিনাথের শিক্ষাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। দারিদ্র্য তাঁকে কোনো দিন ছেড়ে যায়নি। তাই তিনি 'কাঙ্গাল' হরিনাথ। তবুও তারই মাঝখানে তাঁর সাহিত্য-সাধনা, শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা অব্যাহত ছিল।

কর্মজীবনে হরিনাথ অন্যায়ের সঙ্গে কোথাও আপস করতে পারেননি। তাই ছেলেবেলায় অনাহারের দুঃস্বপ্নকে মনে রেখেও কাপড়ের দোকানের চাকরি ছেড়েছেন। পরে ছেড়েছেন নীলকুঠির চাকরি। এর অন্যতম কারণ হিসেবে সতীশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'কাঙ্গাল হরিনাথের জীবনী' গ্রন্থে বলেছেন—'কুঠীর কর্ম্মচারীবর্গ সাধারণত যেরূপ অসচ্চরিত্র উৎকোচগ্রাহী, দরিদ্র প্রজার উৎপীড়ক হয়, তাহাতে অগণ্য অর্থলাভের সম্ভাবনা থাকিলেও তিনি কুঠীর মধ্যে কাজ করিলেন না ; অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাঁহার শিক্ষানবিশী পরিত্যাগ করিলেন।'[১]

এর পর হরিনাথ গ্রামের বালকদের লেখাপড়ার জন্য ১৮৫৪ সালের ১৩ জানুয়ারী কুমারখালিতে একটি বাংলা পাঠশালা তৈরি করেন। আর নিজে সেখানে অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা করতে থাকেন। নিজের বাল্যজীবনে লেখাপড়া শিখতে না পারার বেদনাই তাঁকে গ্রামের বালকদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারে উৎসাহিত করেছিল। হরিনাথেরই চেষ্টায় এই স্কুলের সুনাম বৃদ্ধি পায় এবং শেষ পর্যন্ত সরকার এর আর্থিক দায় বহন করতে স্বীকৃত হন। হরিনাথ এবং অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ বেতন পেতে থাকেন। প্রধানশিক্ষক হিসেবে হরিনাথের বেতন নির্ধারিত হয় কুড়ি টাকা এবং অন্যান্যদের পনেরো টাকা করে। হরিনাথ প্রধানশিক্ষকের অতিরিক্ত টাকা না নিয়ে অন্য শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট বেতনের টাকাই গ্রহণ করতে থাকেন। 'সংবাদপ্রভাকর', 'এডুকেশন গেজেট', 'সাপ্তাহিক বার্তাবহ' প্রভৃতি পত্রিকায় এই স্কুলকে দাঁড় করানোর জন্য হরিনাথের অপরিসীম শ্রমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও গ্রামের যেসব ছেলেরা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বিপথগামী হয়ে যাচ্ছিল, তাদের জন্য বন্ধু মথুরানাথ মৈত্রের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে তিনি নৈশ-বিদ্যালয় চালু করেন। এই নৈশ-বিদ্যালয়ের ছেলেরা এখানে কিছুটা লেখাপড়া শিখে পরে ইংরেজী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে রীতিমতো শিক্ষিত হয়ে উঠেছিল। রামমোহন ইংরেজীশিক্ষার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন প্রথম। বিদ্যাসাগর তাকে কার্যকর করেছেন। কিন্তু সুদূর গ্রামাঞ্চলে বসে হরিনাথের নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন, আবার তারই সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তারের

চেষ্টা—বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সমকালীন যুগজীবনের পটে তাঁকে সমাজ-মনস্কতায় অনেকটা প্রাগ্রসর করে তুলেছে।

বাংলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসেও কাঙ্গাল হরিনাথ একটি বিশেষ জায়গা দাবি করতে পারেন। উনিশ-শতকের শিক্ষিত বাঙ্গালীর স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা শ্রীরামপুর মিশনের প্রচেষ্টার সমকালেই শুরু হয়েছিল। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় একটি সংগঠন গড়ে উঠেছিল 'Calcutta Ladies Association for Native Female Education' নামে। এঁদেরই সঙ্গে সঙ্গে রাধাকান্ত দেব, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুর, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ অভিজাত ব্যক্তিরাও স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারে উৎসাহী হয়েছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে বেথুন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় বাংলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে যুগান্তর সূচনা করলো। কিন্তু এরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কলকাতার ধনী অভিজাত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা। আর বিদ্যাসাগরও কলকাতায় বসেই নিজের পদাধিকার ও ব্যক্তিত্বের সাহায্যে উচ্চশিক্ষিত ধনী বাঙ্গালী ও ইংরেজ-সরকারের সাহায্যেই স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। এরই পাশাপাশি স্বল্পবিত্ত ইংরেজী শিক্ষাবিহীন পল্লীবাসী হরিনাথের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন তাঁর উন্নত সমাজ-চেতনাকেই আমাদের সামনে তুলে ধরে।

সেদিন ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল সম্পূর্ণ নিজেদেরই প্রয়োজনে। অন্তত মধুসূদন আর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশ্চাত্য-শিক্ষায় উচ্চ-শিক্ষিত এই দুজন মানুষের কথা এখানে বিশেষ করে বলা যায়। মধুসূদন যখন সাহিত্যে পুরুষের উপযুক্ত সঙ্গিনী প্রমীলাকে নির্মাণ করার কথা ভাবছেন, আর সত্যেন্দ্রনাথ অনুবাদ করছেন মিলের 'Subjection of Women', সেই বছরেই হরিনাথ নিজের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করে নিজেই শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। Frantz Fanon-এর 'The wretched of the Earth'-এর ভূমিকা লিখতে গিয়ে Jean-Paul Sartre ঔপনিবেশিক শক্তির সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মুখে অধিকৃত দেশগুলির প্রতিক্রিয়াকে স্তর পরম্পরায় চিহ্নিত করতে গিয়ে প্রথম স্তরকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন—"The European elite undertook to manufacture a native elite. They picked out promising adolescents. They branded them, as *with a red-hot* iron, with the principles of western culture ; they stuffed their mouth full with high-sounding phrases, grand glutinons words that stuck to the teeth".[২]

মধুসূদন-সত্যেন্দ্রনাথ সার্ত্রে-চিহ্নিত এই ঔপনিবেশিক সংস্কৃতায়নের ফসল। কিন্তু হরিনাথের অবস্থান কোথায় ? সমকালের যে সব ভাবনা সমাজবিকাশের স্তর থেকে স্তরান্তরে নিয়ে যাওয়ার বীজ হিসেবে মেট্রোপলির বৃত্তে আবর্তিত হচ্ছিল, 'in the air'-

এ-ও তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। আর হরিনাথের ব্যক্তিত্বের শক্তি, সামর্থ্য এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্য এইখানে যে, তিনি তাকে সম্পূর্ণ অবধারণ করে মহানগরী থেকে দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে তার বিস্তার ঘটিয়েছেন। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে তাই নবজাগরণ যুগের প্রধান প্রবক্তাদের সঙ্গে হরিনাথেরও নাম পাশাপাশি করতে হয়। হরিনাথ তাঁর 'বিজয় বসন্ত' উপন্যাসে বিদুষী পত্নীর স্বামী হওয়ার সৌভাগ্য বর্ণনা করেছেন— 'এতাদৃশ সুখের সন্নিধানে ইন্দ্রিয়-সুখ কত অকিঞ্চিৎকর, যাঁহারা বিদ্যাবন্ভার্যা, তাঁহারাই জানিতে পারেন।'[৩] উপন্যাসের এই অংশে এসে আমাদের মধুসূদনের লেখা ইংরেজী প্রবন্ধগুলির কিছু অংশ এবং জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্রগুলির কিছু অংশ মনে পড়ে।

হরিনাথের সাহিত্যসাধনা আর পত্রিকাসম্পাদনাও তাঁর সমাজচেতনার সঙ্গেই অন্বিত। তাঁর 'বিজয় বসন্ত' আর 'বাউলসঙ্গীত' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেও রচনার তালিকা বেশ দীর্ঘ। ঔপনিবেশিক ধ্যান ধারণাকে আত্মসাৎ করলেও ইংরেজী শিক্ষা না থাকার জন্য তাঁর সাহিত্য হয়ে উঠেছে গ্রামবাংলার বিশেষ সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক পরিমণ্ডলেরই ভাষ্য, অথচ তারই মাঝখানে নবজাগরণের যুগের চিন্তাচেতনার প্রতিফলনও এক আলাদা ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছে। তাঁর সাহিত্যজীবনের গুরু বলা যায় ঈশ্বর গুপ্তকে। তাঁরই প্রেরণায় আর অনুকরণে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। ১৮৫৭ সালের ২১ অক্টোবর 'সংবাদ প্রভাকরে' 'টাকা' নামে তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। সমকালীন সমাজের মূল্যবোধের রূপান্তরকে কবি এই কবিতায় সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন— "আত্মীয়স্বজন তেজি, কত শতজন, তোমা হেতু করিতেছে, সমুদ্র লঙ্ঘন॥ / কত সম্বিদ্যাবান, জ্ঞান হারাইয়ে। / রাজদ্বারে দণ্ডনীয় উৎকোচ খেয়ে॥"[৪]

এ ছাড়াও গদ্য পদ্য মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশটির মতো গ্রন্থ লিখলেও তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থই মুদ্রিত হয়নি। এমনকি পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায় না। হরিনাথের রচিত গ্রন্থের তালিকায় আছে শিশুপাঠ্য নীতিকথামূলক উপাখ্যান, পাঁচালি, গীতাভিনয় বা নাটক, ধর্ম ও সাধনতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্ব। শিশুপাঠ্যের মধ্যে আছে দ্বাদশ শিশুর বিবরণ, কবিতা-কৌমুদী, একলব্যের অধ্যবসায় প্রভৃতি নীতিকথা ও উপদেশমূলক রচনা। বিজয়া, কৃষ্ণকালী-লীলা, কংসবধ, প্রভাস-মিলন, পাষাণোদ্ধার, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ প্রভৃতি পাঁচালি যেমন তিনি রচনা করেছিলেন, তেমনি অক্রূর সংবাদ, ভাবোচ্ছ্বাস প্রভৃতি নাটক ও গীতাভিনয়ও তিনি রচনা করেন। এই ধর্মাশ্রিত রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ও জীবনীকার জলধর সেন বলেছেন, "গ্রামের যুবকগণ যাহাতে নির্দোষ আমোদ উপভোগ করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে পারেন, সেইজন্য হরিনাথ অনেকগুলি পৌরাণিক নাটক যাত্রা পাঁচালী ও কীর্তন রচনা করিয়া নিজেই শিক্ষার ভার গ্রহণপূর্বক যুবকগণের দ্বারা সেই সকল নাটক ও যাত্রার অভিনয় করাইতেন।"[৫]

হরিনাথের ধর্ম ও সাধনতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে ব্রহ্মাণ্ডবেদ,

অধ্যাত্মআগমী, পরমার্থগাথা, কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের বাউল সঙ্গীত, আনন্দ উৎসব, মাতৃমহিমা প্রভৃতি। এগুলোতে তাঁর শেষ জীবনের অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসারই পরিচয় আছে। ব্রহ্মাণ্ডবেদ হরিনাথের গভীর তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় বহন করছে। গ্রন্থটি ৬টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এখন দুষ্প্রাপ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের ইতিহাসে হরিনাথের উপন্যাসোপম তিনটি রচনাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে আছে 'বিজয়বসন্ত', 'প্রেম প্রমীলা' ও 'চিত্তচপলা'। বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত পরিবারের গৃহবিবাদকে উপলক্ষ করে 'চিত্তচপলা' উপন্যাসটি রচিত হয়।[৬] 'প্রেমপ্রমীলা' উপন্যাসের কাহিনীতে রূপকথার প্রভাব আছে। এক পরিচয়হীন রাজপুত্র ও রাজকুমারী প্রমীলার প্রেম বর্ণিত হয়েছে এই কাহিনীতে। হরিনাথের গদ্যে ইংরেজী-সাহিত্যের প্রভাব পড়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু সংস্কৃতবহুল সঙ্গীতময় ভাষা ব্যবহারে তাঁর 'প্রেম প্রমীলা'র কাহিনী উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। 'বিজয়বসন্ত' হরিনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা। বন্ধুদের অনুরোধে রচিত এই উপন্যাসটি ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে এর জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে এর উল্লেখ থেকে। বলা বাহুল্য, এর কাহিনীও সংস্কৃত উপাখ্যান থেকে গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যেও আছে রূপকথার বৈশিষ্ট্য। কাহিনী উপস্থাপনায়, প্রকৃতির বর্ণনায়, ভাষা-প্রয়োগের অভিনবত্বে এটি সমকালীন পাঠকের কাছে আদরণীয় হয়েছিল। সেই সঙ্গে তাঁর এই গ্রন্থেই জাতীয়তাবোধ, ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সমকালীন সামাজিক আন্দোলনগুলি সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া এটিকে আলাদা মাত্রা দান করেছে। পরাধীনতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে হরিনাথ উপন্যাসের একটি বিশিষ্ট চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, "সংসারে যতপ্রকার সুখ আছে, স্বাধীনতা-সুখ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। সংসারে যতপ্রকার দুঃখ আছে, পরাধীনতা-দুঃখ সকল হইতে দুঃসহ।" বিজয়বসন্তের প্রকাশের আগের বছরই (১৮৫৮) প্রকাশিত হয়েছে 'পদ্মিনী উপাখ্যান'। তারও আগে ঈশ্বর গুপ্তের কণ্ঠে স্বাদেশিকতার মহিমা ঘোষিত হয়েছে। যুগ-চেতনার সেই প্রবল অভীপ্সা হরিনাথের জাগ্রত চিত্তকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই স্পর্শ করেছে। এই বিজয়বসন্তেই হরিনাথ সমকালীন বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে তাঁর অভিমত স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন। বিধবা-বিবাহের বিরোধিতা তিনি করেন নি, কিন্তু ব্রহ্মচর্য যে বেশি কাঙ্ক্ষিত তা পরিষ্কার ভাবেই বলেছেন: "দ্বি-স্বামিণী অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতালম্বিণী সহস্রাংশে গুরুতরা ও দেবতার ন্যায় পূজনীয়া, তাহার সন্দেহ নাই।"[৭] এই সীমাবদ্ধতা হরিনাথের সামাজিক অবস্থান বিচার করলে একান্তই স্বভাবিক মনে হবে।

কিন্তু যুগজীবনের স্পন্দনের সঙ্গে তিনি কীভাবে তাল মিলিয়েছিলেন তার অন্য পরিচয়ও এখানে আছে। বৃদ্ধ রাজাকে বিবাহ-সভায় দেখে জ্ঞানবতী এক যুবতী বলেছে যে, উন্মত্ত বধির খঞ্জ অন্ধ বালক বৃদ্ধ প্রভৃতির বিবাহ করা উচিত নয়। নারীর

কণ্ঠে প্রচলন-বিরোধী এই স্পষ্ট ঘোষণা হরিনাথের 'বিজয়বসন্তে'ই আমরা প্রথম শুনলাম। আবার আদর্শ শিক্ষাব্রতী হরিনাথ আচার্যের বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে অন্যান্য বিশেষণের সঙ্গে যখন 'কুসংস্কারবিরত' শব্দটি যোগ করেন, তখন এই গ্রামীণ মানুষটিকে হিন্দু কলেজের আদর্শ শিক্ষকদের পাশাপাশি আসন দিতেই হয়। একটি আদর্শ বিদ্যালয় কেমন হবে, তা-ও তিনি বিস্তৃতভাবে বলেছেন তাঁর এই উপন্যাসে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দু ধরনের শিক্ষা সম্পর্কেই তাঁর আগ্রহ। তাঁর কল্পনার আদর্শ বিদ্যালয়ে থাকবে, 'জগদ্বিখ্যাত মহামান্য পণ্ডিতগণের প্রতিমূর্তি'। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে শরীর-চর্চা, সঙ্গীত-চর্চা ও শিল্প-চর্চারও সুযোগ থাকবে।[৮] ছাত্রদের মানস বিকাশের এই সর্বাঙ্গীণ আয়োজন হরিনাথ তাঁর সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় করে উঠতে পারেন নি, কিন্তু আমরা যখন দেখি শিক্ষার এই পূর্ণতা-বিধানের সঙ্গে একেবারে সাম্প্রতিক কালের শিক্ষা-চিন্তার ঐক্য, তখন বোঝা যায় আচার্য হিসেবে তাঁর ভাবনা কতটা গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্য। শুধু সাহিত্য হিসেবে নয়, এই ধরনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামতের জন্যও 'বিজয়বসন্ত' গ্রন্থটিকে আলাদা মূল্য দিতে হবে। হয়তো এ কারণেই সমকালের মানুষকে গ্রন্থটি গভীরভাবেই স্পর্শ করতে পেরেছিল। এ শুধু রবীন্দ্র-উল্লেখের ভিত্তিতেই নয়, আমরা আরও প্রমাণ পেতে পারি গ্রন্থটির বহু সংস্করণ থেকে। বাংলা ১৩২১ সালে এই উপন্যাসের চতুর্দশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সেকালে বর্ণ-পরিচয়ের মতো শিশুপাঠ্য গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোনো বাংলা বইয়ের এত বহুল মুদ্রণ আমরা লক্ষ্য করি না।

হরিনাথ শুধু নিজেই সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি, ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও কয়েকজন সাহিত্য-শিষ্যও তৈরি করেছিলেন। মীর মশাররফ হোসেন, জলধর সেন, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মীর মশাররফ হোসেন তাঁর 'আমার জীবনী'তে হরিনাথকে সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি জানিয়েছেন আর জলধর সেন তাঁর জীবনী রচনা করে ও গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে গুরু ঋণ শোধ করার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে বাউল গান রচয়িতা ও সংগ্রাহক কাঙ্গাল হরিনাথ তথা ফিকিরচাঁদ আর এক ধরনের গুরুত্ব পেতে পারেন। তাঁর বিচিত্রমুখী মনীষার একটি দিক এখানে প্রকাশিত। এই গানগুলিতে শুধু ঈশ্বর চিন্তা নয়, তাঁর মানবমুখী চেতনার পরিচয়ও পাওয়া যায়। এই বাউল গানের সবগুলির উৎকর্ষ সমান না হলেও, সব শ্রেণীর মানুষকে মুগ্ধ করার ক্ষমতা এগুলির ছিল। 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল' শীর্ষক জনপ্রিয় গানটি তাঁরই লেখা। জীবনের নিষ্করুণ সাধারণ সত্যকেও তিনি বাউল গানের মাধ্যমেই প্রকাশ করেছেন—'শরীর অচল হয় রে যখন, পুত্র কন্যা স্ত্রী-পরিজন, / বিষ নয়নে দেখে তখন, বন্ধু না করে জিজ্ঞাসা। / ক্ষমতা যখন থাকে, সম্ভ্রমে সবাই ডাকে, কর্তা বলিয়ে করে প্রশংসা'।[৯] ড. সুকুমার সেনের ভাষায়, 'রবীন্দ্রনাথের

আগে বাউল গানের—যাহাকে ইংরেজীতে বলে Vogue তাহা হরিনাথই সৃষ্টি করিয়াছিলেন।'[১০] 'কাঙ্গাল' ও 'ফিকিরচাঁদ' ভণিতায় হরিনাথ প্রায় এক হাজার বাউল গান লিখেছেন। তাঁর রচনাবলীতে কিছু বাউল সঙ্গীত সঙ্কলিত হয়েছে। মাঝে মাঝে তাঁর বাউল সঙ্গীত আধ্যাত্মিকতা ছাড়াও অপূর্ব কাব্যসৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছে : 'অরূপের রূপের ফাঁদে, পড়ে কাঁদে / প্রাণ আমার দিবানিশি, / কাঁদলে নির্জনে বসে, আপনি এসে, / দেখা দেয় সে রূপ রাশি।'[১১] কাঙ্গাল হরিনাথের এই গান ভবিষ্যৎ কালের কাব্য-ভাষা সৃষ্টিতেও পথ দেখিয়েছে। হরিনাথ আবার কেবলমাত্র বাউল গান রচনাই করেন নি, গানের একটি দল তৈরি করে গান প্রচারও করে বেড়াতেন। লালনের থেকে বয়সে অনেক ছোট হলেও তাঁদের দুজনের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। হরিনাথ তাঁর 'ব্রহ্মাণ্ড বেদ' গ্রন্থে লালনের কয়েকটি গানও সঙ্কলিত করেন। রবীন্দ্রনাথের আগে হরিনাথই লালন ফকিরের গান সাধারণের সামনে তুলে ধরার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তাঁর নিজের লেখা বাউল গানে লালনের মতোই জাতিভেদ ও ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে ঘৃণা উচ্চারিত হয়েছে। শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিরোধ মেটানোর জন্য তিনি রচনা করেছেন 'কৃষ্ণ-কালীলীলা' বিষয়ক সঙ্গীত। বাঙ্গালীর হৃদয় বেদনায় নিষিক্ত 'বিজয়া' সঙ্গীতও হরিনাথের লেখনীতে রূপ পেয়েছে। দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নিজের সৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন তিনি। এরই সাহায্যে পৌঁছতে চেয়েছেন দেশের নিরক্ষর অগণ্য সাধারণ মানুষের কাছে। এখানে তিনি প্রকৃতই লোক-শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

অন্য দিকে হরিনাথের জীবনের মহৎ কীর্তি হল 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' নামক পত্রিকার প্রকাশ। ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে অর্থাৎ ১২৭০ সালের ১ বৈশাখ থেকে তিনি 'গ্রামবার্তা-প্রকাশিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। পরবর্তী কালে এই পত্রিকা পাক্ষিক ও সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে হরিনাথ তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন, "গ্রামবার্তা প্রকাশিকা সংবাদপত্রিকার দ্বারা গ্রামের অত্যাচার নিবারিত ও নানা প্রকারে গ্রামবাসীদিগের উপকার সাধিত হইবে এবং তৎসঙ্গে মাতা বঙ্গভাষাও সেবিতা হইবেন, ইত্যাদি নানাপ্রকার আশা করিয়া…'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র কার্য আরম্ভ করিলাম।"[১২] এর আগে হরিনাথ ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকরে' গ্রামীণ মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা লিখতেন। নিতান্ত স্বল্পবিত্ত হয়েও গ্রামাঞ্চল থেকে এই ধরনের পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত হরিনাথের অসামান্য মনোবল ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর সহমর্মিতার প্রকাশ। একদিকে সঙ্গীত ও নাটকের প্রচার, অন্য দিকে পত্রিকা-সম্পাদনা—হরিনাথের ব্যক্তিত্বকে দু ধরনের বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। দেশের সাধারণ মানুষের ও দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গ যোগস্থাপন আর গ্রামীণ অনগ্রসর পরিধির বাইরে গ্রামের সংবাদ পৌঁছে দিয়ে বহির্জগতের সঙ্গে যুক্ত করা —এই দুটি দায়িত্ব পালনের ভেতর দিয়ে হরিনাথ নবজাগরণের যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছেন। 'গ্রামবার্তা-প্রকাশিকা'-র উদ্দেশ্য সম্পর্কে হরিনাথ তাঁর দিনলিপিতে

আরো বলেছেন যে, নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচার, দেশীয় জমিদারদের সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচারের প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার জন্যই তিনি 'গ্রামবার্তা' প্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করেন। হরিনাথের মনে এ-ও আশা ছিল, তাঁর 'গ্রামবার্তা'র প্রতিবাদের ভাষা শুধু শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে নয়, শাসকগোষ্ঠীর কাছেও গিয়ে পৌঁছবে। কারণ গ্রামবার্তা প্রকাশের সময়েই দেশী সংবাদপত্রের অনুবাদ করার জন্য রবিনসন সাহেব অনুবাদ কার্যালয় খুলেছিলেন।

হরিনাথের পত্রিকা প্রকাশের আর এক উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষা চর্চা। তাঁর দিনলিপিতে একথাও তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের গ্রামবার্তায় মাতৃভাষা-চর্চা সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা এখনো পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক : "যতদিন বঙ্গসন্তান মাতৃভাষা উপেক্ষা করিয়া পরভাষার পক্ষপাতী থাকিবেন, যতদিন মাতৃভাষা ঘৃণা করিয়া বৈদেশিক ভাষানুশীলনে সময় ক্ষেপণ করিবেন, ততদিন বঙ্গের উন্নতির আশা আমরা করি না, ততদিন জাতীয় উন্নতির কোন সম্ভাবনা দেখি না। যাহাতে দেশে মাতৃভাষার চর্চা দিন দিন বৃদ্ধি পায়, যাহাতে মাতৃভাষা আদরের সামগ্রী, যত্নের ধন বলিয়া লোকের প্রতীতি জন্মে, যাহাতে সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া মাতৃভাষার দীনবেশ ঘুচাইতে সমর্থ হয়েন, বিবিধ রত্নে মাতৃভাষাকে অলংকৃত করিতে কৃতসংকল্প হয়েন, সে-বিষয়ে চেষ্টা করা প্রত্যেক বঙ্গসন্তানের অবশ্য কর্তব্য কর্ম।"[১৩]

আর্থিক অসুবিধা ছাড়াও হরিনাথকে আরো নানা ধরনের প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কিন্তু একনিষ্ঠ হরিনাথ নির্ভীকভাবেই গ্রামের অত্যাচার অবিচারের সমস্ত সংবাদ গ্রামবার্তায় প্রকাশ করতে থাকেন। খবর সংগ্রহের জন্য তিনি অন্যের ওপর নির্ভর করতেন না। কখনো নিজের পরিচয় গোপন করে, আবার কখনো প্রকাশ্যভাবে অনেক দূরে দূরান্তরের গ্রামে গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতেন। তার ফলে গ্রামবার্তা প্রকাশিকা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণকেই তুলে ধরতো। এই গ্রাম-ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে তিনি আবার অন্য ভাবেও ব্যবহার করতেন। শান্তিপুর, উলা, মেহেরপুর, চাকদা প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গার নামের উৎপত্তির কারণ, সেখানকার প্রাচীন ইতিহাস, ইত্যাদি সংগ্রহ করেও তিনি তাঁর গ্রামবার্তায় প্রকাশ করতেন। এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাও নবজাগরণ-যুগেরই বৈশিষ্ট্য।

পত্রিকা-সম্পাদনার কাজে নিজেকে পুরোপুরি নিয়োগ করার জন্য হরিনাথ শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে দিয়ে বই বিক্রয়ের কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু এই ব্যবসা শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবিকা নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট থাকে নি। যে সমস্ত ধনী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় তাঁর 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র কাজ চলতো, তাঁরাও অনেকেই দেশীয় জমিদার ও স্থানীয় শাসকের বিরূপতা লক্ষ্য করে সাহায্যের হাত গুটিয়ে নিচ্ছিলেন। এইভাবে বাইশ বছর গ্রামবার্তা চলার পর ১২০০ টাকার বিপুল ঋণ মাথায় রেখে হরিনাথ পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

হরিনাথের জীবনীকার জলধর সেন 'গ্রামবার্তা-প্রকাশিকা'র ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই পত্রিকার সাহায্যে সাধারণ দরিদ্র গ্রামবাসীর ওপর জমিদার, মহাজন ও কুঠিয়ালদের অত্যাচার অনেকখানিই কমেছিল। এ ছাড়াও প্রজাদের প্রতি সরকারের কর্তব্য সম্পর্কেও নানা প্রবন্ধ তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত হোত। নদী ও জলনিকাশী সংস্কার করে গ্রামের মানুষের জলকষ্ট নিবারণ, ডাক ও পুলিশ বিভাগের কাজের সুব্যবস্থা সম্পর্কে নানা প্রবন্ধ তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ডাকঘরে মনিঅর্ডার ব্যবস্থা প্রচলনের কথা তিনিই প্রথম উত্থাপন করেন। সংবাদপত্রের অনুবাদক রবিনসন সাহেব গ্রামবার্তা থেকে অনুবাদ করে নানা জ্ঞাতব্য তথ্য সরকারের দৃষ্টিগোচর করেছিলেন।

ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট আর দেশী জমিদার—দু দলেরই অন্যায় অবিচারের বিবরণ তাঁর পত্রিকায় সমান গুরুত্ব পেত। একবার পাবনার এক ম্যাজিস্ট্রেট মি. হাম্‌ফ্রি গ্রাম পরিদর্শনে গিয়ে এক দরিদ্র বিধবার দুগ্ধবতী গাভীকে হস্তগত করেন। হরিনাথ তাঁর গ্রামবার্তায় 'গরু চোর ম্যাজিস্ট্রেট' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেন। হাম্‌ফ্রি সাহেব হরিনাথকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেও পারেন নি। বরং পরবর্তীকালে তাঁর প্রশংসা করেছিলেন।

ঠাকুর-জমিদারদের অত্যাচারের প্রকাশে তাঁর ভূমিকার কথা মনে রেখে সাংবাদিক হিসেবে তাঁর সততা এবং নির্ভীকতাকে আমরা কিংবদন্তীর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের জমিদারী ছিল কুষ্টিয়ার বিরাহিমপুর পরগণায়, শিলাইদহে ছিল যার প্রধান কার্যালয়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকেই এঁদের প্রজাপীড়নের দুর্নাম ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলে বরং আরো বেড়েছিল। হরিনাথ তাঁর গ্রামবার্তায় এঁদের অত্যাচারের বিবরণ দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করতেন। প্রথম দিকে এঁরা হরিনাথকে অর্থের প্রলোভনে বশীভূত করার চেষ্টা করেন। তাতে অসমর্থ হওয়ায় গুণ্ডার সাহায্যে হরিনাথকে দমন করারও চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতেও তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন।[১৪] এই সমস্ত ঘটনার পর হরিনাথ এঁদের অনুরোধ করে লেখেন, "ভ্রাতৃভাবে বিনয় করিয়া বলিতেছি, অত্যাচার পরিত্যাগ করুন। তাঁহার নিরীহ ও দুর্বল সন্তানগুলি অত্যাচারিত না হয়, ঈশ্বর এই নিমিত্ত ভারত রাজ্য ব্রিটিশ সিংহের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। অত্যাচার করিয়া একদিন না হয় দু-দিন পার পাইবে, তিন দিনের দিন অবশ্যই তাহা রাজার কর্ণগোচর হইবে।"[১৫]

নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচার, ম্যাজিস্ট্রেটের অন্যায়, এ সমস্ত কিছুর প্রতিবাদের চেয়েও বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে অসামান্য প্রভাবশালী ঠাকুর পরিবারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য নির্ভীক সত্যভাষণ হরিনাথের ব্যক্তিত্বে যে অসামান্যতা আরোপ করেছে, তারই পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শক্তির ঔদার্য সম্পর্কে হরিনাথের অন্ধ বিশ্বাস ওপরের উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নবজাগরণ যুগের একজন সচেতন

মানুষ হিসেবে এখানেই তাঁর সীমাবদ্ধতা। তবে এই সীমাবদ্ধতা কিন্তু ব্যক্তি হরিনাথের দুর্বলতা নয়। উনিশ শতকের নবজাগরণ যুগের প্রায় কোনো বুদ্ধিজীবীই এর বাইরে যেতে পারেননি। ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখের মতো স্বদেশানুরাগী মহীরুহ ব্যক্তিরাও এই মানসিকতার প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। হেমচন্দ্র লিখেছিলেন, "ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব" আর বন্ধুর অনুরোধে হলেও নবীনচন্দ্র ভিন্ন প্রসঙ্গে একই ধরনের কবিতা 'ভারত-উচ্ছ্বাস' লিখে প্রতিযোগিতায় জিতে পুরস্কার পেলেন পঞ্চাশ গিনি। সমকালীন আরো অনেকের নামও এই প্রসঙ্গে করা যায়। হরিনাথের কণ্ঠেও আমরা শুনতে পাই রাজস্তোত্র—"ব্রিটিশের নিশান তুলি সবে মিলি, কর জয় মঙ্গলধ্বনি। / বলরে অনাথ মাতা পতিব্রতা, ভিক্টোরিয়া মহারাণী ; / ওরে যাঁর রাজ্যের মাঝে উদয় আছে, অস্তে না যায় দিনমণি।" এই অত্যাচারী স্থানীয় ইংরেজ শাসনের বিপরীতে ইংরেজের সুশাসন সম্পর্কে, তাদের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন আসল চেহারা সম্পর্কে একটা বোধ কীভাবে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল জানি না, তবে হরিনাথের ভাবনায় তার প্রতিফলন এখানে আমরা খুবই স্পষ্টভাবে দেখবো। এ ধারণা রবীন্দ্রনাথের মনেও কি কিছুটা প্রসারিত ছিল না? বড় ইংরেজ আর ছোট ইংরেজের বৈপরীত্যে আমরা তার পরিচয় পেয়েছি।

কিন্তু হরিনাথের চরিত্রের এই স্ববিরোধ তাঁর বহুধা-বিস্তৃত কর্মময় জীবনের গৌরবকে বিন্দুমাত্রও লঘু করে না। বরং আমরা বলতে পারি, তাঁর বুদ্ধি, মনন ও হৃদয়বৃত্তি শুধুমাত্র তাঁর রচনাবলীর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। নিজে সক্রিয়ভাবে সমস্ত কাজই তিনি হাতে-কলমে করে দেখিয়েছেন। একজন আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ সাংবাদিক, আবার জীবনের শেষ প্রান্তে আন্তরিকভাবে অধ্যাত্মরসপিপাসু এই মানুষটি দারিদ্র্যের আর অত্যাচারের দোহাই দিয়ে কোনো দিন জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেননি। গণমানসের পুঞ্জীভূত বেদনাকে তিনি নিজের করতে পেরেছিলেন বলেই তারাও তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং সাধারণের এই সহমর্মিতা শুধু সাংবাদিক হরিনাথের অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ থেকে তৈরি হয়নি, তাঁর যাত্রা পাঁচালী-ধর্মী নাটকগুলির রচনা ও প্রযোজনার মাধ্যমে, তাঁর বাউল ফিকিরচাঁদের সঙ্গীত রচনা এবং তার ব্যাপক অনুশীলন ও প্রচারে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে সরাসরি গিয়ে পেঁৗছেছেন। আমাদের এ-ও মনে রাখতে হবে কাঙ্গাল হরিনাথ সমাজের কোনো উচ্চ মঞ্চ থেকে এদের মাঝখানে নেমে আসেননি, তিনি সাধারণেরই একজন। তাই হয়তো তাঁর এই সার্বিক গণমুখী সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা এতখানি সফল হয়েছে। নিজের সামাজিক শ্রেণী-অবস্থানের সুবিধার জন্যই হয়তো শিক্ষক হিসেবে তিনি শুধু বালক-বালিকার শিক্ষার আয়োজনই করেননি, যারা শৈশব-কৈশোর অতিক্রম করে গেছে, যারা বিপথগামী হয়েছে—তাদেরও শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার সংকল্পকে কার্যকর

করার মধ্যেই আমরা দেখবো হরিনাথের সমাজ-সম্পর্কিত ধারণায় একটা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সামগ্রিক সঙ্কল্প। তাই নবজাগরণ যুগের এই বিশিষ্ট পুরুষ সম্পর্কে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি—তিনি সেকালের সমাজে নিজেই একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। নিজেতে নিজেই তিনি হারিয়ে যাননি, সুযোগ্য শিষ্য-পরম্পরায় তাঁর চিন্তা-চেতনার ধারা বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে বাহিত হয়েছে। মীর মশাররফ হোসেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ নিজেদের সৃষ্টিতে ও কর্মপ্রচেষ্টায় তাঁর আদর্শকেই বহু-বিস্তৃত করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র : নব্য বাঙ্গালীর সৌন্দর্য ও জীবনসন্ধান

মুখবন্ধ / শিল্পী ও ভাবুক

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আগেও নব্য বাঙ্গালীর জীবনে এবং মনে বড় এবং মাঝারি মাপের মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে অন্তত তিনজনের কথা আজও শিক্ষিত মানুষের অস্তিত্বে গভীর দাগ কেটে বসে আছে। সর্বসাধারণের কাছেও বিবিধ প্রসঙ্গে ওই নামগুলি প্রায়ই উচ্চারিত। রামমোহন বিদ্যাসাগর মধুসূদন। রামমোহন প্রাচীন শুদ্ধ জ্ঞান এবং সামাজিক-ব্যবহারিক কর্মকে মিলিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর ওই দ্বিতীয় কাজটি করতে করতে শিল্পসুষমার চৌহদ্দীতে ঢুকে গিয়েছিলেন। মধুসূদন কোনো ধর্ম প্রচার করেন নি, শিক্ষা ও সমাজসংস্কারে নেতৃত্ব দেন নি। তিনি সাহিত্যে, সৌন্দর্যে জাতিকে জাগ্রত করেছিলেন। রামমোহন বাঙ্গালীকে দিয়েছিলেন আইডেনটিটি এবং কর্মদীক্ষা। কর্মবীর বিদ্যাসাগর আমাদের ভাষা যোগালেন—গদ্যের শক্তি আর লাবণ্য। আর মধুসূদন দিলেন শব্দের স্বপ্নের নন্দনকানন। এবং বঙ্কিম তাঁর হাতে-গড়া কৃষ্ণের মতো জ্ঞান-কর্ম-সৌন্দর্যের তিন ভুবনের অধিকার দিতে চেয়েছিলেন।

গল্প লিখে পাঠককে আনন্দ দেওয়াই তাঁর কাছে প্রাথমিক কাজ বলে মনে হয়েছিল। জীবনের শেষ উপন্যাস পর্যন্ত এই দায় তিনি বহন করেছেন। সামাজিক দায়িত্ব, দার্শনিক মনন বারংবার তাঁকে রূপভ্রষ্ট করতে চেয়েছে। উপন্যাসের মতো জনপ্রিয় মাধ্যমটিকে ভাবনার মুখপত্র করে তুলতে প্ররোচিত করেছে। কোথাও কখনো কিছুটা টললেও শেষ পর্যন্ত ভোলেন নি যে তিনি একজন এনটারটেনর, কারণ তিনি শিল্পী।

কিন্তু প্রথম বই থেকেই এবং দ্বিতীয় উপন্যাস থেকে প্রবলভাবে উপভোগের সঙ্গে উপলব্ধির ও জিজ্ঞাসার নানা মাত্রা সংযোজিত হতে লাগল, যদিও একান্ত দুর্বল দু-একটি কাহিনী ছাড়া উপলব্ধি ও জিজ্ঞাসার জন্য উপভোগকে বর্জন করেন নি লেখক।

তিনটি উপন্যাস লেখার পরে বঙ্কিমচন্দ্র রূপরচনার পাশাপাশি সরাসরি তত্ত্ব ও সমাজচিন্তার একটি সম্পূরক জগত সৃষ্টি করে নিলেন। বের করলেন বঙ্গদর্শন এবং পরে প্রচার পত্রিকা। চিন্তাশীল লেখকদের সংঘ গড়ে উঠল তাঁকে ঘিরে। সমাজ-তত্ত্ব ইতিহাস রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি ধর্ম ও দর্শন—নানা বিষয়ের প্রবন্ধ লিখে, অন্যকে দিয়ে লিখিয়ে বাঙ্গালীর চিন্তা চেতনার নায়কত্ব গ্রহণে অগ্রসর হলেন বঙ্কিম। পরবর্তী

বিশ বৎসর তিনি পাশাপাশি নভেল আর প্রবন্ধ সমানে লিখেছেন। দুই দিকেই ক্রমিক এবং সমান্তরাল পরিবর্তন ঘটেছে। প্রবন্ধের উৎসে যে চিন্তা, তার প্রভাব উপন্যাসে সক্রিয় হতে চেয়েছে। যুক্তিমুখ্য চিন্তায় এবং উপলব্ধি-গাঢ় রূপসম্ভোগে দ্বন্দ্ব চলেছে। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে নিজ ক্ষেত্রে উপন্যাসের জয় অব্যাহত থেকেছে। অন্য দিকে ঔপন্যাসিকের রূপসাধনা তাঁর চিন্তাকে ভাষার রম্যতায় বেঁধেছে। প্রবন্ধ ব্যাপারটা বঙ্কিমের হাতেই প্রবন্ধ সাহিত্য হয়ে উঠেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু উপন্যাস লিখলে বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে বেঁচে থাকতেন। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী জাতির মানস জাগরণ এবং বিকাশে মধুসূদনের মতো তাঁর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক। যত বিচিত্র উপাদানে নব্য বাঙ্গালী গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে ভাষাশিল্পের কার্যকারিতা সবচেয়ে বলবান এবং স্থায়ী—এটা এই জাতির একটা বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত আরো হাজার বছর আগে থেকে রূপমোহ তথা ইন্দ্রিয়ালুতায় এর বীজ বোনা হচ্ছিল।

বঙ্কিম যদি শুধু প্রবন্ধ লিখতেন, তো বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক হিসেবে সম্মান পেতেন। বিভিন্ন বিষয়ে লেখা সেইসব প্রবন্ধ সমকালীন বাঙ্গালীর চিন্তাকে একটা জাতীয় চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ করবার বিশেষ অভিপ্রায়ে নিয়োজিত হয়েছিল। এর ফলে প্রবন্ধকার উন্নীত হয়েছিলেন মনীষীর পদবীতে।

ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে তিনি প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। তারপরে দু ধরনের লেখাই লিখে চলেন। সম্ভবত ইন্দ্রিয়ালু রূপমুগ্ধ ও আবেগ-প্রবণ জাতির সত্তাকে বিকশিত করতে করতে তাকে এক দ্বিতীয় পরিচয়ের যুক্তিপ্রবুদ্ধ দৃঢ়তায় দাঁড় করাবার সাধনা করেছিলেন বঙ্কিম।

২. উপন্যাসকার বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র বারোটি পুরো উপন্যাস এবং কয়েকটি ছোট আকারের গল্প লিখেছিলেন। তাঁর উপন্যাসগুলি আজও আদ্যন্ত সুখপাঠ্য। পাঠককে আনন্দ দেবার প্রশ্নে কোনো কালে তাঁর মনে সংশয় দেখা দেয় নি। গল্পকে সাজানো ছোটানো বাঁকানো ওঠানো-নামানো-থামানো এইসব কিছুই করা হয়েছে: (১) সংশ্লিষ্ট মানুষগুলির ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য এবং পারস্পরিক সম্পর্কের সরল-জটিল সূত্রগুলির টানে, আর (২) পাঠকের মনে উত্তেজনা প্রশান্তি হতাশা প্রত্যাশার রস সম্ভোগের জন্য।

তাঁর উপন্যাসে তিনি যে মানবজগত তৈরি করেছেন, তার প্রেম-ঘৃণা-অবহেলা, ঈর্ষা-জিগীষা, প্রবল তৃষ্ণা, মর্মভেদী অপ্রাপ্তি সমকালের এবং সর্বকালের। অনেক সময়েই আমরা প্রাচীনদের আলোচনায় বসে বর্তমান সময়ে তার কার্য ও রচনাকে কতটা গ্রহণ করা, ব্যবহার করা সম্ভব সেই বিচারে প্রবৃত্ত হই। ক্লাসিক-চর্চায় বসে এখনকার প্রয়োজন-প্রাসঙ্গিকতায় তাকে কেটে-ছেঁটে নেবার প্রবণতা স্বাস্থ্যকর নয়। সাম্প্রতিক

সমস্যাগুলি মেটাবার মতো নগদ পাওনার লোভে টেনেবুনে ব্যাখ্যা করাটা এক ধরনের বিকৃতি, যাতে আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক অভিপ্রায়গুলি সমর্থন পায়। আসলে এইসব লেখা যুগকে ডিঙিয়ে অমলিন আনন্দের স্রোতটি অন্তরে প্রবাহিত রাখে এবং তার মধ্য দিয়ে গূঢ়াহিত কিছু মানবিক জিজ্ঞাসায়, অস্তিত্বের রহস্যে, নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে বিপন্ন বিস্ময়ে পাঠকের বোধবুদ্ধিকে বিমূঢ় এবং প্রসারিত করে—একই সঙ্গে অন্তর্মুখী স্তব্ধতা আনে এবং অনন্তস্পর্শী চিত্তবিস্ফার ঘটায়।

ও'র বারোটি উপন্যাসের মধ্যে তিনটি অস্খলিত রূপনৈপুণ্যে, গভীর-জটিল জীবনবোধে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের সমকক্ষ। কপালকুণ্ডলা বিষবৃক্ষ সীতারাম। শিল্পঘটিত কিছু সমস্যার জন্য কৃষ্ণকান্তের উইলকে এই পর্যায়ে রাখা গেল না। দুর্গেশনন্দিনীতে শিক্ষানবিসীর কিছু ছাপ। চন্দ্রশেখর আনন্দমঠ রাজসিংহ বিবিধ স্খলনের ফলে চূড়ান্ত সিদ্ধিতে পৌঁছয় নি। মাঝারি ভালো, কিন্তু বিশিষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাস হিসেবে তাদের স্থান নির্দিষ্ট রইল। ইন্দিরা এক পৃথক লঘু ভূখণ্ডে নিজ গৌরবে উজ্জ্বল। এবং ব্যর্থতা সত্ত্বেও মৃণালিনীতে পাপী পশুপতির চরিত্রদ্যুতি, রজনীতে অমরনাথের ব্যক্তিত্ব, তথা লবঙ্গলতার বিকৃত চিত্তের সম্ভাব্যতায় বড় হাতের ছাপ। দেবী চৌধুরাণী বঙ্কিমের দুর্বলতম রচনা, তত্ত্বের দ্বারা সবচেয়ে বেশি আহত, যদিও যে কোনো চতুর পাঠক এর তত্ত্বটুকুর খোলস ছাড়িয়ে সহজ প্রণয়-গল্পের রস বের করে নেবে।

২.১. কল্পনার ইতিহাস এবং হৃদয়ের মুক্তি

বঙ্কিমচন্দ্র অতীত ইতিহাসে পেছিয়ে গিয়ে গল্প লিখতে ভালবাসতেন। তাঁর বারোটির মধ্যে আটটি উপন্যাস ইতিহাসাশ্রয়ী। অবশ্য ইতিহাসের তুলনায় সর্বত্র কল্পনার প্রশ্রয়। ইতিহাসের নামজাদা মানুষেরাও ওঁর কল্পনার যোগে রূপান্তরিত, অন্য ব্যক্তিত্বে ঘটেছে তাদের নবজন্ম। খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ থেকে তিনি কী পরিমাণ ভ্রষ্ট, কেন রোমান্স নামেই এদের ঠিক পরিচয়—এ রকম ছাত্রভুলনো সমস্যায় আমাদের ব্যস্ত না হলেও চলবে। আমাদের আসল চিন্তার বিষয় বঙ্কিমসেবিত এই কল্পনাপ্রশ্রয়ী ইতিহাসের স্বরূপ কী এবং লেখকের কোনো বিশেষ অভিপ্রায় তারা সিদ্ধ করেছে কি না।

অতীতকে পুনর্নির্মাণ করার জন্য খুব একটা পরিশ্রম তিনি করেননি। মোগল-পাঠান যুগ, পতনোন্মুখ লক্ষ্মণ সেনের হিন্দু রাজত্ব, কোম্পানির আমল—এদের বিশিষ্ট করে তোলবার মতো ডিটেলের কাজ, তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ বিশেষ চোখে পড়ে না। তুলির মোটা আঁচড়ে প্রয়োজনমতো কখনো রাজকীয় ঐশ্বর্য শক্তি উচ্ছৃঙ্খলতা দুর্নীতির একটা সাধারণ বাতাবরণ তৈরি করেছেন, কিংবা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অথবা দ্বৈত শাসনের বিপর্যস্ত অপদার্থতা, রাজপুতদের নব-উত্থানের বলদৃপ্ত ভঙ্গি, কখনো বা সন্ন্যাসীদের

দলবদ্ধ বিদ্রোহ বিশেষ বিশেষ বর্ণসম্পাত করেছে মাত্র। এর বেশি তিনি চানও নি। তিনি ওদেশের স্কট কিংবা এদেশের রমেশচন্দ্র দত্তের মন নিয়ে উপন্যাস লিখতে বসেন নি। অতীত ইতিহাস তাঁর কাছে বৃহৎ কার্য, বিপুল ঐশ্বর্য, প্রভূত শক্তি, ক্ষমাহীন দুর্বলতা, আকাশছোঁয়া কামনা, অতলস্পর্শী পাপের স্বাভাবিক ভূমি। আর সমকালীন বাঙ্গালী সমাজে ভিড় জমিয়েছিল ইংরেজি সেরেস্তার কর্মচারী—হৌসের বাবু, স্কুল-শিক্ষক, ডেপুটি কালেক্টর, রায় সাহেবীর উমেদার, অপদার্থ বিলাসী বেশ্যাসেবী ভূস্বামী ও তার মোসাহেবের দল, বিভিন্ন বৃত্তির উপস্বত্বভোগী। এই সমাজের শ্রেষ্ঠ শক্তিমানেরা নিমকমহলের দেওয়ানগিরি অথবা সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতি বা পুস্তক ব্যবসার বেশি এগোতে পারেন নি। বিধবা বিবাহ, সতীদাহ-রদ প্রভৃতি আন্দোলন যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, তা রাজ্য ভাঙ্গাগড়া, অর্থনীতি-নিয়ন্ত্রণ, দেশ-বিদেশের সঙ্গে মিত্রভেদ-মিত্রলাভের মন্ত্রণা, জাহাজ ভাসিয়ে সামুদ্রিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনাপত্যের সমতুল্য কিছু নয়। অথচ ইংরেজি শিক্ষা ও পশ্চিমের সাহিত্য বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়কে স্বাধীনচিত্ততা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল, আশা-কামনাকে যতটা অভ্রভেদী করে তুলেছিল, কোনো বন্ধন না-মানা ভাবাবেগ, সব রীতিলঙ্ঘী হৃদয়বৃত্তিকে যে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছিল, তার যথার্থ ভিত্তি ছিল না পরাধীন দেশের জীবনে। সেই ভিত্তি ও আধারের খোঁজেই বঙ্কিমের ইতিহাস পরিক্রমা। অতীতাশ্রয়ী কাহিনীগুলিতেও বঙ্কিমের মুখ পেছন দিকে নয়, একান্তভাবেই বর্তমানে।

২২. রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে

বঙ্কিমের উপন্যাসের নীতিঘটিত সমস্যা নিয়ে সেকালে-একালে আমরা একটু বেশি ভেবেছি। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে রক্ষণশীল বলে নিন্দাও করেছি। কারণ :

১. বালবিধবার প্রণয় বা বিয়েকে তিনি পাপ মনে করেছেন। তাদের কেউ অপঘাতে মরেছে, কেউ বা উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। যেমন, কুন্দ, হীরা, রোহিণী।

২. পরপুরুষে আসক্ত অসতী নারীদের তিনি নরকবাসের দণ্ড দিয়েছেন। নিদর্শন, শৈবলিনী।

৩. সাধ্বী বিবাহিতা রমণীদের প্রতি বঙ্কিমের অতি শ্রদ্ধা। সামাজিক প্রথাকে সযত্নে রক্ষা করে যে সতী তার মহিমায় লেখক মুগ্ধ। যেমন, সূর্যমুখী, ভ্রমর, লবঙ্গ।

এর মধ্য দিয়ে নারীজাতির প্রতি যে মনোভাব প্রকাশ পায়, তা দণ্ডধারী সমাজ-শাসকের। নবযুগ-সুলভ সামাজিক বিপ্লব, এমনকি ধীর লয়ের অগ্রগতিও নয়, ইনি চাইতেন চিরাচরিত পারিবারিক স্থিতি অটুট থাকুক। এ কারণেই প্রগতিপন্থীদের অভিযোগ।

উল্লিখিত প্রসঙ্গগুলির কোনোটি গ্রহণযোগ্য মনে করি না। এগুলির মূলে স্থূল পর্যবেক্ষণ আর উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্যের উদ্দেশ্য বিষয়ে ভ্রান্ত তত্ত্ববোধ।

বঙ্কিম দেবেন্দ্র-নগেন্দ্র-গোবিন্দলালদের ভেতরে বাইরে কম শাস্তি দেননি। অন্য পক্ষে প্রতাপকে স্বর্গধামের প্রবেশপত্র দিয়েছেন। অর্থাৎ নৈতিকতার প্রশ্নে তিনি পুরুষ-নারীর ভেদ রাখেননি। প্রেমে বিয়েতে পুরুষকে নৈতিক বিচারের ঊর্ধ্বে রাখার মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণাকে একেবারে উৎসাদিত করে বঙ্কিম আধুনিক পুরুষের জন্ম ঘটালেন।

কিন্তু উপন্যাসের নৈতিকতার বিচার আরো গভীর ও স্বতন্ত্র একটি দৃষ্টিকোণ থেকে করণীয়। ভাল উপন্যাসে কোনো মানুষই শ্রেণী বিশেষের প্রতিনিধি নয়। কুন্দ, রোহিণী, হীরা তিনজনে বিধবা কিংবা সূর্যমুখী, ভ্রমর, লবঙ্গ তিনজনে সতীসাধ্বী গৃহবধূ—এই পরিচয়ে তাদের চরিত্রের বাইরেটাই মাত্র ছোঁয়া যায়, ভেতরটা অনেক গোলমেলে। একে অন্যের থেকে এত পৃথক, প্রত্যেকে মূল ধাতুতে অনন্য, বিবর্তনে স্বতন্ত্র, সকলের পরিবেশ ও সংশ্লিষ্ট মানুষজনের এত নিজস্বতা, যাতে গোষ্ঠীগত সাধারণ ধর্মগুলি আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। গল্পে উপন্যাসে কোনো পাত্রপাত্রীর দোষগুণ তার নিজের, তার শ্রেণীর নয়। লেখক যদি রোহিণীকে কলঙ্কিনী রূপে চিত্রিত করেন, তাকে সমগ্র বিধবা নারীসমাজের প্রণয়াসক্তির প্রতি লেখকের তীব্র ভৎর্সনা বলে গ্রহণ করার কারণ দেখি না।

আরো ভেতর দিকে তাকালে বোঝা যাবে, 'পাত্রপাত্রীর দোষগুণ' কথাটাও কিছু কাজের নয়। কোনটা দোষ কোনটা গুণ তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। দোষ বা গুণ সামাজিক ধর্ম, ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য নয়। একের পক্ষে যা দোষ, অন্যের পক্ষে তা গুণ। এক পরিবেশে যা গুণ অন্য অবস্থায় তা দোষ। বঙ্কিম পুরুষ নারী নির্বিশেষে মানুষের ভেতরের রহস্যের সন্ধান করেছেন। মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন, তাকে ভেদ করার চেষ্টা করেছেন শিল্পীর নিষ্ঠায়, নৈতিকতার রায়ে তিনি কাউকে বাতিল করেননি। সৃষ্ট নরনারীর প্রতি তাঁর সমান নিস্পৃহতা। ঈশ্বর নেই বলে—থাকলে এই মানববিশ্বের প্রতি তাঁরও ওই রকম নিস্পৃহতাই থাকত। তবুও কাউকে পাপিষ্ঠা, কাউকে পুণ্যাত্মা বলেছেন, ওটা সামাজিক বিশ্বাসের প্রথাবদ্ধ ভাষা। পাঠকের পরিচিত ও প্রিয় বিশেষণ। ওখান থেকে শুরু করে লেখক আমাদের যেখানে নিয়ে ফেলেন সেখানে ওই শব্দগুলি অর্থহারা, ভিন্ন মানবিক তাৎপর্য প্রকাশ করে। পরিচিত অভ্যস্ত পথ ধরে এগিয়ে তবেই দিগন্ত সমুদ্র আকাশ দেখতে হয়। কখনো আপাত রক্ষণশীলতার পোশাক থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র মানবসত্যের খোঁজে রক্ষণশীলতা-বা বিপ্লবিয়ানার সব ধ্যানধারণাকে অস্বীকার করেছিলেন।

২৩. হিন্দু-মুসলমান-ইংরেজ / স্বাধীনতা-পরাধীনতা

বঙ্কিমের তৃতীয় উপন্যাস মৃণালিনী থেকে বেশ কয়েকটি কাহিনী জাতীয় ভাবের উদ্দীপক হিসেবে কাজ করেছে। কাজটি উপন্যাসের দিক থেকে অতিরিক্ত, কিন্তু নবোত্থিত বাঙ্গালীর মন তৈরি করে তুলতে ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছিল। এখানেও

বঙ্কিমের ভাগ্যে আধুনিকদের তরফ থেকে অপ্রশংসাই জুটেছে।

১. তিনি মুসলমান মোগল রাজশক্তিকে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি এবং হিন্দু রাজপুতদের স্বাধীনতার সংগ্রামী রক্ষক হিসেবে এঁকেছেন রাজসিংহতে। মৃণালিনী-সীতারামে হিন্দুরা মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষা করছে। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা মুসলমানদের পর্যুদস্ত করাকে আদর্শ বলে মনে করেছে।

২. ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহৃত। দেবী চৌধুরাণীতে, এমন কি আনন্দমঠেও। ইংরেজ রাজত্ব স্থায়ী হবে এরূপ ভবিষ্যৎবাণীও আছে।

মোট কথা, বঙ্কিম-প্রচারিত জাতীয়তাবাদ হিন্দুত্বের সীমায় সঙ্কীর্ণ, মুসলমান-বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসনে সমর্থিত প্রাণ।

কথাগুলি সত্য বলে মনে হলেও আসলে এদের গোড়ায় গলদ।

যে বইয়ে দিল্লীর বাদশাহ মেবার কুক্ষিগত করতে চাইছেন, যেখানে তুর্ক সৈন্যেরা চক্রী সেনাপতির সাহায্যে লক্ষ্মণ সেনকে বিতাড়িত করছে, সেসব ক্ষেত্রে মুসলমানেরা আক্রমণকারী এবং হিন্দুর প্রতিরোধ স্বদেশ রক্ষার চেষ্টা বলে গণ্য হবেই। আধুনিক অর্থে সেকালে দেশাত্মবোধ ছিল না। কিন্তু সেই পুরনো রাজ্য দখলের যুদ্ধকে একালের দৃষ্টিতে অর্থপূর্ণ করতে গেলে, এভাবেই জাতীয়তাবাদের একটি মাত্রা আরোপ করতে হয়। আধুনিক কালেও যে কোনো যুক্তি-প্রবুদ্ধ রাজনৈতিক চেতনার মানুষ আক্রমণ-কারীর দিকে তর্জনী তুলবেই। আবার হিন্দু প্রতাপ মুসলমান নবাব মীরকাশিমের হয়ে ইংরেজ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাশিমের পূর্ব ইতিহাস টেনে এনে তাঁকে তো লাঞ্ছিত করেন নি। স্বদেশ হিতৈষীরূপে উজ্জ্বল বর্ণেই এঁকেছেন।

সীতারামে-রাজসিংহে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু পক্ষপাত আছে। আনন্দমঠে ইংরেজরাই মূল শত্রুরূপে চিহ্নিত, আক্রান্ত, ও পর্যুদস্ত হলেও অকারণে যবন বিনাশের আওয়াজ উঠেছে, মুসলমান পল্লীতে দাঙ্গাবাজি হয়েছে। এগুলির মূল খোঁজার চেষ্টা এই প্রবন্ধেই পরের দিকে করেছি। তবে লেখকের হিন্দুয়ানি যেখানে গল্প ও চরিত্রের স্বাভাবিকতাকে স্তব্ধ করে প্রকট—সেখানেই শিল্পচ্যুতি, অন্যথা উপন্যাসের পাঠক হিসেবে স্পর্শকাতর হলে চলে না।

সীতারামে এক পীড়ন-ক্লিষ্ট মৌলবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে আপন শক্তিতে নায়ক নবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আদর্শ রাজ্য গড়ার সেই সম্ভাবনাকে উদার হৃদয় মুসলমান ফকিরও সমর্থন জানিয়েছে। লেখক কিন্তু পাপ ও অনাচারে সেই রাজা ও রাজ্যকে মজ্জিত করে কাহিনী শেষ করেছেন। হিন্দু রাজ্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠার অতি উৎসাহের এই পরিণতি কি ঔপন্যাসিকের হিন্দুয়ানির সঙ্গে সুসঙ্গত?

বঙ্কিমের ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসে বড় ছোট যে সব মুসলমান নারীপুরুষ আছে, তাদের উজ্জ্বল ও জটিল ব্যক্তিত্ব নির্মাণে লেখক কার্পণ্য করেছেন, এরূপ অভিযোগ

টি'কবে না। মতিবিবি, মেহের, উদিপুরী, জেবুন্নিসা, দরিয়া, মবারক, ঔরংজীব, মীরকাশিম, দলনী, তকি, কতলু, ওসমান, আয়েষা পাপপুণ্য নিয়ে বঙ্কিম-উপন্যাসে সৃষ্টির শীর্ষ পর্যায়ে আসীন। মুসলমান বলে এ'রা লেখকের অবহেলার পাত্র নয়।

গল্পের মধ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনকে দেখাবার বাস্তব অসুবিধা ছিল, সে ধারার জাতীয় জাগরণ তখনো ঘটে নি। সর্বোপরি ইংরেজ শাসনের স্বরূপ সম্বন্ধে বুদ্ধিজীবীদের দ্বিধার শেষ ছিল না। সেই সময়ে তিনি চন্দ্রশেখরে ইংরেজ-যুদ্ধে মীরকাশিম-প্রতাপের গৌরবের ছবি এ'কেছেন, দেবী চৌধুরাণীতে স্বদেশী ডাকাতদের দ্বারা বিধ্বস্ত ইংরেজ সৈন্যের বিবরণে বিজয়োল্লাস প্রকাশ করেছেন। আর আনন্দমঠ তো সফল সশস্ত্র বিপ্লবের একটি ব্লুপ্রিন্ট হয়ে উঠেছে। ইংরেজের রক্তে জননী জন্মভূমির অভিষেকই সন্তানদের চূড়ান্ত অভিপ্রায় রূপে ঘোষিত হয়েছে। বঙ্কিমের দ্বিধা ছিল আর সমকালে তা থাকারই কথা। কিন্তু উল্লিখিত তিনটি উপন্যাস নব্য বাঙ্গালীর ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতাচেতনাকে পুষ্ট করতে খুব বড় ভূমিকা নিয়েছিল।

২.৪. অনন্তের মুখে মানুষ

অনাধুনিক মানুষ সঙ্কীর্ণ সীমায় বদ্ধ ছিল। অনন্ত আকাশ এবং দিগন্তজোড়া সমুদ্র ছিল দেবদেবী এবং অতিলৌকিক শক্তির আবাস। নতুন যুগের মানুষ মনের দিক থেকে বিশ্বের অধিবাসী, আরো বেশি সৃষ্টির রহস্য-ভেদী কসমিক চেতনার অভিমুখী। বাংলা কাব্যে-উপন্যাসে মানুষকে সেই বিমূঢ় অনন্তবোধের মুখে দাঁড় করিয়েছিলেন মধুসূদন এবং বঙ্কিম। রাবণের জিজ্ঞাসা, 'কেন' বিধি তার প্রতি বাম—এই প্রশ্নের কোনো উত্তর মেলে নি ঘটনাধারার কার্যকারণ সূত্রে, যুক্তিতে বা বুদ্ধিতে—নিজ কর্মফলে কিংবা পাপপুণ্যের প্রথামাফিক হিসেবে। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের কেন্দ্রটিও একটি আকাশস্পর্শী প্রশ্নের আকারে মানুষের কামনা-বাসনা সুখ-শোক প্রত্যাশা-প্রাপ্তি সব কিছুকে অর্থহীন ধূলি মুষ্টিতে পরিণত করে অনন্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়। আবার একেবারে পৃথক ধরনের হলেও সীতারামকে মহিমার শিখর থেকে পতনে বিধ্বস্ত দেখে পাঠকের ভয় ও বিস্ময় চরিত্রের গভীর অন্তর্লোকে যে অন্ধকারে পথ হারায়, তা-ও সীমাহীন। মানুষ এবং তার নিয়তির অসম অথচ অনিবার্য এই সংগ্রাম, যা নাকি আধুনিক মানুষের এক চরম প্রত্যয়, সেখানে বাংলা উপন্যাসের পাঠককে বারবার পে'ীছে দেবার কৃতিত্বে অমর বঙ্কিম!

৩. প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র নানা বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। একটা বিশেষ অভিপ্রায় নিয়ে লিখেছেন, শুধু জ্ঞানচর্চার আনন্দে নয়। নতুন জেগেছে যে বাঙ্গালী জাতি, সে বুদ্ধিতে এবং যুক্তিতে দীক্ষা নিক। তার জন্য যে সৌন্দর্যস্নানের আয়োজন মধুসূদনের মতো

কবিরা করেছেন এবং স্বয়ং নিজে প্রতিক্ষণ করে চলেছেন নতুন নতুন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে, তাতে যেন নৈষ্কর্ম্য ও রসোন্মত্ততা তাকে গ্রাস না করে। যুক্তির বন্ধনে তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তকে সুনির্দিষ্ট করে তুলে তিনি সে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশেষত বাঙ্গালীর জাতীয়তাবাদী চৈতন্য এবং সুস্থ ও পরিণতবুদ্ধি মানুষ হিসেবে তার সামাজিক দায়িত্ববোধ বিকশিত করা আপনার কর্তব্য বলে তিনি মনে করেছিলেন।

বঙ্কিমের মৃত্যুর পরে একশ বছর পেরিয়ে গেছে। তাঁর অনেক চিন্তা এখন অপ্রাসঙ্গিক এবং বহু সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য। প্রচুর নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণের জন্ম হয়েছে। আর পরিণতবয়স্ক পাঠক তো ঐকমত্যের জন্য অন্যের প্রবন্ধ পড়েন না, সমকালের লেখার সঙ্গেও তাঁর মতান্তর। তবুও বড় ভাবনা, মনীষীর জ্ঞানানুশীলনের সংস্পর্শ আমাদের চিন্তাকে শাণিত করে, প্রবুদ্ধ করে। বড় প্রাবন্ধিকের অমরত্ব সেখানে।

তাছাড়া বঙ্কিমের প্রবন্ধ ভাষার লাবণ্যে, কৌতুকের স্পর্শে চিন্তাকেও স্বাদু করে তুলেছিল। যুগান্তরেও সে স্বাদের অনেকটা অম্লান আছে।

৩১. সমালোচনা / উপভোগে চিন্তার বন্ধন

বঙ্কিমের আগে বিক্ষিপ্ত কিছু লেখালেখি হলেও তিনিই প্রবন্ধের এই বিশেষ শাখাটিকে বাংলায় একটি ভদ্রস্থ মানে উন্নীত করেন। যিনি মুখ্যত পাঠকের উপভোগের যোগানদার, তিনি উপভোগের বিজ্ঞান রচনায় ব্রতী হলেন। উচ্চাঙ্গের শিল্প-সম্ভোগ একটা মাঠো প্রমোদ নয়, তার জন্য চাই ন্যূনতম অনুশীলন, দেখবার চোখ—শোনবার কান। সেই চোখ কানের অনুশীলনের দায়িত্ব নিয়েছিল এই সমালোচনাগুলি। তৈরি পাঠক ছিল না বলেই নিজের লেখাগুলির জন্যেও তাঁকে পাঠক তৈরি করে নিতে হয়েছে। তাছাড়াও, বাঙ্গালীর মনের বিকাশে সাহিত্যাশ্রয়ী হৃদয়বত্তার গুরুত্ব এত বেশি বলেই, তিনি সাহিত্যাস্বাদকে একটি জ্ঞানশৃঙ্খলার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু 'জ্ঞানশৃঙ্খলা' কথাটিতে কিছুটা ফাঁক থেকে গেল। অন্য বিষয়ের প্রবন্ধের সঙ্গে সমালোচনার পার্থক্য আছে। অন্যত্র যুক্তি ইত্যাদি জ্ঞানের অভিমুখী, এখানে যুক্তিজ্ঞান গিয়ে পৌঁছবে উপভোগে। সমালোচনাকে বলা ভাল 'জ্ঞান-উপভোগমূলক শৃঙ্খলা'। কোথাও তিনি উপভোগের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হন নি, আবার যুক্তিহীন ভাবালু সিদ্ধান্তকে প্রশ্রয় দেন নি।

৩২. ইতিহাস / নৃতত্ত্ব থেকে সমাজতন্ত্র

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর নৃতাত্ত্বিক অতীত পরিচয় খুঁজেছেন 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে। বর্তমান 'বঙ্গদেশের কৃষক'-দের নিয়ে ছোটখাট বই লিখে ফেলেছেন। আধুনিক বাঙ্গালীর সঙ্গে এদের সম্পর্ক কতটুকু—সেই নৃতাত্ত্বিক উৎসের চিহ্ন কোথায়

নব্য ইংরেজি শিক্ষিতের মধ্যে, অথবা এদের সঙ্গে জানাচেনা কতটুকু হাসিম শেখ রামা কৈবর্তের। চাকরিজীবী এই মধ্যবিত্তেরা জমিজমা কিনে ছোটখাট জমিদার হবার স্বপ্ন দেখত। আর নিজেদের বংশ ও বর্ণকৌলিন্যের গর্বে অন্ধ থাকত। বঙ্কিমের নৃতাত্ত্বিক বিচার সেই গর্বকে উপহাস করল। ভূমি সমস্যার ব্যাখ্যান করে বঙ্কিম তাদের উদারচিন্তা ও জমিদারদের শোষণ-পীড়নের বৈপরীত্য দেখিয়ে ভূস্বামী হবার স্বপ্নকে বিদ্রূপ করলেন। প্রকৃত দেশ যে অনশনক্লিষ্ট কৃষকদের আশ্রয় করে অবস্থিত, এই সত্য তুলে ধরে তাদের স্বদেশহিতৈষণার আওয়াজ যে কতটা ফাঁকা তা প্রমাণ করলেন।

এই সময়ে বেরলো সাম্য। বেন্থাম-মিল অনুসৃত এই সমাজতন্ত্রকে যতই পরবর্তীরা 'ইউটোপিয়া' বলে মনে করুন, ইংরেজি-জানা বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীর আভিজাত্য-গর্বিত উচ্চমন্যতার ভিত ধসিয়ে দেবার মতো বই। এত ভীষণ দর্পণ বঙ্কিম ছাড়া আর কে ধরতে পেরেছিলেন ঊনবিংশ শতকের আত্মস্ফীত সম্প্রদায়ের সামনে?

বঙ্কিমচন্দ্র সাম্য বইটির প্রচার বন্ধ করেছিলেন ভেতরের বাইরের কোন চাপে, তা নিয়ে আলোচনা হতেই পারে। কিন্তু বইটা তিনি ছেপে প্রচার করেছিলেন এ সত্য তো মুছে ফেলা যাবে না। যা আলোড়ন ঘটবার ঘটেছিল। লেখক হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়ায় লোকের তো আগ্রহ বাড়বারই কথা।

রাজনীতি এবং ইতিহাস বিষয়ের প্রবন্ধে ইংরেজশাসন নিয়ে লেখকের যে দ্বৈত মনোভাব তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সে যুগে সেরকমই হবার কথা। কিন্তু লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার হল বারংবারই বাঙ্গালী জাতীয়তার কথা লেখক বলেছেন, ভারতীয়ত্ব গৌণভাবে দু-একবারই মাত্র উল্লিখিত। হিন্দুত্বে আস্থা দৃঢ় হলেও, ভারতীয়ত্বের তুলনায় বাঙ্গালীত্বকে অধিক গুরুত্ব দেবার মধ্যে লেখকের জাতিসত্তা বিষয়ক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় মেলে।

সর্বশেষে বঙ্কিমের হিন্দু পুনরুত্থানবাদী মতবাদ নিয়ে কয়েকটি কথা বলা দরকার। উপন্যাস থেকে শুরু করে রাজনীতি ও ইতিহাস চিন্তা পর্যন্ত নানা স্থানে তার প্রতিফলন এবং মুসলমান-বিরোধী বলে বঙ্কিমের নিন্দা অনেক। উপন্যাস বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এ সম্পর্কে কিছু বলেছি। সাধারণভাবে আরও একটু ভেবে দেখা প্রয়োজন।

যদিও বঙ্কিমে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী ভাবনার বীজ ছিল, কিন্তু এই ভাবান্দোলনের সব ধারাগুলি সমানভাবে পশ্চাৎমুখী ছিল না। জাতীয়তাবাদী চেতনার শিকড় খুঁজতে গিয়েই তিনি হিন্দুত্বে পৌঁছেছিলেন। এদেশের ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ধারাটি খুবই জটিল। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শও যথেষ্ট অস্পষ্ট। প্রকৃত প্রস্তাবে ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণ হিন্দু উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তের। মুসলমানেরা নানা কারণে

সেই চিন্তা-চেতনার জগৎ থেকে স্বতন্ত্র থেকেছেন। এর জন্য দায়ী ইতিহাস, ব্যক্তি-বিশেষ নয়। যাঁরাই আত্মপরিচয়ের মূল খুঁজেছেন, হিন্দুত্ব ব্যাপারটিকে বাদ দিতে পারেননি। যাঁরা সাহেবিয়ানায় আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা আচারে-আচরণে বিশ্বাসে হিন্দুত্বের ধার ধারেননি, জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে তাঁরা দূরেই থেকেছেন। পরবর্তী কালে মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা নবচেতনাকে আহ্বান জানালেন, তাঁরাও কিন্তু ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের ভাব ও কর্মধারাকে যুক্ত করেই সমাজকে জাগাতে চেয়েছেন। সমস্যা হয়েছে নবযুগে মুসলমানদের অতিবিলম্বিত প্রবেশ এবং মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অতি ধীর বিকাশের ফলে। হিন্দু ও মুসলমান-বাঙ্গালীর সংস্কৃতি পরস্পরের সম্পূরক হয়ে উঠতে পারত, কিন্তু প্রতিস্পর্ধী হয়ে বাড়তে লাগল। রাজনৈতিক স্বার্থের ভূমিকাও এর পেছনে সক্রিয় ছিল। সে যাই হোক, বঙ্কিমের হিন্দুত্ব এবং আধুনিক মৌলবাদকে যাঁরা এক করে দেখতে চান, তাঁরা যুক্তি এবং ইতিহাস — এর কোনোটারই ধার ধারেন না।

৩.৩. দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব / অপৌরুষেয় তত্ত্ব থেকে জাতীয় নেতৃত্ব

বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র ৫৬ বৎসর বেঁচেছিলেন। শেষ দিকটায় ধর্ম ও দর্শন নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করেছেন। যদিও একটু বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে তাঁর অনুশীলনতত্ত্ব, গীতার ব্যাখ্যা, সাংখ্যদর্শন-ভাবনা এবং কৃষ্ণচরিত্র রচনা কোনোটিই মেটাফিজিক্স নয়, বরং সোশ্যলজি।

প্রথমত হিন্দু ধর্মসংস্কৃতির পুনর্বিচার এবং নবরূপে তাকে ব্যবহারিক জীবনে প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয়ত জাতীয় স্বাধীনতা এবং উন্নয়নের বাসনা, তৃতীয়ত অভীষ্ট পূরণের কোনো বাস্তব পথ না থাকায়—দেবীচৌধুরাণী-সীতারাম-আনন্দমঠে সেই পথ খোঁজার ভিন্ন ভিন্ন কাল্পনিক প্রয়াস ব্যর্থ হবার ফলে, লেখক একদিকে ব্যক্তিগত অনুশীলনতত্ত্বে প্রতিটি সচেতন মানুষের আত্মোন্নয়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরসদৃশ (সীতারাম, প্রফুল্ল, সত্যানন্দ মানুষ ছিল) কোনো নেতার স্বপ্ন দেখেছেন, যাঁর বিবদমান সব বৃত্তিগুলির চরম বিকাশ এবং পরিপূর্ণ মিলন ঘটেছে।

স্বপ্নসম্ভব এই জাতীয় নেতা তৈরি করবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ঔপনিষদিক ব্রহ্মকে বাস্তব সমাজভূমিতে এক বলিষ্ঠ পুরুষরূপে নামিয়ে আনলেন—মহাভারতের ঐতিহাসিক কৃষ্ণে, কিন্তু বাঙ্গালীর প্রেমময় লীলাদ্রব কিশোর কৃষ্ণে নয়।

লীলামাধুর্য থেকে বীর্যে বাঙ্গালীর স্বপ্নসাধকে তুলে নিতে চেয়েছিলেন বঙ্কিম, কিন্তু ভরসা দিয়েছিলেন নিরাকার নির্গুণের শুষ্ক শুদ্ধ জ্ঞানচর্চায় নয়, বলিষ্ঠ পৌরুষের সামাজিক মুক্তিমন্ত্রেই তার দীক্ষা হবে।

☐ ক্ষেত্র গুপ্ত

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : কালের বৃত্তে

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) কালের স্রষ্টা নন, কালের সৃষ্টি। বাংলা কাব্যক্ষেত্রে আধুনিক কালের স্রষ্টা যেমন মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), রোমান্স-উপন্যাস আর প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আধুনিক কালের স্রষ্টা তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। অনুরূপ কোনো কৃতিত্বের দাবিদার নন হেমচন্দ্র। তিনি কালের অনুগত, পারিপার্শ্বিকের অনুগত।

মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান নন তিনি। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মতো বিত্তকৌলীন্যময় আভিজাত্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও তিনি লালিত-পালিত হননি। আবার দরিদ্র পরিবারের সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) মতো সাহস, তেজস্বিতা, আত্মবিশ্বাস, মেধার তীক্ষ্ণতাও তাঁর ছিল না।

হেমচন্দ্র দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তাঁর অন্ন-বস্ত্রের সংকট ছিল। মেধাগুণে সেকালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজের স্কুল বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। পরবর্তী কালে প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়েছে।[১] পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তি লাভ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে এন্ট্রান্স আর ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। কেরাণীগিরি করেছেন, স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে বৃত হয়েছেন, আইন পরীক্ষা দিয়ে ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে এল. এল. আর ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে বি. এল উপাধি অর্জন করেছেন। কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেছেন, উপার্জন-স্বল্পতা হেতু মুন্সেফের চাকরি নিয়েছেন। আবার কিছুকাল পরে সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে ফিরে এসেছেন, আইন-ব্যবসায়ে যোগ দিয়েছেন। ক্রমশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছে। পরবর্তী কালে হাইকোর্টের প্রধান উকিলের পদটি লাভ করেছেন।

হেমচন্দ্রের জীবনের প্রথম পর্বটি এভাবেই আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অতিবাহিত। দরিদ্র পরিবারের সন্তান অধ্যবসায় গুণে মধ্যবিত্তের প্রতিষ্ঠা আর সম্মান লাভ করেছেন। চিন্তায় ভাবনায়, সাহিত্য রচনায় এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীরই প্রতিভূ তিনি। অবশ্য একথাও ঠিক, 'হেমচন্দ্রের জীবনে কোনো রূপ নাট্যচমক নেই, প্রবল অস্থিরতা

নেই। অন্তর্লীন শক্তির অগ্ন্যুদগার তাঁর কর্ম ও ভাবনাকে আর্ত করে তোলেনি …নিজেকে ছাপিয়ে যাবার বীর্য নেই, প্রাণকে বাজি রাখবার দুঃসাহস নেই।'[২]

২

হেমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বেই এদেশে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কর্ণওয়ালিসের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (১৭৯৩) বিদেশী শাসককুলের পৃষ্ঠপোষক এক জমিদার শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে। অন্য দিকে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর চাতুর্য-কৌশলে শাসককুলের একান্ত বাধ্য-বিনীত একদল এদেশীয় ইংরেজি-শিক্ষিত কেরানীর আবির্ভাব ঘটেছে। খ্রীস্টান মিশনারীরা খ্রীস্টধর্ম প্রচারে পূর্ণ উদ্যমে ব্রতী। হিন্দুধর্মও আত্মরক্ষার চেষ্টায় তৎপর। ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা অব্যাহত। স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন ঘটেছে। সংস্কার মুক্তির প্রয়াসে ইয়ংবেঙ্গলদের দুঃসাহসিক কার্যকলাপ তখন স্মৃতিতে পর্যবসিত। পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাবে সমাজ-মানসে নিত্যনতুন দ্বন্দ্ব আর আলোড়ন অবশ্য অব্যাহত। বাংলা সাহিত্যে হেমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বেই পুরোদমে বাংলা গদ্যের চর্চা শুরু হয়ে গেছে, যার আদর্শ ইংরেজি গদ্য। পাশ্চাত্য নাটকের অনুসরণে বাংলা নাটক রচনা শুরু হয়েছে। কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রেও পালাবদল ঘটেছে। হেমচন্দ্রের আবির্ভাব এই নতুন কালটিতে, সাধারণভাবে যে কালটি নবজাগরণের কাল নামে পরিচিত।

হেমচন্দ্রের জন্ম-মৃত্যুর কাল-পরিধির পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মন্তব্য-বিশেষ প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য। তিনি লিখেছেন : "হেমবাবুর জন্ম-সময়ে (৬ বৈশাখ ১২৪৫ সাল) কোন কিছু ভাঙ্গিতে পারিলেই কৃতবিদ্য আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। সমাজ ভাঙ্গিতে হইবে, ধর্ম্ম ভাঙ্গিতে হইবে, প্রথা ভাঙ্গিতে হইবে, চরিত্র ভাঙ্গিতে হইবে, সদাচার ভাঙ্গিতে হইবে। এমন কি, অনাচারে, অত্যাচারে স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিরা, অকালে কালস্রোতে ডুবিতে পারাও যেন সেই সময়ে গৌরবের বিষয় বলিয়া ধারণা হইত। আর এখন, হেমবাবুর মৃত্যু-সময়ে (১৩১০ সালের ১০ জ্যৈষ্ঠ) বোধ হয়, যেন সিকস্তির পর একটু পয়স্তি হইতেছে। ভাঙ্গনের পর যেন একটু অন্য দিকে গড়নের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই ভাঙ্গন-গড়নের মাঝখানে হেমবাবুর জীবন। …তাঁহার কবিতাতেও এই ভাঙ্গন-গড়ন…অনুস্যূত আছে।"[৩]

হেমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার কালটি দীর্ঘই বলা চলে। তাঁর প্রথম কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিণী' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে। আর শেষ কাব্য 'চিত্তবিকাশ'-এর প্রকাশ ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে। অক্ষয়চন্দ্র-কথিত 'ভাঙ্গন-গড়ন'-এর যে দ্বিমুখী প্রবণতা ওই কালটিতে দেখা যায়, তা হেমচন্দ্রের কাব্য-কবিতাতেও বিদ্যমান।

নতুন কালের নতুন মানসিকতায় পুরনো কালের পুরনো ব্যবস্থার পরিবর্তন

স্বভাবতই কাম্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু পরিবর্তনের জন্যে উপযুক্ত প্রস্তুতির যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি প্রয়োজন রয়েছে সংযম ও সতর্কতার। ইতিহাস সাক্ষী, উনিশ শতকের প্রথম পর্বের সেই পরিবর্তনকামী প্রয়াসসমূহ সর্বতোভাবে সংযত ও সতর্কতা-পূর্ণ ছিল না। পরিবর্তনের কামনাটা জেগেছিল সমাজের উপরিস্তরে, মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে। কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরে পুরনো আদর্শই বজায় ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে পরিবর্তনের ঢেউ সমাজের নিম্নস্তরকেও স্পর্শ করলো।

৩

এখন দেখা যাক, হেমচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-সাধনায় এই নতুন কালটিকে কীভাবে গ্রহণ করলেন। তাঁর প্রথম কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিণী'র (১৮৬১) বিষয়বস্তু বাস্তব-অভিজ্ঞতাজাত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ স্নাতক শ্রীশচন্দ্র ঘোষের আত্মহত্যার ঘটনায় বিচলিত হয়ে এ কাব্য রচনা করেন হেমচন্দ্র। আত্মঘাতী শ্রীশচন্দ্র কবির প্রতিবেশী বাল্যবন্ধু। উভয়ে একই সঙ্গে স্নাতক হন। উচ্চ শিক্ষিত শ্রীশচন্দ্র তাঁর পারিবারিক পরিবেশের সঙ্গে, বিশেষত অশিক্ষিতা স্ত্রীর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। এই মানসিক ব্যবধানই শেষ পর্যন্ত তাঁকে আত্মঘাতী করে। নতুন কালের উচ্চশিক্ষিত এক তরুণের মানসিক দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতার সেই পরিচয় হেমচন্দ্র তাঁর কাব্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। শিক্ষায়-কর্মে-চিন্তায়-ভাবনায় স্ত্রী যথার্থ জীবনসঙ্গিনী হয়ে উঠবে, হয়ে উঠবে সহকর্মিণী, এ আকাঙ্ক্ষা নবজাগরণকালেরই আকাঙ্ক্ষা (স্মরণযোগ্য, ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর প্রমীলা চরিত্রে এই আকাঙ্ক্ষারই কাব্য-রূপায়ণ দেখা যায়)। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার তখনো সীমিত। কবির উক্তিতে সামাজিক অবস্থার সেই অন্ধকার দিকটি নির্দেশিত—"একে ত নারীজাতি পরের অধীনা। তাহাতে অভাগা দেশে দাসী মত কেনা॥ পৃথিবী-ভিতরে জানে পরিবারজন। রন্ধনশালার সীমা-ভিতরে ভ্রমণ॥" কবি মনে করেন, এজন্য নারীর ওপর দোষারোপ করা অনুচিত। নারীকে উপযুক্তভাবে শিক্ষিতা করে তুলতে না পারলে শিক্ষিত পুরুষের জীবন সার্থক হতে পারে না। শিক্ষিত পুরুষ-সমাজের দায়িত্ব হল স্ত্রী-সমাজকে শিক্ষিতা করে তোলা। সন্দেহ নেই, হেমচন্দ্রের এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা তাঁর প্রগতিশীলতারই পরিচয়বহ। স্পষ্টতই তিনি স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থক।

অথচ এই হেমচন্দ্রই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) অনুকরণে 'বাঙালীর মেয়ে' নামে পরবর্তীকালে যে রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লেখেন (১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'কবিতাবলী' দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত) তাতে বাঙ্গালী-মেয়ের প্রতি তাঁর অবজ্ঞাই প্রকাশ পায়—"হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে— / ধারাপাতে মূর্তিমান, চারুপাঠ পড়া, / পেটের ভিতরে গজে দাসুরায়ী ছড়া। / ···অঙ্ক শাস্ত্রে—বররুচি, গ্যালিলো,

নিউটান, / গণ্ডা কড়ি গুন্তে হ'লে জানের বাড়ী যান ; / পাত্তেরে প'ড়োর মত অক্ষরের ছাঁদ, / কলাপাতে না এগুতে গ্রন্থ-লেখা সাধ !"

হেমচন্দ্রের উপরি-উক্ত পংক্তিগুলিতে তাঁর প্রগতিশীলতার বিন্দুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং মানসিক দীনতা আর রুচিহীনতাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঙ্গালী মেয়ের যে অবস্থা কবির রঙ্গ-ব্যঙ্গের অবলম্বন হয়ে ওঠে, সে অবস্থা কারা সৃষ্টি করেছে? যথার্থ শিক্ষাদানের দায়িত্ব-কর্তব্য কাদের? স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের প্রথম পর্বে কিছু অসঙ্গতি ঘটতেই পারে। পাঠক-মনোরঞ্জন আর সস্তা বাহবার লোভেই এ কবিতা লেখেন হেমচন্দ্র। মুহূর্তের জন্যেও আত্মসমালোচনায় প্রবৃত্ত হন না। রঙ্গ-ব্যঙ্গের যোগ্য ওই বাঙ্গালী মেয়েরা, না তৎকালীন পুরুষ-শাসিত সমাজ? প্রশ্ন জাগে বৈকি। স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে হেমচন্দ্রের প্রগতিশীলতায় সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হয়।

আবার প্রথম ভারতীয় পরীক্ষার্থিনী হিসেবে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬১-১৯২৩) ও চন্দ্রমুখী বসু-র (১৮৬০-১৯৪৪) ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়ে স্নাতক উপাধি প্রাপ্তিতে তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে হেমচন্দ্র কবিতা রচনা করেন। 'বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গরমণীর উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে' রচিত ওই কবিতায় হেমচন্দ্র উল্লসিত : "এতদিনে জাগিল রে জীবনে বিশ্বাস, / ঘুচিল হৃদয় হ'তে কালের হতাশ ॥ / বাঙালীর কামিনীর হৃদয়-কমলে / পাশ্চাত্য সাহিত্য-রূপ দিনমণি জ্বলে ॥"

উপরিউক্ত তিনটি দৃষ্টান্ত থেকে শুধু একটি সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য। তা হল, হেমচন্দ্র স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। আর সে শিক্ষা প্রতিদিনের জীবনচর্যাকে মার্জিত পরিচ্ছন্ন করবে, এটাই তাঁর কাম্য ছিল।

৪

হেমচন্দ্র তাঁর দেশপ্রেমমূলক কবিতাসমূহের জন্য সমালোচকদের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। হেমচন্দ্রের কবিতা-বিষয়ে রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮-১৯০৯) প্রাসঙ্গিক মন্তব্য স্মরণযোগ্য : "...his patriotic lyric on India is known by heart to a large circle of readers..."[৪]

রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬-১৮৯৯) উক্তিও প্রশংসাপূর্ণ : "তাঁহার রচিত ভারত-সঙ্গীত অতি চমৎকার। উহা স্বদেশ-প্রেমাগ্নিতে চিত্তকে একেবারে প্রজ্বলিত করিয়া তুলে এবং তূরীধ্বনির ন্যায় মনকে উত্তেজিত করে।"[৫]

আর সজনীকান্ত দাসের সিদ্ধান্ত হল : "হেমচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যে ও বাঙালীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন ; কারণ, তিনি আমাদের স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশ-প্রেম যে পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, এমন আর সে-যুগের কোনও কবি করেন নাই।"[৬]

বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রেমের সুরটি প্রথম ধ্বনিত হল উনিশ শতকে। বাঙ্গালী-মানসে দেশপ্রেমের উন্মেষ ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে। প্রাক্-হেমচন্দ্র-কালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮.২-১৮৫৯) 'স্বদেশ', 'মাতৃভাষা', 'ভারত-সন্তানের প্রতি', 'ভারতের অবস্থা', 'ভারতের ভাগ্যবিপ্লব' প্রভৃতি কবিতায় প্রবল দেশানুরাগের পরিচয় লভ্য। তাঁর কোনো কোনো কবিতা-পংক্তি তো প্রবাদপ্রতিম। যেমন :

(১) ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেম পূর্ণ নয়ন মেলিয়া,
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥ (স্বদেশ)

(২) মাতৃসম মাতৃভাষা, পুরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে ॥ (মাতৃভাষা)

(৩) এখন আলস্য নহে বিধান-বিহিত।
সাধ্যমতে সিদ্ধ কর স্বদেশের হিত ॥ (ভারত-সন্তানের প্রতি)

(৪) দেশের দারুণ দুখ, দেখিয়া বিদরে বুক,
চিন্তায় চঞ্চল হয় মন।
লিখিতে লেখনী কাঁদে, ম্লানমুখ মসিছাঁদে
শোক-অশ্রু করে বরিষণ ॥ (ভারতের ভাগ্যবিপ্লব)

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৮৬) 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) ও 'কর্মদেবী' (১৮৬২) দেশাত্মবোধক কাব্যদ্বয়ও হেমচন্দ্রের 'বীরবাহু কাব্য' (১৮৬৪) প্রকাশের পূর্বেই প্রকাশিত। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী-উপাখ্যান'-এর "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, / কে বাঁচিতে চায় ? / দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, / কে পরিবে পায় ? / কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, / নরকের প্রায়। / দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে, / স্বর্গ-সুখ তায় ॥'—প্রভৃতি পংক্তি সে সময়ে শিক্ষিত যুব-সমাজে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছে। মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩ 'মেঘনাদবধ কাব্য'-ও (১৮৬১) হেমচন্দ্রের 'বীরবাহু কাব্য'-পূর্ববর্তী রচনা। দেশপ্রেমের সুরটি সে কাব্যেও স্পষ্টগোচর : "জন্মভূমি রক্ষা হেতু / কে ডরে মরিতে ? যে ডরে / ভীরু সে মূঢ় শত ধিক তারে।"[৭] মধুসূদনের 'জন্মভূমির প্রতি' কবিতাটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। তাই এ কথা স্বীকার করা চলে যে, দেশাত্মবোধক কাব্য-কবিতা রচনার অনুকূল একটি ক্ষেত্র হেমচন্দ্রের পূর্বেই প্রস্তুত হয়েছিল।

হেমচন্দ্রের 'বীরবাহু কাব্য' কাল্পনিক উপাখ্যান-আশ্রয়ী। রঙ্গলালের কাব্যদ্বয়ের মতো ইতিহাস-আশ্রয়ী বা মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-র মতো পুরাণ-আশ্রয়ী নয়। হেমচন্দ্র তাঁর কাব্যের বিজ্ঞাপনে জানিয়েছেন : "পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ

স্বদেশরক্ষার্থ কী প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গল্পটী রচনা করা হইয়াছে।"

কাব্যটির আলোচনা-প্রসঙ্গে সাহিত্যের ঐতিহাসিকের মন্তব্য প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য। তাঁর মতে, এ কাব্যে "রঙ্গলালের অনুসরণ আছে, তবে রচনা-পারিপাট্যে এবং স্বদেশ-প্রীতির প্রকাশে হেমচন্দ্র রঙ্গলালকে অনেকখানি ছাড়াইয়া গিয়াছেন। রঙ্গলালের কাব্যে স্বদেশপ্রীতির প্রকাশ পশ্চাত্তাপে, এবং তা নিষ্ক্রিয়গোছের, দৈবনির্ভরশীল। বীর-বাহুতে স্বদেশপ্রেম সক্রিয়। নায়কের মনোবেদনার মধ্যে লেখকের মনোবেদনাই মুখরিত—

এবে সেই দেশমান্যা ভারতবক্ষেতে, ম্লেচ্ছকুল পদে দলে।

লক্ষ তরি ভাসাইব, ম্লেচ্ছদেশ মজাইব,

বাণিজ্য করিব ছারখার।

তোর সিংহাসন পাত ম্লেচ্ছকুল ভস্মসাৎ,

প্রেয়সীরে করিব উদ্ধার॥

কাব্যটির নায়কের এই আশা তখনকার ইংরেজী শিক্ষিত অনেক বাঙ্গালী যুবকেরই মনে জাগিতেছিল।···

বীরবাহুতে হেমচন্দ্র যে সক্রিয় দেশপ্রিয়তা মুখরিত করিলেন তাহা অবিলম্বে প্রথমে চৈত্রমেলা-হিন্দুমেলায় ও পরে জাতীয় আন্দোলনে প্রতিধ্বনিত হইল এবং প্রাণনাথ দত্ত, হরলাল রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাট্যরচনায় বিশেষভাবে প্রতিমূর্ত হইল।"[৮]

উপরিকথিত 'চৈত্রমেলা-হিন্দুমেলা'র সূচনা ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে। হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী'র প্রথম খণ্ডে (১৮৭০) মুদ্রিত 'ভারত-বিলাপ' ও 'ভারত-সঙ্গীত' উল্লেখ-যোগ্য দুটি দেশাত্মবোধক কবিতা। ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪) সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ২৮ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম কবিতাটি এবং ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ৭ শ্রাবণ সংখ্যায় দ্বিতীয় কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

'ভারত-বিলাপ' কবিতায় দেশের পরাধীনতায় কবি বিলাপপ্রবণ। ভারত-বাসীর ব্রিটিশভীতিতে ব্যথিত তিনি: "ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই / গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই, / ফুটিয়ে ফুকারি বলিতে না পাই·· / এমনি সদাই হৃদয়ে ত্রাস॥" পরাধীনতাজনিত গ্লানি কবিকে পীড়িত করে: "কি হবে বিলাপ করিলে এখন, / স্বাধীনতা-ধন গিয়াছে যখন, মনের মাহাত্ম্য হয়েছে নিধন তখনি সে সাধ ঘুচে গিয়াছে।" পরাধীন জাতির স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা অর্থহীন, দাসত্ব-লাঞ্ছনা বহনই তার ভবিতব্য: "সাজে না এখন অভিলাষ করা, / আমাদের কাজ শুধু পায়ে ধরা, / মস্তকে করিয়ে দাসত্বের ভরা / ছুটিতে হইবে ওদের পাছে!" পরাধীনা দেশ-জননীর জন্য যুগপৎ কবির আক্ষেপ ও মমতার প্রকাশ: "আগে ছিল বাণী ধরা-রাজধানী, / স্মরণে যেন গো থাকে সে কাহিনী, / এবে সে কিঙ্করী হয়েছে দুখিনী / বলিয়ে দম্ভ ক'রো না গরিমা॥"

তুলনীয়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা-পংক্তি : "ভারতের দশা হেরি বিদরে হৃদয়। / জননী দুর্ভাগ্যে যথা তাপিত তনয় ॥ / মনে হ'লে প্রাচীন সুখের সুসময়। / অসম্ভব বলি কভু প্রত্যয় না হয় ॥ কিরূপেতে বিজাতীয় রাজা রাহু আসি। / সুখরূপ শশধরে আহারিল গ্রাসি ॥" (ভারতভূমির দুর্দশা)

'ভারত-বিলাপ' কবিতায় কবির বক্তব্য উত্তমপুরুষের জবানীতে প্রকাশিত। কিন্তু 'ভারত-সঙ্গীত' কবিতার বক্তব্য শিবাজীর সমকালীন এক স্বদেশপ্রেমিক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মাধবাচার্যের উক্তিতে পরিবেশিত : "বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে, / সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, / সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, / ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় ॥" অথবা, "হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি! কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি, / গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি !— / আর কি ভারত সজীব আছে ?" আমাদের পরাধীনতার মূল কারণ যে উচ্চ নীচ শ্রেণী-বিদ্বেষ, জাতিভেদ-প্রথা, পারস্পরিক অনৈক্য, সেকথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় : "একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে, / ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, মিলে, / কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে, / তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।" তুলনাযোগ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উক্তি : "ঈর্ষা হিংসা দ্বেষ মদে পূর্ণ এই দেশ। / সকলে সমান নাই ইতর-বিশেষ ॥···নাহি মাত্র ঐক্য সখ্যভাবের সঞ্চার।" (ভারতভূমির দুর্দশা)।

পুরাণকাহিনী-আশ্রয়ী 'বৃত্রসংহার কাব্য'-তে (প্রথম খণ্ড : ১৮৭৫, দ্বিতীয় খণ্ড : ১৮৭৭) সমালোচক স্বদেশপ্রেমিক এক কবিকে আবিষ্কার করেছেন : "এ কাব্যের স্বর্গচ্যুত দেবতাদের দুরবস্থায়, বেদনায় অপমানবোধে স্বদেশচ্যুত গৌরবহারা সমকালীন ভারতীয়দের অন্তর-বাণীটি বেজেছে। ইন্দ্রের কঠোর সাধনা, দধীচির আত্মদানে হারানো স্বাধীনতা ও গৌরব ফিরে পাবার কল্পনায় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দিগন্তে উঁকি দিয়েছে। কাম-রতি-কুবের এ কাব্যে দানববিজিত স্বর্গে হীন দাস্যে নিযুক্ত থেকেছে। এদের মাধ্যমে হয়তো আমাদের জাতীয় পরাধীনতা ও দাস্যবৃত্তির গ্লানির প্রতি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন কবি। দেশচ্যুতির অগৌরবের মধ্যেও বীর্যবান ইন্দ্র ও দেবগণের সাধনায় পৌরুষ আছে। বিজয়ী শত্রুর পদলেহনে আছে শুধুই হীনমন্য লাঞ্ছনা।··· ভোগবাসনায় ও অর্থ-বিত্তের লোভেই জাতি নির্বিকার চিত্তে পৌরুষ হারিয়ে পর-পদানত হয়ে থাকছে, এই কথাটিই হেমচন্দ্র বলতে চেয়েছেন। আর ইন্দ্র-দধীচি কবির স্বপ্ন – যে স্বপ্ন আদর্শলোকের ছবি এঁকে চরম দুর্দিনে ও দুরবস্থায় মানবমনকে আশ্বস্ত করে।"[৯]

সে যাই হোক, পরাধীন স্বদেশে বসে বিদেশী শাসককুলের বিরোধিতায় এ-ধরনের কৌশল-গ্রহণ অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধক বহু উপন্যাস ও নাটকেই এ কৌশল অনুসৃত। ইতিহাসের পটভূমিতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে উপলক্ষ করে ওই সমস্ত রচনায় বস্তুতপক্ষে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে।

হেমচন্দ্র স্বদেশপ্রেমিক, কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করতে পারেন নি। পারেন নি অগ্রাহ্য করতে। শাসককুলের রোষদৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তিনি। তাই 'কবিতাবলী'র প্রথম সংস্করণের 'ভারত-বিলাপ' কবিতার অন্তিম স্তবকটি দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জন করেন। স্তবকটি হল: "ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর। নহিলে শুনিতে এ-বীণা ঝঙ্কার। বাজিত গরজে, উথলি আবার। উঠিত ভারতে ব্যথিত প্রাণ।"

'ভারত-সঙ্গীত' কবিতাটিও দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত হয়। কারণ—"এই পদ্য প্রকাশিত হওয়ার পর মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সরকার বাহাদুর বিশেষ করিয়া এই পদ্যটির অনুবাদ করাইলেন।" (এডুকেশন গেজেট)[১০] শাসকগোষ্ঠী অবশ্য হেমচন্দ্রকে শেষ পর্যন্ত শাস্তিদানে সমর্থ হন নি। কিন্তু হেমচন্দ্র সতর্ক হন।

শুধু তাই নয়। তৃতীয় সংস্করণ 'কবিতাবলী'র (১২৮৩ বঙ্গাব্দ) অন্তর্ভুক্ত 'ভারত-ভিক্ষা' কবিতায়[১১] কবির স্বদেশপ্রেম অন্তর্হিত। কবি রাজশক্তির প্রশস্তি-কীর্তনে প্রবৃত্ত: "আসিছে ভারতে বৃটন-কুমার, / শুন হে উঠিছে গভীর বাণী / গগন ভেদিয়া, 'জয় ভিক্‌টোরিয়া / রাজরাজেশ্বরী, ভারতরাণী।" ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ২৩ তারিখে কলকাতায় প্রিন্স্‌ অব্‌ ওয়েল্‌সের (পরবর্তীকালে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) আগমন উপলক্ষে এ কবিতা রচিত হয়। আলোচ্য কবিতা প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকের মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ—"ভারত-সঙ্গীত লিখিয়া হেমচন্দ্র দেশের রাজশক্তির কাছে যে অপরাধ করিয়াছিলেন 'ভারত-ভিক্ষা' (১৮৭৫) লিখিয়া তাহার স্খালন করিতে হইল।"[১২]

১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে 'ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব' নামে একটি কবিতা পুস্তিকা প্রকাশ করেন হেমচন্দ্র। বাংলা ভাষায় রচিত মূল কবিতার সঙ্গে ইংরেজিতে তার ভাবানুবাদও ছিল। মহারাণীকে উপহার প্রদানের উদ্দেশ্যেই ওই ইংরেজি অনুবাদ যুক্ত হয়। অনুবাদ অবশ্য তাঁর নয়।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, হেমচন্দ্রের দেশপ্রেমকে কোন নিক্তিতে বিচার করা হবে? 'ভারত-ভিক্ষা' কবিতায় হেমচন্দ্র ব্রিটিশের গুণকীর্তনকালে সিপাহী-বিপ্লব-দমনে উল্লাস প্রকাশ করেছেন ('প্রচণ্ড সিপাহী-বিপ্লবে যে বহ্নি / নিবাইল তীব্র প্রচণ্ড দাপে।')। একালের ঐতিহাসিকেরা 'সিপাহী-বিদ্রোহ'-কে (১৮৫৭) প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামরূপে গণ্য করেন। অথচ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বা হেমচন্দ্রের মতো কবিদের কাছে 'সিপাহী-বিদ্রোহ' ছিল নিতান্তই অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা মাত্র। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'নানাসাহেব' বা 'কানপুরের যুদ্ধে জয়' প্রভৃতি কবিতা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতোই হেমচন্দ্রও বস্তুতপক্ষে দ্বৈধ মানসিকতার অধিকারী। যুগপৎ দেশপ্রেমিক ও রাজশক্তির স্তাবক। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীর মতো বক্তৃতা ও আস্ফালনপ্রিয়। সেই সঙ্গে নিরাপত্তাকামী বাস্তববাদী আপসপন্থী। উত্তেজনার আগুন পোহানো আর কি। সন্দেহ নেই, হেমচন্দ্রের দেশপ্রেম দুর্বল। এ দুর্বলতা তাঁর

চরিত্রের দুর্বলতাই প্রমাণ করে। অন্য দিক থেকে বলা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে হেমচন্দ্র—সকলেরই দেশপ্রেম ছিল কল্পনা-বিলাস বা একটা 'আইডিয়া' মাত্র। স্বদেশ-জননীর ধারণাটি প্রথম বাস্তবায়িত হয় 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন'কে (১৯০৫) উপলক্ষ করে। উনিশ শতকের অন্যান্য বুদ্ধিজীবীর মতো হেমচন্দ্রও দেশের পরাধীনতায় ব্যথিত হয়েছেন, কিন্তু ব্রিটিশ-শাসনের উচ্ছেদ চান নি। কারণ, স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষার যোগ্যতা তখনো দেশবাসীর মধ্যে গড়ে ওঠে নি। বরং ব্রিটিশ শাসনের প্রগতিশীল দিকগুলি সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের মতো তাঁকেও আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছিল।

প্রসঙ্গত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা মনে পড়ে যায়। তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা না করে বরং পরাধীন অবস্থার মধ্যেই শিক্ষা-বিস্তার ও সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হয়েছেন। ব্রতী হয়েছেন চরিত্র-গঠনে। দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবার যথার্থ উপায়টি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সেই সঙ্গে মনে পড়ে, শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রয়োজনে তিনি সহযোগিতা করলেও, কোনো রকম অন্যায় আদেশের কাছে মাথা নত করেন নি। চিন্তায় ও কর্মে স্বাধীনতা উপভোগের মতো সাহস আর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তিনি। পরাধীন দেশবাসীর পায়ের নিচে যে মাটিটুকুর সংস্থানের ব্যবস্থা তিনি করতে চেয়েছিলেন, তারই মধ্যে ছিল সাহসী উদ্যমী স্বাধীন শক্তিশালী জাতি-গঠনের প্রয়াস। বিদ্যাসাগরের জীবনে 'আইডিয়া' আর কর্মের কোনো ফারাক ছিল না। হেমচন্দ্র তাঁর কাব্য কবিতায় যতই না কেন দেশপ্রেমের কথা বলুন, বিদ্যাসাগরের চেয়ে তিনি বড় দেশপ্রেমিক, এ কথা বোধ করি স্বীকার্য নয়। অথচ বিদ্যাসাগর সরাসরি দেশপ্রেম প্রচারে একটি ছত্রও রচনা করেন নি।

৫

বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক হেমচন্দ্রকে "হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির যুগনির্দিষ্ট ধারক ও বাহকরূপে, যুগের ভাবপ্রতিনিধিত্বের প্রতীকরূপে" অভিহিত করেছেন।[১৩]

উনিশ শতকে নানা রূপ ধর্ম-সংঘাতে হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটে। প্রাচীন শাস্ত্র-পুরাণাদির অনুবাদ-প্রাচুর্যে যেমন তার প্রমাণ পাই, তেমনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের (১৮৩৬-১৮৮৬) আবির্ভাবে, শশধর তর্কচূড়ামণির (১৮২৫-১৯২৮) হিন্দুধর্ম-ব্যাখ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকায় হিন্দুধর্মের নব প্রতিষ্ঠার আয়োজনে এবং বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪), 'সীতারাম' (১৮৮৬) উপন্যাস-ত্রয়ে ও 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬) গ্রন্থে কিংবা নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯), 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩), 'প্রভাস' (১৮৯৬) কাব্যত্রয়ে তার পরিচয় পাই। তালিকাটি আরো দীর্ঘ হতে পারে।

পুরাতনের পুনর্বিচার নবজাগরণের অন্যতম লক্ষণ। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যেও সে লক্ষণ পরিস্ফুট। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার কাব্য' (১ম খণ্ড ১৮৭৫ / ২য় খণ্ড ১৮৭৭) মহাভারতের কাহিনী-আশ্রয়ে রচিত। শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে অশুভের বিনাশ-প্রদর্শনই সে কাহিনীর উদ্দেশ্য। হেমচন্দ্রের কাব্যেও অশুভ শক্তির পরাজয় ঘটেছে, তাঁর নতুনত্ব শুধু স্বদেশপ্রীতির উদ্বোধনে। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে' (১৮৬১) যে নিয়তিবাদের প্রতিষ্ঠা, তা "আত্মবিরোধক্লিষ্ট আধুনিক মনের জীবনার্তিরই একটা দৈব প্রতিরূপ", পক্ষান্তরে হেমচন্দ্রের কাব্যে "নিয়তিবাদ কর্মফলের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিধানের অমোঘ ন্যায়-বিচার। একটি দৈবলীলার ছদ্মবেশধারী মানবিকতার স্বাধীন, বেদনাময় বিকাশ; অপরটি দৈবশক্তি-নিয়ন্ত্রিত মানব-কর্মফলের অনিবার্য পরিণতি।"[১৪] এক্ষেত্রে হেমচন্দ্র অবশ্য হিন্দু ঐতিহ্যেরই অনুসারী। 'দশমহাবিদ্যা'য় (১৮৮২) কিন্তু পুরাণ-তন্ত্রের নতুন ব্যাখ্যাদানের প্রয়াসী তিনি। দশমহাবিদ্যার পরিচয়-প্রদানের সঙ্গে সমাজ-ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের স্তরগুলি উদ্ঘাটনে তিনি ব্রতী হয়েছেন। তথ্য হিসেবে স্মরণযোগ্য, ছাত্রজীবনে ইংরেজিতে রচিত 'Life of Shrikrishna' প্রবন্ধে তিনি খ্রীস্ট ও কৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশের সাদৃশ্য প্রদর্শন করেন। প্রবন্ধটি রেভারেণ্ড লঙ্ পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। আর ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ইংরেজি পুস্তক 'Brahmo Theism in India'-তে ব্রাহ্মধর্মের বিরোধিতা করে তিনি হিন্দুধর্মের পক্ষ নেন।

সমালোচক-কথিত 'হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির যুগনির্দিষ্ট ধারক ও বাহক' হেমচন্দ্রকে পাওয়া যায় একাধিক কবিতায়। উদাহরণ: 'কবিতাবলী' প্রথম খণ্ডের 'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পূজা', 'দেবনিদ্রা', 'গঙ্গার উৎপত্তি', 'ভারত-কামিনী', 'অন্নদার শিবপূজা', 'দুর্গোৎসব' এবং দ্বিতীয় খণ্ডের 'কাশীদৃশ্য', 'গঙ্গার মূর্তি', 'মণিকর্ণিকা', 'বিশ্বেশ্বরের আরতি' ইত্যাদি কবিতা।

পাশাপাশি এমন পংক্তিও রয়েছে, যেখানে তিনি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মন নিয়ে হিন্দুধর্মের সমালোচনায় প্রবৃত্ত। যেমন, 'চিন্তাতরঙ্গিণী'তে: "দুর্বল মানব-মন সেই সে কারণ। পূজে ভবদেব করি প্রতিমা গঠন ।। সাকার স্বরূপে তাই নিরাকারে ভাবে। মাটি পূজা করি ভাবে মোক্ষপদ পাবে ।। একবার এরা যদি প্রকৃতি-মন্দিরে। প্রবেশি ডাকিতে পারে জগতবন্ধুরে ।। শিব-দুর্গা কালী নাম ভুলিবে সকল। পরব্রহ্ম নাম মাত্র জপিবে কেবল ।।" এ যেন ব্রহ্মবাদীদের উক্তি।

আর দেশাচারকে যদি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করে দেখা হয়, তাহলে হেমচন্দ্র যে কখনো কখনো তার বিরুদ্ধেও দাঁড়িয়েছেন, একথা স্বীকার করে নিতে হয়। যেমন 'বিধবা রমণী' কবিতায়: "হায় রে নিষ্ঠুর জাতি পাষাণ-হৃদয়, / দেখে শুনে এ যন্ত্রণা তবু অন্ধ হয়, / বালিকা যুবতী ভেদ করে না বিচার, / নারী বধ ক'রে তুষ্ট করে দেশাচার। / এই যদি এদেশের শাস্ত্রের লিখন, / এ দেশে রমণী তবে জন্মে কি কারণ?

পুরুষ দুদিন পরে আবার বিবাহ করে / অবলা রমণী ব'লে এতই কি সয় রে ?" ক্ষুব্ধ কবির কণ্ঠে অভিশাপ-বাণী ধ্বনিত হয় : "অবিলম্বে হিন্দুধর্ম ছারখার হবে। / হিন্দুকুলে বাতি দিতে কেহ নাহি রবে।" 'ভারত-কামিনী' কবিতাতেও স্ত্রী-সমাজের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের নিন্দা করেন তিনি : "অরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার— / এই কি তোদের দয়া, সদাচার ? / হয়ে আর্যবংশ—অবনীর সার / রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে।" হেমচন্দ্র এই সমস্ত ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুগামী। বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারীতে। 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব —দ্বিতীয় পুস্তক' প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবরে। হেমচন্দ্র তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উক্তির পাশাপাশি রেখে হেমচন্দ্রের কবিতা দুটি পাঠ করলে আমাদের মন্তব্য সত্য বলে প্রমাণিত হবে : "হায়, কি আক্ষেপের বিষয়, দেশাচারই এ-দেশের অদ্বিতীয় শাসনকর্তা, দেশাচারই এ-দেশের পরম গুরু ; দেশাচারের শাসনই প্রধান শাসন, দেশাচারের উপদেশই প্রধান উপদেশ।...

ধন্য রে দেশাচার। তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা !"[১৫] 'কবিতাবলী' প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত উপরিউক্ত কবিতা দুটিতে হেমচন্দ্র নতুন কালেরই পক্ষ নিয়েছেন। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির অন্ধ অনুগত তাঁকে বলা চলে না। ভাবলে অবাক লাগে, মধুসূদন যেহেতু ধর্মমতে খ্রীস্টান, আর হেমচন্দ্র যেহেতু হিন্দু, সেহেতু হেমচন্দ্র মধুসূদনের তুলনায় বড় কবি, এমন ধারণা একসময়ে অনেকেই পোষণ করতেন।

৬

সমকালের বিভিন্ন ঘটনা হেমচন্দ্রের বহু কবিতার বিষয়বস্তু। বেশ বোঝা যায়, সমকাল তাঁকে নানাভাবে আলোড়িত করেছে। স্পর্শ করেছে। এ সমস্ত কবিতায় সমকালের সরব দ্রষ্টা তিনি। কবিতাগুলির মূল্য নিতান্তই সাময়িকতা-আশ্রয়ী, সমাজ ইতিহাসের সঙ্গেই এগুলির যোগ। যেমন ১২৮০ সালের দুর্ভিক্ষ-জনিত দুঃখ দুর্দশার চিত্র লভ্য 'ভারতে কালের ভেরী' কবিতায়। 'বাজিমাৎ' কবিতাটিও উপলক্ষ্যাশ্রিত। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্স কলকাতায় আসেন। সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী 'জেনানা' দর্শনে তাঁর অভিলাষ হয়। বাংলার ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য কলকাতা হাইকোর্টের জুনিয়র গভর্নমেন্ট প্লীডার জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর গৃহে যুবরাজকে এজন্য আমন্ত্রণ করেন। ৩ জানুয়ারী সন্ধ্যায় জগদানন্দের ভবানীপুরের গৃহে যুবরাজ উপস্থিত হন। মুখোপাধ্যায় পরিবারের মহিলাগণ তাঁকে বরণ করেন। এ ঘটনায় হিন্দুসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। 'বাজিমাৎ'-এ সেই আলোড়ন-উত্তেজনারই প্রতিফলন। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে স্যার রিচার্ড টেম্পল মিউনিসিপ্যাল আইন বিধিবদ্ধ

করলে হেমচন্দ্র লেখেন 'সাবাস হুজুক আজব শহরে'। ভোটের রাজনীতিকে ব্যঙ্গ করে এ কবিতা লেখা হয়। ব্যঙ্গরসটুকু উপভোগ্য। 'নেভার নেভার' কবিতাটিও ব্যঙ্গাত্মক। উপলক্ষ্য ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ইলবার্ট বিল।[১৬] ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে ভারতবর্ষ থেকে লর্ড রিপণের বিদায় গ্রহণ উপলক্ষে রচিত হয় 'রীপণ-উৎসব—ভারতের নিদ্রাভঙ্গ'। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন উপলক্ষে রচিত হয় 'রাখিবন্ধন'। 'হায় কি হলো।' কবিতায় সমকালীন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক-চিত্রণে হেমচন্দ্র স্যাটায়ারিস্ট : "পরের অধীন দাসের জাতি 'নেসেন' আবার তারা ? / তাদের আবার 'এজিটেসন্'—নরুণ উঁচু করা !"

'বিদ্যাসাগর' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে রচিত শোক কবিতা। 'বিশাল উদার চিত্ত দয়ার সাগর', 'অদ্বিতীয় বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষা-গুরু', 'স্বাধীন স্বতন্ত্র চিত্ত' বিদ্যাসাগরের প্রশস্তি কীর্তন। হেমচন্দ্রের বিশ্বাস : "অসামান্য দ্বিজবর।—তব দেবদেহ ; মরণেও বঙ্গবাসী ভুলিবে না কেহ। / ·· বঙ্গের হৃদয়ে নিত্য করুণার পট। / দরিদ্র সন্তান হ'য়ে জিনিলে সম্রাট্।" সমকালের আরো কয়েকজনের মৃত্যুতে এ ধরনের বেশ কয়েকটি শোক-কবিতা লিখেছেন তিনি।

৭

মধুসূদন হেমচন্দ্র সম্পর্কে বলেছিলেন 'A real B.A', ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন হেমচন্দ্র। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ছিল। তাঁর সাহিত্য-কর্মে তার প্রমাণও রয়েছে। শেক্সপীয়রের 'টেম্পেস্ট' নাটকের অনুবাদ করেছিলেন 'নলিনী-বসন্ত নাটক' (১৮৬৮) নামে। অনুবাদ অবশ্য রূপান্তরমূলক। 'ছায়াময়ী'-র (১৮৮০) অবলম্বন দান্তের 'ডিভাইনা কমেডিয়া'। সন্দেহ নেই, ইংরেজি অনুবাদের সাহায্য নিয়েছিলেন। শেক্সপীয়রের 'রোমিও-জুলিয়েট' নাটকের ছায়া-অবলম্বনে হেমচন্দ্র রচনা করেন 'রোমিও-জুলিয়েত' (১৮৯৫) নাটক। 'আশাকানন' (১৮৭৬) Allegory রীতিতে রচিত সাঙ্গরূপক কাব্য। 'কবিতাবলী'র অন্তর্ভুক্ত 'ইন্দ্রের সুধাপান', ড্রাইডেনের 'Alexander's Feast'-এর অনুসরণ। লঙফেলোর 'Psalm of Life' অবলম্বনে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতাটি রচিত। পোপের 'Eloisa to Abelard' কবিতার অনুবাদ 'মদন পারিজাত'। 'চাতকপক্ষীর প্রতি' শেলির 'To a Skylark'-এর অনুবাদ। টেনিসনের 'In Memoriam' কাব্যের কয়েকটি স্তবকের অনুবাদ পাই 'নববর্ষ' কবিতায়। স্কটের 'My Native Land' কবিতার অনুসরণে রচিত 'চিত্তবিকাশ' (১৮৯৮) কাব্যভুক্ত 'জন্মভূমি' কবিতা।[১৭]

সমালোচকের ধারণা, 'ভারত-সঙ্গীত' ও 'ভারত বিলাপ' "কবিতা দুটি ক্যাম্পবেলের ইংরেজ বীরদের যশোগাথার প্রেরণা পেয়ে লেখা। 'ভারত-বিলাপে'র মধ্যে

জেম্‌স্‌ টমসনের Rule Britannia-র অনুরণন শোনা যায়।"[১৮] 'চিন্তাতরঙ্গিণী'-তে (১৮৬১) বায়রনের 'Don Juan' কাব্যের প্রভাব রয়েছে। 'বৃত্রসংহার কাব্যে' মিল্টনের 'Paradise Lost' কাব্যের অল্পস্বল্প ছায়াপাত কেউ কেউ লক্ষ্য করেছেন। হেমচন্দ্র তাঁর কোনো কোনো কাব্যের আখ্যাপত্রে বিভিন্ন বিদেশী কবির কবিতাংশ উদ্ধার করেছেন। ইংরেজি লিরিক ওডের স্ট্রোফি-অ্যান্টিস্ট্রোফি-ইপোডের অনুসরণে 'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা', 'অন্নদার শিবপূজা', 'ভারত-ভিক্ষা' কবিতায় প্রয়োগ বা আরম্ভ, শাখা ও পূর্ণ কোরাস পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করেছেন। এসবই পাশ্চাত্য, বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের নিদর্শন। অবশ্য একথাও ঠিক, মধুসূদনের মতো বহু ভাষাবিদ তিনি ছিলেন না। মধুসূদনের মতো মাধুকরীর ক্ষমতাও তাঁর ছিল না।

হেমচন্দ্রের ক্ষেত্রে যা আমাদের বিস্মিত করে, তা হল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (১৭১২-১৭৬০) আর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আকর্ষণ তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি। 'বীরবাহু কাব্য-ভুক্ত' 'করিছে ঝম্প, ধরণী কম্প, করাল কৃপাণ ধরে রে' অথবা 'কেহ করে হাহাকার, কেহ বলে মার মার, ভীম শব্দ কোলাহলে স্বর্গ মর্ত্ত পূরিল' ইত্যাদি পংক্তি কি ভারতচন্দ্রের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় না? ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের 'মুখবন্ধ' লিখেছিলেন হেমচন্দ্র। সে 'মুখবন্ধ'-তে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে মধুসূদনের তুলনা-প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের প্রশংসার পরিমাণই ছিল বেশি: "সত্য বটে, ভারতের তুল্য সুলেখক আজ পর্যন্ত এদেশে জন্মগ্রহণ করে নাই, এবং বোধহয় আর জন্মিবে না। …প্রাত্যহিক ব্যাপার সমস্ত সুন্দররূপে সাজাইয়া, তাহাতে বাক্যামৃত বর্ষণ করাই তাঁহার সাধ্য ছিল, এবং তাহাতেই তিনি অপ্রমেয় দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন।… যেখানে যে কথাটি খাটে, যে ব্যক্তির মুখে যেরূপ উক্তি সম্ভব, কোন্‌ উৎপ্রেক্ষা কোন্‌ কালের উপযোগী, কোন্‌ শব্দটি, কোন্‌ পদটি উচ্চারণ করিলে কোন্‌ রসের উদ্দীপন করে, এই সকলের প্রতি যে লেখক দৃষ্টি রাখিতে পারেন, তাঁহার লেখাই সমুৎকৃষ্ট হয়। কবি মাইকেলের কি এসকল গুণ নাই—এমন নয়। কিন্তু বোধ হয়, যেন তিনি পদবিন্যাসকালীন কথার হ্রস্বতা ও দীর্ঘতার প্রতিই কেবল লক্ষ্য রাখেন; তাহাদের উপযোগিতা অনুপযোগিতা বিবেচনা করেন না। ভারতচন্দ্রের কিন্তু যে কথাটি না হইলে নয়, সেই কথাটি প্রয়োগ করা আছে; সুতরাং সে সকল কথা একবার কর্ণে প্রবেশ করিলে বিস্মৃত হওয়া দুঃসাধ্য।"[১৯]

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর চতুর্থ সংস্করণে হেমচন্দ্রের ওই 'মুখবন্ধ' পুনর্লিখিত হয়। এই লেখায় হেমচন্দ্র মধুসূদনের স্বাতন্ত্র্য ও শক্তির দিকটি তুলে ধরেন। অর্থাৎ মধুসূদন সম্পর্কে হেমচন্দ্রের মনোভাব পরিবর্তিত হয়: "আমরা এতদিন কবিকুলের চক্রবর্তী ভাবিয়া ভারতচন্দ্রকে মাল্য-চন্দন দানে পূজা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু বোধহয়, এতদিন পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় কবিকে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইল।…মনে করিবেন না যে আমি ভারতচন্দ্রের কবিত্ব-শক্তি অস্বীকার করিতেছি।

তিনি যে প্রকৃত কবি ছিলেন, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু কবিদিগের মধ্যেও প্রধান অপ্রধান আছেন। কেহ বা ভাবের চমৎকারিত্বে, কেহ বা লেখার চমৎকারিত্বে লোকের চিত্তহরণ করেন। ভারতচন্দ্র যে শেষোক্তপ্রকার কবিদিগের অগ্রগণ্য, তৎসম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করিবার কাহার সাধ্য নাই। পরিপাটী সর্বাঙ্গসুন্দর শব্দবিন্যাস করিয়া কর্ণকুহরে অমৃতবর্ষণ করিবার দক্ষতা তিনি যেরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন, বঙ্গকবিকুলের মধ্যে তেমন আর কেহই পারেন নাই; এবং সেই গুণেই বিদ্যাসুন্দর এতদিন সজীব রহিয়াছে। কিন্তু গুণিগণ যে সমস্ত গুণকে কবি কৌলীন্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ গণনা করেন, ভারতচন্দ্রের সেসকল গুণ অতি সামান্য ছিল। বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্র-রচিত সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহাতে অন্তর্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়, তাদৃশ ভাব তাহাতে কই? কল্পনারূপ সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গবেগ কই, বিদ্যুৎছটাকৃতি বিশ্বোজ্জ্বল বর্ণনাছটা কোথায়? তাঁহার কবিতাস্রোত: কুঞ্জবন-মধ্যস্থিত অপ্রশস্ত, মৃদুগতি প্রবাহের ন্যায়; বেগ নাই, গভীরতা নাই, তরঙ্গগর্জন নাই; মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে অথচ নয়ন এবং শ্রবণ তৃপ্তিকর।"[২০] এ আলোচনায় মধুসূদনের অনন্যতার পরিচয় যেমন আছে, তেমনই ভারতচন্দ্রের প্রতি হেমচন্দ্রের অনুরাগেরও অভাব নেই।

অন্য দিকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রশস্তিমূলক রঙ্গরসাত্মক কবিতা 'পাঁটা', 'এণ্ডাওয়ালা', তপস্যামাছ', 'আনারস' প্রভৃতির আদর্শে হেমচন্দ্র লিখেছেন 'দেশলাই-এর স্তব'। ঈশ্বরচন্দ্রের সাংবাদিক কবিসুলভ ধরনধারণটি হেমচন্দ্রের 'নেভার-নেভার', 'বাজিমাৎ', 'হায় কি হলো?', 'সাবাস হুজুক আজব শহরে' ইত্যাদি কবিতায় অনুসৃত। ঈশ্বরচন্দ্রের 'আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো'র ('দুর্ভিক্ষ': গীত ১) রঙ্গরসের আকর্ষণেই যেন হেমচন্দ্রের 'বাঙ্গালীর মেয়ে' কবিতাটি লেখা হয়। হেমচন্দ্রের 'কুলীন-মহিলা—বিলাপ' ঈশ্বরগুপ্তের 'কৌলীন্য' কবিতাটি স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রভেদ: ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা ব্যঙ্গ রসাত্মক, হেমচন্দ্রের কবিতা করুণ রসাত্মক। 'নীলকর' কবিতায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার থেকে নিস্তার লাভের জন্যে কবি ঈশ্বর গুপ্ত, 'বিশ্বমাতো ভিক্টোরিয়া'র শরণাপন্ন হন, হেমচন্দ্রের পূর্বোক্ত কবিতায় কুলীন মহিলাগণ 'ইংলণ্ডেশ্বরী' 'ভারতেশ্বরী' ভিক্টোরিয়ার কৃপাপ্রার্থিনী। ঈশ্বরচন্দ্রের 'বিধবা-বিবাহ' ও 'বিধবা-বিবাহ আইন' কবিতায় রক্ষণশীল মানসিকতার প্রকাশ, হেমচন্দ্রের 'বিধবা-রমণী' ও 'ভারত-রমণী' কবিতায় অবশ্য প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনার অভিব্যক্তি। পরিবর্তিত পটভূমিকায় হেমচন্দ্র মানসিকতায় স্বতন্ত্র, কিন্তু তাঁর বহু কবিতাতেই ঈশ্বরচন্দ্রের রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাংবাদিক মনোভাবের প্রকাশ যে ঘটেছে, তাতে সন্দেহ নেই। এ ধরনের কবিতায় হেমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রের মতোই ইংরেজি শব্দের সঙ্গে কথ্য বুলির উপভোগ্য মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। আবার আখ্যানকাব্যসমূহের বাহ্য কাঠামোয় তিনি রঙ্গলালের অনুসারী।

হেমচন্দ্রের কবি-দৃষ্টি ও রচনা-কৌশল তাই বিশুদ্ধ পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শ প্রভাবিত, একথা বলা চলে না।

৮

হেমচন্দ্র তাঁর 'বৃত্রসংহার কাব্য'কে মহাকাব্যরূপে দাবি করেন নি। কিন্তু সমালোচকদের কল্যাণে দীর্ঘকাল একাব্য মহাকাব্যের মর্যাদা লাভ করে এসেছে। এ কাব্যের জন্য কেউ তাঁকে মধুসূদনের সার্থক উত্তরসূরীরূপে দেখেছেন, কেউ বা আবার মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর ওপরে 'বৃত্তসংহার কাব্য'কে স্থান দিয়েছেন। রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১—১৮৯৪) তাঁর 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৮৭) নিম্নোক্ত ধারণা ব্যক্ত করেছেন—"হেমবাবু যখন মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত মেঘনাদবধের টীকা লেখেন, বোধহয়, তৎকালেই ঐ পুস্তকের অনুকরণে এবং ঐরূপ প্রণালীতে কাব্য লিখিতে তাঁহার ইচ্ছা জন্মে—বৃত্রসংহার সেই ইচ্ছার ফল।" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬—১৯২৩) উভয় কবির তুলনামূলক আলোচনায় লিখেছেন—"মধুসূদন গুরু, হেমচন্দ্র শিষ্য; মধুসূদন ওস্তাদ, হেমচন্দ্র সাকরেদ।··· হেমচন্দ্র জাতি-বৈরের অপরাজেয় ও অদ্বিতীয় কবি···। যেখানে জাতি-বৈরের কথা, সেইখানেই হেমচন্দ্র গুরুর উপর টেক্কা দিয়াছেন, সেইখানেই তিনি মধুসূদনের উপর চলিয়া গিয়াছেন। জাতি-বৈরের কাব্যে হিসাবে 'বৃত্রসংহার' বাঙ্গালার অদ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ —ভাবে, রসে ও ঝাঁজে যেন ফাটিয়া পড়িতেছে; এমন হয় নাই, বুঝি-বা এমন হইবে না।"[২১] আর রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা'য় (১৮৭৮) মন্তব্য করেছেন—"এক্ষণকার কবিদিগের মধ্যে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ দ্বারা সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত।"

কিন্তু কালের পরিবর্তনে 'বৃত্রসংহারকাব্য'-এর বিচারেও পরিবর্তন ঘটেছে। হেমচন্দ্রের মহিমা হ্রাস পেয়েছে। বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে সমালোচকের মনে হয়েছে—"বৃত্রসংহার মেঘনাদবধের মত এক অখণ্ড রসের অভিব্যক্তি, এক সুসংযত ভাব-কল্পনার বিকাশ, এক আদ্য-মধ্য-অন্ত সম্বলিত অনবদ্য গঠন-সুষমার নিদর্শন নহে। ইহার ঘটনা-বিন্যাসের অন্তরালে কোন নবানুভূত সাংকেতিক তাৎপর্য্য, কোন তীব্র, একমুখীন হৃদয়াবেগ গভীরতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে নাই। ইহার তথ্য-সমাবেশ কোন নবারুণদ্যুতির আভাসে ভাস্বর হইয়া উঠে নাই।"[২২]

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে যে কবি অত্যন্ত পাঠক-সমাদৃত ছিলেন, যাঁর কাব্য ও কবিতা-সংকলনসমূহ বহু সংস্করণ-ধন্য, বিশ শতকের অন্তিম পর্যায়ে তিনি বিস্মৃতপ্রায়। একদা তাঁর কাব্য-কবিতা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত পঠিত হোত। আজ তাঁর কোনো কোনো কবিতা অবশ্য স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে কখনো কখনো স্থান পেয়ে থাকে।

আর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁকে স্মরণ করা হয়।

বেশ বোঝা যায়, হেমচন্দ্রের কাব্য-কবিতা রসমূল্যে কালোত্তীর্ণ হতে পারে নি। একালের বিচারে তাঁর অধিকাংশ কবিতাই পদ্যপদবাচ্য। আর কাব্যসমূহ নীরস, বর্ণনাত্মক।

অথচ মধুসূদন আজও পাঠক-সমাদৃত। তাঁর মহিমা ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। কালজয়ী সাহিত্য-স্রষ্টারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন তিনি। তাঁর সাহিত্য পেয়েছে ধ্রুপদী মহিমা।

তা সত্ত্বেও হেমচন্দ্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। নবজাগরণ-কালের আশা আকাঙ্ক্ষা, আলোড়ন-উদ্দীপনা, আক্ষেপ ও হতাশা তাঁর কাব্য-কবিতায় বিধৃত। কবি হেমচন্দ্র কালের সাক্ষী। কবি হেমচন্দ্র কালের শিকারও। মহাকাল বড় নির্মম বিচারক![২৩]

কালীপ্রসন্ন সিংহ

বন্দনা

উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময় বাংলার জীবনে ব্যস্ততম কাল। সমাজ-আন্দোলন, শিক্ষাবিস্তার, সাহিত্য-শিল্পের প্রসার, নাট্যরচনা ও অভিনয়, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, জাতীয়তাবোধের উন্মেষ—নানা মানুষের নানা প্রচেষ্টার মধ্যে বহুবিচিত্র কর্মযজ্ঞ। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিত্বের কার্যসম্ভারে বাংলার সে এক মানুষ হয়ে ওঠার পালা।

ঠিক এই সময়ে, ১৮৪০-১৮৭০, মোটে তিরিশ বছরের আয়ুষ্কাল নিয়ে কালীপ্রসন্নের আবির্ভাব। জোড়াসাঁকোর এক শ্রেষ্ঠ ধনী পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা নন্দলাল সিংহও মারা যান অল্প বয়সে। তখন কালীপ্রসন্নের বয়স মোটে ছয় বৎসর। অল্প বয়সে পিতৃহীন হয়ে কালীপ্রসন্ন যে ধনসম্পত্তির অধিকারী হন, সে যুগে একজন ধনী বাঙ্গালী পরিবারের সবার পক্ষে তা জোটে নি। কিন্তু স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী তিনি আলস্যে, বিলাসে, ভোগে, দম্ভে কিংবা শৌখিন কর্মকাণ্ডে নিজেকে কখনোই জড়িত রাখেন নি। মাত্র তিরিশ বছরের জীবনে কালীপ্রসন্ন বড় মাপের যে কত কাজ করে গেছেন, তার হিসেব নিলে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। মনে হয়, যেন তাঁর সময়-কালের বাংলায় যত রকমের কর্মকাণ্ড ঘটে চলেছে, তিনি তার প্রায় সব কিছুর সঙ্গেই নিজেকে জড়িত রেখেছেন। এবং প্রায়শই নিজের ক্ষমতায়, প্রতিপত্তিতে ও কর্মকৃতিত্বে নিজেকে প্রথম সারিতে স্থাপন করেছেন। তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে যে অসংখ্য কাজ তিনি করে গেছেন, তাঁর মৃত্যুর শতাধিক বৎসর পরেও তা আমাদের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

বাড়িতেই Debating Club প্রতিষ্ঠা করে তিনি আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত ঘটান। সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হল বিদ্যোৎসাহিনী সভা। এই সভা কালীপ্রসন্ন যখন প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁর বয়স চোদ্দ-পনেরো বৎসর। এই সভার উদ্যোগেই শুরু হয় তাঁর প্রাথমিক কাজকর্ম। সাহিত্য-শিল্প-সমাজ বিষয়ে আলোচনা, বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা প্রকাশ, সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ—সব কাজ করে চলেছেন তিনি। ওই সভারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করলেন বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ। আগে থেকেই নাট্যরচনায় হাত দিয়েছিলেন, এবার নিজের প্রতিষ্ঠিত মঞ্চের জন্য নাট্যরচনা শুরু হল। শুধু নাট্যরচনা নয়, প্রযোজনা-পরিচালনা এবং অভিনয়েও মুখ্য অংশ গ্রহণ করলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের বাংলায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা করলেন। বিদ্যাসাগরের উৎসাহ ও উপদেশ, বহু শিক্ষিত ও পণ্ডিত মানুষের সহায়তায় নিজে মুখ্য সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করে নয় বছরের মধ্যে সপ্তদশ খণ্ডের বাংলা অনুবাদ মুদ্রিত করে প্রকাশ করলেন এবং তিন সহস্র মহাভারত বিনামূল্যে বিতরণ করলেন।

বাইশ বছর বয়সে রচনা করেন বাংলা সাহিত্যের অসামান্য উজ্জ্বল গ্রন্থ 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'। এই একটি গ্রন্থ রচনার জন্যই তিনি এদেশে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। রচনা করলেন আইন বিষয়ক ইংরেজি গ্রন্থ—*The Calcutta Police Act.*

সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র প্রকাশে অগ্রণী হলেন। বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' পূর্বেই প্রকাশ করেছিলেন। তা ছাড়া মাসিকপত্র 'সর্বতত্ত্ব-প্রকাশিকা' প্রকাশ করেন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক ও প্রধান ব্যক্তি হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হলে কালীপ্রসন্ন ওই পত্রিকার সর্বস্বত্ব ক্রয় করেন এবং নিজ দায়িত্বে এই অসামান্য পত্রিকাটি প্রকাশ অব্যাহত রাখেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-র খ্যাতিমান সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদক-পদ ত্যাগ করলে কালীপ্রসন্ন ওই প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার সম্পাদক পদে বৃত হন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে সেই কর্ম সম্পাদন করেন। এর সঙ্গেই 'পরিদর্শক' নামে একটি দৈনিকপত্রও চালাতে থাকেন। নিজের পত্রিকা পরিচালনা কিংবা অন্য পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ ও সম্পাদনা করা ছাড়াও, তিনি সেই সময়ের অনেক ইংরেজি, বাংলা, উর্দু পত্রপত্রিকার প্রকাশ ব্যাপারে অর্থ সাহায্য করতে থাকেন।

সাহিত্যের উন্নতির জন্য নিজে সাহিত্যরচনা করা ছাড়াও অন্য লেখকদের তিনি উৎসাহ দিতে থাকেন। নিজের উদ্যোগে 'সাহিত্য সম্মিলনী' অনুষ্ঠান করে সমসাময়িক লেখকদের একসঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া সাহিত্যরচনায় উৎসাহ দানের জন্য পুরস্কার দেওয়া, গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়া—এসব কাজও তিনি করে গেছেন।

তখন সমাজ আন্দোলনের যে উত্তুঙ্গ জোয়ার বইছিল, কালীপ্রসন্ন তাতেও নিজেকে জড়িত রেখেছিলেন। বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ' আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন, রক্ষণশীলদের প্রতিবাদের উত্তরে নিজে উদ্যোগী হয়ে অজস্র মানুষের সই সংগ্রহ করে বিধবাবিবাহের সপক্ষে আন্দোলনে নেমে পড়েন। বিধবাবিবাহ আইন চালু হলে, বিধবা বিবাহেচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এর সঙ্গে বহুবিবাহ বন্ধের জন্য আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং কৌলীন্যপ্রথা নিবারণের উদ্যম—সমাজ-আন্দোলনে অংশগ্রহণের অংশবিশেষ।

এদেশীয় শিক্ষা প্রসারের জন্য একাধিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং অন্য বিদ্যালয়কে অর্থ সাহায্য, এগুলি তো ছিলই। তার ওপরে নীল আন্দোলনে কৃষকদের পক্ষাবলম্বন

করা, নীল-মামলায় সহায়তা, লঙের জরিমানার অর্থদান, নিজ ব্যয়ে 'নীলদর্পণ' নাটকটি প্রকাশ করে বিতরণ করা, নিজে জমিদার হয়ে প্রজার পক্ষ অবলম্বন করা, কৃষকদের দুর্দশার বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা ও তাদের উন্নতির পথনির্দেশ করা—সবই তাঁর কাজের অঙ্গ। দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে, তার প্রতিরোধের চেষ্টায় তিনি এগিয়ে আসেন। আবার ল্যাংকাশায়ারের দুর্ভিক্ষেও তিনি বিচলিত হয়ে অর্থ সাহায্য করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সপক্ষে সেই যুগে একমাত্র তিনিই দাঁড়িয়েছিলেন।

কালীপ্রসন্নের সব কাজের পেছনেই ছিল একটি সুস্থ, পরিচ্ছন্ন সামাজিক দায়িত্ববোধ। এই দায়বদ্ধতার দ্বারাই তিনি চালিত হয়েছিলেন। কোনো রকম ভাবাবেগ বা অহমিকা কিংবা দম্ভ এর পেছনে কাজ করেনি। এর দ্বারা প্রণোদিত হয়েই তিনি দেশ, জাতি, ভাষা, শিক্ষা, রাজনীতি, কৃষি, স্বাস্থ্য, নারীস্বার্থ, প্রজাস্বার্থ ইত্যাদি সর্ব বিষয়েই নিজেকে যুক্ত করেছেন। মাত্র তিরিশ বছরের জীবনকালে এত বহুবিধ কাজের সঙ্গে যুক্ত একজন মানুষ কমই দেখতে পাওয়া যায়!

শিক্ষা

কলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলে বিখ্যাত সিংহ পরিবারে কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম। পিতা নন্দলাল সিংহ এবং মাতা ত্রৈলোক্যমোহিনী। ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর জন্ম। তাঁর যখন ছয় বৎসর বয়স, তখন তাঁর পিতা নন্দলালের মৃত্যু হয়। সিংহ পরিবারের অতুল বৈভবের অধিকারী হন কালীপ্রসন্ন। নন্দলাল কোনো দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন নি। বাল্যকাল থেকেই কালীপ্রসন্নের অভিভাবক হন বিচারক হরচন্দ্র ঘোষ। তিনি ছিলেন কলকাতার ছোট আদালতের তৃতীয় জজ, উকিল নন। এই হরচন্দ্র ঘোষ তখনকার পরিচিত নাট্যকার হরচন্দ্র ঘোষ নন। কালীপ্রসন্নের সম্পত্তির এবং স্বয়ং কালীপ্রসন্নের দেখাশোনার সব দায়িত্ব ইনি গ্রহণ করেন। তিনি কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর দু বছর আগেই (১৮৬৮) মারা যান। হরচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে সিংহ পরিবারের সম্পত্তি যেমন বেড়েছিল, তেমনি স্বয়ং কালীপ্রসন্নেরও শিক্ষা ও চরিত্রগঠন মজবুত হয়েছিল। তাঁর ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি হিন্দু কলেজে পড়াশোনা করেন। গৃহশিক্ষক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে তিনি সংস্কৃত শেখেন এবং বাংলাভাষা অনুশীলন করেন। উইলিয়াম ক্লার্ক পেট্রিক সাহেবের কাছে ইংরেজি শেখেন। প্রথাগত শিক্ষার বাইরে তিনি নিজের চেষ্টায় ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বংশগত ঐতিহ্য ও পরিবেশ। তা ছাড়া স্বয়ং বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁদের পরিবার ও তাঁর অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক ছিল। ধনী অভিজাত বাঙ্গালী পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি চিরকাল বিদ্যাসাগরের আদর্শে ধুতি-চাদর ও চটিজুতা পরতেন।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁর বাল্যকাল থেকেই গড়ে উঠেছিল। জীবন-গঠনে যেমন হরচন্দ্র ঘোষের অভিভাবকত্ব কাজ করেছে, তেমনি মানবিকতার বিস্তারে, চরিত্রগঠনে তাঁর ওপর বিদ্যাসাগরের প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা

বিদ্যোৎসাহিনী সভার মধ্য দিয়েই কালীপ্রসন্নের চিন্তা ও কাজের প্রকাশ ও বিকাশ ঘটেছিল। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর বাড়িতে Debating Club প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে ওই সভার নাম হয় বিদ্যোৎসাহিনী সভা। এই সভার সভ্য ছিলেন তৎকালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ। প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, কৃষ্ণদাস পাল, বিদ্যাসাগর প্রমুখ এর সভ্য ছিলেন। কালীপ্রসন্ন ছিলেন এই সভার প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক, পরিচালক ও প্রাণপুরুষ। এর আগে রামমোহনের আত্মীয়সভা (১৮১৫) এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯) ছিল অনেকাংশেই ধর্মীয় সভা। তবে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৪১), সর্ব্বশুভকরী সভা (১৮৪৯), সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ সমিতি (১৮৫৪) প্রভৃতি সাধারণ সভা থাকলেও, বিদ্যোৎসাহিনী সভাই বলা যেতে পারে, সাহিত্য-শিল্প সমাজভাবনার প্রথম সভা। এই সভার বিবরণ দিয়ে 'সংবাদপ্রভাকর' (১ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬) লিখেছিল:

> "...এই সভাদ্বারা দেশের যে কত হিতসাধন হইবেক তাহা বলা যায় না। ইতিপূর্বে এই কলিকাতা নগরীতে একটিও বাঙ্গালা সভা ছিল না, শ্রীযুক্তবাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা করিবাতে অধুনা অনেক ভদ্র সন্তানেরা আপনাপন বাটীতে এক এক বাঙ্গালা সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ...আমরা দেশীয় সকল ব্যক্তিকে এই পরামর্শ প্রদান করি যে শ্রীযুক্তবাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের দৃষ্টান্তের অনুগামী হউন, তাহা হইলে বোধকরি অত্যল্পকালমধ্যে দেশস্থ তাবতেই সভ্যতাসোপানে পদার্পণ করিবেক।"

বিদ্যোৎসাহিনী সভার কার্যাবলী

এই সভায় ধর্মসম্বন্ধীয় কোনো আলোচনা বা কাজ হোত না। ধর্মভাবমুক্ত এই সভার দ্বারা সমাজ সাহিত্য রাজনীতি প্রভৃতি বহু বিষয়ে উদ্যোগী কাজকর্ম করা হোত। তার কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন যখন তীব্র আকার ধারণ করে, তখন কালীপ্রসন্ন ও বিদ্যোৎসাহিনী সভা তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। কালীপ্রসন্ন বরাবরই বিধবাবিবাহের সপক্ষে ছিলেন। কলকাতার রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গ এর প্রতিরোধে একত্র

হয় এবং তারা স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনপত্র ইংরেজ সরকারের কাছে পাঠিয়েছিল। কালীপ্রসন্ন তখন বিদ্যোৎসাহিনী সভার উদ্যোগে বিধবাবিবাহের সমর্থনে প্রায় তিন হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন এবং সেই আবেদনপত্র পাঠিয়ে দেন ব্যবস্থাপক সভায়।

তারপর বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে (১৮৫৬) এই বিবাহকে জনমধ্যে প্রচলিত করে তোলার জন্য তিনি এগিয়ে আসেন। ঘোষণা করা হয়, যাঁরা বিধবা বিবাহ করবেন, বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে তাঁদের এক হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করা হবে। সেই মর্মে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হতে থাকে। বিধবাবিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরের সর্বকার্যের দোসর ছিলেন কালীপ্রসন্ন। তার সঙ্গে বহুবিবাহ নিবর্তন এবং কৌলীন্য-প্রথা রহিতকরণেও তাঁকে সাফল্যজনক ভূমিকা নিতে দেখা যায়।

২. কলকাতায় বারাঙ্গনাদের নির্দিষ্ট কোনো বাসস্থান ছিল না। তাদের নিজস্ব কোনো এলাকাও ছিল না। শহরের যত্রতত্র এদের বাস এবং ক্রমসংখ্যাবৃদ্ধি সমাজের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বারাঙ্গনাদের শহর প্রান্তে নির্দিষ্ট স্থানে সরিয়ে এনে তাদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা স্থিরীকৃত করে দেওয়ার সক্রিয় উদ্যোগ নেন কালীপ্রসন্ন। এই মর্মে বিদ্যোৎসাহিনী সভায় আলোচনা হয়, বিভিন্ন স্থানে আলোচনাসভার ব্যবস্থাও করা হয়, ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে আবেদনপত্র পাঠানো হয়। শেষ পর্যন্ত সোনাগাছি ইত্যাদি কয়েকটি অঞ্চল বারাঙ্গনাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

৩ মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কাব্য প্রকাশিত হলে দেশীয় শিক্ষিত-জনের মধ্যে পক্ষে-বিপক্ষে বিস্তর আলোচনা সমালোচনা হতে থাকে। 'মেঘনাদবধের' যথার্থ মূল্যায়ন করতে ইতিহাস অনেক সময় নেয়। কিন্তু কাব্যটি প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই (১২ ফেব্রুয়ারী ১৮৬১) বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে মধুসূদনকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। কালীপ্রসন্ন তার প্রধান উদ্যোক্তা। সেখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মধুসূদনের কাব্যের এবং তার প্রকাশরীতির প্রশংসা করা হয়। একটি মানপত্র অর্পণ করা হয়। রুপোর তৈরি একটি সুদৃশ্য পানপাত্র কবিকে উপহার দেওয়া হয়। বাংলায় এই জাতীয় সম্বর্ধনার ব্যবস্থা এই প্রথম।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে ভারতবন্ধু রেভারেন্ড লঙ সাহেবকেও সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁর স্বদেশযাত্রা-কালে এই সম্বর্ধনার (১ মার্চ ১৮৬২) ব্যবস্থা করে কালীপ্রসন্ন এই বিদেশী বন্ধুর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

৪. এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের পর মাতৃভাষায় শিক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বই নিয়ে বিদ্যাসাগর ইংরেজ সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠান। নিচু ক্লাসের মতো উঁচু ক্লাসেও বাংলাভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম করার সুপারিশ করা হয়। সঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়েও প্রস্তাব পাঠানো হয়। ইংরেজ সরকার কিছুটা আগ্রহ দেখিয়ে বিদ্যালয় স্থাপন, খরচ-খরচার ঘাটতিপূরণ, স্ত্রী-শিক্ষা প্রসার প্রভৃতি বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু তখনকার চাহিদার তুলনায় তা কিছুই নয়। তাই কাজ হচ্ছিল নামমাত্র। বালিকা-

বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের বেতন অবধি জুটছিল না। সরকার মোটামুটি ঘাটতি পূরণ করে দিলেও, সামগ্রিক আর্থিক দায়িত্ব পালনে সম্মত হল না। ফলে বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং ধনী অভিজাত ও শিক্ষিত মানুষদের সহায়তায়, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে চাঁদা তুলে এই নতুন বিদ্যালয়গুলিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন।

কালীপ্রসন্ন এই ব্যাপারে প্রথম থেকেই এগিয়ে আসেন। তিনি বিদ্যাসাগরের কাজে সহায়তা করেন এবং নিজেও উদ্যোগ নিয়ে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন, শিক্ষা-কেন্দ্রগুলিতে অর্থ সাহায্য করেন। বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনে তিনি বিদ্যোৎসাহিনী পাঠশালা পরিচালনা করতেন। বহু ছাত্র সেখানে লেখাপড়ার সুযোগ পেত। সাতটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন, একটি বিদ্যালয়ে একশত টাকা দিয়ে ইংরেজি ও সংস্কৃতের শিক্ষক রাখার ব্যবস্থা করে দেন। এইসব বিদ্যালয়ের সকল কৃতী ছাত্রদের তিনি পুরস্কার দিতেন। বাংলাভাষায় ভাল রচনার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। অর্থ সাহায্য দিয়েও বহু ভাল ছাত্রের পরবর্তী উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন।

৫. সাহিত্যচর্চা ও আলোচনার একটি উদ্যোগী সংস্থা হিসেবে বিদ্যোৎসাহিনী সভা তার কার্য পরিচালনা করতে থাকে। সমাজসমস্যা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে এখানে সাহিত্য আলোচনাও হতে থাকে। সাহিত্যচর্চাতেও উৎসাহ সৃষ্টি করা হয়। কালীপ্রসন্ন নিজে উদ্যোগী হয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর লেখা 'বাবু' প্রহসনটি ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। বিদ্যোৎসাহিনী সভা থেকে এর পুনর্মুদ্রণ করা হয় ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে। কালীপ্রসন্নের সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করা দুটি নাটক বিক্রমোর্বশী (১৮৫৭) এবং মালতীমাধব (১৮৫৮) এবং মৌলিক নাট্যরচনা সাবিত্রী-সত্যবান (১৮৫৮) এখান থেকেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে সেগুলির অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়।

অন্যদের সাহিত্য অনুশীলনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য তিনি পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। দুশো, তিনশো টাকা পর্যন্ত তিনি পুরস্কার দিয়েছিলেন।

৬. মূল মহাভারতটি বাংলায় গদ্যানুবাদ করে প্রকাশ করেন। সাতজন কৃতবিদ্য সদস্য পণ্ডিতের যৌথ-প্রচেষ্টায় এই কাজ শেষ করতে সময় লাগে নয় বছর। সপ্তদশ খণ্ডে মহাভারত মুদ্রিত করে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

৭. এ ছাড়া পুস্তকালয় স্থাপন, দাতব্য চিকিৎসালয় ও ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা এবং জলসত্র নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। কলকাতার মানুষের জলকষ্ট দূর করার জন্য কালীপ্রসন্ন বিলেত থেকে চারটি আধুনিক ধারাযন্ত্র আনিয়ে শহরের চারটি স্থানে সুদৃশ্যভাবে বসিয়ে দেন। খরচ হয় প্রায় তিন হাজার টাকা। সেই ধারাযন্ত্রগুলি এখনো শহরের সুদৃশ্য শোভাবর্ধন করে চলেছে।

৮. বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। নাম বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২০ এপ্রিল ১৮৫৫, সম্পাদক ও

পরিচালক কালীপ্রসন্ন। বিদ্যোৎসাহিনী সভার সকল কার্য ও তার বিবরণ এতে প্রকাশিত হোত। তা ছাড়া সমাজ, সাহিত্য রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ আলোচনা প্রকাশ পেত। কালীপ্রসন্নের লেখা 'বাল্যবিবাহ', 'বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা' প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার যেসব কাজকর্ম তখন নিয়মিত হয়ে চলেছে, তার সর্বাংশেই কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বয়ং। এবং তখন তাঁর বয়স কুড়ি বৎসরের মধ্যে।

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ

বিদ্যোৎসাহিনী সভার উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয় বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কিছু আগে থেকেই কলকাতা ও আশেপাশের অঞ্চলে ধনী বাঙ্গালীদের বাড়িতে রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে নাট্যাভিনয়ের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। কিছুটা খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার জন্য, কিছু অংশে আভিজাত্য ও জাঁকজমক দেখানো এবং অবশ্যই ইংরেজদের মতো তারাও নাট্যশালা তৈরি করে নাট্যাভিনয় করতে পারে, এমন একটা অহমিকা-বোধ--এই সব মিলিয়েই ধনী বাঙ্গালীর প্রাসাদমঞ্চে নাট্যাভিনয় শুরু হয়। তবে এদের মধ্যে যে গুটিকয়েক মঞ্চ ও তার উদ্যোক্তা যথার্থ নাট্যাভিনয়ের ইচ্ছাতেই রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিল, বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ সেকটির অন্যতম।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১১ এপ্রিল, রামনারায়ণ তর্করত্নের অনুবাদ করা ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয় দিয়ে এই রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হয়। যদিও এর এক বছর আগেই এই রঙ্গমঞ্চটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই রঙ্গমঞ্চে আর অভিনীত হয়েছিল কালীপ্রসন্নের অনুবাদ করা কালিদাসের বিক্রমোর্বশী (২৪ নভেম্বর ১৮৫৭), মণিমোহন সরকারের অনুবাদ করা মহাশ্বেতা (১৮৫৭)। কালীপ্রসন্নের অনূদিত মালতীমাধবের অভিনয়ের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা, রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে নাটক রচনা করা এবং পাশ্চাত্য থিয়েটারের রীতিতে নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা--সব কিছুরই প্রাণপুরুষ কালীপ্রসন্ন। বাংলা থিয়েটারের উদ্যোগপর্বেই দেখি, কালীপ্রসন্ন মঞ্চের মালিক, নাট্যকার এবং প্রধান অভিনেতা। 'বিক্রমোর্বশী' তাঁর নাটক, প্রধান উদ্যোগীও তিনি এবং এই নাটকের প্রধান চরিত্র পুরুরবার ভূমিকাভিনেতাও বটে। সে সময়ের সংবাদপত্রে তাঁর এই অভিনয়ের প্রচেষ্টা এবং পুরুরবার চরিত্রে অভিনয় খুবই প্রশংসা লাভ করেছিল। কালীপ্রসন্ন কখনো কোনো নারীচরিত্রে অভিনয় করেছেন, এমন তথ্য আমাদের জানা নেই।

'সাবিত্রী-সত্যবান' পুরাণ অবলম্বনে লেখা তাঁর মৌলিক নাট্যরচনা। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে এই নাটকটির ঠিক প্রথাগত অভিনয় হয়নি। এখানে এই নাটকটির

'আভিনয়িক পাঠ' হয়। হয়েছিল ৫ জুন, ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে। 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকার বিবরণ (৫ জুন ১৮৫৮) :

"...কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গভূমিতে শ্রীযুক্তবাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত সাবিত্রী-সত্যবান নাটকের আভিনয়িক পাঠ হইবেক। এরূপ প্রথা বঙ্গবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত নাই, তবে ইংরাজী সেক্সপীয়ার প্রভৃতি যেরূপ পঠিত হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপে পঠিত হইবেক অধিকন্তু ইহাতে বিস্তর গীত সংযোজিত হইবায় তাহা যন্ত্রের সহিত মিশাইয়া গান করা যাইবেক।"

ঠিক কী ধরনের অভিনয় হয়েছিল তা সঠিক বোঝা না গেলেও, এটুক বোঝা যাচ্ছে যে, রঙ্গমঞ্চে প্রথাগত অভিনয় হয় নি। সঙ্গীত সহযোগে পাঠের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যন্ত্রানুষঙ্গও ছিল। ড. সুকুমার সেন মনে করেন, 'Dramatic recital' ধরনের হয়েছিল। তবে একথা ঠিক, বাংলা রঙ্গমঞ্চে আভিনয়িক পাঠ এই প্রথম। অভিনয়ের সেই হুজুগের দিনে, নাটক নিয়ে এই ধরনের পরীক্ষা, বাদ্যগীতাদি সহযোগে এই ধরনের আভিনয়িকপাঠ নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা মঞ্চে কালীপ্রসন্ন প্রথম অভিনেতা নাট্যকার। এর আগে বাংলায় এরকম দেখা যায় নি। পরে অবশ্য এর বহুল প্রচলন হয়। তা ছাড়া তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। 'পুণ্য' পত্রিকায় (পৌষ-মাঘ, ১৩০৫) হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'কালীপ্রসন্ন সিংহ' প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, কালীপ্রসন্ন অলাবু তুম্বের ধরনে কাগজের তুম্ব তৈরি করেছিলেন। "৺কালিসিংহ মহাশয়ের তাম্বুরু নামক কলাবতী বীণার এরূপ কাগজের তুম্বী নির্মাণের চেষ্টার জন্য সমস্ত সঙ্গীতসমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।"

তিনি তখনকার কলকাতার নাট্যমোদী ব্যক্তি বলে পরিচিত ছিলেন, অন্যান্য রঙ্গমঞ্চগুলির সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত থেকেছেন, তাদের উৎসাহিত করেছেন, নাট্যাভিনয় দেখতে গিয়েছেন। শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটির তিনি কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালা সেই সময়ে সাহস করে মধুসূদনের প্রহসন দুটি 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' অভিনয় করতে পারে নি। কালীপ্রসন্নের সভাপতিত্বে শোভাবাজারের নাট্যদল কিন্তু সাহস করে প্রথমটির অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিল। তা ছাড়া যে বাগবাজার এমেচার নাট্যাভিনয়ের ধারায় পরিবর্তনের সূচনা করতে চলেছিল, যাদের উদ্যোগে এর পরেই (১৮৭২) ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হতে চলেছিল, কালীপ্রসন্ন তাদের 'সধবার একাদশী'র তৃতীয় অভিনয়ে উপস্থিত থেকে উৎসাহিত করেছিলেন।

কালীপ্রসন্নের নাট্যরচনায় সংস্কৃত নাট্যরচনার বিন্যাসকেই বেশি লক্ষ্য করা যায়। তার সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য নাট্যরীতিকেও মেনেছেন, বিশেষ করে নাট্যরীতির গঠনগত আঙ্গিকের দিক দিয়ে। এই মিশ্র ভাবনা সেই সময়কার অনেক নাট্যকারের মধ্যেই দেখা যায়। এমন কি মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকেও এই মিশ্রভাবনা রয়েছে। প্রথম থেকেই

বাংলা নাটকে এই দুই রীতির সমন্বয়ের একটা চেষ্টা দেখা যায়। পরবর্তীকালে তারই অনুসরণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে।

মহাভারত অনুবাদ

শুধুমাত্র মহাভারত অনুবাদ কর্মের জন্যই কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে অনুবাদ শুরু করে ১৮৬৬-তে এই কাজ শেষ হয়। এই সময়ের মধ্যেই খণ্ডে খণ্ডে পুস্তকাকারে তিনি এটি প্রকাশ করেন। মোট ১৭টি খণ্ড। তিন হাজার কপি বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেন। জাতির মানসে মহাভারতের প্রভাব তৈরি করার জন্যই তাঁর এত উদ্যোগ, আয়োজন ও অর্থব্যয়। মোট আড়াই লক্ষ টাকা খরচ হয়। এর জন্য তাঁকে উড়িষ্যার জমিদারি ও কলকাতার বেঙ্গল ক্লাবের সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে হয়।

বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণায় ও উপদেশেই তিনি এত বড় একটি কাজে হাত দেন। বিদ্যাসাগর এর পূর্বেই মহাভারতের কিছু কিছু বাংলা গদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশও করেছিলেন মহাভারতের আদিপর্বের (উপক্রমণিকা ভাগ) প্রথম ৬২টি অধ্যায়। তারপর কালীপ্রসন্নের উদ্যোগে মহাভারতের অনুবাদকর্ম শুরু হলে বিদ্যাসাগর নিজের কাজ বন্ধ করে দেন এবং কালীপ্রসন্নকে বারবার অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দেন। এর দু মাস আগে বর্ধমানের মহারাজা সরল গদ্যে মহাভারত অনুবাদ শুরু করেছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্নের জীবিতকালে তার কোনো খণ্ডই প্রকাশিত হয় নি। সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে।

সাত জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহায়তায় অনুবাদকর্ম শুরু হয়। বিদ্যাসাগর-নির্দিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলী পরে সংখ্যায় আরো বেড়ে যায়। অনূদিত মহাভারতের উপসংহারে কালীপ্রসন্ন সশ্রদ্ধচিত্তে এই পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তার কথা উল্লেখ করেছেন। চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, কালীপ্রসন্ন তর্করত্ন, ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য তখন প্রয়াত। আর জীবিতদের মধ্যে ছিলেন অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন, রামসেবক বিদ্যালঙ্কার এবং হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের অষ্টাদশ খণ্ড মহাভারত বাংলা অনুবাদে ১৭টি পৃথক খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়। প্রাঞ্জল গদ্যে পুরো অনুবাদ করা হয়। বিদ্যাসাগর ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি সব সময়ে সাহায্য করেন।

কালীপ্রসন্ন বারবার পণ্ডিতদের সহযোগিতার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। ফলে অনেকেরই মনে হতে পারে যে, বোধ হয় কালীপ্রসন্ন নিজে এই অনুবাদের কাজে কোনো অংশ গ্রহণই করেন নি। কিন্তু একথা আজ পরিষ্কার যে, সব পণ্ডিতের সাহায্য সত্ত্বেও

কালীপ্রসন্নের কলম সব সময়েই সক্রিয় ও যুক্ত ছিল। আজকের ভাষায় এডিটর ইন চীফ হিসাবে তিনি সকলের বঙ্গানুবাদ নিজে দেখতেন এবং ভাষাগত ঐক্য রক্ষার জন্য কলম ধরতেন। তা না হলে বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন ধরন ও রীতি এই অনুবাদে থেকে যেত। তার বদলে এই অনুবাদকর্মে সব সময়েই ভাষার ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রধান সম্পাদক কালীপ্রসন্নের নিপুণ হস্ত সব কিছুর ওপরে কাজ করে গেছে। বোঝা যায়, এ ভাষা তৎকাল-প্রচলিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতী ভাষা নয়, এ ভাষা বিদ্যাসাগর-প্রচলিত সাধু গদ্যের ক্লাসিকরূপী, অথচ প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। যথার্থ সম্পাদকের কার্য সম্পাদনে কালীপ্রসন্নের কৃতিত্ব তাই অনস্বীকার্য।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থ সংগ্রহে লিখেছিলেন :

> "কালীপ্রসন্নবাবু অতীব সাবধানে সংস্কৃত মূলের অবিকল অর্থ বাঙ্গালা অনুবাদেতে রক্ষা করিয়াছেন এবং ঐ অনুবাদও এতাদৃশ সুকোমল ও সুমধুর হইয়াছে যে, তাহার পাঠমাত্রেই পরিতৃপ্ত হইতে হয়।"

কালীপ্রসন্নের মহাভারতের প্রাঞ্জল ও সরল অনুবাদের প্রশংসা সে যুগে অনেকেই করেছেন। সুললিত ও সাধুভাষায় এই অনুবাদকর্মই যে শ্রেষ্ঠ এবং এই অনুবাদ যে সরল ও সাহিত্যগুণসম্পন্ন, ফলে পাঠকের কাছে সবচেয়ে বেশি আদৃত, একথা লিখেছেন ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর Literature of Bengal গ্রন্থে। মহাভারতের এই গদ্যানুবাদে পণ্ডিতী ভাষার গাম্ভীর্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রসাদগুণ ও লালিত্য। সেই কারণে এর অনুবাদের একশ বছর পরেও 'মহাভারতের কথা' লিখতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসুকে স্বীকার করতে হয়েছে : 'মূলানুগ ও সুখপাঠ্য এই অনুবাদকর্ম বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।'

সে সময়ে চলছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসারের যুগ ও হুজুগ। তখন কালীপ্রসন্ন জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মহাভারতের ভূমিকায় তিনি সেকথা লিখেও গেছেন। ভারতবর্ষের গৌরবস্বরূপ মহাভারতের 'অবশ্যম্ভব মর্য্যাদা' যাতে চিরদিন বর্ত্তমান থাকে সেই কারণেই তিনি এই 'দুঃসাধ্য ও চিরসঙ্কল্পিত' ব্রতে ব্রতী হয়েছিলেন।

এই ভাবেই তিনি শ্রীমদ্ভাবগীতার বঙ্গানুবাদও করেন। এই অনুবাদ তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমের গীতার ব্যাখ্যা ও কৃষ্ণচরিত্রের উপস্থাপনার অনেক আগেই কালীপ্রসন্ন এই কার্যে যত্নবান হয়েছিলেন। তাঁর ভাগবতের অনুবাদে ও ব্যাখ্যায় ভাবাবেগের চেয়ে যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যাই বেশি।

এ ছাড়া আরো কিছু পুরাণের অনুবাদের পরিকল্পনা ছিল তাঁর। বরাহনগরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'পুরাণ সংগ্রহ কার্য্যালয়' থেকেই এই সব অনুবাদ কর্ম করা হোত। মহাভারতের অনুবাদের বিশাল কর্মযজ্ঞ এখানেই হয়েছিল। মহাভারতের উপসংহারে কালীপ্রসন্ন ঘোষণাও করেছিলেন যে, তিনি হরিবংশ ইত্যাদি আরো অনেক পুরাণের

অনুবাদের ব্যবস্থা করবেন। রামায়ণ অনুবাদের সংকল্পও তাঁর ছিল। মহাভারতের সঙ্গে একই সময়ে রামায়ণ অনুবাদেরও কথা প্রচার করা হয়েছিল (সংবাদ প্রভাকর, ১৩ জুলাই ১৮৫৮)। কিন্তু মহাভারতের কাজ শুরু করে তার বিশাল চাপে রামায়ণ অনুবাদের পরিকল্পনা বন্ধ হয়ে যায়।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টের লেখা জুলিয়াস সীজারের জীবনচরিত অনুবাদের ইচ্ছাও তাঁর ছিল। কিন্তু অকালমৃত্যু এইসব চিন্তাভাবনাকে বাস্তবায়িত হতে দেয় নি।

পত্রপত্রিকা সম্পাদনা

কালীপ্রসন্ন তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের ফাঁকে কত যে পত্রপত্রিকা প্রকাশ করেছেন, সম্পাদনা করেছেন, উপদেষ্টা থেকেছেন, আর্থিক সহায়তা করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই।

১. বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা—বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হোত। এটি মাসিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ (৮ বৈশাখ ১২৬২ সাল) কালীপ্রসন্ন এর প্রধানতম ব্যক্তি ছিলেন। সম্পাদক তো ছিলেনই। প্রায় এক বছর পত্রিকাটি চলেছিল। কলকাতার বাইরে মফঃস্বলেও এই পত্রিকাটি জনপ্রিয় ছিল। মূল্য ছিল এক আনা। বিদ্যোৎসাহিনী সভার ভাবনাচিন্তা ও কর্মের প্রকাশ এই পত্রিকায় ঘটতো। সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য সব বিষয়েই লেখা থাকতো।

২. সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা—প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসন্ন। এটিও ছিল মাসিক পত্রিকা। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'প্রাণিবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা, শিল্পসাহিত্য দ্যোতক' পত্রিকা ছিল এটি।

৩. বিবিধার্থ সংগ্রহ—যে যুগের প্রথম শ্রেণীর এই পত্রিকাটির প্রথম ছয় পর্বের সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র। এটি ছিল সে যুগের প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা। 'পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্পসাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।' ছয় পর্ব সম্পাদনা করার পর ১৭৮১ শকের চৈত্র মাসে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদক-পদ ত্যাগ করেন। তখন এই উচ্চ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাটির সম্পাদক মনোনীত হন কালীপ্রসন্ন। সপ্তম পর্ব থেকে (১৭৮৩ শকের বৈশাখ-অগ্রহায়ণ) সম্পাদক ছিলেন তিনি।

বিবিধার্থ সংগ্রহের ৭ম সংখ্যার (বৈশাখ ১৭৮৩ শক) ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন লিখলেন :

> "বিশেষত শ্রীযুক্তবাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পরিবর্তে তৎপদে অপর ব্যক্তির সুশৃঙ্খলে কার্য্যনির্বাহ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। বিবিধার্থ যে প্রকার পত্র, মিত্র মহাশয়ই তাহার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। অনুবাদক-সমাজ বিবিধার্থ সহৃদয়-সমাজের স্নেহভাজন ও পাঠকমণ্ডলীর নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় নহে জানিয়াই অগত্যা আমারে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।"

কালীপ্রসন্ন অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে এই পত্রিকার সম্পাদনা কার্য করেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল

যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন তাঁর বিদ্যাবত্তা, জ্ঞান ও সমাজ উন্নয়নের ঐকান্তিক আগ্রহে, কালীপ্রসন্ন তাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, রাজেন্দ্রলালের সময়ে পত্রিকার প্রকাশ ছিল অনিয়মিত, কালীপ্রসন্নর কালে তা হয়ে উঠেছিল নিয়মিত। বিদ্যাসাগর প্রমুখ যে রাজেন্দ্রলালের পরে ভুল ব্যক্তিকে এই গুরু দায়িত্বের জন্য বাছাই করেন নি, তার প্রমাণ কালীপ্রসন্ন কাজের মধ্যেই দিয়েছিলেন।

পত্রিকাটি দায়িত্বের সঙ্গে পরিচালনা করলেও ব্রিটিশের রাজরোষে কালীপ্রসন্ন অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তিনি 'নীলদর্পণ' সংক্রান্ত মামলায় লঙ সাহেবের জরিমানার টাকা দিয়ে দেন এবং তাঁরই অর্থে বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশ পেত। তা ছাড়া পত্রিকায় নীলদর্পণের সপক্ষে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল বলে ইংরেজ সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

৪. পরিদর্শক—দৈনিক পত্র হিসেবে প্রকাশিত হোত। সম্পাদক ছিলেন জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনগোপাল গোস্বামী। ১২৬৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি আকারে ক্ষুদ্র ছিল। ১ অগ্রহায়ণ ১২৬৯ সাল (১৪ নভেম্বর ১৮৬২) থেকে কালীপ্রসন্ন নিজে সম্পাদক হন। পত্রিকাটির আকার বড় করা হয়। বেশ কয়েক মাস পত্রিকাটি তাঁর সম্পাদনায় চলেছিল। প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতির কারণে বন্ধ হয়ে যায়।

৫. অন্য পত্রপত্রিকাকে সাহায্য—নিজের পত্রিকাগুলি পরিচালনা ও সম্পাদনা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রায়ই তাঁর সময়ের অন্যান্য বাংলা, ইংরেজি, উর্দু ভাষার পত্রপত্রিকাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

ক. বিখ্যাত হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার খ্যাতিমান সম্পাদক ও পরিচালক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হলে (১৪ জুন ১৮৬১) পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয় এবং তাঁর পরিবারবর্গ খুবই দুর্গতিতে পড়ে। কালীপ্রসন্ন হরিশচন্দ্রের স্ত্রীকে পাঁচ হাজার টাকা দেন। তাঁর বিধবা স্ত্রীর মামলার জরিমানার টাকাও দিয়ে দেন। বিনিময়ে তিনি হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার মুদ্রাযন্ত্র এবং সর্বস্বত্ব গ্রহণ করেন। মালিকানা গ্রহণের চেয়েও পত্রিকাটি প্রকাশের ইচ্ছাই কাজ করেছিল বেশি। বিদ্যাসাগরকে মুখ্য উপদেষ্টা রেখে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে পরিচালক এবং হিন্দু প্যাট্রিয়টের অন্যতম জন্মদাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের ওপর সম্পাদনার ভার দেন। কিন্তু পত্রিকা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে নানা বিবাদে পত্রিকাটির দুরবস্থা দেখা দেয়। বিদ্যাসাগর সব বিবাদ মিটিয়ে পত্রিকা প্রকাশ অব্যাহত রাখার খুবই চেষ্টা করেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন, মধুসূদন, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখের চেষ্টাতেও কোনো ফল হয় নি। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণদাস পালের হাতে দায়িত্ব যায়। তিনি এটির পরিচালনভার বিদ্যাসাগরের থেকে সরিয়ে ট্রাস্টের হাতে দেন। পত্রিকাটি ট্রাস্টের সম্পত্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অর্থাৎ জমিদারদের মুখপত্ররূপে পরিচালিত হতে থাকে। কী পত্রিকার কী পরিণতি!

খ. সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা—মাসিক এই পত্রিকাটি ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের চেষ্টায়। ১৮৫১-তেই বন্ধ হয়ে যায়। কালীপ্রসন্ন আর্থিক সহায়তা করেন, ফলে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে আবার প্রকাশিত হতে থাকে।

গ. ভারতবর্ষীয় সম্বাদপত্র—রাজনীতি সংক্রান্ত পাক্ষিক সমাচারপত্র। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে প্রথম প্রকাশ। সম্পাদক তারকচন্দ্র চূড়ামণি। কালীপ্রসন্ন পাঁচশত টাকা দেন পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য।

ঘ. সুপরিচিত সোমপ্রকাশ পত্রিকার আর্থিক বিপদের দিনে ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে কালীপ্রসন্ন দুইশত টাকা দান করেন।

ঙ. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে একটি মুদ্রাযন্ত্র দান করেন। কিছু দিন তিনি এই পত্রিকার 'যন্ত্রাধ্যক্ষ' নির্বাচিত হয়েছিলেন।

চ *Mookerjee's Magazine* প্রকাশের জন্য কালীপ্রসন্ন নিজেই একটি মুদ্রাযন্ত্র কিনে দেন। পরে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলে এই 'প্রেস'-টি দেওয়া হয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের '*Bengalee*' সাপ্তাহিক পত্রকে।

ছ. নবাব আবদুল লতিফ খান বাহাদুরের অনুরোধে 'দূরবীন' নামে উর্দু সংবাদপত্রের স্বত্ব ক্রয় করে তার পরিচালনায় সাহায্য করেন।

হুতোম প্যাঁচার নক্সা

হুতোম প্যাঁচার নক্সার প্রথম ভাগ ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং প্রথম-দ্বিতীয় ভাগ একত্রে প্রকাশ পায় ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে।

এই গ্রন্থটি কালীপ্রসন্নের লেখা নয় বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ এটিকে বিদ্যোৎসাহিনী সভার লিপিকর ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা বলে কল্পনা করেছেন। কিন্তু এর ভাষারীতি ও সেই সময়কার পত্র-পত্রিকা ও ব্যক্তিবৃন্দের সাক্ষ্য থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, এই গ্রন্থটি কালীপ্রসন্নেরই লেখা। অন্য কেউ এর লেখক নন। কালীপ্রসন্ন রচয়িতা এবং ভুবনচন্দ্র লিপিকর মাত্র। ভুবনচন্দ্র পরে হুতোমের অনুকরণে 'নিশাচর' ছদ্মনামে 'সমাজকুচিত্র' রচনা করেন এবং হুতোমকে উৎসর্গ করেন। এই ভুবনচন্দ্র 'আমার গুপ্তকথা' (হরিদাসের গুপ্তকথা)-র রচয়িতা। ভাষা ও বর্ণনা এবং বিষয়—কোনো দিক দিয়েই 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র ধারে-কাছে ভুবনচন্দ্রের লেখা আসতে পারে না। কালীপ্রসন্নই যে 'হুতোম' তা এখন সন্দেহাতীত।

নক্সায় রয়েছে সমাজচেতনা, ব্যঙ্গবিদ্রুপের কশাঘাত, হাস্যরস, চলতি ভাষা ব্যবহারের নৈপুণ্য, জীবন ও জগৎকে দেখবার অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি—সব মিলিয়ে বাংলা সাহিত্যের একটি অসামান্য গ্রন্থ এই 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'। উনিশ শতকের

কলকাতার সমাজজীবনের অবস্থা নিয়েই যত রঙ্গব্যঙ্গ ও বাস্তবসচেতনতা ফুটে উঠেছে। সমাজের কুপ্রথা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আঘাত হানা হয়েছে। কালীপ্রসন্ন তাঁর নিজের জীবনেও সমাজের সব রকম দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চেয়েছেন এবং সমাজের প্রগতিশীল আন্দোলনে নিজেকে জড়িত রেখেছেন।

সমসাময়িক ব্যঙ্গের বিষয় হিসেবে 'হুতোমে' কী নেই? মোসাহেব পরিবৃত জমিদার, মাতাল, উমেদার, হঠাৎ অবতার, ব্রাহ্ম, পাদরী, ইয়ং বেঙ্গল, বাবু, ফোঁটাতিলক-কাটা বোষ্টম, ভিখারী, কেরাণী, দোকানী, রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার, বুকিং ক্লার্ক, চড়ক, গাজন, মাহেশের রথ, দুর্গোৎসব, যাত্রা কবি, হাফ-আখড়াই-এর আসর, শেরি শ্যাম্পেনের মজলিস, গঙ্গায় নৌকাবিলাস, নগরে বারাঙ্গনা—সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ—সমাজ-দ্বন্দ্বের যেখানেই কপটতা ও ভণ্ডামি, সেখানেই তীব্র আক্রমণ করা হয়েছে। এর মধ্যে 'লোকাজ্ঞতা' ও 'পরিহাসরসিকতা' প্রকাশ পেয়েছে। কিছু কিছু অংশ স্বভাবতই জোনাথন সুইফ্‌ট্ কিংবা চার্লস ডিকেন্সের সঙ্গে সহজেই তুলনা করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন :

> " 'Hootam Pyancha' a collection of Sketches of city life, something, after the manner of Dickens, 'Sketches by Boz' in which the follies and peculiarities of all classes...are described in racy vigorous language."

কিন্তু সবার ওপরে রয়েছে লেখকের বেদনা। এইভাবে সমাজের ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও তীব্র কশাঘাতের অন্তরালে তাঁর গভীর সমাজচেতনা এবং সামাজিক দুর্দশার জন্য হতাশা ও তার জন্য বেদনা—সমস্ত লেখাগুলিকেই মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। আবার বেদনার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ ও বিদ্রূপের মিশ্রণ ঘটেছে। ধর্ম সম্পর্কে উদার ও মুক্ত-চিত্ত হুতোম যেখানেই ধর্মের ভণ্ডামি দেখেছেন সেখানেই তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শাণিত বাণ হেনেছেন -- হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীস্টান, তা যে ধর্মই হোক।

এই নক্সায় কলকাতার 'তৎকালীন বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার' এবং জনযাত্রার যে ফোটোগ্রাফিক চিত্র রয়েছে, তাতে এগুলি ঐতিহাসিক দলিল হয়ে উঠেছে। বহু যুগ পেরিয়ে আসার পর সেই সময়ের আক্রান্ত ব্যক্তিগণ এখন অতীত। ব্যঙ্গের লক্ষ্যের যে জেনারেশান ছিল, তা-ও এখন লুপ্ত। তাই হুতোমের নিন্দাপঙ্কে আজ গ্লানিগন্ধ নেই। পুরনো কলকাতার সার্বিক চিত্র এখন ঐতিহাসিক রসটুকুর স্থায়ী মূল্য লাভ করেছে। ঐতিহাসিক রস, সমাজচেতনা ও হাস্যরস—এই তিনে মিলে হুতোম বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

কালীপ্রসন্ন কখনোই নীতিবাগীশ হননি। তিনি বাস্তবচিত্র বর্ণনার সঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন, রঙ্গরসিকতা করেছেন। ব্যঙ্গের সেই মানুষ বা চরিত্র বা ব্যবস্থাগুলি এখন নেই, কিন্তু অনাবিল হাস্যরস এখনো উছলে উঠছে। চরিত্রগুলিও ব্যক্তিসীমা

ছাড়িয়ে গোষ্ঠী চরিত্র লাভ করেছে এবং স্বভাবতই লেখক নিজের চরিত্র ও সমাজ-অবস্থানকেও ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি। হাস্যরস সৃষ্টির এই প্রক্রিয়া একেবারে আধুনিক। প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতেও এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে :

> "সত্য বটে অনেকে নক্সাখানিতে আপনারে আপনি দেখতে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন, তা বলা বাহুল্য। তবে কেবল এইমাত্র বলতে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই, অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমন কি স্বয়ং-ও নক্সার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই।"

এর মধ্যে লেখা কিছু কিছু কবিতায় যে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে পরবর্তী কালের নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের 'গৈরিশ ছন্দে'র আভাস লক্ষ্য করা যায় এবং এখান থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে গিরিশচন্দ্র তাঁর ছন্দের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন, একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।

ভাঁড়ামি ও অশ্লীলতামুক্ত এই নক্সার প্রধান গুণই হল বাস্তব সমাজসচেতনতা। ভাষা, ভঙ্গি ও রচনার রঙ্গ মিলিয়ে এই নক্সা হয়ে উঠেছে 'সরস মিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী'। এই নক্সার মধ্যে উদার, মুক্ত ও প্রগতিশীল এক সমাজসচেতন লেখকের তীক্ষ্ণ ও রসযুক্ত মনের আস্বাদ পাই। রঙ্গরসিকতা, শ্লেষ, বিদ্রূপ ও কশাঘাতের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের সমাজজীবনের এ এক ঐতিহাসিক পটচিত্র—দলিল, যা প্রায়শই শিল্পগুণে সমৃদ্ধ। এর গুণগুলি হল : নক্সা রচনার নতুন আঙ্গিক, সমাজচেতনা, হাস্যরস, সংস্কারমুক্ত আধুনিক দৃষ্টি, চলিত গদ্য ভাষার নিপুণ ব্যবহার, বিষয় বর্ণনা, চরিত্র চিত্রণ, বাস্তবতা, সরসতা, নক্সাকারের নিজের চরিত্র ও সমাজের প্রতি নির্মোহ দৃষ্টি। এত কথা কি, শুধুমাত্র বাংলা চলিত গদ্যের সুনিপুণ ও সার্থক ব্যবহারের গুণেই হুতোম প্যাঁচার নক্সা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তখনকার কলকাতার চালু কথ্য ভাষাকে প্রধানত তিনি গ্রহণ করেছেন। তৎসম-তদ্ভব-অর্ধতৎসম-দেশী-বিদেশী শব্দের কথ্যরীতিসম্মত পদ সমন্বয়ে, ক্রিয়াপদে ও সর্বনাম পদে চলিত রূপ প্রয়োগে, বাচনভঙ্গির বৈশিষ্ট্য, এমন কি বানান পদ্ধতির মধ্যেও চলিত রূপ বজায় রাখার চেষ্টা—সব দিক দিয়েই বাংলা চলিত গদ্যের সঠিক আদর্শ গড়ে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গেই বলে রাখা ভাল, মহাভারতের অনুবাদের ভাষা সংস্কৃতগন্ধী হলেও প্রাঞ্জল ও সরল। তার লালিত্যগুণ অসামান্য।

আত্মমর্যাদা ও জাতীয় মর্যাদা

বিদ্যাসাগরের কর্মকালের শ্রেষ্ঠ কুড়ি বৎসর (১৮৫০—৭০) কালীপ্রসন্ন তাঁর সঙ্গে জড়িত। বিদ্যাসাগরের কর্মের দোসর ছিলেন কালীপ্রসন্ন। মোটা চাদর ও চটি জুতো পরতেন। অথচ রক্ষণশীলতাকে প্রশ্রয় দেন নি। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার জ্ঞানালোক

দু হাত ভরে নিয়েছেন। আত্মমর্যাদা ও জাতীয় মর্যাদা রক্ষা করে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতায় নিজেদের তৈরি করে নিতে চেয়েছিলেন। তা বলে এদেশীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতাকে কদাপি বর্জন করেন নি। বিদ্যাসাগরের মতো কালীপ্রসন্নও বুঝেছিলেন বাংলা, ইংরাজি ও সংস্কৃত এই তিনটি ভাষা না জানলে বাংলা ভাষার উন্নতি সম্ভব নয়। আবার দুজনেই সংস্কারমুক্ত ছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ধর্মান্দোলনের যে ভাবাবেগ ও উন্মত্ততা দেখা দিয়েছিল, দুজনেই তা থেকে মুক্ত ছিলেন। ধর্মভাবমুক্ত উদারহৃদয়ের এই দুজন মানুষই সেকালের ব্যতিক্রম। বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়াবেগের যোগফলে গড়ে উঠেছিল মানবপ্রেম। অখণ্ড মানবতাবোধ ও মানবদরদই এই দুজনকে এক জায়গায় এনে দিয়েছিল। সেকালের দ্বৈত মানসিকতামুক্ত কালীপ্রসন্ন সব সময়েই প্রগতিশীল আন্দোলনের দোসর ছিলেন।

কালীপ্রসন্নের আত্মমর্যাদাবোধই তাঁকে জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। জাতীয় সম্মান রক্ষায় তিনি সব সময়ে উদ্যমী ছিলেন। নীলদর্পণের মামলায় বিচারপতি স্যার মর্ডান্ট ওয়েল্‌স বাঙ্গালীদের নিন্দে করেন। নীলদর্পণ মামলায় সাক্ষীদের সম্পর্কেও বিরূপ মন্তব্য করেন। এর প্রতিবাদে কলকাতায় যে সভা হয় (২৬ আগস্ট ১৮৬১) তাতে কালীপ্রসন্ন রাজরোষ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বিচারপতি ওয়েল্‌সের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। ওয়েল্‌সের বিরুদ্ধে বিলেতে আবেদন করা হয় দু হাজার স্বাক্ষর যুক্ত করে। ওয়েল্‌স সতর্কিত হন। পরে ওয়েল্‌স ভারতপ্রেমী হয়ে উঠেছিলেন।

এই কালীপ্রসন্নকে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে মোটে ২৩ বছর বয়সে তিনি এই পদ গ্রহণ করেন এবং 'জাস্টিস অব দি পীস'-ও হন। বিচারপতি হিসেবে তাঁর দক্ষতা, নির্ভীকতা ও পক্ষপাতশূন্যতা প্রশংসিত হয়। তিনি সাদার্ন ডিভিসনের ম্যাজিস্ট্রেট হন এবং কিছু দিনের জন্য কলকাতা পুলিশের প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ চালান। এই সময়েই তিনি বিচারের সুবিধের জন্য ইংরেজিতে 'The Calcutta Police Act' (জুন ১৮৬৬) সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।

নিজে অভিজাত জমিদার হয়েও তিনি বাংলার কৃষকদের নিয়ে চিন্তা করেছেন এবং প্রায়শই তাদের পক্ষ নিয়েছেন। ১৮৩০ থেকেই বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে প্রজাবিদ্রোহ ঘটতে শুরু করে। পাবনা, নদীয়া, ফরিদপুরে এই সব প্রজাবিদ্রোহ হয়। এই সব প্রজাবিদ্রোহ এবং বিক্ষোভ কখনো জমিদারের বিরুদ্ধে, কখনো নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে, কখনো একসঙ্গে দু পক্ষেরই বিরুদ্ধে ঘটে চলেছিল। ১৮৪২-এ ফরিদপুরের ফরাজী আন্দোলনের নেতা মহম্মদ সোহাইন ঘোষণা করেন, '(আমরা) আর জমিদারের খাজনা দেব না, নীলকর সাহেবের জন্য নীল বুনব না ও বিদেশী ফিরিঙ্গিদের রাজত্বকেই মানব না।'

নীলচাষীদের দুর্দশা, নীলকরদের অত্যাচার—সবই তুঙ্গে ওঠে ১৮৫৯—৬০-এ। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রজাদের পক্ষ নিয়ে লড়েন। কালীপ্রসন্ন তাঁকে সহযোগিতা করেন। হিন্দু পেট্রিয়ট তখন এই ব্যাপারে অগ্রণী পত্রিকা ছিল। কালীপ্রসন্ন কৃষকদের নিয়ে আগে থেকেই চিন্তাভাবনা শুরু করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' রচনার দশ বছর আগেই ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১ জুন ডেভিড হেয়ারের বাৎসরিক স্মরণসভায় কালীপ্রসন্ন কৃষি সম্বন্ধে যে স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাতে তিনি স্পষ্টভাবেই বাংলার কৃষকদের দুরবস্থার কথা এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায়ের কথা লেখেন। এ ছাড়াও তাঁর অন্য যেসব প্রবন্ধ পাওয়া যায়, তার মধ্য দিয়ে তিনি দেশীয় সমাজ, সাহিত্য, রাষ্ট্র, অর্থনীতি—সব বিষয়েই আলোচনা করেছেন। তবে মূল লক্ষ্য ছিল জাতীয় ভাবধারা, মর্যাদা ও চরিত্রের উন্নতিসাধন।

এই জাতীয়তাবোধ থেকেই তিনি তাঁর সময়ের সিপাহী মহাবিদ্রোহের খবর সংগ্রহ করতেন। তখন অধিকাংশ ধনী অভিজাত বাঙ্গালীই সিপাহীবিদ্রোহের বিপক্ষে ছিলেন। কালীপ্রসন্ন সাগ্রহে এই মহাবিদ্রোহের গতিবিধির খবর নিতেন এবং সিপাহীদের জয়ে নিজে আনন্দবোধ করতেন। তাঁর এই ভূমিকা নীল আন্দোলন সম্পর্কেও দেখা গেছে। নীলকরদের অত্যাচারে কৃষকদের দুর্দশায় তিনি বেদনাবোধ করেছিলেন। নানাভাবে তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আবার দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটক নিয়ে মামলা চালু হলে তিনি সর্ব বিষয়ে সহায়তা করেছিলেন। দীনবন্ধুর বিরুদ্ধে মামলা হলে তার সব খরচের অঙ্গীকার করেছিলেন। রেভারেন্ড লঙ্ সাহেবের জরিমানার এক হাজার টাকা তৎক্ষণাৎ আদালতে জমা করেছিলেন। নিজ ব্যয়ে নীলদর্পণের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে জনগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলেন। আবার নীল-চাষীদের বন্ধু হরিশচন্দ্রের মৃত্যু হলে তাঁর স্মরণার্থ প্রবন্ধ পুস্তিকা 'বঙ্গেশ বিজয়' রচনা করে প্রকাশ করেন। তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থায় উদ্যোগী হন। বিবিধার্থ সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়ে সেখানে নীলদর্পণ নাটকের সপক্ষে বিস্তারিত আলোচনা করেন (১৭৮৩ শক, আষাঢ়):

> 'দীনবন্ধু বঙ্গদেশের যথার্থ হিতচিকীর্ষু, নিরীহ প্রজাবর্গের বিষম দুর্গতি দর্শন করিয়াই তন্নিরাকরণ মানসে নীলদর্পণ প্রণয়নে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মনোরথ বিফল হয় নাই, তিনি প্রার্থনাতিরিক্ত ফললাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। নীলদর্পণ বঙ্গদেশের ভাবী ইতিহাসে লেখকদিগের প্রধান উপজীব্য হইয়াছে।'

আগেই বলেছি, রাজরোষে পড়ে কালীপ্রসন্নের সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহ বন্ধ হয়ে যায়।

তিরিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনকালে এত বহুবিচিত্র কার্যসম্ভারের সঙ্গে কালীপ্রসন্ন যুক্ত ছিলেন যে, তা স্বল্পকথায় শেষ করা সম্ভব নয়। উল্লেখযোগ্য, যে প্রতিটি কাজেই তাঁর প্রগতিশীল মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকের নানা ব্যক্তিত্বের মধ্যে কালীপ্রসন্ন তাই আজও আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। সাম্প্রতিক কালের কোনো লেখকের 'দেশী'য় প্রথায় তাঁর চরিত্রহননের যে প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছিল, পরবর্তী গবেষণায় তা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে প্রমাণিত হয়েছে। কালীপ্রসন্ন তাঁর কর্মজীবনের মধ্য দিয়ে মানুষের মঙ্গলসাধনা এবং দেশ ও জাতির উন্নতি ও মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর শেষ জীবনে নিজের জ্ঞাতিবৃন্দ এবং কতিপয় পরিজনের ব্যবহার তাঁকে ব্যথিত করেছিল। একশ বছরের অধিক কাল পরেও কারো কারো আচরণ ইতিহাসমনস্ক ব্যক্তিদের বেদনাহত করছে। এই আলোচনায় তার কিছুটা স্খালন করতে পারলে খুশি হব।

শিশিরকুমার ঘোষ

অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও সুকঠিন সত্যনিষ্ঠা যাঁর চালিকাশক্তি তিনি হলেন উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী শিশিরকুমার ঘোষ।

১৮৪০ সালে যশোর জেলার (আজকের বাংলাদেশ) পলুয়ামাগুরা গ্রামে লব্ধপ্রতিষ্ঠিত উকিল হরিনারায়ণ ঘোষ ও শ্রীমতী অমৃতময়ীর তৃতীয় পুত্র শিশিরকুমারের জন্ম। তাঁর আরো একটা নাম ছিল—মন্মথলাল ঘোষ, সংক্ষেপে M. L G, যা তাঁর লেখার নিচে স্বাক্ষর করা থাকত। কিন্তু মুদ্রাকরের ভুলে তা M. L. L. হিসেবে পরিচিত হয়ে যায়।

বাইশ বছর বয়সেই শিশিরকুমার অন্য ভাইদের সঙ্গে মিলে নিজের গ্রামে একটা বাজার স্থাপন করেন, নাম দেন মায়ের নামে—'অমৃতবাজার'। এই বয়সেই ১৮৬২ সালে নিজের গ্রামে ছাপাখানা স্থাপনের দীর্ঘ দিনের সাধ পূর্ণ করার জন্য কলকাতার এক বিধবা মহিলার কাছ থেকে ৩২ টাকায় "বেলেইন প্রেস" নামে একটা কাঠের মুদ্রাযন্ত্র কিনে আনেন। স্থানীয় ছুতোরদের সাহায্যে সেটা বসানো হয়। মুদ্রাযন্ত্রের নাম দেওয়া হয়—"অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্র।" সংবাদপত্র প্রকাশের ইচ্ছাকে তখনকার মতো স্থগিত রেখে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও কৃষি বিষয়ক একটা পাক্ষিক পত্রিকা—"অমৃত-প্রবাহিণী" প্রকাশ করেন ১৮৬২-র ডিসেম্বরে।

কলকাতায় থেকে অমানুষিক পরিশ্রম করে শিশিরকুমার এক প্রেস মালিকের সহায়তায় ছাপাখানার যাবতীয় কাজ, যেমন—অক্ষর সাজানো, কম্পোজ করা, ফর্মা ছাপানো ইত্যাদি শিখেছিলেন। নিজের গ্রামে ফিরে কয়েকজন যুবককেও এই কাজ শিখিয়েছিলেন পত্রিকা প্রকাশের সুবিধার্থে।

এইভাবে "যশোহর অমৃতবাজার অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্রে" বাংলা সাপ্তাহিক হিসেবে "অমৃতবাজার পত্রিকা" আত্মপ্রকাশ করে ১২৭৪ সালের ৯ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার (২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৮)। মূল্য ছিল বার্ষিক পাঁচ টাকা।

বস্তুত ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনা, স্বাধীনতাবোধ তখনো দানা বেঁধে ওঠে নি। যার প্রথম প্রতিফলন বলা যায় ডিরোজিওর কবিতা—To India, My Native Land-এ আমরা দেখি, তা যেন সহস্র গুন বর্ধিত হয়ে এল অমৃতবাজার পত্রিকার শিরোভূষণরূপে—

"অধীনতা কালকূটে মরি হায় হায়
করেছে কি আর্যসুতে চেনা নাহি যায়।"

অমৃতবাজার পত্রিকা ছিল সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতার আদর্শ দৃষ্টান্ত এবং একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সাহসী সংগঠক। নির্ভীক দৃঢ়চেতা শিশিরকুমার প্রথম থেকেই পত্রিকার যাবতীয় কাজ—সম্পাদনা, কম্পোজ, ছাপানো ইত্যাদি নিজেই করতেন। সাহায্য পেতেন আনন্দমোহন বসু, হেমন্তকুমার প্রমুখের কাছ থেকেও। পত্রিকার নীতি-নির্ধারণ ও পরিচালনাও ছিল তাঁর। সে সময়ে প্রত্যন্ত গ্রামে বসে ছাপাখানা চালানো ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। ছাপার পাশাপাশি আনুষঙ্গিক সব কিছুই নিজেদের তৈরি করতে হোত। প্রেসের রোলার জমানো, ম্যাট্রিক্স বানানো, কালি তৈরি থেকে কাগজ পর্যন্ত। কাগজ তৈরিতে ব্যর্থ হলেও উৎকৃষ্ট কালি তিনি তৈরি করেছিলেন।

সে যুগে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজকে অনুকরণ করাটা উৎকট ভাবে ফুটে উঠেছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁদের মধ্যে ছিল ইংরেজদের সঙ্গে মিলনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এর বিরুদ্ধে শিশিরকুমার শোনালেন আত্মনির্ভরশীলতার অমোঘ মন্ত্র—"we are we, they are they" এবং অমৃতবাজার পত্রিকাই সর্বপ্রথম অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ঘোষণা করে—"শাসক ইংরেজ ও শাসিত ভারতবর্ষের স্বার্থ কখনও এক হইতে পারে না, প্রত্যুত উহা পরস্পরের পরিপন্থী।"

শিশিরকুমার সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন উদাসীন দেশবাসীকে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করতে হলে উপযুক্ত সংবাদপত্রের প্রকাশ অত্যন্ত জরুরী এবং তা তাঁর কর্মকাণ্ডেই প্রমাণিত। নির্ভীক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও শিশিরকুমার ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও সত্যনিষ্ঠ। অমৃতবাজারের আগেই হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় ১৮৫৯—৬০ সালে তিনি M.L.L. স্বাক্ষরে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-কাহিনী লিখতেন। পরে অমৃতবাজার পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচারের সংবাদ প্রকাশ করে শিশিরকুমার আদালতে পর্যন্ত অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়েছেন। বাংলার বাইরেও "অমৃতবাজার পত্রিকা" রীতিমতো জনপ্রিয় ছিল। ১৮৭২ সাল থেকে পত্রিকায় ইংরেজী অংশ বেশি প্রকাশিত হতে শুরু করে। বালগঙ্গাধর তিলকের লেখায় জানা যায়—"অমৃতবাজার পত্রিকার জন্য প্রতি সপ্তাহে মহারাষ্ট্রের লোকেরা উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। ইহার বিদ্রূপ ও শ্লেষাত্মক রচনা এবং কঠোর সমালোচনা সকলেই খুব উপভোগ করিত। মহারাষ্ট্রের লোকেরা বলাবলি করিত যে শিশিরবাবু এক পা জেলের দিকে বাড়াইয়াই লিখিতে বসিতেন।" (উদ্ধৃতি : যোগেশচন্দ্র বাগল)

অমৃতবাজারে প্রকাশিত উদ্দীপনামূলক রচনায় ইংরেজ সরকারও কিছু ভয় পেয়েছিল। শিশিরকুমারের ভাই মতিলাল ঘোষ লিখেছেন—"এই সময় শিশিরকুমার খুবই গরীব ছিলেন। কলিকাতাতেও তাঁহার বিশেষ কোন প্রতিপত্তি ছিল না। তাঁহাকে

হাতে রাখিবার জন্য ছোটলাট নিজে তাঁহাকে ডাকিয়া অর্থের লোভ দেখাইলেন। ...কিন্তু শিশির অন্য ধাতুতে গড়া। তিনি ধীরভাবে বললেন 'দেশে অন্তত একজন সৎ সাংবাদিক থাকা উচিত। ...শিশিরকুমারের এই দাম্ভিক উক্তির প্রতিশোধ লইবার জন্যই ইডেন বড়লাটকে অনুরোধ করায় একদিনেই 'ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন পাশ হল।" (উদ্ধৃতি : যোগেশচন্দ্র বাগল) ১৮৬৮ সালে শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়। মনোমোহন ঘোষ-এর সওয়ালের পর মুক্তি পেয়ে তিনি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষ সাধনে সর্বশক্তি নিয়ে আত্মনিয়োগ করেন। সে সময়ে সাধারণ জনগণের কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। শিশিরকুমারের উদ্যোগেই এ অভাব পূর্ণ হয়। প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কলকাতায় ১৮৭৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি "ইণ্ডিয়ান লীগ" গঠন করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, সে সময়ে "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন" নামে সংস্থাটি ছিল জমিদারদের সংগঠন। কিন্তু শিশিরকুমার প্রবর্তিত ইন্ডিয়ান লীগ-এ ইন্ডিয়ান শব্দটি ব্রিটিশ ভারত নয়, শুধুমাত্র ভারতচেতনা ও ভারত ভূখণ্ডকেই সূচিত করে। লীগের উদ্দেশ্যগুলিও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ—"১ সর্বসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিশেষতঃ একজাতিত্ববোধের উন্মেষ সাধন; ২. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বত্ব রক্ষার নিমিত্ত উপায় নির্ধারণ; ৩. দেশের অর্থোৎপাদিকা শক্তি যাহাতে সম্যক বিকাশ লাভ করিতে পারে তাহার উপায় অবলম্বন।" (১৮৭৫ সালের ১৫ আগস্ট 'সাধারণী'-তে উদ্ধৃত) কিছু বিষয়ে ইন্ডিয়ান লীগ সফলও হয়। যেমন লীগের আন্দোলনের ফলেই সরকার ১৮৭৬ সালের ৩১ মার্চ কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের জন্য একটা আইন বিধিবদ্ধ করে। ওই বছরেই লীগের উদ্যোগে "অ্যালবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স" নামে একটি শিল্প ও কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিদ্যালয়টি কিছু দিন সরকারী সাহায্যও পায়। পরে সেখানে চিত্রকলা শিক্ষার ব্যবস্থাও হয়েছিল। স্বভাবতই এটা স্পষ্ট যে, ভারতের রাজনীতিতে শিশিরকুমারের দান বিরাট।

কিছু দিন পরে মতান্তরের ফলে ইন্ডিয়ান লীগ থেকে সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ পদত্যাগ করেন এবং লীগেরই ছায়া অবলম্বনে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। দুয়েরই কার্যক্রম ছিল প্রায় অভিন্ন। যদি লীগের সদস্যদের মধ্যে পরস্পর মতান্তর না হোত, তাহলে বোধ হয় এর সৃষ্টি হোত না। অবশ্য পরে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন শক্তিশালী হয়, লীগ উঠে যায়। লীগের সদস্যরাও অনেকেই অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দেন।

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও শিশিরকুমারের অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে যে বিধবা বিবাহ চালু হয়েছিল শিশিরকুমার তার পক্ষে কলম ধরেছিলেন। নিজের পত্রিকায় তিনি লিখেছেন—"আমাদের দেশে যতটি প্রকাশ্য বেশ্যা আছে, অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে তাহাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন

বিধবা, বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া বেশ্যা হইয়াছে।…বিধবা বিবাহে জাতি কেন যায় বুঝি না।… এই সহস্র সহস্র বিধবা নারীর দুঃখ দেখিয়া এদেশীয়গণের বুক পাষাণ হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহাদের বুক পাষাণ হইয়াছে বলিয়া বিধবাদিগের দুঃখ কমে নাই।" (১১ মার্চ ১৮৬৯)

জাতীয়তার উন্মেষ সাধনে সংস্কৃতির ভূমিকা অপরিহার্য, এ কথা শিশিরকুমার উপলব্ধি করেছিলেন। তাই বঙ্গীয় নাট্যশালা স্থাপনে উদ্যোগী সম্বলহীন একদল যুবকের পাশে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। নানাভাবে তিনি এই ন্যাশনাল থিয়েটার উদ্বোধনে সাহায্য করেছেন। এই ন্যাশনাল থিয়েটারের মধ্য দিয়েই প্রকৃতপক্ষে থিয়েটারে সাধারণের প্রবেশাধিকার ঘটে। আগে তা শুধু ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শুধুমাত্র অর্থ সাহায্য নয়, থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য "বাজারের লড়াই", ও "নয়শো রুপেয়া" নামে দুটো প্রহসন-নাটকও তিনি লিখেছিলেন এবং এ দুটি যথাক্রমে ৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩ ও ১১ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৪ সালে অভিনীত হয়। তিনি এই থিয়েটারের একজন পরিচালকও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

জ্ঞানপিপাসু শিশিরকুমার শেষ জীবনে বৈষ্ণব ধর্মানুরক্ত হয়ে ধর্মজীবনে আশ্রয় নেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন প্রগতিশীল ব্রাহ্ম। কেশব সেনের ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল নিবিড়। এক সময়ে ব্রাহ্মদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী "আনন্দবাদী দল" হিসেবে পরিচিত হয়। শিশিরকুমার এর অগ্রণী। ১৮৬৯ সালে "নরপূজার" ঘটা দেখে তিনি ব্রাহ্মসমাজ থেকে সরে যান। এরপর ধীরে ধীরে বৈষ্ণব ধর্মে আসক্ত হন। তাঁর নিজের কথায়—"মুক্ত হইবার দুইটি পথ আছে। এক জ্ঞান পথ, আর এক ভক্তিপথ। কিন্তু ইহার কোনটি ভালো ? কোনপথে আমরা যাইবো ? তখন এ সম্বন্ধে কোন রূপ নিশ্চয় না করিতে পারিয়া দুই ভাই দুইটি পথ ভাগ করিয়া লইলাম। মেজদাদা লইলেন ভক্তি-পথ আমি লইলাম জ্ঞান-পথ।" কিন্তু অদ্ভুতভাবেই তিনি জ্ঞান-পথ ছেড়ে ভক্তি-পথে চলে আসেন। এর পেছনে তাঁর মেজদার প্রভাব ছিল প্রবল। শিশিরকুমার লিখেছেন—"সে যাহা হউক জ্ঞান বড় না ভক্তি বড় এই কথা লইয়া তর্ক হইল। আমি বলি জ্ঞান বড় মেজদাদা বলেন ভক্তি বড়। কিন্তু মেজদাদা আমার সহিত কখনো তর্কে পারিতেন না। তবে আমার টান বরাবরই ভক্তির দিকে ছিল। মেজদাদা যদিও তর্কে পারিলেন না, কিন্তু আমি মনে বুঝিলাম যে, তিনি অগ্রবর্তী হইয়াছেন, আর আমি পাছে পড়িয়া গিয়াছি।…তখন ভাবিলাম শ্রীগৌরাঙ্গ আমার প্রিয়বস্তু, আর মেজদাদাও আমার প্রিয়বস্তু।" এর পর শিশিরকুমার সত্যিই "শ্রীগৌরাঙ্গের চিহ্নিত দাস" হয়ে পড়েন। এই পর্বে এসে তিনি রচনা করেন শ্রীঅমিয় নিমাইচরিত। যা ৬ খণ্ডে প্রকাশিত। সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, Hindu Spiritual Magazine প্রভৃতি ধর্মবিষয়ক পত্র-পত্রিকা।

তাঁর বহুমুখী প্রতিভার নমুনা হিসেবে "সর্পাঘাতের চিকিৎসা" (১৮৬৮)

"সংগীত শাস্ত্র" (১৮৮৯) প্রভৃতি বই উল্লেখযোগ্য। শিশিরকুমার ধর্মজীবনে এসেও জীবনানুসন্ধিৎসা থেকে সরে যান নি। নতুনভাবে জীবনের অর্থ খুঁজেছেন। তার আবরণটা অবশ্য আধ্যাত্মিকতার।

বাংলা তথা ভারতের রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিক শিশিরকুমার ঘোষের বিচিত্র জীবনের সমাপ্তি ঘটে ৭২ বছর বয়সে ১৯১১ সালের ১০ জানুয়ারী।

□ কমল আইচ

আলোর পথিক শিবনাথ শাস্ত্রী

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭—১৯১৯) প্রধান পরিচয়, তিনি ব্রাহ্মসমাজের নেতা এবং তাঁর জীবনের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ এই ব্রাহ্ম সমাজকে ঘিরেই। তবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মজিলপুরের পণ্ডিত-ঘরের ছেলে শিবনাথ বাবা হরানন্দ ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগর, বড়মামা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহচর্য-প্রভাবে গতানুগতিক জীবনধারা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে সাহসী পদচারণা শুরু করেছিলেন জীবনের প্রথম ভাগেই। শাস্ত্রনিষ্ঠার সঙ্গে বাস্তব যুক্তিবাদ, সমাজমনস্কতা, উদার মানবিক বোধের সমন্বয় তাঁকে ক্রমে এক যুগন্ধর ব্যক্তিত্বে উন্নীত করেছিল। ছাত্রজীবনে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছে তাঁকে, অবাঞ্ছিত লোকের সংসর্গ ও কুশিক্ষা কাটিয়ে উঠতে হয়েছে, পারিবারিক প্রথার কাছে নতিস্বীকার করে প্রথমে বাল্যবিবাহ (তের বছর বয়সে) এবং বাবার জেদবশে তার ছ' বছর পর এন্ট্রান্স পাশ করার বছরে দ্বিতীয় বিবাহে মত দিয়ে গভীর অন্তর্দাহে দগ্ধ হতে হয়েছে। এসবের কোনোটাই বৃথা যায় নি তাঁর জীবনে। মাত্র ন' বছর বয়সে (১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে) সংস্কৃত কলেজে ভর্তির বছরে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠান চাক্ষুষ করার সুযোগ তাঁর ঘটেছিল। পাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর বাবার সহপাঠী ছিলেন এবং কলেজে পড়ার সময়ে বিদ্যারত্নের কাছে তাঁর বাবা টাকাপয়সা ধার পর্যন্ত নিয়েছিলেন, এমন ঘনিষ্ঠতা ছিল। একুশ বছর বয়সী শিবনাথ তাঁর বিপত্নীক সহপাঠী যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মহালক্ষ্মী নামে এক বালবিধবার বিয়ের ব্যবস্থা করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। মেয়েটিকে তাঁর 'জ্ঞাতিদাদা' হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন পড়াতেন। বিয়েতে মেয়ের দাদা ঈশান রায় আর শিবনাথের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। নবদম্পতির একসময়ে দশায় নিজের স্কলারশিপের টাকা তাঁদের হাতে দিয়ে একসঙ্গে থেকে তাঁকে জ্ঞাতিবর্গের অশেষ লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। 'আমি শৈশবাবধি বিদ্যাসাগরের চেলা ও বিধবা বিবাহের পক্ষে।...আমি তাঁহাকে বিধবা বিবাহ করিবার জন্য নাচাইয়া তুলিলাম। তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন।...আমি বিবাহের ঘটক, আমি তাঁহাদের বিপদের সময় কিরূপে সাহায্যদানে বিরত থাকি?...দম্পতী যখন ঘোর নির্যাতন ও দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়াছেন, তখন সাহায্যের উপায় থাকিতে সাহায্য না করা অধর্ম" (আত্মচরিত, পৃষ্ঠা ১০১-১০২)। সুতরাং বাবার ঘোরতর আপত্তি ও ক্রোধ সত্ত্বেও শিবনাথের বন্ধুকৃত্য, স্কলারশিপ বাঁচাতে কঠোর পরিশ্রমে পড়াশোনা ও

পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জন, মহালক্ষ্মীর মৃত্যুজনিত আঘাত ক্রমশ কঠোর বাস্তবের মাটিতে তাঁকে নামায়। ততদিনে তাঁর ব্রাহ্মসংসর্গ ঘটেছে এবং ওই বছরই (১৮৬৯) কেশবচন্দ্র সেনের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়ে তাঁকে পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত হতে হয়। 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় একগুঁয়ে' হরানন্দ একমাত্র পুত্রের ধর্মান্তর গ্রহণ ক্ষমা করেন নি। ছেলের পাঠানো টাকা ছুঁতেন না, মুখদর্শন করতেন না। সম্পর্কের এমন পর্যায় যে, 'পিতা আমাকে মারিবার জন্য গুণ্ডা ভাড়াতে কয়েক বৎসরে ২০/২২ টাকা ব্যয় করিলেন' (আত্মচরিত, পৃষ্ঠা ৪১৪), যদিচ বহু বছর পর শিবনাথের কঠিন অসুখের সময়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে তাঁর কলকাতায় আসার বৃত্তান্তে চমৎকৃত হতে হয়। পণ্ডিত হরানন্দ সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং স্ত্রীকে নিজে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, এ-ও বড় কম কথা নয়।

সুতরাং পরিবেশকে অতিক্রম করার ঐতিহ্য শিবনাথের পরিবারে ছিল। জাতবিচার না করে ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার কথা নিজের মায়ের সম্বন্ধে বলতে তিনি শ্লাঘাবোধ করেছেন। যোগেন্দ্র-মহালক্ষ্মীর নতুন সংসারে বন্ধু হিসেবে তাঁর থাকা নিয়ে বড়মামা বিদ্যাভূষণের অনুমতিদানই বা কম যায় কিসে? জনৈক গোপকন্যার সর্বনাশে জড়িত থাকার অপরাধে একজন ধনাঢ্য গ্রামবাসীকে এই পণ্ডিতমশায়ই মোকদ্দমার ভয় দেখিয়ে খোরপোষ দিতে বাধ্য করেছিলেন। প্রতিবেশী ছুতোর-পরিবারের বালবিধবা মেয়েটিকে স্কুলে ভর্তি করা নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শিবনাথের কথা হলে, তাকে শুধু বিদ্যাসাগরই কোল দেন নি, তাঁর মা ভগবতীদেবীও সস্নেহে গ্রহণ করেছিলেন—একথা বলতে শিবনাথ পুলকিত হয়েছেন। হিন্দুর অন্ধ সংস্কারের গোঁড়ামি, ছুঁৎমার্গ, আচারসর্বস্বতা পেছনে ফেলে মানুষের গৌরব প্রতিষ্ঠায় জীবন উৎসর্গ করার শিক্ষা এইভাবে তাঁর দিনে দিনে সম্পূর্ণ হয়েছিল। কেশবচন্দ্র সেনের 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'-কে স্বীকার করলেও তার মধ্যে ব্যক্তিপ্রাধান্যের প্রকট রূপ, অহেতুক আচার বাহুল্য, কথায় কাজে ফাঁক নিয়ে সমালোচনায় মুখর হতে তাঁর বাধেনি এবং শেষ পর্যন্ত ওই দলের সংস্রব ছেড়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় তাঁকে ব্রতী হতে দেখা যায়। বিশ্বাসের খাতিরে মা বাবা আত্মীয়-স্বজন, দীক্ষাগুরু কেশবচন্দ্র, অনেকের থেকে তাঁকে দূরে যেতে হয়েছে, সরকারী চাকরি ছেড়ে সংসার নিয়ে অনিশ্চয়ের পথে পা বাড়াতে হয়েছে, কঠোর পরিশ্রমে স্বাস্থ্যহানি মেনে নিতে হয়েছে, কিন্তু কর্তব্যভ্রষ্ট হননি তিনি, কারও প্রতি কোনো বিদ্বেষ পোষণও করেন নি।

বলতে গেলে নারীশিক্ষা, নারীমুক্তির ভাবনা বহুলাংশে শিবনাথ শাস্ত্রীর ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রণ করেছিল। আত্মজীবনীতে কত প্রসঙ্গে যে বিষয়টি উঠেছে তার শেষ নেই। এক্ষেত্রে বাস্তবিক তিনি 'বিদ্যাসাগরের চেলা'। কলেজের ছাত্র অবস্থায় উপেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে এক বিধবার বিবাহ দিতে মেয়েটিকে চুরি করে আনার দুঃসাহস তিনি দেখিয়েছিলেন, তার মর্যাদা ও নিরাপত্তার জন্যও তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। 'সেই রাত্রি

দ্বিপ্রহরের সময় সেই কন্যাকে গাড়ি করিয়া লইয়া মহলানবিশ মহাশয়ের পরিবারে রাখিতে গেলাম'। সমাজভ্রষ্ট মেয়েদের জন্য তাঁর মনে গভীর বেদনাবোধ কাজ করতো। তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টাও বহু বার তিনি করেছেন। যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন, তার জন্য দুঃখ পেয়েছেন, অকপটে ব্যর্থতা স্বীকারও করেছেন। মাদ্রাজে প্রকাশ্য সভায় dancing girl নামে পরিচিত কুলটা দেবদাসীদের নিয়ে ভদ্রসমাজের আদিখ্যেতায় তিনি যে সভা-ত্যাগ করেছিলেন, সেটা তথাকথিত সমাজের ভদ্রতার মুখোশ খুলে দিতে। সামাজিক ব্যাধি নিরাময়ের চেষ্টায় কত অপ্রিয় সিদ্ধান্ত যে তাঁকে নিতে হয়েছে! আবার স্নেহস্পর্শে সন্তপ্ত বিপন্ন হৃদয়ে তিনি আস্থা ও মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটিয়েছেন। নিরাশ্রয় দুর্দশাগ্রস্ত যে মহিলাটি তাঁদের বাড়িতে ঝি-এর কাজ পেয়ে এই 'ভালমানুষ বাবু'-র জন্য তাঁর গভীর ভালবাসায় মাতৃত্বের সমান মর্যাদায় উঠেছিলেন, শিবনাথ তাঁর কথায় কৃতজ্ঞচিত্তে লিখেছেন: 'সাধে কি আমি নারীজাতিকে ভালবাসি! যে পাপে ডুবিয়াছিল, পাপ যার দৈনিক আচরণ হইয়াছিল, তাহারও হৃদয়ে এই প্রেমের শক্তি, তাহারও এই কৃতজ্ঞতা।' (আত্মচরিত পৃষ্ঠা ১২২)। মাতৃজাতি বুঝি স্নেহের পারাবার। বর্ধমানের বড়বেলুনগ্রামে জমিদারের নিষেধে ব্রাহ্ম প্রচারকদলকে যখন কেউ সাহায্য করতে আসেন নি, 'জমিদারগণ আমাদের খাওয়া বন্ধ করিতেছেন শুনিয়া গ্রামের নারীগণ দয়া করিয়া গোপনে গোপনে আমাদের খাবার পাঠাইতেছিলেন। সাধে আমি নারীকুলের এত গোঁড়া!' (আত্মচরিত. পৃষ্ঠা ২৯৩)।

এই গোঁড়া নারীভক্তি তাঁকে নারীশক্তির উৎস-সন্ধানে ব্যাপৃত করেছিল। ইংলণ্ড ভ্রমণকালে (১৮৮৮) ইংরাজ সমাজের শ্রী, সৌষ্ঠব, শৃঙ্খলায় নারীর সৃষ্টিশীল ভূমিকায় তিনি চমৎকৃত হন। নারী-আন্দোলনের নেত্রী, সমাজ-সংস্কারক মিসেস বাটলারকে দেখে তাঁর আশ্চর্য লাগে। 'দেখিয়া মনে যেন নব শক্তি পাইয়াছিলাম।... নারীকুলের মধ্যে এক আশ্চর্য শক্তি সঞ্চার হইতেছিল।' শাস্ত্রীমশায় যথার্থ বলেছেন— 'ইংলণ্ডের নারীশক্তি কিরূপে সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা করিতেছে, তাহা এদেশের লোক জানে না। এদেশের প্রাচীন ভাবাপন্ন অনেক মানুষের মত এই যে নারীগণকে সামাজিক স্বাধীনতা দিলে সামাজিক পবিত্রতা থাকিবে না। ঠিক ইহার বিপরীত কথা সত্য; নারীগণের শিক্ষা ও স্বাধীনতার উপরেই সামাজিক শান্তি ও পবিত্রতা নির্ভর করে।' (আত্মচরিত, পৃষ্ঠা ৩৪২)। তাঁর দৃঢ় প্রতীতি, 'ইংলন্ডের মহত্বের পশ্চাতে ইংলণ্ডের নারীগণ'। অবাধ মেলামেশা, স্বাধীন গতায়াতে মেয়েদের স্বভাবচ্যুতির আশঙ্কায় যাঁরা শঙ্কিত, শিবনাথ তাঁদের ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত নারীসমাজের দিকে তাকিয়ে শিক্ষা নিতে বলেছেন। অবরোধ নয়, শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্মুক্ত আলোকিত প্রাঙ্গণে সক্রিয় উপস্থিতিই নারীসমাজকে তাদের যথোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। 'প্রজা সাধারণের মধ্যে জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞানস্পৃহা প্রবল থাকা নর-নারীর সম্মিলনের মধ্যে পবিত্রতা রক্ষা হওয়ার একটি প্রধান উপায়।' বিদেশে যথেচ্ছ উচ্ছৃঙ্খল

মদ্যপ মেয়েদের কদর্য জীবনযাপন শিবনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি। তাদের অধঃপতনে তিনি শিউরে উঠেছেন। অন্য দিকে স্নিগ্ধ গৃহকোণে বিদেশী অতিথিকে কামমোহ থেকে মুক্ত করে স্বচ্ছন্দ প্রীতির পরিবেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশ্চর্য বৃত্তান্ত তাঁকে মুগ্ধ করেছে। ইস্পী পরিবারের মা ও দুই মেয়ের লোকহিতৈষণার কথা তিনি শ্রদ্ধাসহকারে লিখেছেন: 'এমন পবিত্র নারীমূর্তি অল্পই দেখিয়াছি। এরূপ সৌজন্য, এরূপ হ্রীশীলতা, এরূপ পবিত্রতা যে নারীমূর্তিতে থাকে, তাহা একবার দেখাও জীবনের একটা পরম লাভ।' জন ব্রাইট-এর কন্যা সম্পর্কে এই শ্রদ্ধাবোধ অকৃত্রিম। ভারতবর্ষের নারীকুলের জন্য ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী ভূমিকার কথা এই মহীয়সী জানতেন ও তাঁকে সম্মান করতেন। শাস্ত্রীজীর ভাল লেগেছিল, ইংলণ্ডের পরিবারে 'গৃহিণীর সর্বময় কর্তৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা' সামাজিক শ্রী এনে দিতে পেরেছে। নানাবিধ সমাজকৃত্যে মেয়েদের সফল অংশগ্রহণের মূল্য তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দেশে ফিরে দু বছরের মধ্যে (১৮৯০) ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর নারীজাগরণের স্বপ্ন সার্থক করার নতুন পদক্ষেপ নেন। প্রথম জীবনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা তো তাঁর ছিলই। খেলাচ্ছলে ছোটদের শিক্ষা-দানের গুরুত্বও তিনি মানতেন। বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় তাঁর সে চিন্তা আরো সমৃদ্ধ হয়েছিল। পিতা হরানন্দ নিজের গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় গড়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রেরণা নিশ্চয় তার মূলে বিদ্যমান ছিল। শিবনাথের উদ্যোগে এই আন্দোলনের নবযুগের সূত্রপাত হয়।

কোচবিহারের রাজপরিবারে হিন্দুমতে নিজের মেয়ের বিয়েতে সম্মতি জানিয়ে (১৮৭৮) কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে প্রবল সমালোচনা ও বিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। অন্যান্য প্রশ্নে তর্কাতর্কি আগে থেকেই চলছিল। এই বিরোধে শিবনাথ নীতিগত প্রশ্নে কেশববিরোধী পক্ষের সামনের সারিতে অবস্থান নেন। কলম তো ধরেই ছিলেন, মুখের ওপর দশ কথা শোনাতেও ছাড়েন নি। কিন্তু দলাদলির উগ্রতায় যে অভব্য অসৌজন্য, তাতে তাঁর মর্মপীড়ার অন্ত ছিল না। কেশববাবুর স্খলনে তাঁর ক্ষোভ, ক্রোধ অগ্ন্যুৎপাতের মতো বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখও কম হয় নি। কেশববাবু ও তাঁর স্ত্রী সম্বন্ধে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা কখনো তিনি হারান নি। 'দলাদলিকে শত ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করিতেছে। ইহা মানবপ্রকৃতিকে কিরূপ বিকৃত করে ভাবিয়া দুঃখ হইতেছে।…ঐ শ্লেষোক্তি পাঠ করিয়া আমার চক্ষে জলধারা বহিল…' (আত্মচরিত, পৃষ্ঠা ২৮৭)। কেশব সেনের মৃত্যুর জন্য নিজেদের পরোক্ষ দায়িত্ব তিনি অস্বীকার করেন নি! 'আমাদের শ্লেষ, কটূক্তি প্রভৃতিতে তাঁহার মানসিক দুঃখ অতিমাত্রায় বর্ধিত করে।…তাঁহার পত্নীর মুখ যখন দেখিতাম, তখন চক্ষের জল রাখিতে পারিতাম না।…আমরা পরোক্ষভাবে তাঁহার মৃত্যুর অন্যতম কারণ, এই মনে হইয়া

সেই দুঃখ ঘনীভূত হইত।...মৃতদেহ লইয়া আমরা অনেকে শ্মশানঘাটে গেলাম এবং অশ্রুজলে ভাসিয়া এ-জীবনের অন্যতম গুরুকে চিতানলে অর্পণ করিয়া আসিলাম।' (আত্মচরিত, পৃষ্ঠা ২৯৫)। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নয়, নীতির প্রশ্নে লড়াই করেও মানবিক থাকা যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী তার দৃষ্টান্ত।

এই মানবিকতার গুণেই জাতপাতের বিচার, ছুঁৎমার্গ, অনাথদের দুর্দশায় বিচলিত হয়ে তিনি কাজে নেমেছেন। অন্ধ্রের রাজমহেন্দ্রীতে সাহিত্যিক-সমাজ-সংস্কারক বীরেশলিঙ্গম্ পান্টুলু, কোকনদা শহরে রামকৃষ্ণিয়া প্রমুখ বিধবাবিবাহ-সমর্থক সমাজনায়কদের প্রসঙ্গ স্বভাবতই তাঁর কাজকর্মে, লেখাজোখায় এসেছে। 'কামটি' সম্প্রদায়ভুক্ত রামকৃষ্ণিয়ার কাজের লোকের আনা জলে শিবনাথের চান স্থানীয় ব্রাহ্মণদের ক্ষুব্ধ করেছিল। আর পাশাপাশি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভীমরাও-এর সংস্কারমুক্ত উদার সহযোগিতায় তিনি আশার আলো দেখতে পান। কোইম্বাটুরে বন্ধু শূদ্র রঙ্গনাথমের জন্য গোয়ালঘরে খাওয়ার ব্যবস্থার কথা জেনে শিবনাথ মর্মাহত হয়েছিলেন। অস্পৃশ্য 'পঞ্চমা'র বাড়িতে দুধ ও আপম্ খেয়ে তাঁকে স্থানীয় লোকেদের ভয় ভাঙ্গাতে হয়েছিল। শূদ্রকুলে ব্রাহ্মণী কন্যা কমলাম্মার বিবাহ এই সময়েরই ঘটনা। শিবনাথ দেখেছেন সমাজ ব্যবস্থায় অসামঞ্জস্য, কদাচারের তো অন্ত নেই। দাক্ষিণাত্যে কোনো কোনো ব্রাহ্মণ পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিয়ে করলেও অন্যান্য পুত্রসন্তানেরা সামাজিক স্বীকৃতিতে শূদ্রাসঙ্গ করে, শূদ্রাগর্ভে সন্তানের বাপও হয়, অথচ তাদের জন্য জনকের দায়দায়িত্ব নেই। নীচ জাত ভেবে মানুষের সন্তানকে পথের ধুলোয় বসিয়ে খেতে দেয়। এমন আরো কত কী। শূদ্রের ছায়া যাতে ব্রাহ্মণকে না মাড়াতে হয়, তার জন্যও নানা কানুন। এই হতচ্ছাড়া পরিবেশে শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ বিধবাবিবাহের উদ্যোগ নিয়ে, অনাথ বিদ্যালয় স্থাপন করে, জাতপাতের ছুঁৎমার্গী কুসংস্কার ভেঙ্গে মানুষের মর্যাদায় মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রণী হয়েছিলেন জেনে গর্ব হয়।

বাস্তবিক চোখ-কান খোলা রাখলে একদিকে শাস্ত্রের উত্তুঙ্গ আদর্শবাদ আর আচার-বিচারের অক্টোপাস-বন্ধন ও সামাজিক বঞ্চনার গরমিলে সুস্থ যুক্তিশীল, হৃদয়বান মানুষের ক্ষিপ্ত হওয়ারই কথা। ব্রাহ্মসমাজরীতির চৌহদ্দির মধ্যে সর্বত্যাগী শিবনাথ শাস্ত্রী প্রচারপুস্তিকা লিখে, পত্রপত্রিকা সম্পাদনা করে, বক্তৃতায়, প্রচার অভিযানে, ভ্রমণে, সুদূর পশ্চিম ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতের প্রান্ত পর্যন্ত সমাজসংস্কারের বার্তা নিয়ে গিয়েছেন। ইংলন্ড পর্যন্তও সেসব চেষ্টার ফল তিনি নিয়ে যেতে পেরেছেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, সংস্কৃতে এম. এ. পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী শাস্ত্রী শিবনাথ ব্রাহ্ম আদর্শের মধ্যে গতানুগতিক ঐতিহ্যবাদ ও সংস্কারের মিথ্যা বন্ধন থেকে মুক্তির আলো পেয়েছিলেন। যদিও সমাজ তাঁর থেকে হয়তো প্রত্যাশা করেছিল অনেক অনেক বেশি। তাঁর সমাজ-সচেতন প্রজ্ঞার দৃষ্টি তৎকালীন বঙ্গসমাজকে অতিক্রম করে সমগ্র ভারতবাসীর প্রগতির পথ সন্ধান করেছে। বিদ্যাসাগরের স্নেহধন্য শিবনাথ সীমিত

চেষ্টায় সমাজসংস্কারে নেমেছেন, কিছুটা সফলও হয়েছেন। কলম ধরেছেন বিদ্যা-বিলাসের শৌখিনতায় নয়, প্রধানত সামাজিক উপযোগের ভাবনায়, যদিচ সুরসিক ভাবালু কবিহৃদয় তাঁর সব রচনার অন্তর্লোকে রসধারা প্রবাহিত রেখেছে। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন (ভারতসভা) প্রতিষ্ঠা (১৮৭৬) ছাড়া আর কোনোভাবে কোনো রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তার প্রকাশ তাঁর কাজকর্মে স্পষ্টভাবে পাই না বলে ক্ষোভ করে লাভ নেই। রবীন্দ্রনাথ 'প্রবল মানব-বাৎসল্য'-কেই তাঁর চরিত্রধর্ম বলে চিহ্নিত করে-ছিলেন। তারই বলে ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাণীর বদলে বেদশাস্ত্রকে তিনি মানুষের বুদ্ধি, মেধা, উপলব্ধির ফসল বলে মানবিকী শ্রদ্ধা দেখান, বিদ্যাসাগরী রীতিতে শাস্ত্রকে সমাজপ্রগতির হাতিয়ার করার লক্ষ্যে শাস্ত্রচর্চা করেন, রামমোহন প্রবর্তিত বিচারধারা মানুষের মধ্যে ছড়াতে চান, সব ধর্মের সারসন্ধান করে সমন্বয়, ঐক্য, সংহতির ভিত্তি খোঁজেন, মানুষের বৌদ্ধিক মুক্তির পথনির্দেশ দেন। শিবনাথের প্রতিপক্ষ নববিধান-সমাজের পত্রিকা *The World and New Dispensation* তাঁর মৃত্যুর পর ১৬ অক্টোবর ১৯১৯ তারিখে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিল : "The hero in the cause of nation and humanity, a poet of no mean order, an enthusiastic preacher gifted with fiery eloquence of the principle of simple theism and social equality and a man of high ideas, which have materialised themselves in the institutions for the education of boys and girls and took him to all length of self sacrifice, true and faithful in all his private relations." বিদ্যাসাগরের মতো শিবনাথ শাস্ত্রী শিক্ষার পথ ধরে সমাজপ্রগতির উজ্জ্বল সরণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামতনু লাহিড়ী, বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন ও তাঁদের সমকালীন সমাজচিত্র উদ্‌ঘাটন করে তিনি জাতির শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে গেছেন। অন্ধ অতীতচারিতাকে তিনি ধিক্কার দেবেন বৈকি! 'বর্তমানের সহিত তুলনায় ভূতকালকে সুন্দর দেখা বড় স্বাভাবিক। মানুষ সচরাচর একটা বড় বিষম ভ্রান্তিতে পড়ে।...'প্রাচীন ভারত' একথা বলিবামাত্র সকলের মনে হইবে মহাকবি বাল্মীকি ও তাঁহার কাব্য, প্রাচীন আর্য ঋষিগণ ও বেদ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি ;--কিন্তু এ সকল যদি মুছিয়া দেওয়া যায়, তবে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা কি শ্রদ্ধার বস্তু ?...প্রাচীন ভারতের সামাজিক দুষ্ক্রিয়া-সকল কি কেহ যত্নপূর্বক ইতিবৃত্তে লিখিয়াছে ?... যেগুলিতে প্রাচীন ভারতের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, সেগুলিই কেবল লিপিবদ্ধ হইয়াছে,...বর্তমানের বীভৎস ছবি দেখিয়া প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, তাই অতীতের দিকে তাকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়।...চিন্তাবিহীন লোক ভাবিয়া থাকে যে ভূতকালের সবই ভাল, এবং বর্তমানে সবই মন্দ।' (সমাজরক্ষা ও সামাজিক উন্নতি, বক্তৃতাস্তবক, পৃষ্ঠা ২৩-২৪)। যথার্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে প্রাচীন

ভারত পর্যালোচনার আহ্বান এখানে স্পষ্ট। আর সমকালের যা কিছু সদর্থক, প্রগতিবাদী, তাকে যথোচিত মর্যাদায় বরণ করার উদ্যোগ তো তাঁর রচনাবলীর ছত্রে ছত্রে, বিশেষত সমাজভাবনামূলক রচনায় সুস্পষ্ট। মিথ্যা আচার-বিচার, ভণ্ড সমাজপতিদের উপদ্রব থেকে মানুষের মুক্তি যে বড় দরকার। 'যদি এমন দেখা যায় যে সমাজের ব্যবস্থাসকল···বহুসংখ্যক নরনারীর গলে রজ্জু দিয়া দুর্গতিতে ডুবাইতেছে, বহুসংখ্যক লোককে অজ্ঞতার মধ্যে নিমগ্ন রাখিতেছে, তবে বলিব সমাজ উন্নতির সহায় না হইয়া দুর্গতির কারণ হইয়াছে।···সমাজের সাধ্য নাই, ক্ষমতা নাই, সাহস নাই যে সে পাষণ্ড জমিদারকে সমাজচ্যুত করেন; কিন্তু হয়ত, এক দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান শূদ্রবন্ধুর সহিত ভালবাসায় একত্র আহার করিয়াছে অমনি সমাজ তাহার উপর খড়্গহস্ত হইলেন।' (তদেব, পৃষ্ঠা ৩০-৩২)। বৈষম্যের বিনিপাত অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রীমশায় তাঁর নিজের মতো করে তাঁর পথ অনুসন্ধান করেছেন। 'স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে ব্রাহ্মগণ কোন সমাজ ভাঙ্গিতে চান না। ভাঙ্গা উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য ভাল হওয়া। আমাদের ভাল হইতে গেলে যদি সমাজ ভাঙ্গিয়া যায় তবে আমাদের দোষ কি?' (তদেব, পৃষ্ঠা ৩৪)। কি সমাজসংস্কার, কি বিদেশী শাসন থেকে মুক্তিলাভ, সর্বত্র এই ভাল হয়ে ওঠার নৈতিক শিক্ষার পথ তিনি দেখিয়েছেন।

ধর্মনিষ্ঠাকে প্রগতির পরিপন্থী ভাবতে পারেন নি শিবনাথ। ধর্মভাবনার সীমাবদ্ধতার কথা তাঁর মনে আসেনি, তাকে অতিক্রম করে বৈজ্ঞানিক সমাজদর্শনে উন্নত কোনো জীবনবোধের সন্ধানও তিনি করেননি। বিদ্যাসাগরের বস্তুনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা থেকে এক্ষেত্রে তিনি দূরে থেকেছেন। একাকিত্বই বিদ্যাসাগরী সমাজভাবনার অগ্রগতি ব্যাহত করেছিল। শিবনাথ সংগঠনের ছত্রছায়ায় তাঁর নিজস্ব দর্শনকে কাজে রূপায়িত করতে নেমে নিঃসন্দেহে এক ধাপ এগিয়েছেন। তবে যুগ ও পরিবেশ-পরিস্থিতি আরো বৃহত্তর কর্মভূমির পরিসর তাঁকে দেয়নি। প্রায় এক শতাব্দী কালের ব্যবধানে থেকে সেকালের সমাজসংস্কারক, কর্মবীর, শিক্ষাব্রতী, উদার মানবতাবাদী পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর অগ্রগামী ভূমিকার দিকে দৃক্‌পাত করে শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হয়।

□ করুণাসিন্ধু দাস

মীর মশাররফ হোসেন

ভারতীয় ইতিহাস প্রায়শই ভীষণ রকমের পাগলামির লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। এর অন্যতম উদাহরণ হল, মধ্যযুগীয় ধর্মীয় বিশ্বাসের যূপকাষ্ঠে ভারতের ভৌগোলিক শব-ব্যবচ্ছেদের ঘটনা। ভাষা, সাংস্কৃতিক একপ্রাণতা, ভূখণ্ড ও অর্থনৈতিক বন্ধন ইত্যাদি যাবতীয় সংজ্ঞা-সূত্রের উপাদানকে বাদ দিয়ে স্রেফ ধর্মের আশ্রয়ে জাতিসত্তা নির্ধারণের মূর্খতা যে কতখানি অবৈজ্ঞানিক এবং অনৈতিহাসিক, সে হিসেব এ শতকের প্রথমার্ধের রাজনীতিক ও সমাজ-প্রবক্তারা তেমন করে উপলব্ধি করতে চাননি। ফলে বঙ্গদেশ তো বিভক্ত হলই, একই সঙ্গে ভাগ বাঁটোয়ারার শিকার হয়ে পড়লো বাংলা ভাষা, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসও। এ বাংলার সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকের কলমে যেমন ও বাংলার মুসলিম লেখকেরা ছাঁটাই হয়ে গেলেন, তেমনই আবার ও বাংলার মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচনাকাররা সামরিক একনায়কতন্ত্রী আয়ুব খানের জমানায় এ বাংলার হিন্দু লেখকদের নাম নথীবদ্ধ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। আবদুল হাই বা আলী আহসানের কলমে বাংলা সাহিত্যের অখ্যাত মুসলিম পুঁথি লেখক, কিসসা রচয়িতা ও পদ্যকাররা যতখানি জায়গা পেলেন, এ বাংলার অনেক অবদান সৃষ্টিকারী হিন্দু লেখক তেমন গুরুত্ব পেলেন না। আবার সুকুমার সেন, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব চৌধুরী প্রমুখের দৃষ্টিতে শেখ কবির, আফজল, শেখ ফয়জুল্লাহ্, সৈয়দ আইনুদ্দীন, সৈয়দ মুর্তজা, আলাওল, আলী রেজা, কমর আলী, সৈয়দ সুলতান, নওয়াজিস প্রমুখ শতাধিক বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি একেবারেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়লেন। প্রায় অনালোচিত থেকে গেল আরাকান রাজসভার সাহিত্য। দৌলত কাজী, কোরেশী মাগন ঠাকুর, আবদুল করীম খোন্দকার প্রমুখের সাহিত্য চর্চার ইতিহাস বিশ্লেষিত হল না তেমন করে। এমন কি অনুল্লেখিত অবজ্ঞায় প্রায় হারিয়ে যাবার মতো অবস্থা সৃষ্টি হল আধুনিক কালের মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭ ১৯১২), নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী (১৮৫৮—১৯০৩), আর্জুমন্দ আলী চৌধুরী (১৮৭০—১৯১৪), মোজাম্মেল হক (১৮৬০—১৯৩৩), মোহাম্মদ নজিবর রহমান (১৮৬০—১৯২৩), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০—১৯৩১), কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২—১৯২৬), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০—১৯৩২), ডাক্তার

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯—১৯৩৬), মুজফ্ফর আহমেদ (১৮৮৯—১৯৫৩), শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩—১৯৫৩), নূরুন্নেসা খাতুন (১৮৯৪—১৯৫৩), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪—১৯৫৩), সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৫—১৯৫৩) প্রমুখ লেখক। কবি গোলাম মুস্তফা, জসীমুদ্দীন, আবদুল কাদির, বেগম সুফিয়া কামালের মতো লেখকেরাও এ বাংলার সাহিত্যের ইতিহাসে জায়গা পাবার উপযোগী বলে বিবেচিত হলেন না। স্বভাবতই মীর মশার্‌রফ হোসেনের লেখা বাংলা সাহিত্যকে কতখানি সমৃদ্ধ করেছে, তাঁর কর্মপ্রয়াস উনিশ শতকের শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের চেতনাকে কীভাবে কতটা পরিপুষ্ট করে তুলেছিল, সে ইতিবৃত্ত অনেকটাই ইতিহাসের আড়ালে থেকে গেছে। একমাত্র তাঁর 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসখানাই একালের কিছু পাঠকের মনে গেঁথে রয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য থেকেই মীর মশার্‌রফ হোসেনের সাহিত্য-কীর্তি ও সমাজ-ভাবনার পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ১৮৭৩ সালে মীর মশার্‌রফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' নামে একখানা ৭৫ পৃষ্ঠার নাটক প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ১২৮০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র সে নাটকের সমালোচনা লিখতে গিয়ে বলেন, 'আমরা পাবনা জিলার প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত এবং বিষাদযুক্ত হইয়াছি।…আমরা পরামর্শ দিই যে, গ্রন্থকারের এসময়ে এগ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা কর্তব্য।' অথচ এই বঙ্কিমচন্দ্রই আবার মীর মশার্‌রফ হোসেনের গদ্যরীতি সম্পর্কে লিখেছেন, 'জনৈক কৃতবিদ্য মুসলমান কর্তৃক এই নাটকখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানী বাঙ্গালার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালার অপেক্ষা এই মুসলমান লোকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ।' বঙ্কিম মশার্‌রফের গোরাই ব্রীজ বা গৌরী সেতু (১৮৭৩) কাব্যগ্রন্থের সমালোচনার সময়েও তাঁর ভাষা-রীতির প্রশংসা করেন।

বঙ্কিমের মন্তব্যের মধ্য দিয়ে যেমন বঙ্কিম নিজেও উদ্ঘাটিত হয়ে ওঠেন, তেমনই উদ্ঘাটন করেন সেকালের সমাজ-মানসিকতার একটা বিশেষ দিক এবং সেই পটভূমিতে মশার্‌রফ হোসেনের কৃতিত্বের পরিচয়টুকু। বস্তুত উনিশ শতকের বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে ইউরোপীয় এন্‌লাইটমেন্টের অনুপ্রবেশ একেবারেই ঘটেনি। কেননা ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশের জয়কে এদেশের বেনে-বুদ্ধির মানুষেরা যে দৃষ্টিতে এবং যেভাবেই গৌরবান্বিত করুক না কেন, মুসলমানরা বিষয়টাকে ধর্মীয় দৃষ্টিতে দেখতেই অভ্যস্ত ছিলেন। আবার ১৮৫৭ সালে 'সিপাহী বিদ্রোহে'র মধ্য দিয়ে ভারতের যে প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তার ব্যর্থতাও এ-দেশের মুসলমানদের বিষাদগ্রস্ত করে তুলেছিল। ব্রিটিশ-বিরোধী ঘৃণার মনোভঙ্গি থেকেই তারা ব্রিটিশের বিরাগভাজন হয়ে পড়ায় এবং সেই ঘৃণার বশেই ইংরেজি ভাষা শিক্ষা বয়কট করার ফলে সরকারি চাকরি, সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ এবং সরকার-সংশ্লিষ্ট ব্যবসার সুযোগ ইত্যাদি আর্থনীতিক

ক্রিয়াকলাপ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। তাই যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণী পুষ্ট হয়ে ওঠার কথা, হিন্দুর মধ্যে তা সম্ভাবিত হলেও মুসলমানের ভেতর সে সময়ে তেমন সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না। বরং মুসলমানদের মধ্যে এক গভীর নৈরাশ্য দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছিল, উনিশ শতকের ব্রিটিশের ছত্রছায়ায় হিন্দু পুনরুত্থানবাদী চেতনার সম্প্রসারণজনিত ঘটনায়। এ কারণেই সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষাচর্চা সম্পর্কে মুসলমানরা অনেকটাই বীতস্পৃহ হয়ে পড়ে। মোগল ও পাঠান আমলে এদেশে যে পার্শী ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির কিছুটা বিস্তার ঘটেছিল, শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে তখনো সেই রেশ থেকে গিয়েছিল।

তবে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যধর্মী ও সমন্বয়বাদী—দুটো ধারা তখন অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। 'ধর্ম গেল' বলে তখন যারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে, মশাররফ হোসেন সেই স্বাতন্ত্র্যবাদীদের দলে না গিয়ে, বরং সমন্বয়বাদী চেতনা প্রসারে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। সে ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু মিত্র ও মাইকেল মধুসূদন দত্তকে তিনি আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। আর বাংলা গদ্যরীতি নির্মাণের ক্ষেত্রে অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে প্রভাবিত করেছিলেন। কিন্তু প্লট নির্মাণের ক্ষেত্রে বঙ্কিম যে ইউরোপীয় মডেল গ্রহণ করেছিলেন, মশাররফ সেই মডেলের অনুসারী ছিলেন না। তিনি দোভাষী পুঁথি রচনারীতিকে অনেকটা আধুনিক অবয়ব দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। 'গ্রামবার্তা' পত্রিকার সম্পাদক কাঙ্গাল হরিনাথ ছিলেন মশাররফের সাহিত্যগুরু। সাহিত্য জীবনের শুরুতে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। এই পত্রিকায় মুসলমান-সমাজের বিবাহ-পদ্ধতির তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন। উনিশ শতকের আরবি-পারসি পড়া মুসলমান সমাজে তা যথেষ্ঠ আলোড়ন সৃষ্টি করে। নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার কথাই হল এ প্রবন্ধের বিষয়। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সংরক্ষণশীল মনের সঙ্গে মশাররফের গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান।

তিনি উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, কাব্য, প্রবন্ধ – সব মিলিয়ে প্রায় তিরিশখানা বই লিখেছিলেন। অনেক বইয়ের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়েছে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। ফলে কালিক চিত্রে ভাস্বর তাঁর অনেক রচনাই। নারী স্বাধীনতার বিষয়টাও এসেছে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। তিনি জন্মেছিলেন অবিভক্ত নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার লাহিড়ীপাড়া গ্রামে ১৮৪৭ সালের ১৩ নভেম্বর এক আধা-সামন্ত পরিবারে। তাঁর লেখাপড়ার জীবনটাও ছিল বেশ অগোছালো। ষোল বছর বয়সে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে তিনি পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। পরের বছরেই কলকাতায় কালীঘাটের এক স্কুলে চলে আসেন। 'আমার জীবনী' গ্রন্থে তিনি নিজেই অকপটে লিখেছেন—সে সময়ে, সেই সতেরো বছর বয়সে কীভাবে জনৈক ঠাকুরাণীর সঙ্গে মাখামাখি করতেন। যে বাড়িতে ছিলেন সে বাড়ির বড় মেয়ের সঙ্গে তখনই প্রেম

করতেন। অথচ তাঁর বিয়ে দেওয়া হল প্রেমিকার ছোট বোনের সঙ্গে। প্রেমিকার জোর করে বিয়ে দেওয়া হয় অন্যত্র। বলাই বাহুল্য, মশাররফের প্রথম বিবাহের জীবন খুব সুখের হয়নি। এই ঘটনাই তাঁকে মুসলিম নারীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেতনায় উদ্দীপিত করে। তিনি লিখেছেন, 'আমাদের সমাজের নীতি চমৎকার। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই।' (আমার জীবনী, পৃষ্ঠা ৩৩৮)

তাঁর লেখাপড়াও খুব বেশি দূর এগোয়নি। আর উনিশ শতকের মুসলমান সমাজের শিক্ষা-ভাবনা নিয়ে তিনি ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন, 'ইংরেজী পড়িলে পাপ তো আছেই। আর মরিবার সময় পিড়ী মিড়ী করিয়া মরিতে হইবে। আল্লাহ রসুলের নাম মুখে আনিবে না।··ইংরেজী পড়িলে একরূপে ছোটখাটো শয়তান হয়, দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করে, সরাব খায়।···হালাল হারামে প্রভেদ নাই। পাক-নাপাক জ্ঞান থাকে না। মাথার চুল খাটো করিয়া নানা ভাবে ছাঁটে। সাহেবী পোশাক পরে।' (আমার জীবনী, পৃষ্ঠা ২৬৪)

এ রকম এক অবস্থার মধ্যে তিনি ভাষাচর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টিতে নিয়োজিত হয়েছিলেন এবং বঙ্কিমের কালের লেখক হয়েও একটা নিজস্ব আদল গড়ে তুলেছিলেন। আখ্যান বৈশিষ্ট্য হিসাবে তাঁর লেখায় দোভাষী পুঁথি, রূপকথা এবং অধ্যাত্ম কথাও প্রাধান্য পেয়েছে। ধর্মমূলক কবিতা ও কাহিনীও লিখেছেন ধর্মের ইতিবাচক আদর্শে মানুষকে অনুপ্রাণিত করার জন্য। কিন্তু রূঢ় সমাজ-বাস্তবতার চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর শৈল্পিক দক্ষতা খুবই উচ্চমানের।

এ ছাড়া তাঁর সংস্কার-বিহীন মুক্ত মনের পরিচয়ও সেকালের পটভূমিতে বিচার করলে কম বিস্ময় উদ্রেক করে না। নিজের লেখায় 'আল্লাহ' শব্দটা না বসিয়ে তিনি 'ঈশ্বর', 'ভগবান' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করার সাহস দেখিয়েছেন সেই উনিশ শতকের ধর্মীয় গোঁড়ামিতে ভরা সমাজ-ব্যবস্থার কথা মনে রেখেও। তাঁর বহুল-পঠিত উপন্যাস 'বিষাদ-সিন্ধু'র উদ্ধার পর্বের চতুর্থ প্রবাহে লিখেছেন : ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান ভগবান, সমাজের মূর্খতা দূর কর! কুসংস্কার তিমিরসদজ্ঞান জ্যোতি প্রতিভায় বিনাশ কর। নিজের ছেলে-মেয়ের নামের সঙ্গে ডাকনাম জুড়ে দিয়েছেন সুনীতি, সুমতি, রণজিৎ, ধর্মরাজ, সুধন্বা ইত্যাদি। এখনো এ বাংলায় মুসলমানের ছেলের নাম 'অনুভব' বা 'অন্বয়' রাখলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান অধ্যাপকের নাক কুঁচকে ওঠে। অথচ সেকালে মশাররফ হোসেন ব্যক্তিক জীবনাচরণের ক্ষেত্রে সেই নজির স্থাপন করেছিলেন। এটা কম কথা নয়।

এ নিয়ে 'আমার জীবনী'তে তিনি এক চমৎকার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণনগরের স্কুলে পড়ার সময়ে তিনি সেই শহরের হিন্দু-মুসলমান মিলমিশের চিত্র দেখে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। বাবার দেওয়া পাজামা চোগা চাপকান তিনি বাড়িতে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। শান্তিপুরের ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে শুরু করেন। আর মাথার

টুপি? সেটা শেষ পর্যন্ত আগুনে পুড়িয়েই দেওয়া হয়। ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে বাবা মুয়াজ্জম হোসেনকে বলেছিলেন কৃষ্ণনগরের অভিজ্ঞতার কথা। বাবাও খুশি হয়েছিলেন কৃষ্ণনগরে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি সৃষ্টির কথা শুনে।

মশাররফ হোসেন প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কার ভাঙ্গার কাজেও ব্রতী হয়েছিলেন। সে ক্ষেত্রে কারোর ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত লাগতে পারে জেনেও তিনি ভূত-প্রেত এবং মুসলিম ধর্মশাস্ত্র বর্ণিত জিন-পরি নিয়ে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি। 'আমার জীবনী' গ্রন্থের ৯৭ পৃষ্ঠায় তখনকার সমাজ-মানসিকতার নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছেন। লিখেছেন :

> 'আমার যে সময় জন্ম হয়—সে সময়, আমাদের দেশে অত্যন্ত ভূতের ভয় ছিল। ভূতও এক শ্রেণীর ছিল না। শিশু সন্তানদিগের জন্য পেঁচাপেঁচি নির্ধারিত ভূত। জাতঘরে তাহাদেরই অধিকার আধিপত্য। জাতঘরের বারান্দায় দিবারাত সমভাবে আগুন জ্বলিত। শুকন কাষ্ঠের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে।··· বারান্দার এক পার্শ্বে চাটাই দ্বারা ঘিরিয়া দিবারাত্র কোরাণ সরীফ পাঠ···। জন্মের পরক্ষণেই সাতবার আজান···। প্রত্যেকের মনে বিশ্বাস যে আজানের আওয়াজ যতদূর বাতাসে লইয়া যায়,···তত দূর ভূত-প্রেত, দেও-দৈত্য, দানো, জেন পরি অধিকন্তু শয়তান থাকিতে পারে না।'

তাঁর সর্বাধিক আলোচিত উপন্যাস 'বিষাদ-সিন্ধু'-তেও তিনি শিল্পমূল্য সৃষ্টির তাগিদেই ধর্মীয় বিশ্বাসের দাসত্ব ভেঙ্গে দিয়েছেন। 'বিষাদ-সিন্ধু'-র মূল কাহিনী-কাঠামো সংগ্রহ করেছেন সপ্তম শতকের আরব দেশের খলিফা-তান্ত্রিক শাসন-কাহিনী থেকে। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদের নাতি হোসেনের সঙ্গে শাসন ক্ষমতা নিয়ে যুদ্ধ বেধে যায় ওই বংশেরই আর এক দাবিদার হযরত মাবিয়ার ছেলে এজিদের। হোসেনের জন্য যে কোনো মুসলমানের মন দুঃখদীর্ণ হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। তাঁদের দৃষ্টিতে এজিদ হয়ে ওঠেন নরখাদক। মশাররফ হোসেন কিন্তু প্রথা ভেঙ্গে এজিদ সম্পর্কে পাঠককে সংবেদনশীল করে তুলতে চেয়েছেন। মধুসূদন যেমন তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্যে' রাবণকে বীরের আসনে বসিয়ে তার চরিত্রে নায়কোচিত মহিমার দ্যুতি সঞ্চারিত করেছেন, মশাররফ হোসেনের এজিদ যেন অনেকটা সে রকমই। রাষ্ট্রনীতির চেয়ে হোসেনের স্ত্রী জয়নারের প্রতি এজিদের রূপমোহ সৃষ্টির দ্বারা মশাররফ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বকে আবর্তিত করতে চেয়েছেন। ফলে উপন্যাসটি মহাকাব্য না হয়েও মানবীয় রসে মহাকাব্যিক আমেজ আনার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। মধুসূদন এক চিঠিতে এই কারবালা যুদ্ধের কাহিনীর মধ্যে মহাকাব্যিক সম্ভাবনার কথা উল্লেখও করেছিলেন। মশাররফ হোসেন 'এজিদ' চরিত্র নির্মাণে মধুসূদনের দ্বারা প্রভাবিত হতেই পারেন। আবার বঙ্কিমের শিল্পরীতির মতোই 'বিষাদ-সিন্ধু'-তেও রূপমোহ সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়। তবে ঐতিহাসিক চরিত্রের নাম থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিমের

'রাজসিংহ' যেমন ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, তেমনই 'বিষাদ-সিন্ধু'-ও ইতিহাসের সত্যাসত্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়নি। শিল্পসৃষ্টির প্রেরণাই লেখককে তাড়িত করেছে। 'বিষাদ-সিন্ধু'-র অন্যতম সম্পদ হল এর ভাষা। যেমন :

"শিষ্যগণ করযোড়ে বলিতে লাগিলেন 'প্রভুর অগোচর কি আছে? ঘনাগমে কিম্বা নিশাশেষে পূর্ণচন্দ্র হঠাৎ মলিন ভাব ধারণ করিলে তারাদলের জ্যোতি তখন কোথায় থাকে? আমরা আপনার চির আজ্ঞাবহ। অকস্মাৎ প্রভুর পবিত্র মুখের মলিন ভাব দেখিয়াই আমাদের আশঙ্কা জন্মিয়াছে।...আমরা বেশ বুঝিয়াছি. সামান্য বাত্যাঘাতে পর্বত কম্পিত হয় নাই। সামান্য বায়ু প্রবাহেও মহাসমুদ্রে প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হয় নাই। প্রভো! অনুকম্পা প্রকাশে শীঘ্র ইহার হেতু ব্যক্ত করিয়া অল্পমতি শিষ্যগণকে আশ্বস্ত করুন।" (উপক্রমণিকা, বিষাদ-সিন্ধু)

সে দিক থেকে উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের বিকাশ ধারায় মশাররফ হোসেন এক বড় মাপের স্থাপত্য-গৌরবের অধিকারী।

মশাররফ হোসেনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক মনোভূমির পরিচয় বিধৃত রয়েছে ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'জমিদার দর্পণ' শীর্ষক নাটকে এবং ১৮৯০ সালে প্রকাশিত 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' নামের এক উপন্যাস-ধর্মী রচনায়। ১৮৬০ সালে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত হবার পর বাংলায় দর্পণ-নাটক লেখার রেওয়াজ চালু হয়ে যায়। যেমন পল্লীগ্রাম দর্পণ, কেরাণী দর্পণ, চাকর দর্পণ, জেল দর্পণ ইত্যাদি। কিন্তু জমিদার দর্পণ, ঠিক সে জাতীয় হুজুগের ফসল নয়। হুজুগই যদি হবে, তাহলে সতেরো বছর পর প্রকাশিত 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'-য় মশাররফ হোসেন নীলকর অত্যাচারের কাহিনী রূপায়ণে অতটা আন্তরিক হয়ে উঠতে পারতেন না।

যে সময়ে বাংলার বাবুরা ইংরেজ সাহেবদের মনোরঞ্জনের জন্য ঘরের বউ-ঝিকে পর্যন্ত মদ খাইয়ে সাহেবদের সামনে বিবস্ত্রা করে তুলছেন, সেই পরিস্থিতিতে আধা-সামন্ত পরিবারে জন্মেও এবং টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে এক জমিদারি এস্টেটের ম্যানেজারের চাকরি করেও মশাররফ হোসেন জমিদারদের অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেছেন। 'জমিদার দর্পণ' নাটকে নিপীড়িত মানুষের প্রতি লেখকের সমবেদনা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার কৃষকের লাঞ্ছনায় লেখক মর্মে মর্মে পীড়া অনুভব করেছেন। 'নীল দর্পণের' মতো সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের কথা 'জমিদার দর্পণে' না থাকলেও অত্যাচারী জমিদারদের প্রতি মানুষের ঘৃণা সৃষ্টির মনোভঙ্গি ধিকৃত।

আর 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থে নীলকর অত্যাচারের কাহিনী তো আছেই। আছে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সংগ্রাম ও প্রতিরোধ প্রয়াসের কথা।

'গাজী মিয়ার বস্তানী' (১৯০০) নামের রসরচনার মধ্যেও মশাররফ হোসেন তদানীন্তন সমাজের কুশ্রী কালো চিত্রকে তুলে ধরেছেন নিপুণ মুন্সিয়ানায়। এ গ্রন্থের

বিষয়বস্তু হল জমিদারদের স্বেচ্ছাচার, জোর-জুলুম, অনাচার, সে-সময়কালের সরকারী কর্মচারীর দুর্নীতি, সামাজিক অনাচার, মানুষের স্বার্থপরতা ইত্যাদি।

এ ভাবেই মীরের চিন্তায় তাঁর কালের সমাজ ও স্বদেশ আন্দোলিত হয়ে ওঠে সাহিত্যের স্বকীয় পরিভাষায়। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির ছোপলাগানো উনিশ শতকের গর্ভবিন্দুতে দাঁড়িয়ে মীর এ কারণেই হয়ে ওঠেন এক ভিন্ন মাত্রার সমাজ-সংস্কারক।

তাঁর এই সমাজ-সংস্কারের ভাবনা শুধু ধর্মীয় কু-আচার বা পশ্চাদ্‌গামিতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়নি। সে-কালের সেই সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে তিনি অনেকাংশেই হয়ে উঠেছিলেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এখানেই তাঁর অনন্যতা। এ রকম একজন লেখক ও চিন্তাবিদের, তাই এ কালের, বিশেষ করে এ বঙ্গের নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠাটা বিশেষভাবেই দরকার।

মীর মশাররফ হোসেন রচিত গ্রন্থ তালিকা

রত্নাবতী ১৮৬৯ (উপন্যাস)
গোরাই ব্রীজ বা গৌরীসেতু ১৮৭৩ (কাব্য)
বসন্তকুমারী ১৮৭৩ (নাটক)
জমিদার দর্পণ ১৮৭৩ (নাটক)
এর উপায় কি ? ১৮৭৫ (প্রহসন)
বিষাদ-সিন্ধু (ঐতিহাসিক উপন্যাস)
মুহররম প্রথম পর্ব ১৮৮৫ দ্বিতীয় পর্ব ১৮৮৭
এজিদ-বধ পর্ব ১৮৯১
সঙ্গীত লহরী প্রথম খণ্ড ১৮৯৪
গো-জীবন ১৮৮৯ (প্রবন্ধ)
বেহুলা গীতাভিনয় ১৮৮৯
উদাসীন পথিকের কথা ১৮৯০ (ঐতিহাসিক উপন্যাস)
গাজী মিয়ার বস্তানী (উপন্যাস) প্রথম অংশ ১৮৯০
দ্বিতীয় অংশ ১৯০৮
মৌলুদ শরীফ ১৯০৩ (গদ্য-পদ্য)
মুসলমানের বাঙলা শিক্ষা ১৯০৩
বিবি খোদেনার বিবাহ ১৯০৫ (কবিতা)

হযরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ ১৯০৫ (কবিতা)
হযরত বেলালের জীবনী ১৯০৫
হযরত আমির হাসদার ধর্মজীবন লাভ ১৯০৫ (কবিতা)
মদিনার গৌরব ১৯০৬ (কবিতা)
মোশ্লেম বীরত্ব ১৯০৭ (কবিতা)
এসলামের জয় ১৯০৮ (কবিতা)
আমার জীবনী ১৯০৯-১০, ১২ খণ্ড
বাজীমাত ১৯০৮ (কবিতা)
হযরত ইউসোফ
খোতবা
বিবি কুলসুম ১৯১০
সম্পাদিত পত্রিকা ☐ আজীবন নেহান (মাসিক)
প্রথম সংখ্যা এপ্রিল ১৮৭৪

☐ জিয়াদ আলী

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা : ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে রমেশচন্দ্র দত্ত

বাংলা অভিধানে 'সার্বভৌম' বলে একটি শব্দ আছে, যার সরলার্থ সর্বভূমিতে যাঁর অধিকার, সর্বভূমির যিনি অধিপতি—প্রতিভাধর সর্ববিদ্যাবিশারদ কৃতীদের ক্ষেত্রেই বিশেষণটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে, যেমন রবীন্দ্রনাথ—'সার্বভৌম কবি রবীন্দ্রনাথ', কেননা সাহিত্যের সকল শাখাতেই তাঁর সৃষ্টিশীল পদচারণা কীর্তি রচনা করেছে। রবীন্দ্রনাথের মতোই বিশেষণটি ব্যবহৃত হতে পারত রমেশচন্দ্র দত্তের ক্ষেত্রেও, অন্তত এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করার মতোই তাঁরও ছিল ঐশ্বর্য ও বিস্তার। ওই বিশেষণটি ব্যবহার করলে হয়তো অতিশয়োক্তির মতোও শোনাত না, কিন্তু তাঁর সব কৃতিত্বকেই ক্ষতাক্ত করে দিয়েছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে তাঁর সমর্থনসূচক মতামতটি—যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরেজের অবলম্বিত ভূমি রাজস্বনীতির মধ্যে ছিল অন্যতম নিন্দিত ধিক্কৃত ব্যবস্থা, সমকালে তো বটেই পরবর্তীকালেও সমাজ অর্থনীতির পর্যালোচনায় যে অভিমতটি ঐকমত্যের ভিত্তিতে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিতই হয়েছে, তাতে খুব স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে আমাদের জাতীয় জীবনে একদা যে বড় রকমের অনর্থটি ঘটে গিয়েছিল অবশ্যই তার নাম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। স্বাভাবিকভাবেই সমকালে 'রমেশচন্দ্র দত্ত' নামের সম্ভ্রম-মিশ্রিত মনোভাবটিও দশ-কুড়ি বছর পর থেকে আর থাকেনি, অপনয়িত হতে হতে শেষ অবধি ঐতিহাসিক উল্লেখই হয়ে উঠেছে মাত্র। আজও শিক্ষিত-সচেতন ব্যক্তিকেও রমেশচন্দ্র দত্তর নামে দু-চার কথা বলতে হলে 'সংসদ চরিতাভিধান' বা 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' জাতীয় গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে হয়।

অথচ ইতিহাস অর্থনীতি রাজনীতি সাহিত্য শাস্ত্র কোন দিকেই না তাঁর পরাক্রমী পরিক্রমণ ঘটেছিল ! বিস্ময়ের অন্ত থাকে না যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'-র রমেশচন্দ্র অংশের গ্রন্থতালিকার দিকে নজর রাখি, যদিও সে তালিকা পূর্ণ নয়। এর বাইরে আছে অসংখ্য ইংরাজি রচনা, যা ব্রিটিশ শাসক ও ভারতীয়দের সতর্ক-শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে তিনি লিখে গিয়েছিলেন। বরোদার দেওয়ানের চাকরি নিয়ে শাসন সংক্রান্ত নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালীন সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছিলেন, কংগ্রেস নেতৃত্বে এসে নিরীক্ষামূলক অসংখ্য লেখাজোখা নিয়ে সভাসমিতিতে আসতে শুরু করে

দিয়েছিলেন—সম্মিলিত লেখ্যকাণ্ডে কী নেই। ইতিহাস রাজনীতি অর্থনীতি পুরাণশাস্ত্র ক্লাসিক সাহিত্য—এমন কি নবোদ্ভূত বাংলা সাহিত্যও! সৃষ্টিদক্ষ সজীব এই ধরনের কিছু কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ধরনের বিস্তারিত বিশ্লেষণ না করলে তাঁদের সম্পর্কে অল্প কথায় সবটুকু বলা যায় না। দেশে দেশে কালে কালে এই জাতীয় কিছু ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, যাঁরা বাড়তে বাড়তে বেড়ে চলেন বা শাখা-প্রশাখা ডালপালা শিকড়-ঝুরি নামাতে নামাতে এমন এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে বিরাজ করেন, তখন তাঁকে ওই ধরনের 'সার্বভৌম প্রতিভা', 'বনস্পতি', 'মহীরুহ', নানা নামে চিহ্নিতই করতে হয়, কেননা চিহ্নিতকরণের আর যে কোনো উপায়ই থাকে না—কোনটি ছিল তাঁর সূচনাংশ, স্ব-স্থান! পত্রে পল্লবে-মুকুলে মঞ্জরিত আজকের এই মহীরুহের মূলাধারটি ছিল কী! কোন উদ্ভেদ ব্যাকুলতায় বারে বারে কিশলয়িত হয়েছে! কিশলয় থেকে পল্লব—পল্লব থেকে ডালপালা—কাণ্ড! ১৯০৯ সালের ৩০ নভেম্বর রমেশচন্দ্র দত্ত মারা গেলে 'দৈনিক বসুমতী'তে সম্পাদক সুরেশচন্দ্র শোকস্তম্ভে সেই ভাবই ব্যক্ত করেন—"স্বদেশনিষ্ঠ, স্বদেশবাসীর প্রিয় রমেশচন্দ্র—বিচক্ষণ রাজকর্ম্মচারী রমেশচন্দ্র, কংগ্রেস-যজ্ঞের অন্যতম অধ্বর্য্যু, বাগ্মী রমেশচন্দ্র, দীন বঙ্গ সাহিত্যের ভক্ত উপাসক, ঔপন্যাসিক, ঋগ্বেদের অনুবাদক রমেশচন্দ্র—ইংরাজী সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, নানা ইংরাজী গ্রন্থের প্রণেতা রমেশচন্দ্র, রাজস্ব ও শাসন ব্যবস্থায় পারদর্শী, সুতার্কিক, কর্জ্জন-বিজয়ী রমেশচন্দ্র, রাজা ও প্রজার বন্ধু, বিজ্ঞ ব্যবস্থাপক রমেশচন্দ্র, গায়কবাড়ের অমাত্য, বরোদার দেওয়ান রমেশচন্দ্র, ভারতের সকল শুভানুষ্ঠানের হিতকামী কর্ম্মবীর!"

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির মধ্যে স্পষ্টতই শ্রদ্ধাজনিত হাহাকারের সঙ্গে বক্তব্য প্রতিপাদনের একটা অস্থিরতাও লক্ষণীয়। অর্থাৎ কী বিশেষণ যুক্ত করলে রমেশচন্দ্র দত্তের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণভাবে ধরা যাবে! সেদিনে এই রকমের আবেগঘন অস্থিরতা থাকাই স্বাভাবিক, কেননা আজও তো রমেশচন্দ্রকে নিয়ে পণ্ডিত কৌতূহলী মহলে দিগ্‌ভ্রান্তির চিহ্ন কিছু কম নেই! তাঁর কৃত্যাকৃত্যের মধ্যে থেকে কোনটাকে যে বলব তাঁর মূল অভিজ্ঞান, কী যে তাঁর মূল শক্তি বা প্রেরণা এ নিয়ে বিতর্ক বেধেই আছে! দু-একজন তো সরাসরি তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্র-অনুসারী ঔপন্যাসিক রূপেই চিহ্নিত করতে চান। বিশেষত 'মাধবী কঙ্কন', 'বঙ্গবিজেতা', 'জীবনপ্রভাত' (মহারাষ্ট্র), 'জীবন সন্ধ্যা' (রাজপুত)-এর পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ বলেনও স্থানে স্থানে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষাও সফল ঔপন্যাসিক! কেউ কেউ বলেন, তিনিই অবিভক্ত ভারতবর্ষের প্রথম অর্থনৈতিক ইতিহাসের লেখক—কৃষি অর্থনীতিবিদ। একদল তো জোর দিয়েই বলতে চান তিনিই ভারতের প্রথম সচেতন সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক রাজনীতিবিদ। এমন মতও তাঁর সম্পর্কে আছে যে, তিনি নিছকই হিন্দু-পুনরুত্থানবাদী প্রাচীন শাস্ত্রবেত্তা—ছাব্বিশ বছর একাদিক্রমে প্রথম শ্রেণীর ইংরেজ কর্মচারীরূপে শাসনকার্যের সঙ্গে যুক্ত থেকেও রামায়ণ মহাভারত থেকে শুরু করে বেদ ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদ গীতা ষড়দর্শন, অষ্টাদশপুরাণে যে ভাবে

মনোনিবেশ করেছেন, তাঁকে তো আপাতভাবে তা বলা যেতেই পারে।

মনে হয় পরবর্তীকালে পাঠক যে এই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়বেন এই ভাবনাচিন্তা করেই রমেশচন্দ্র তাঁর স্থান নিজেই নির্দেশিত করে গিয়েছিলেন অগ্রজকে লেখা এক পত্রে —'আমি বেঁচে থাকব প্রাচীন কাব্যসাহিত্য ও সভ্যতা সম্পর্কিত লেখার মধ্যে দিয়ে এবং অর্থনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে দিয়েই।' অথচ আশ্চর্য, তিনি চার-চারটি ঐতিহাসিক উপন্যাস ছাড়াও 'সংসার', 'সমাজ'-এর মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উপন্যাসও রচনা করেছিলেন। অধিকন্তু সেইগুলি ইংরাজিতে অনুবাদও করেছিলেন, অথচ প্রত্যাশা রাখার ক্ষেত্রে কোনো জল্পনারই জাল বুনলেন না!

অনেকেই মনে করেন রমেশচন্দ্রের প্রথম প্রেমটা ছিল সাহিত্যের সঙ্গেই। যেহেতু সারা জীবনই কোনো না কোনো ভাবে অবসরে-অবকাশে সাহিত্যের সঙ্গে যোগটা রেখেই চলেছিলেন। প্রথম জীবনে লালবিহারী দে সম্পাদিত 'Bengal Magazine'-এ এবং শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'Mukeıjee's Magazine'-এ 'Arcydae' ছদ্মনামে (R. C. D.) ইংরাজিতে কবিতা-প্রবন্ধ তো লিখতেনই, পরবর্তীকালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত হলে, তাঁর পড়ানোর বিষয়ই তো হয়েছিল ভারতীয় মহাকাব্য ও প্রাচীন সাহিত্য। ১৯০২ সালে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখকে নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনিই, যদিও এরও আগে ১৮৭৭ সালে 'The Literature of Bengal···From The Earliest Times To The Present Day With Copious Extracts From The Best Writers' প্রকাশ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও রমেশচন্দ্র জানতেন প্রথম শ্রেণীর মৌলিক প্রতিভা না থাকলে সাহিত্যে স্থান পাওয়া যায় না, যা কিনা মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-দীনবন্ধুদের ছিল বলেই তিনি মনে করতেন এবং যা তাঁর মধ্যে ছিল না। তবুও সময়ের ডাকে বিশেষ ঐতিহাসিক মহামুহূর্তে যার যা কিছু আছে তাই নিয়েই এগিয়ে আসতে হয়, ইতিহাস-সচেতন রমেশচন্দ্র এই সার কথাটি মনে করেই নিজস্ব সীমাবদ্ধতা নিয়েও এগিয়ে এসেছিলেন, কেননা মনেপ্রাণে তিনি বিশ্বাস করতেন জাতি গড়ে উঠছে। আর, একটা জাতি গড়ার সর্বময় নির্মাণযজ্ঞে নিজস্ব ভাষা নিজস্ব সাহিত্যের গুরুত্ব কতখানি তাও তিনি জানতেন। তাই স্পষ্ট মনে সেই উদ্যোগে সামিল হওয়ার জন্যেই তিনি এগিয়ে এসেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের পরামর্শকে শিরোধার্য জ্ঞান করে। তা না হলে ভাবার কোনো কারণ নেই, বঙ্কিমচন্দ্রের আদেশে গুরুকৃত্য করার জন্যেই তিনি সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে কোনো ভাবেই রমেশচন্দ্র গুরু রূপে মানতেন না, মানলে 'সংসার' উপন্যাসে ওইভাবে একাধিকবার 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের উল্লেখ করে উপন্যাসোক্ত বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত বিরূপতাকে সমালোচনা করে বিদ্যাসাগর ও বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত সংস্কারমুক্তির প্রশংসা করে উপসংহার টানতেন না।

রমেশচন্দ্রের চরিত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর অগ্রজ যোগেশচন্দ্র বলেছিলেন,

তাঁর চরিত্রের নাকি দুটি দিক ছিল উল্লেখনীয়। এক, অদম্য জ্ঞানতৃষ্ণা, দুই, যশলিপ্সা। প্রথমটি সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই, তবে দ্বিতীয়টি সম্পর্কে বলা যায়, তাঁকে শুধু যশলিপ্সু বললে কোথায় যেন বিশ্লেষণের এক বড় ভ্রান্তি থেকে যায়, আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যাকুলতার থেকেও তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছিল জাতি গঠনের শুভ মুহূর্তে নিজেকে নিয়োজিত করার কার্যকরী মনোভাব, গালভরা কথায় যাকে বলা যায় উৎসর্গীকরণ। অবশ্যই যোগেশচন্দ্রের বক্তব্যের মধ্যে যে কিছু সত্য নেই তা নয়, অল্প বয়স থেকেই রমেশচন্দ্র ছিলেন খুবই একনিষ্ঠ, পরিবারের বড়দের বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আই সি এস পরীক্ষা দেবার ব্যাকুলতা জানিয়ে বিলেতের জল্পনাকল্পনা অনুশীলন-প্রস্তুতিতে যেভাবে কিশোর কালের দিনগুলো কাটাতেন, বিশেষত রমেশচন্দ্র যেভাবে ইংল্যান্ডের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন, চলতি কথায় তাকে আর কীভাবেই বা ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু যোগেশচন্দ্র ছোট ভাই রমেশচন্দ্রকে যেভাবে দেখেছিলেন, অল্প দিনের মধ্যেই সেই রমেশচন্দ্রের বদল হয়েছিল। রমেশচন্দ্র-চরিত্রের সর্বাপেক্ষা বড় কথা ক্রমাগত তিনি নিজেকেই নিজে বদলে বদলে চলেছিলেন। ক্রমাগতই ছোট থেকে বড় রাস্তায় উঠে এসেছিলেন। তাঁর শুরু যেখানে, অবশ্যই শেষ অবধি সেখানে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেননি। রমেশচন্দ্রের জীবনের শেষ দিকে কার্জনের বঙ্গভঙ্গ নিয়ে আন্দোলন-প্রতিআন্দোলন বাদ-প্রতিবাদ তুমুলে উঠেছিল। রমেশচন্দ্রের ভূমিকাটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। একদা উচ্চপদের রাজকর্মচারী হওয়ার কারণে বঙ্গভঙ্গ সংক্রান্ত নানান কমিশনের তিনি সদস্য ছিলেন, আবার কংগ্রেস নেতৃত্বের অংশীদার হওয়াতে সরাসরি জাতীয় স্তরের নেতাদের মধ্যেকার আলাপ-আলোচনায়, সভা-সমিতির নানা বক্তৃতায় অংশও নিতেন। উদ্ধৃতি দেবার প্রয়োজন নেই - একই কথা তাঁর বক্তৃতায় ঘুরে ফিরে আসত—ছোটখাট ভেদ অহমিকা ও স্বার্থজ্ঞান ভুলে উৎসর্গীকরণের মনোভাব নিয়ে যদি এগিয়ে আসতে পারি তাহলে জাতিগঠনের এই পুণ্যলগ্নে কোনো বাধাই বাধা হয়ে পথ রুখতে পারে না। সমকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে সে সময়ে বহু মত বহু পথ ব্যক্তিত্বের তীব্র সংঘাত ছিল। রমেশচন্দ্র নিজস্ব চিন্তার সবটুকু বোধগম্য করাতে পারেননি এবং পারেননি বলেই বরোদার রাজস্ব সচিব হয়ে চাকরি নেওয়ার পরে তিনি দেশ ও জাতি গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্যে নিবেদিতাকে যে চিঠিটি লেখেন, তার মধ্যেই তাঁর সারা জীবনের হৃৎস্পন্দনটি ধ্বনিত হয়েছে। বারে বারে বলেছেন দেশ বা কোনো অঞ্চলের সর্বাত্মক উন্নয়নের জন্যে দরকার বাস্তববাদী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সাধারণ মানুষকে সর্বপ্রয়াসে সেসব কাজে সামিল করা। সর্বাত্মক উন্নয়ন বলতে বুঝেছিলেন—এক, ঐক্য: দুই, কৃষির উজ্জীবন: তিন, শিল্পের উন্নয়ন: চার, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ। সর্বোপরি চিঠির শেষে জোর গলাতেই বলেছিলেন—"Everything shall be open and above-board, nothing done in dark tortuous, secret, autocratic ways. Dreams! Dreams! some will exclaim. Well, let

them be so, —it is better to dream of work and progress than to wake to inaction and stagnation. This to last shall never be my vocation, it is not in my nature······Ever your loving godfather." বাস্তবিকই বড় কিছু করতে হলে স্বপ্নই দেখতে হয়। বর্তমানের ন্যূনতম আলোকরেখা দেখেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে মনশ্চক্ষুতে দেখতে হয় এবং সেই ভাবেই নিজেকে গতিশীল করে প্রকল্প-পরিকল্পনা রচনা করতে হয়। রমেশচন্দ্র পারিপার্শ্বিক বিশ্বের দৃষ্টান্ত নিয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে সেই ভারতকেই দেখতে পেয়েছিলেন। নতুন নতুন কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে যত বেশি করে দেখেছেন তত বেশি করেই ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান তৈরি করে নিয়ে ভাবী দিনের পরিকল্পনা রচনা করে চলেছিলেন। কোনো দ্বিধা সংকোচ বা জড়তার সেখানে প্রশ্নই ছিল না। 'রমেশচন্দ্র দত্ত' চরিত্রের মেরুদণ্ডটা ছিল এখানেই, বনস্পতি-চরিত্রের মূলত্র। বঙ্কিমচন্দ্রকে পরম শ্রদ্ধেয় জ্ঞান করেও তাই বিধবাবিবাহের প্রশ্নে বঙ্কিমচন্দ্রের রক্ষণশীল মনোভাবকে সমালোচনা করতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হননি। আধুনিক ভারতের শিক্ষিত মানুষজনের কাজের ভাষা যে হবে ইংরাজি, সে সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেও বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিতে পরাঙ্মুখ থাকেননি। ভারতবর্ষের ইতিহাস-ঐতিহ্য সৃষ্টিতে বেদাশ্রিত ধর্ম-দর্শন যে অনেকখানি শাঁস জল দিয়েছে সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ থেকেও বুঝেছিলেন, আধুনিক ভারত গড়বে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত শক্তিতেই. কার্জন অবলম্বিত নীতির মধ্যে দিয়ে সেই ঐক্যনাশী দুর্যোগ যখন ঘনিয়ে এসেছিল তখনই তিনি ছুটে ছুটে গিয়েছিলেন কখনো ভারতের 'আম-জনতার' কাছে, কখনো ভারত-সচিব মর্লে তথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে. কখনো বা গোখলেকে সহকর্মীরূপে নিয়ে খোদ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সভায়, লেবর পার্টির মাননীয় দরদী সভ্যদের কাছে। হতে পারে রমেশচন্দ্রের ওই ধরনের উদ্যম যে পরিমাণে ব্যয়িত হয়েছিল, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট-'লেবর-পার্টি'-ভারত সচিবের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ স্থাপনে, তার আনুবীক্ষণিক অংশই ব্যয়িত হয়েছিল 'আম-জনতার' সঙ্গে জনমত সৃষ্টিতে। হতে পারে এই প্রবণতা নিতান্তই কার্যোদ্ধারের সাময়িক পন্থা, কোনো সত্যিকারের গঠনাত্মক প্রক্রিয়া নয়, কিন্তু ভুললে চলবে না বঙ্গব্যবচ্ছেদের সেই দুর্যোগে রমেশচন্দ্র সেই পন্থাই নিতে চেয়েছিলেন, যাতে কিনা সাময়িকভাবে প্রস্তাব রদ করে দিয়ে আরো বড় গঠনাত্মক কর্মসূচী গ্রহণ করার মতো সময় হাতে পাওয়া যেতে পারে, কেননা সে সময়ে সবচেয়ে বড় কথা তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল জাতি গঠনের যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, শিক্ষিত বাঙ্গালীর আত্মবিকাশের যে শুভলগ্ন উপস্থিত হয়েছে, তা যেন কোনোভাবে বিঘ্নিত না হয়। দেশ বলতে আজকের আপামর জনসাধারণের যে প্রত্যয়—সেদিন তা কোথাও ছিল না, ছিল কাছে-দূরে সৃজ্যমান শিক্ষিত শ্রেণীরই অস্তিত্ব, তারই কথা ভেবে রমেশচন্দ্র একটু বেশি রকমের বাস্তববাদী হয়ে উঠেছিলেন মাত্র। Arnold Toynbee-এর মতোই

রমেশচন্দ্রও বুঝেছিলেন আপাতভাবে প্রাচ্য-প্রতীচ্য যতই দূরতম বিপরীত কোটিতে অবস্থান করুক না কেন, নতুন জাতিগঠনের প্রয়োজনে নবোদ্ভূত অস্তিত্ব রক্ষার অনিবার্য তাগিদে দুজনেই নিজস্ব অবস্থান থেকে সরে এসে ক্ষেত্র বিশেষে একত্রীভূত হতে বাধ্য হবে এবং বাস্তবে হচ্ছেও তাই—পরিতৃপ্ত রমেশচন্দ্র অযথা বিঘ্নের আশঙ্কায় একটু বেশি ব্যাকুল হয়ে যেকোনো মূল্যে তাকে বন্ধ করতেই সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন।

রমেশচন্দ্র দত্তের বাবা ছিলেন ডেপুটি কলেক্টর। সরকারী কাজে তাঁকে ঘুরতে হোত সেকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। অনিবার্যভাবেই বালক রমেশচন্দ্রকেও পিতার বদলি-চাকরির ফলভোগ করতে হোত। সে সময়ে রেল ছিল না, যাতায়াতের মাধ্যম ছিল অশ্ব, নৌকা ও পাল্কি। এই ঘোরাঘুরির মধ্যে দিয়ে তিনি যেমন জনপদজীবনের প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ-লাঞ্ছনা আশা আকাঙ্ক্ষা দুর্দৈবের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, তেমনি ইংরেজের প্রত্যক্ষ সংযোগ-সান্নিধ্যে ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে নবোদ্ভূত বাঙ্গালী সমাজকেও দেখেছিলেন। এই দেখাশোনার আরো সম্পূর্ণতা ঘটেছিল পিতা ঈশানচন্দ্র দত্ত তাঁকে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে (হেয়ার স্কুল) ভর্তি করে দেওয়াতে। পরবর্তীকালে এই স্কুলই ইংরাজিচর্চার অন্যতম কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি পেয়েছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত নতুন পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতায় নিজেকে আরো স্থির লক্ষ্যে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন, আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন নতুন ভারতের হৃৎস্পন্দনকে। অচিরে বাবা-মা মারা যাওয়াতেও লক্ষ্যচ্যুত হননি, অধিকন্তু আরো অধ্যবসায়ী হয়ে উঠেছিলেন। কাছ থেকে দেখেছিলেন কাকা শশীচন্দ্রকে, যিনি সে সময়ে ইংরাজি ভাষার একজন নামী লেখকরূপেও পরিগণিত হয়েছিলেন। নিজেকে আরো ছাড়িয়ে, আরো বাড়িয়ে একেবারে চরম সীমায় তুলে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন রমেশচন্দ্র। অবশ্যই সেদিনকার চরম সীমার অর্থই ছিল বিলেত যাওয়া ও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করা। তিনি জানতেন, সে সময়ে বিলেত যাওয়ার অর্থ অশেষ লাঞ্ছনাকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নেওয়া এবং এ-ও জানতেন তাঁর পিতামহ ছিলেন বিলেত যাওয়ার একেবারেই বিরোধী। তবুও পালিয়ে গিয়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসবার জন্যই তিনি নিজেকে তৈরি করতে থাকেন এবং গোপনে টাকাকড়ি যোগাড় করে নিয়ে একদিন সেই পথেই পাড়ি দেন। স্মরণীয় ১৮৬৮ সালের ৩ মার্চের সেই দিনটি। সেদিনের সেই যাত্রায় সঙ্গী ছিলেন আরো দুটি কিশোর—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল গুপ্ত। সুরেন্দ্রনাথের পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মতি থাকলেও বিহারীলাল গুপ্তের পিতা মনোমোহন গুপ্তের সম্মতি একেবারেই ছিল না, সঙ্গতিও ছিল না। আক্ষরিকভাবেই বিহারীলাল পালিয়ে গিয়েছিলেন বন্ধু সুরেন্দ্রনাথের দেওয়া পথ-খরচ ভরসা করে। খবর পেয়ে মনোমোহন ছুটেছিলেন খিদিরপুরের জাহাজঘাটের দিকে ছেলে বিহারীলালকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে। বাঙ্গালীর সমাজ-

জীবনের ইতিহাসে ঘটনাটি উল্লেখ করার মতোই। বিলেত যাওয়া, সুশিক্ষিত হয়ে বড় কাজ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দীপনা কোন স্ফুটনাঙ্ক স্পর্শ করলে এই ধরনের ঘটনা ঘটে! এমন তো নয় বিলেত যাওয়া আকছারই হচ্ছে। তখনো পর্যন্ত সে অর্থে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্যে একজনই গিয়েছিলেন—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না, সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ধনীর দুলাল, বিলেত যাওয়া হয়ে উঠেছিল তাঁদের রক্তের ধারা। পিতা দেবেন্দ্রনাথ না গেলেও পিতামহ দ্বারকানাথ গিয়েছিলেন এক নয়—একাধিকবার। সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথের যাওয়া আর রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্তের যাওয়া এক নয়। কিশোর মনে বর্ধমান সমাজ-চৈতন্যে কোন বিদ্যুৎ সংযোগ ঘটলে বিলেত যাওয়া কলেজ পালিয়ে মেট্রোয় সিনেমা দেখার মতোই হয়ে ওঠে। রমেশচন্দ্র ওই আঠারো-উনিশ বছরের মধ্যেই অগ্রণী বাঙ্গালী সমাজের নাড়ির স্পন্দনটা ধরতে পেরেছিলেন। বিলেতে সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা দিতে দিতে এবং ফল বেরোলে বুঝে গিয়েছিলেন কোনো অলীক স্বপ্নচয়ন তিনি করেননি, করছেনও না। কোনোভাবে অযোগ্য তিনি তো ননই—অযোগ্য নয় তাঁর ভারতীয় বন্ধুরাও। বলা দরকার, আই সি এস-এ তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন।

পরবর্তী কালে দেশে ফিরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরতে ঘুরতে, তুল্যমূল্যভাবে ইংরাজ সিভিলিয়ানদের সঙ্গে যাচাই করতে করতে তাঁর এই স্বপ্নেই একেবারে আগুন ধরে গিয়েছিল। শুধু নিজেকে নয়, নবজাগ্রত বিদ্যাজীবী এই বাঙ্গালী সমাজের মেধা ও কর্মশক্তিকে আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন, বুঝেছিলেন আপাতভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জীবনচেতনায় যতই বৈপরীত্য থাকুক, এখনো পর্যন্ত যতই মুষ্টিমেয় কয়েকজন এই জীবন-সমন্বয়ের নির্যাস নিয়ে এগিয়ে চলুক না কেন, আগামী দিনে এটাই হবে সার্বিক উত্তরণের পদ্ধতি বা সরণি। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কর্মক্ষেত্রে এই সমন্বয় চেতনা নিয়েই। সেদিনের সেই মুহূর্তে তাঁর কাজ হয়ে উঠেছিল দ্বিমুখী। এক—শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজকে এ বিষয়ে সম্যকভাবে অবহিত করে তুলে বাস্তববাদী করে তোলা, দুই—ইংরাজ শাসককুলকেও জানানো নবোদ্ভূত এই শিক্ষিত শ্রেণীর মেধা ও কর্মকুশলতা সম্পর্কে—কাজের ভিত্তিতে এরা কারো থেকে ন্যূন নয়। ১৮৩৩ সালে কোম্পানীর সনদ নবীকরণের সময় থেকে এ দেশীয় শিক্ষিত সমাজকে যথাযথভাবে যাতে কাজে নিয়োজিত করা যায়, তা নিয়ে যে কথাবার্তা উঠেছিল খোদ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এবং ভারতের শাসন-কর্তৃত্বে থাকা কর্তাব্যক্তিদের মনে—যাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন বেন্টিঙ্ক, টমাস মুনরো, এলফিনস্টোন প্রমুখ, রমেশচন্দ্র নির্দ্বিধায় তাঁদের সঙ্গেই সুর মিলিয়ে বলে উঠেছিলেন—"শিক্ষিত সমাজ একটি উদীয়মান শক্তি ভারতবর্ষে। নিজেদের দেশের উচ্চতর চাকুরীতে তারা একটা ভালো অংশ দাবী করে। এই দাবী নাকচ করা,

ভারতবর্ষের শিক্ষিত এবং প্রভাবশালী সমাজকে বিরোধী করে তোলা, দেশে অসন্তোষ ও ক্ষোভ বৃদ্ধি করা এবং একচেটিয়া শাসনের দ্বারা সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে তোলা অতি সহজ কাজ। অপর পক্ষে উদীয়মান শক্তিগুলিকে সরকারের সপক্ষে টেনে আনা, শাসন ব্যবস্থায় শিক্ষিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অংশীদার করে তোলা, নিজেদের মঙ্গলামঙ্গল, শিল্প ও কৃষির ব্যাপারে তাদের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া এবং স্বদেশবাসীর বৈষয়িক উন্নতিবিধানে ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে তাদের দায়িত্ববান করে তোলা বরং বিচক্ষণতার কাজ।" সন্দেহ নেই, রমেশচন্দ্রের এই বক্তব্য ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্তই করে। 'রাজপুরুষে ও ভদ্রলোকে মিলে ভারতের গদি ভাগাভাগি করে নেওয়ার পলিটিক্স', যা কিনা পরবর্তীকালে, আমাদের রাজনীতির অন্যতম ঝোঁকই হয়ে উঠেছিল, তা এই বক্তব্যে প্রশ্রয়ই পায়। কিন্তু সেদিনের পক্ষে যে উদীয়মান শক্তি ভারতে জন্ম নিচ্ছে তাকে পায়ের তলাকার মাটি দেওয়ার তাগিদে রমেশচন্দ্র আর কীই বা করতে পারতেন! উন্নত মানবতাবাদী সভ্যতা, যা কিনা ইংরাজ শাসনের মধ্যে দিয়েই ভারতে এসেছে তাকে তো কোনো মূল্যেই তিনি ফিরিয়ে দিতে পারেন না। এ বিষয়ে তাঁর খোলাখুলি বক্তব্য—"I would therefore beg of you, gentlemen, to try your best to send as many young men as possible to England for there they would imbibe ideas of liberty and equality between men and women." (আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরলে রমেশচন্দ্র দত্তকে উত্তরপাড়া হিতকরী সভাতে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়, তার প্রত্যুত্তরে রমেশচন্দ্রের বক্তব্যের অংশ।)

রমেশচন্দ্র রাজারাজড়াদের উত্থান পতনের তথ্যপঞ্জীকে বিশ্বস্তভাবে সাজিয়ে যাওয়ার কাজকেই ঐতিহাসিকের একমাত্র কাজ বলে মনে করতেন না। একটা বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতিতে ভেতর-বাইরের নানান প্রয়াসের টানাপোড়েনে ইতিহাসে কীভাবে যে গতির সৃষ্টি হয়, অনিবার্য ফলশ্রুতিতে ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা হয়, বিশ্লেষণে বিশ্লেষণে সমকালীন শিক্ষিত সমাজকে বারেবারে তাই বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। ইংরাজ শাসন কোনো 'অদৃষ্টের বিড়ম্বনা' নয়, ইতিহাসের সঙ্গত গতিই —আর এই গতি সৃষ্টি হয়েছিল ইংরাজ জাতিরও ভেতরকার স্বার্থ-সাধের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই, যেমন অভিজাত সামন্তপ্রভুরা মধ্যযুগীয় লিপ্সায় শুধুই চেয়েছিল জয় করতে—ইংরেজ সওদাগর-লুঠেরারা চেয়েছিল অবাধ লুণ্ঠনের মৃগয়া-ভূমি রচনা করতে, শিল্প বিপ্লবের প্রসাদপুষ্ট উচ্চাকাঙ্ক্ষীরা চেয়েছিল জিনিসপত্রের কেনাবেচার জন্যে বাজার দখল করতে। ঘটনায় ঘটনায় এরই সম্মিলিত রূপ ইংরাজ শাসন—যে ইংরাজ শাসনের অন্যতম দিকই দুঃখ দারিদ্র্য অভাব অনটন লাঞ্ছনা। কিন্তু আজকের এই প্রেক্ষিত অনুযায়ী তবুও এই শাসনকে অন্যথা করে অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গাও নেই ভারতবাসীর, কেননা এরই সঙ্গে ইংরেজ যে এনে দিয়েছে

য়ুরোপের সর্বমুখীন জ্ঞানবিজ্ঞানের আলো, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণী, সর্বময় মানবাধিকার—তাকে নিঃশেষিত করে না নেওয়া অবধি আর অন্য কোনো পথই নেই। আর তা ছাড়াও দেশের তথাকথিত স্বাধীনতা-পরাধীনতার প্রশ্ন নিয়েও তাঁর প্রত্যয় অন্য দিগন্ত ছুঁয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন মানব সভ্যতার ইতিহাস স্থূল বৈরিতার মধ্যে দিয়ে রচিত হয়নি, হয়েছে পারস্পরিক আদান-প্রদান সাহচর্য সম্প্রীতির দ্বারা উন্মোচিত আত্মবিকাশের মাধ্যমেই। ইংরাজি শিক্ষার মধ্যে দিয়েই। সভ্যতার এই সূত্রটি প্রচারিত হয়েছে। রমেশচন্দ্রের স্থির বিশ্বাস হয়ে উঠেছিল সেই সভ্যতাই ভারতে গড়ছে, —সেই নতুন জাতিই। সুতরাং জাতি গঠনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে ইংরেজ সম্পর্কে কোনো স্থায়ী বৈরিতার প্রশ্নই রাখতে চাননি। 'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস'-এ বারে বারে ঘুরে ফিরে ইংরেজ লুণ্ঠনের যে নগ্নচিত্র তুলে ধরেছেন, তা যেন অনেকটা 'মহান সভ্যতার বাণীবাহী' ইংরেজ শাসকদের বোঝাতে যে, প্রাচ্য ভূখণ্ডে যে সভ্যতা নতুন পৃথিবী সৃষ্টির উদ্দীপনা নিয়ে আসতে পারত নবোদ্ভূত শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের সাহচর্য নিয়ে, তা শুধুই লুণ্ঠনে লুণ্ঠনে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে।

আধুনিক কালের ইতিহাসকে নিজের মতো করে আত্মস্থ করে রমেশচন্দ্র দত্ত বুঝতে পেরেছিলেন, অন্যতম চালিকাশক্তিরূপে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে। রাজারাজড়াদের যুগ শেষ, একালের ইতিহাসকে যে এরাই নিয়ন্ত্রণ করবে, কল্যাণমুখী ধারায় সভ্যতাকে প্রবাহিত করবে—এই কারণেই চেয়েছিলেন অর্থনৈতিক ভিত্তিটাকে দৃঢ় করতে। চেয়েছিলেন কৃষির ব্যাপক উজ্জীবন, অবশ্যই সে উজ্জীবন হবে সেচব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়নের মধ্যে দিয়েই। রমেশচন্দ্র দত্ত নিজ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতাতেই দেখেছিলেন, সেচব্যবস্থার মধ্যযুগীয় ব্যবস্থাদি। অথচ জমি যে কোনো ভাবেই অনুর্বর নয়, তারও চাক্ষুষ প্রমাণ দেখেছিলেন সরকারী পরিসংখ্যানে। প্রতি বছর, অর্থে অর্থকরী পণ্যে কত সম্পদই না চলে যায় বিলেতে! তাই অবসরে-অবকাশে কল্পনা করে যেতেন সম্যক যত্নকর্ষণা যদি ঘটে তবে এসব জমি কী সোনাই না ফলাতে পারে! 'সংসার' উপন্যাসে, 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' উপন্যাসে সেই কল্পছবিই তিনি দেখিয়েছেন। সময়োচিত ভাবনায় ভেবেই নিয়েছিলেন কৃষি-সেচের সংস্কারে সেই উন্নয়নই সম্ভব হবে, যদি পাকাপোক্তভাবে জমির স্বত্ব লাভ করে রায়ত—এই কারণেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তিনি চেয়েছিলেন—তাঁর হিসাব মতো যাতে কিনা জমির উন্নতিতে রায়ত উৎসাহিত হবে এবং উৎপাদন বাড়বে—পরিণামে যার মধ্যে দিয়ে সম্পদ সৃষ্টি হবে। স্বাভাবিক নিয়মেই সে সম্পদ ভোগাকাঙ্ক্ষা বাড়াবে এবং সেই ভোগাকাঙ্ক্ষার অনিবার্য প্রভাব এসে পড়বে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে। এই কারণেই সেদিন তিনি রেললাইনের সম্প্রসারণ চাননি, চাননি সে অর্থে শিল্পায়নও—একান্তভাবেই মনে হয়েছিল রেললাইন সম্প্রসারণ ও শিল্পের উন্নয়নের অনিবার্য পরিণতিতে দেশের সম্পদ বিদেশে চলে যাবে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকে তিনি তাই দেখেছিলেন লুণ্ঠনের শাসনরূপেই।

কার্যত ছিলও তাই—সে সময়কার ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ তথা ভারতবাসীর সার্বিক দারিদ্র্যের অন্যতম কারণরূপেও তিনি চিহ্নিত করেছিলেন ওই পর্বের শাসনকে।

রমেশচন্দ্র বুঝেছিলেন ব্যাপক ভূমিসংস্কার ভিন্ন ভারতবর্ষ বাঁচবে না—বাঁচবে না তাঁর আধুনিক ভারতের কল্পনা। কেননা আধুনিক সেই ভারতের চালিকাশক্তি অশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ ওই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিপোষণের শাঁস-জল যে আসে ওই জমি থেকেই—কার্যকরী ভূমিসংস্কার করে সম্পদ সৃষ্টির উৎসকে স্বতোচ্ছল না করে তুলতে পারলে উৎসমুখ যে শুকিয়েই যাবে। রমেশচন্দ্রের ছাত্রজীবন কেটেছে হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজে—স্বাভাবিক ভাবে নতুন গড়ে ওঠা কলকাতাকে তিনি দেখেছিলেন অনেক কাছ থেকেই। ইতিবাচক দিকগুলি সম্পর্কে মুগ্ধতা থাকলেও বাবু কলকাতার অন্তঃসারশূন্যতার দিকটাও তাঁর জানা ছিল এবং জানা ছিল বলেই সওদাগর ইংরেজের দালালি করে তোষামোদী করে সময় কাটাতে চাননি—বারে বারে ফিরে ফিরে চেয়েছেন স্বাবলম্বীকরণের দিকে, অবশ্যই ভূমিসংস্কারের চিন্তায়।

রমেশচন্দ্রের ভূমিসংস্কারের চিন্তায় অনেক বৈপরীত্য বিভ্রান্তি। যে কারণে ইতিহাসের দণ্ড মাথায় করে নিয়ে তাঁকে বিস্মৃতপ্রায় সার্বভৌম প্রতিভাই হয়ে থাকতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নতুন করে হয়তো তাঁকে নিয়ে মূল্যায়নেরও সময় এসে গেছে, কেননা সভ্যতার গ্রন্থি মোচনে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা যে কতটা অমোঘ কার্যকরী, শ্রেণী হিসেবে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁর মতো করে আর কেউ এতটা ভাবেননি। বলা যেতে পারে, তাঁর সমস্ত ভাবনারই এই ছিল কেন্দ্রবিন্দু।

□ বারিদবরণ চক্রবর্তী

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক নবজাগরণ ও স্বর্ণকুমারী দেবী

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ। বাংলার নবজাগরণ তখন তরঙ্গশীর্ষে। সমাজ সংস্কারের আন্দোলন রামমোহনের সময় থেকে এসে এক পরিণত অবস্থায় পৌঁছেছে। সতীদাহ প্রথা আইনত নিবারণ করা হয়েছে (১৮২৯)। বিদ্যাসাগরের সময়ে এসে বিধবা বিবাহ প্রথা চালু হয়েছে (১৮৫৬)। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসারের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক পটভূমির পরিবর্তন হয়েছে। ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়েছে। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির নবযুগ এসেছে। বঙ্কিম যুগ থেকে রবীন্দ্রযুগে উত্তরণের পূর্বাহ্ন। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন দত্ত-বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে আধুনিক বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত হয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির এই নবযুগে ঈশ্বরগুপ্ত সূচনা করেছেন বাংলা গীতিকাব্যের। নবজাগরণের আলোকস্পর্শে ব্যক্তিমানবের ও ব্যক্তিমানসের বিকাশ ধরা দিয়েছে সে যুগের কাব্য-সাহিত্যে। বাংলার রেনেশাঁস ও রিফর্মেশনের যুগের পরিণত পর্যায়ে এসে আমরা পেয়েছি সেই যুগের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নবজাগরণের অন্যতম প্রতিনিধি স্বর্ণকুমারী দেবীকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা ও রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে তাঁর অবদান অসামান্য।

> "...এই আন্দোলন এ দেশীয়দিগের মনেও। তাঁহারাও এই সন্ধিক্ষণের বিচার করিতে লাগিলেন. প্রাচীন ও নবীন ইহার মধ্যে কাহাকে বরণ করিবেন ? তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত ও অগ্রসর ব্যক্তিরা স্থির করিলেন যে প্রাচীনকে বর্জন করিয়া নবীনকেই বরণ করিতে হইবে। দেশীয় পক্ষে রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও এই পুরুষত্রয় সারথ্য কার্যের ভার লইয়াছিলেন।" (শিবনাথ শাস্ত্রী)

বাংলার রেনেশাঁস-রিফর্মেশনের এই পর্ব প্রায় শতাব্দীব্যাপী প্রবল সামাজিক আলোড়ন তুলেছিল। তার মধ্যে প্রধান ও আশু লক্ষ্য ছিল মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পশ্চাৎপদ অবস্থার পরিবর্তন আনা। মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতিনীতি, বিধিব্যবস্থা সমাজদেহের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই ঘোর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টাই হল নবজাগরণের আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রেরণা এসেছিল পাশ্চাত্য নবজাগরণের থেকে। ইংরাজি শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে এদেশের শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত সমাজের মধ্যেই এই সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে। রামমোহন রায়ের "আত্মীয় সভা"র থেকেই গঠিত হয় বাংলার রিফর্মেশনের 'Draft Programme' বা কর্মসূচী। স্বভাবতই এই "রিফর্ম" বা সংস্কারের মধ্যে নারীসমাজের প্রতি সামাজিক বৈষম্য, অন্যায় অত্যাচার দূর করা ছিল অন্যতম। কারণ পশ্চাৎপদ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নারীরা ছিল সামাজিক অন্যায় অত্যাচার বৈষম্যের সবচেয়ে বড় শিকার। তাই এ যুগের সবচেয়ে বড় সমাজ-সংস্কারের কাজ হল সতীদাহ প্রথা নিবারণ। তারপর ক্রমশ বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ নিবারণ প্রভৃতি বিষয়েও সামাজিক আন্দোলন শুরু হয় এবং একটি একটি করে কিছু কিছু আইনও পাশ হয়। রামমোহনের পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই এই সমাজ সংস্কার আন্দোলনের হাল ধরেন। তিনি নিজেই জোর দিয়ে বলেছেন যে "বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎ কর্ম"।

নবজাগরণের উদ্দাম গতিবেগ মধ্যযুগীয় স্থবির পুরাতনকে আঘাতে আঘাতে ভেঙ্গে চুরে এগিয়ে যাবার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। সেই বিদ্রোহের তরঙ্গাঘাতে মানুষের সমাজজীবনে যেমন আলোড়ন উঠেছিল, তেমনি ভাবজগতকেও আলোড়িত করেছিল। যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের নতুন ধ্যান-ধারণা গতানুগতিক সামাজিক বিধি-নিষেধ, ধর্মান্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যানধারণার ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। তাই সেই সমাজ সংস্কারের যুগে ধর্ম সংস্কার, প্রচলিত প্রাচীন প্রথাগুলির সংস্কার, আচার-আচরণ বিধির সংস্কার—সব দিক থেকেই প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে চলার তাগিদ এসেছিল। গতানুগতিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-বন্ধনের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসার প্রচণ্ড আবেগ প্রতিফলিত হয়েছিল কাব্য-সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতেও। শুরু হয়েছিল সাহিত্য-সংস্কৃতির নতুন অধ্যায়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ওজস্বী মহাকাব্য 'মেঘনাদ বধ'-এর জাগ্রত নারীকণ্ঠের ঘোষণা :

'পর্বত গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় নদী যবে সিন্ধুর উদ্দেশে
হেন সাধ্য কার সে যে রোধে তার গতি ?'

মাইকেলের কণ্ঠে নবযুগের এই দৃপ্ত ঘোষণার প্রতিধ্বনি আমরা পরবর্তীকালে শুনতে পাই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে :

ওরে চারি দিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর !
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা,
আঘাতে আঘাত কর।

বাংলা কাব্যের মধ্যে এই সময়ে এক রূপান্তর আসে। বৈষ্ণব পদাবলী ও পৌরাণিক কাব্য ও লৌকিক কাহিনীকাব্যের পর্যায় থেকে গীতিকাব্যের পর্যায়ে উত্তরণ হয়। এই পর্যায়ের পুরোধা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর অগ্রণী শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ অধিকারী, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। শুরু হয় বাংলা কাব্যের এক নবতর রোমান্টিক যুগ। পাশ্চাত্য রোমান্টিক কাব্যের ভাবধারার প্রভাব বাংলা কাব্যের মধ্যেও পড়ে। মুখ্যত আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদী গীতিকবিতাগুলির মধ্যে নরনারীর স্বতস্ফূর্ত প্রেম, গার্হস্থ্য জীবন, প্রকৃতিপ্রেম, দার্শনিক তত্ত্বগুলি যেমন রসসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, তেমনি কাব্য-সঙ্গীত-নাটকের মধ্য দিয়ে দেশাত্মবোধ ফুটে ওঠে। আমাদের ঔপনিবেশিক দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক নবজাগরণের এই ছিল বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য নবজাগরণের যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তি মানসের স্বাধীন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রেম, জননী-জন্মভূমির প্রতি আনুগত্য, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়ে ওঠে। পরাধীন দেশের মহৎ শিল্পীদের আবেগ, অনুভূতি, শৈল্পিক চেতনার মধ্যে আত্মবিশ্বাস, ব্যক্তিগত প্রেমের সঙ্গে দেশপ্রেম নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে। মহাকবি মাইকেলের আকুল আবেদন 'রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে' তাই আমাদের গভীরভাবে নাড়া দেয়। যুগের কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়ে ওঠেন : স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায় / দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে কে পরিবে পায়? বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের উদাত্ত আহ্বান ভারতের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। ইতোমধ্যেই দীনবন্ধু মিত্রের ঐতিহাসিক নাটক 'নীল দর্পণ' এবং আরো কয়েকজন সমসাময়িক নাট্যকারের দেশাত্মবোধক নাটক ও সঙ্গীতের মাধ্যমে জাতীয় চেতনার বিকাশ হতে থাকে। গম্ভীর আবেগ ও দুঃখের সঙ্গে বাংলার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে :

কত কাল পরে বল ভারত রে,
দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে।
... ...
নিজ বাসভূমে, পরবাসী এলে,
পর দাসখতে সমুদায় দিলে।

(গোবিন্দচন্দ্র দাস)

দুই

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে ব্রাহ্মসমাজের, বিশেষ করে ঠাকুর পরিবারের অবদান ঐতিহাসিক। নবজাগরণের সব কটি বৈশিষ্ট্যই ঠাকুর পরিবারের মধ্যে ছিল।

হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে অনেক ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মধর্মের কিছুটা উদারতা দেখা যায়। বিশেষ করে স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতার ব্যাপারে ব্রাহ্মসমাজ উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, বিত্ত-ঐশ্বর্য লাভ—সব দিক থেকেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে ঠাকুর পরিবার নবসংস্কৃতির শীর্ষে পৌঁছেছিল! শুধু শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি নয়, দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য বিকাশের ক্ষেত্রেও ঠাকুর পরিবারের ঐতিহ্য উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ, শিল্প-সাহিত্যের বিকাশের অন্যতম কেন্দ্র ছিল ঠাকুর পরিবার, যে পরিবারের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয় রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে। এই পরিবারের ধমনীতে প্রবাহিত দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল। কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জ্বলিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।' [জীবনস্মৃতি]

এই ঠাকুর পরিবারেরই একটি প্রস্ফুটিত কুসুম স্বর্ণকুমারী দেবী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ সন্তান, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২) ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলার সাংস্কৃতিক নবজাগরণের অন্যতম প্রতিনিধি। ঠাকুরবাড়ির প্রথামতো তিনি উচ্চশিক্ষিত হন। বিবাহের পরে অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের কাছে বোম্বাইয়ে গিয়ে ইংরাজি শিক্ষালাভ করেন। ঠাকুর পরিবারের এই ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শের সমন্বয়। তাই একদিক থেকে নীতিধর্ম, শিক্ষা, আবার অন্য দিক থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা সঙ্গীত শিক্ষার প্রচলন ছিল। সেই নবজাগরণের যুগে সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আবার যে পুনরুত্থানবাদের (Reform and Revivalism)-এর চর্চা চলেছিল, সে কথাটাও আমাদের মনে রাখা দরকার। তদানীন্তন আদি ব্রাহ্মসমাজ, আর্য সমাজ, থিওসফিক্যাল সোসাইটি, সনাতন সমাজ, মহারাষ্ট্র সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বিমুখী ভূমিকা থেকেই তা বোঝা যায়। তাঁরা একদিকে স্ত্রী শিক্ষা, নারীর আইনগত অধিকার, হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রচলন প্রভৃতি নানা সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, আবার অন্যদিকে ধর্মসংস্কার, ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদের পক্ষেও কাজ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', বিবেকানন্দের বাণীগুলির মধ্যেও আমরা তৎকালীন সমাজ প্রগতি-আন্দোলনের এই দুই ধারার পরিচয় পাই। রামকৃষ্ণ তখনই তাঁর 'দিব্যচক্ষে' প্রতিটি নারীর মধ্যে অলৌকিক বিশ্ব মাতৃত্বের প্রতিরূপ দেখতে পান। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা এ দেশের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ও স্বদেশী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। তাঁরাও প্রাচীন ভারতের সতী সাবিত্রীর আদর্শকে তুলে ধরেছেন।

এই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের জীবন দর্শনের সম্মিলিত আদর্শের উদার পরিবেশের মধ্যেই স্বর্ণকুমারী বেড়ে ওঠেন। দেশাত্মবোধ ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব ছিল সমগ্র পরিবেশ জুড়ে। সাহিত্য ও সঙ্গীতসাধনা ছিল তাঁর পরিবারগত ঐতিহ্য। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিনীতে তিনি পারদর্শিনী হয়েছিলেন। তিনি বহু গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন, নিজে গান করেছেন। তার মধ্যে আছে দেশাত্মবোধক সংগীত, ধর্ম সংগীত, প্রেম সংগীত, প্রভাত সংগীত, মধ্যাহ্ন সংগীত, সন্ধ্যা সংগীত, নিশীথ সংগীত। একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার—বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হিসাবে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর পরিণত বয়সে ১৯২৭ সালে তাঁকে স্যার আশুতোষের জননীর নামাঙ্কিত জগত্তারিণী স্বর্ণপদক পুরস্কার দেয়।

পত্রিকা সম্পাদনার কাজেও স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন প্রখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'ভারতী' ১৮৭৭ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, কবি অক্ষয় কুমার চৌধুরী ও তাঁর সহধর্মিণী শঙ্খকুমারী চৌধুরাণী সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন। পরবর্তী কালে ৮ম বর্ষ থেকে 'ভারতী' ও সংশ্লিষ্ট পত্রিকা 'বালক'-এর সম্পাদনা করেন স্বর্ণকুমারী দেবী। কয়েক বৎসর পর তাঁর দুই কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী এই সম্পাদনার কাজের সঙ্গে যুক্ত হন।

বঙ্কিম যুগেই তিনি ঔপন্যাসিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর উপন্যাস-গুলির মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সুখ, দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও নানা সমস্যার কথা ফুটে ওঠে।

প্রথম উপন্যাস 'দীপ নির্বাণ' (১৮৭৬) প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এই উপন্যাসে বিদেশীদের হাতে ভারতের স্বাধীনতা হরণের কথা বেদনার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন স্বর্ণকুমারী। 'স্নেহলতা' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক উপন্যাস। 'ছিন্নমুল', 'মালিনী', 'মিবার রাজা', 'বিদ্রোহ', ফুলের মালা প্রভৃতি উপন্যাসে সমসাময়িক যুগের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

গীতিকবিতার ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারী ছিলেন সে-যুগের অন্যতম প্রতিনিধি। প্রেম, প্রকৃতি, গার্হস্থ্যজীবন, তত্ত্বকথা এবং বিশেষ করে, স্বদেশ প্রেমের আবেগ অনুভূতি তাঁর কবিতার ছন্দে ছন্দে ফুটে উঠেছে :

> 'এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী সে শুধু গো যদি আসিত,
> পরাণে এমন আকুল পিয়াসা, যদি সে শুধু গো ভালবাসিত,
> এ মধু বসন্ত, এত শোভা হাসি, এ নব যৌবন এত রূপ রাশি,
> সকলি উঠিত পুলকে বিকশি সে শুধু গো যদি চাহিত।'

স্বর্ণকুমারীর গাথাকবিতাগুলি সমাজচেতনায় উজ্জ্বল। 'উপকথা গাথার মধ্যে

তিনি ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্মকে তীব্র ধিক্কার দিয়েছেন। মানবীতে রূপান্তরিত অলৌকিক মর্মর নারীমূর্তির কাছে রাজপুত্র ও মুনিপুত্র উভয় শিল্পীই তার ওপর অধিকার স্থাপন করতে গেল। কিন্তু সেই অলৌকিক নারীমূর্তি উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করল। অবশেষে যে য়ুনানী যুবক ও রমণীকে ঘিরে তৈরি হয়েছে এই গাথাকাব্য তারাই সামনে এল। পরে বেদনায় দুঃখে ওই নারী আত্মহত্যা করতে গেলে য়ুনানী যুবক তাকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে :

নাশিও না দেবি! মর্ত হতে চির এ সৌন্দর্য সুধারাশি,
চিরদুঃখী এই ভূলোকবাসীর অনন্ত আনন্দ হাসি।
হেরি সুন্দরী! দাও অধিকার, দাও এই ভিক্ষা মোরে,
তোমারি পূজায় সঁপিব জীবন, চির প্রেম ভক্তিভরে।

শিল্প ও সমাজচেতনার এই অপূর্ব সংমিশ্রণ আমাদের মুগ্ধ করে। আবার তাঁর ব্যঙ্গাত্মক কাব্যের মধ্য দিয়েও একটা নীতিবোধ ফুটে উঠতে দেখি :

'তারা বুঝি গরীব দুঃখী, কর্মের ফল তাদের বেলা!
নবাবের আর কে নেয় জবাব, আপনি কর লীলাখেলা।
সবাই পাপী, সবাই তাপী, অপরাধী বিশ্বজোড়া,
তুমিই কেবল মাঝখানেতে দাঁড়িয়ে আছ যুগের তারা।'

এই সহজ সরল বক্রোক্তির পাশাপাশিই আবার দেখা যায় কবি স্বর্ণকুমারীর গভীর কাব্যানুভূতির বিষাদ-আনন্দের ভাবময় অভিব্যক্তি :

'কাঁদিতে দাও গো একা একা, সুধায়ো না কারণ কি সখা।
কেন হৃদে জ্বলিছে অনল, কেন বহে নয়নের জল।
কেন যে গো সারা রাত-দিন এ-হৃদয় গায় দুখ-গান,
জানে না তা জানে না পরাণ।'

স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যে-কাব্যে জাতীয় চেতনা, দেশাত্মবোধ ও বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত (১২৯৬) তাঁর বিখ্যাত গান :

'এক সুরে গাঁথিয়াছি সহস্র জীবন
জীবন মরণে রবে শপথ বন্ধন।
ভারত মাতার তরে সঁপিব এ প্রাণ,
সাক্ষী পুণ্য তরবারী, সাক্ষী ভগবান।
প্রাণ খুলে আনন্দেতে গাও জয় গান,
সহায় আছেন ধর্ম, কারে আর ভয়।'

এই গানটির সঙ্গে তাঁর অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'মিলে সবে ভারত

সন্তান ' (১৮৬৮ সালে হিন্দুমেলায় গীত) এবং রবীন্দ্রনাথের 'একসূত্রে গাঁথিয়াছি সহস্রটি মন'-এর সাদৃশ্য আছে। রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী দেবী প্রায় একসময়েই কাব্য-সাহিত্য রচনা শুরু করেন। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরেই, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর সাহিত্য-কীর্তি স্থাপন করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দীর আগে থেকেই রবীন্দ্রযুগের শুরু। আর স্বর্ণকুমারীর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অধিকাংশই ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমযুগের শেষ পর্বের মধ্যেই রচিত হয়েছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী শুধু ঠাকুর পরিবারের নয়, সেই বিশেষ যুগেরই সৃষ্টি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নবজাগরণের পরিণত পর্যায়ে কাব্য সাহিত্যের নবযুগ আসে। উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, গীতিকাব্য সব দিক থেকেই জোয়ার আসে। মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে আমরা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, নবীনচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন, রজনীকান্ত সেন, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক নবজাগরণের আলোক ও দেশাত্মবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ আরো অনেক কবি শিল্পী সাহিত্যিকের পরিচয় পাই। এই পর্বে স্বর্ণকুমারী ও সমসাময়িক মহিলা কবি সাহিত্যিকরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, প্রসন্নময়ী দেবী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, বিরাজমোহিনী দেবী, লজ্জাবতী বসু, প্রমীলা নাগ, দিলকুমারী বসু, নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী, পঙ্কজিনী বসু, নির্ঝরিণী দেবী প্রমুখ।

নবজাগরণের এই ঐতিহাসিক যুগই সৃষ্টি করেছিল রবীন্দ্রনাথকে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর মতো বিরল প্রতিভাকেও। অবশ্যই এ প্রসঙ্গে সেই যুগেরই এক প্রতিভূ, ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যমণি ঠাকুর পরিবারের ঐতিহ্য ও অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

তিন

শুধু সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই নয়, সমাজসেবামূলক কাজে ও প্রত্যক্ষভাবে সে যুগের স্বদেশী আন্দোলনের কাজেও স্বর্ণকুমারী দেবীর অবদান বিশেষ উল্লেখ্য। তখনকার দিনের রীতি অনুযায়ী মাত্র ১২ বৎসর বয়সে নদীয়ার বিশিষ্ট জমিদার জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর বিবাহ হয় (১৮৬৮)। জানকীনাথ ছিলেন সে যুগের স্বদেশী আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ভারত সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সেক্রেটারী লর্ড হিউমের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। লর্ড হিউমের উদ্যোগে যখন জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয় (১৮৮৫), তখন জানকীনাথ তাঁর বিশেষ সহায়ক ছিলেন। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীও কংগ্রেসের কাজের সঙ্গে যুক্ত হন এবং জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিবেশনে যোগ দেন। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের পঞ্চম

অধিবেশনে ছয় জন মহিলা প্রতিনিধি যোগদান করেন। তাঁরা ছিলেন: পণ্ডিতা রমাবাঈ, লেডি বিদ্যাগোরী নীলকণ্ঠ, রমাবাঈ রাণাডে, শ্রীমতী নিকম্ব, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও স্বর্ণকুমারী দেবী (ঘোষাল)। কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী ও শিল্পমেলায় মহিলাদের হাতের তৈরি বহু শিল্প তাঁরা সংগ্রহ করে আনেন। স্বদেশী শিল্পের এই প্রচার ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে মিশে এক পরিণতি লাভ করে। সেখানেও স্বর্ণকুমারী দেবী এবং তাঁর কন্যাদ্বয় হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবীচৌধুরাণীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

দেশসেবামূলক কাজের প্রেরণা স্বর্ণকুমারী বাল্যকালে ঠাকুর পরিবারের থেকেই পান, এবং সেখান থেকেই এই মানসিকতা তৈরি হতে থাকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের পক্ষে ছিলেন। শিক্ষার মাধ্যমে অন্তঃপুরবাসিনীদের বাইরের জগতের সঙ্গে যুক্ত করার প্রথম প্রচেষ্টা তিনি নিজের পরিবারের মধ্যেই করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন:

> "আহার বিহার পূজা অর্চনার ন্যায় সেকালেও আমাদের (ঠাকুরবাড়ী) অন্তঃপুরে লেখাপড়া মেয়েদের মধ্যে একটা নিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে গয়লানী যেমন দুগ্ধ লইয়া আসিত, মালিনী ফুল যোগাইত, দৈবজ্ঞ ঠাকুর পুঁজি ও পুঁথি হস্তে দৈনিক শুভাশুভ বলিতে থাকিতেন, তেমনি স্নান-বিশুদ্ধা শুভ্র-বসনা, গৌরী বৈষ্ণব-ঠাকুরাণী বিদ্যালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুরে আবির্ভূতা হইতেন, ইনি নিতান্ত সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন না।...বৈষ্ণবী আসিতেন অন্তঃপুরের চতুঃসীমাবদ্ধ মহিলার জন্য। বালিকা, নববধূ ও বিবাহিতা বালিকা-কন্যারা ইঁহার কাছেই শিক্ষালাভ করিতেন। কিন্তু বাড়ীর অবিবাহিত কন্যাগণ বালকদিগের সহিত একত্র অধ্যয়ন ও গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় গমন করিত। ইহাতে আর কিছুই না হউক, বালক বালিকাদের শিক্ষার ভিত্তি সমভাবেই গঠিত হইত। বৈষ্ণব ঠাকুরাণীর নিকট প্রথম বাংলা শিখিবার পর কিছুদিন একজন খ্রীস্টান মিশনারী মহিলা আসিয়া ইংরাজি পড়াইয়া যাইতেন। মেয়ের শিক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রদ বলিয়া পিতৃদেবের মনে হইল না। তারপর একজন অনাত্মীয় পুরুষ অন্তঃপুরে শিক্ষকতার কাজ লইয়াই প্রথম প্রবেশ করিলেন। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী। পরে আদিব্রাহ্ম সমাজের অধীন আচার্য পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে সেজদাদা মহাশয় হেমেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বউঠাকুরাণী তিনজন, মাতুলানী দিদি ও আমার ছোট তিন বোন সকলেই তাঁহার নিকট অন্তঃপুরে পড়িতাম।...অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ইংরাজি স্কুলপাঠ্য পুস্তকই আমাদের পাঠ্য ছিল।"

স্বর্ণকুমারীর অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্তঃপুরের মহিলাদের অবরোধ প্রথা

ভাঙবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি 'স্ত্রী স্বাধীনতা' নামে একখানি পুস্তিকাও লেখেন। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী পরিবারের মধ্যে আধুনিক আবহাওয়া নিয়ে আসেন। এমন কি পোষাক পরিচ্ছদ, সাজসজ্জার মধ্যেও পরিবর্তন আনেন। সে যুগের স্ত্রী শিক্ষা ও নারী প্রগতির ক্ষেত্রে ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্ম সমাজের মহিলারা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বদেশী আন্দোলনের একটি প্রধান অঙ্গই ছিল স্বদেশী শিল্পের প্রসার। বিদেশী দ্রব্যসামগ্রীর বদলে স্বদেশী শিল্পের বাজার বিস্তার করা। উল্লেখ্য যে, এই নবজাগরণের যুগেই ভারতে ধনতন্ত্রের সূচনা হয়। উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী আত্মপ্রকাশ করার প্রচেষ্টা করতে থাকে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী বণিকদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সূত্রপাত থেকেই এই দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে স্বদেশী শিল্পের প্রসারের আহ্বান বিশেষভাবে আসে। রজনীকান্তর 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই'—এর মতো বহু সঙ্গীত, কাব্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। এ ক্ষেত্রেও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অগ্রণী ভূমিকা দেখা যায়। উল্লেখ্য, সেদিনের প্রতিষ্ঠিত জমিদার ও উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীরও অন্যতম প্রতিনিধি ছিল ঠাকুর পরিবার। তাই একদিক থেকে সাবেকী সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্যায় অবিচার বৈষম্যগুলির বিরুদ্ধে যেমন এই পরিবারের মধ্যে নতুন সভ্যতার আলোকপাত হয়েছিল, নারী জাগরণের দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছিল, অপর দিক থেকে তেমনি স্বদেশী শিল্পের বাজার প্রসারিত করার প্রচেষ্টাও দেখা গিয়েছিল। 'হিন্দু মেলা', 'শিল্প মেলা' ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সেই প্রচেষ্টা রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। আবার নবজাগরণের সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যে ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদ দেখা গিয়েছিল, তারও পরিচয় এই ঠাকুর পরিবারের মধ্যে পাওয়া যায়। দেশাত্মবোধ ও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে নবজাগরণের যুগের এইসব বৈশিষ্ট্য-গুলিই সে যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিভূ স্থানীয় ঠাকুর পরিবারের মধ্যে দেখা যায়।

এই পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার মধ্যে এই যুগচেতনা ফুটে উঠেছে।

অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের সঙ্গে বহির্জগতের মিলনের জন্য তিনি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। 'লেডিস থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি'র (Ladies Theosophical Society) সভানেত্রী ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। ঠাকুরবাড়ির মহিলা মহলে থিয়োসফিক্যাল সভা বসতো। তখন থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির মধ্যে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের বাড়ির মহিলাদের নিয়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর এই সভা হোত। ধর্মচর্চাই তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি ও অল্‌কটের মতো বিখ্যাত থিয়োসফিস্টরা সেখানে আসতেন। পরে এই সমিতি ভেঙ্গে যায় ও সেইসব পরিচিত মহিলাদের নিয়ে স্বর্ণকুমারী দেবী একটি 'সখী সমিতি' (১৮৮৬) গঠন করেন। এই

কাজে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের মধ্যে মিলন ও দেশহিতকর কাজ সংগঠিত করা। পিতৃহীন অনাথা বালিকাদের এবং অসহায় বিধবাদের নানাভাবে সাহায্য করা। তাদের নানা রকম হাতের কাজ শিক্ষা দিয়ে কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা করা ছিল এর প্রধান কাজ। এই সখী সমিতির উদ্যোগে ১২৯৫ সালে বেথুন স্কুলে প্রথম 'মহিলা শিল্পমেলা' অনুষ্ঠিত হয়। এই শিল্পমেলা বা প্রদর্শনীতে শুধু মহিলাদের হাতে তৈরি শিল্পই রাখা হয়, কেনা বেচাও মহিলারাই করেন। মহিলাদের মধ্যে শিল্পচেতনা ও উদ্যোগের বিকাশ ঘটানোই ছিল এর উদ্দেশ্য। মহিলা শিল্পমেলা বিষয়ে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর 'বঙ্গের মহিলা কবি' গ্রন্থে লিখেছেন: "এই সমিতি হইতে মহিলা শিল্পমেলা নামক প্রতি বৎসর একটি মেলার অনুষ্ঠান হইত। সেকালের অন্তঃপুরিকাদের নিকট ইহা একটি বিশুদ্ধ আনন্দের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছিল। তাঁহারা ইহার অধিবেশনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন। এইরূপ নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ তাঁহারা ইতোপূর্বে উপভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। 'রমণীতে বেচে, রমণীতে কেনে, লেগেছে রমণী রূপের হাট!' উল্লেখিত যে এই শিল্পমেলায় উৎকৃষ্ট হাতের কাজের জন্য যাঁদের পুরস্কৃত করা হয়, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী।

মহিলাদের মধ্যে এইভাবে শিক্ষার প্রসার, শিল্পচেতনা ও স্বদেশচেতনা বিস্তারের প্রয়াস ছিল বৃহত্তর জাতীয় জীবনের উন্নতি প্রচেষ্টারই অঙ্গ। ইতোমধ্যেই 'হিন্দুমেলা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। তত্ত্ববোধিনী সভার আমল থেকেই স্বদেশী ভাবধারা প্রসারিত হতে থাকে। আদি ব্রাহ্ম সমাজ স্বদেশী ভাবধারার কেন্দ্র ছিল। 'হিন্দুমেলা'-র নেতৃবৃন্দ মহিলাদের মধ্যে অনুরূপ সংগঠন ও প্রচারে উৎসাহ দিতেন। তাঁদেরই সহযোগিতায় মহিলাদের মধ্যে 'সখী সমিতি', 'বঙ্গ মহিলা সমাজ' প্রভৃতি সংগঠন গড়ে ওঠে ও মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতি ও দেশাত্মবোধের প্রচার হতে থাকে। এঁদের মধ্যে এই নবজাগরণের একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে। ব্রত পালন, অরন্ধন, রাখীবন্ধন উৎসবগুলিতে দলে দলে মহিলারা যোগ দেন। বিলিতি বর্জনের আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'সন্ধিক্ষণ' কবিতায় লিখেছেন:

> 'পাঠশালে ছাত্র করে বিদেশী বর্জন
> চমৎকার! দৃশ্য চমৎকার!
> বিলাস বর্জনে হের তরুণী ছাত্রীরা
> অগ্রগামী আজি সবাকার।

বল রাজপুতনারে,—
বেণী বিসর্জিতে পারে
বঙ্গনারী তাঁদেরি মতন,
অন্তরে সে বীরাঙ্গনা
শৌর্যে ভরা মন।'

এই ঐতিহাসিক যুগ সন্ধিক্ষণের একজন সুযোগ্য প্রতিনিধি স্বর্ণকুমারী দেবী। শুধু একজন অসামান্য কৃতী মহিলা হিসাবেই নয়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের, বিশেষত সাংস্কৃতিক নবযুগের অন্যতম প্রতিনিধি। বঙ্কিম-যুগের দীপশিখা হাতে নিয়ে রবীন্দ্র যুগের পূর্বাহ্নে যাঁরা নবসংস্কৃতির দিগন্ত উদ্ভাসিত করেছিলেন, স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি ও সামাজিক নবজাগরণের ইতিহাসে স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম একটি উজ্জ্বল সংযোজন।

কনক মুখোপাধ্যায়

যুগের দর্পণে তরু দত্ত

য়ুরোপের চিন্তা-দর্শনের অভিঘাতে গত শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ সময় জুড়ে সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের যে পালা চলেছিল, তার কিছু না কিছু সবার জানা, প্রথা আর সংস্কারের বাঁধন ভেঙ্গে তীব্র মানসোল্লাসে মগ্ন হয়েছিলেন আমাদের নিকট পূর্বপুরুষেরা। নগরবাসী চিন্তাবিদদের অভিঘাতজনিত সংবেদনার ফসলই হল আধুনিক সাহিত্য। কিন্তু পুরুষের আত্মশক্তি সন্ধানের ঘটনাধারায় নারীর শরিকানা ছিল একেবারেই নগণ্য। কৃষ্টির ধারিকা যাঁরা, সবচেয়ে বেশি যাঁরা tradition-কে বয়ে বেড়িয়েছেন, সামাজিক মুক্তিযজ্ঞে তাঁদের অংশগ্রহণের ঘটনা ছিল যৎকিঞ্চিত। জ্ঞানান্বেষণ, পায়োনিয়র, মহিলা, বামাবোধিনী, অবলা-বান্ধব ইত্যাদি পত্রিকার অনুকূল প্রচারের কথা স্মরণে রেখেও বলতে হয়, সমাজগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেকালের মহিলাদের তেমনভাবে তুলে আনা হয় নি। শিক্ষাসহযোগে মনের সম্প্রসারণ ব্যতীত একাজ সম্ভবও ছিল না। বিদ্যাসাগরের মতো প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, ড্রিংকওয়াটার বীটনের মতো ভারতপ্রেমী ব্যক্তি, বেশ কিছু ডিরোজিয়ান, কিছু ইংরাজ মহিলার উদ্যোগে এবং কিছু উদারচেতা সমাজপতির পৃষ্ঠপোষকতায় শতাব্দীর মধ্যভাগে নারী-শিক্ষার সর্বাত্মক প্রয়োজনের দিকে সমাজের নজর পড়েছিল। তথ্যাদিতে প্রমাণ হয়েছে নর্মাল স্কুলে এবং মিশনারী স্কুলে যে-সব মেয়েরা পড়ার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা হয় বিধবা ও স্বামীপরিত্যক্তা, নয় তো সমাজের নিম্নবর্ণ শ্রেণীর মানুষ। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা শিক্ষাগ্রহণ এবং সম্প্রসারণের কাজে দৃষ্টান্তযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন শতাব্দীর মধ্য পর্বেরও প্রায় ২।৩ দশক পরে। ব্রাহ্মসমাজের গঠনাত্মক ভূমিকা এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে স্মরণীয়। অবরোধ ভেঙ্গে নারীর স্বাধীন চলাফেরার বিষয়টি সামাজিকভাবে চালু করেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের মহিলারা। পোষাক-পরিচ্ছদে আধুনিক রুচি তৈরি করে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং সামাজিক আন্দোলন ও সমাজ বিষয়ক চিন্তনে মেয়েদের ভূমিকা গ্রহণকে নিশ্চিত করে ঠাকুর বাড়ির মহিলারা নারীপ্রগতির সম্মুখ সারিতে ছিলেন। কাব্য, নাটক, উপন্যাস রচনার প্রয়াসে বেশ কিছু মহিলা এগিয়েও এসেছিলেন। নারীজাগৃতির একটা ফলপ্রসূ লক্ষণ হিসাবে তথ্যটিকে ধরা চলে।

উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক জাগরণের একটা বড় লক্ষণ ছিল ইংরাজি সাহিত্যের

চর্চা। ইংরাজি সাহিত্যের সংযোগক্রমেই চিন্তারাজ্যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, এই সাধারণ সত্যটি অনেকেরই নজর এড়ায় নি। জ্ঞানপিপাসু তরুণেরা এজন্যই অবলীলাক্রমে ইংরাজি চর্চার দিকে অগ্রসর হয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে যশ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের পন্থা হিসাবেও বিষয়টিকে দেখা হোত। মোট কথা, ইংরাজি সাহিত্য-প্রেমের একটা বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল উনিশ শতকের মধ্য পর্বে। যাঁরা আত্মভাবচারণার রোমাণ্টিকতায় মগ্ন ছিলেন, অথবা যাঁরা মুক্তচিন্তা ও গণতান্ত্রিক উদারতায় সব সময়েই অনুপ্রেরিত থাকতে চাইছিলেন, এই দুই শ্রেণীর মানুষের কাছেই ইংরাজি সাহিত্য ছিল তীর্থভূমি। ধর্মান্তরিত ব্যক্তি ও পরিবার, মিশ্ররক্তের মানুষ এবং ডিরোজিয়ানদের মধ্যে কেউ কেউ ইংরাজিতে রচনার বিষয়ে সবিশেষ তৎপর ছিলেন। এঁদের অধ্যবসায়ে জ্ঞানজগতের দ্বার খুলে গিয়েছিল, কিন্তু এঁদের ইংরাজি রচনায় দেশীয় সাহিত্যের খুব একটা উপকার হয় নি। তবু এঁদের রচনাকর্ম থেকে একটা মনস্কতার ইতিহাস পাওয়া যায়। কেউ বায়রন, কেউ শেলী, কেউ বা মিল্টনের সঙ্গে iden ified হতে চাইছেন বা সামাজিক প্রচারস্তরে কোনো শৈল্পিক ব্যক্তিত্বকে প্রতীচ্যের কবির সমকক্ষতায় ওজন করা হচ্ছে এবং এ নিয়ে পত্রিকায় উৎসাহিত প্রবন্ধও বেরোচ্ছে, উজ্জীবনের লক্ষণ হিসাবে এসব তথ্য কিছু কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়।

নারী-প্রগতি একটা অনিবার্য সামাজিক ধারা, আর আচারে-অভ্যাসে-সাহিত্যিক অনুশীলনে anglicized হওয়া একটা সামাজিক প্রবণতা। এই দুই প্রেক্ষিতের মধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে আছেন স্বল্পায়ু মহিলা কবি ও সাহিত্যিক তরু দত্ত। প্রগতি-ধারায় অভিসিঞ্চিত তাঁর জীবন, কিন্তু প্রগতির ইতিহাসে তাঁর পরিপূরক অবদানের মাত্রা তেমন উল্লেখ্য নয়। উজ্জীবনের ফসল হিসাবে তাঁকে দেখাটাই বোধ হয় সঙ্গত। মধুসূদন ইংরাজমনস্ক হয়েও যেমন তাঁর অধীত জ্ঞান ও বোধের সাহায্যে দেশীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন, ডিরোজিও ইংরাজিতে লিখেও যেমন কর্মভাবনায় বৈপ্লবিক মন্ত্র সঞ্চারের সামাজিক দায়ভারটি সার্থকভাবে সম্পন্ন করে গেছেন, তরু দত্ত তেমনটা নন। তাঁর গ্রাহিকা-শক্তি যত জীবন্ত, প্রত্যর্পণে বোধ হয় ততটাই কার্পণ্য। তরু দত্ত ইংরাজিতে ও ফরাসিতে কাব্য-উপন্যাস লিখে গেছেন, কিন্তু কিছু বিষয় সংযোগ ছাড়া দেশীয় সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যোগ কোথায়! তাঁর মানসভূমে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড যতটা জাগ্রত, স্বদেশ তার ভগ্নাংশও নয়। সদ্য যৌবনের আবেগ, পারিবারিক কৃষ্টি তরু দত্তকে প্রবলভাবে ঠেলে দিয়েছিল একটা বিশেষ অভিমুখিতায়, যেজন্য তাঁকে স্বদেশে পরবাসী মনে হওয়াটা খুবই সহজ ব্যাপার।

তরু দত্ত প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য মনে রাখা দরকার। (১) তরু বেঁচেছিলেন মাত্র একুশ বছর। (২) তাঁর ছয় বছর বয়সে গোটা পরিবার খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। (৩) গোটা দত্ত পরিবারের কালচার ছিল ইংরাজিতে লেখা ও পড়ার চর্চা চালিয়ে যাওয়া। (৪) ইংলণ্ডে নারী-স্বাধীনতা সুলভ বলে তরু ওখানেই স্থায়ীভাবে বাস

করার (settled হওয়া) ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। (৫) ফরাসী সাহিত্য তরুর মানসিক খাদ্য যোগাতো এবং ওখানকার মানুষের আবেগময়তা ও স্বাধীনতা স্পৃহার সঙ্গে একটা মানসিক সাযুজ্য গড়ে তুলেছিলেন তরু। (৬) দুরারোগ্য যক্ষ্মায় ওঁর দুই ভাই-বোন স্বল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন। (দাদা অজু ১৪ বছরে, দিদি অরু ২০ বছরে) এর মধ্যে অরু ছিল তরুর মানসসঙ্গী। তরু নিজেও একই ভাবে প্রয়াত হন।

তথ্যে প্রমাণ হবে, দত্ত পরিবারের এ্যালবামে তরুর স্থান গ্রহণ ছিল নিশ্চিত। অতিমাত্রায় পরিবারমনস্কতা তরুকে দেশীয় কালচার ও সাহিত্যের দিকে এগোতে দেয়নি। স্বল্প বয়সের মানস সাহচর্যে চরিত্র প্রথম যে প্রবণতা নিয়ে গড়ে ওঠে, ভিন্ন পরিবেশে তার বদলও ঘটে। কিন্তু সেজন্য সময় দরকার। তরুর আয়ু তাকে সে সময় দেয়নি। তাই সাংস্কৃতিক আলোড়নের বীজ-লক্ষণ ধারণ করেও তরুর জীবনে প্রত্যর্পণের সুযোগ আসেনি। স্বল্পায়ু বিশিষ্ট মানুষের আবেগ যে প্রবলভাবে একমুখী হয়, সুকান্ত-সোমেনের দৃষ্টান্তও তা প্রমাণ করে।

তরুর শিল্পকর্মের দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক। তাঁর গণ্ডিবন্ধ (Anglicized সমাজের গোষ্ঠীভাবনা বেশি প্রতিফলিত এই জন্য) শিল্প জীবনে বেশ কিছু লক্ষণ পাওয়া যাবে, যা আধুনিক সংস্কৃতিভাবনার দিশারী, আবার যুগের মহিলা কবিদের স্বভাবধর্মের থেকে বেশ কিছু দূরবর্তী। গিরীন্দ্রমোহিনী, প্রিয়ংবদা, কামিনী রায়ের মতো গৃহসুখ-বিলাসে মগ্ন ছিলেন না তরু। বরং আরো পরিব্যাপ্ত পরিপ্রেক্ষিতকেই খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর রচনায়। যদিও তরুর কবিতায় রোমান্টিক রিভাইভালিস্টদের কাব্য-চেতনার ছাপ আছে, তবু তরুর (শুধু তরু কেন, যে কোনো বাঙ্গালী কবিরই) কবিতা ইংরাজী সাহিত্যের শিল্পমান বিচার্য হওয়া উচিত নয়। ওদেশেও বিদেশীদের ইংরাজী রচনাকে ভিন্ন এক শ্রেণীতে ফেলে বিচার করা হয়। মধুসূদনের কবিতা ভারতীয় ইংরাজের (রিচার্ডসন, বেথুন প্রমুখ) চোখে যে মাত্রাবোধে ধরা দিয়েছে, তাও এক বাঙ্গালীর ইংরাজী কবিতা রচনার বিশিষ্টতায়। এই tradition ধরে এগোলে তরুর কবিতাও সামর্থ্যে অগ্রগণ্য বলে মনে হবে। তরুর শব্দানুষঙ্গ, চিত্রকলা, প্রতীকদ্যোতনা রোমান্টিক যুগের ইংরাজী কবিতার মতোই। কীট্সের বেশ কাছাকাছি। তবু তরু দত্ত ততটা লিরিক হতে পারেন নি, কারণ তাঁর বিবৃতিময়তা। Vivid narrativeness তরুর কবিতার স্বভাবজ বিশেষত্ব—কি আখ্যান কবিতায়, কি গীতিকবিতায়, কি নিখুঁত সনেটে। অথচ তরুর কবিতার মধ্যে বিষণ্ণতার একটা ভারি প্রলেপ রয়েছে। এই বিষণ্ণতাকে অপরিণত মৃত্যু-অভিজ্ঞতার কারণবাহী মনে করা চলতো। গূঢ়চারী আত্মমন্থনের দিকেও যেতে পারতেন তরু দত্ত। স্বভাবজ বিবৃতিময়তাই তাঁকে ওই দিকে যেতে দেয়নি। কাজেই বিষণ্ণতা পরিচিত হয়েছে রোমান্টিক morbidity-র স্বরূপ-লক্ষণ হিসাবে। বহির্মুখী চরিত্র ধর্মের জন্যও বাহ্য

পরিবেশে ঘুরে বেড়িয়েছে তরুর পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি। অন্তর্মুখী প্রকৃতির মেয়ে হলে তরুর জীবন-অভিজ্ঞতা তাঁকে মন্ময়তার বেড়েই বেঁধে রাখতো।

আধুনিক লিরিস্টদের মতোই তরু দত্ত প্রকৃতি-প্রেমিক। প্রকৃতির সৌন্দর্য-ময়তার চেয়ে প্রাণময়তার দিকেই তাঁর স্বাভাবিক ঝোঁক। অরণ্যের রহস্যময় গহনতার দিকে তাঁর প্রবল টান। বৃক্ষপ্রীতিও তাঁর কবিতার এক নিত্যলক্ষণ। বৃক্ষকে জীবনের প্রতীক চেহারায় দাঁড় করিয়ে জীবন ও মৃত্যু চেতনার মৌল অভিব্যক্তি সন্ধান করতে তাঁকে প্রায়ই দেখা গিয়েছে। 'Sonnet-Bagmaree', 'Our Casuarina Tree', 'The Tree of Life' কবিতাগুলি এরই সাক্ষ্যবাহী। সাত ও আটের দশকের মহিলা কবিদের (এ দেশের) দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ বোধ একেবারেই পৃথক।

এবার তরুর একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্মের প্রসঙ্গে আসি। একটি কবিতা সঙ্কলনের (আখ্যান কবিতা ও গীতিকবিতা) বই। নাম 'Ancient Ballads and Legends of Hindustan'—ন'টি কবিতা এই অনুক্রমে সাজানো। Savittri, Lakshman, Jogadhya Uma, The Royal Ascetic and the Hind, Dhruba, Buttoo, Sindhu, Prahlad এবং Sita—পুরাণ প্রসঙ্গ ও লোককাহিনী থেকে কাহিনীগুলি সংগৃহীত। আদর্শ ব্যক্তি চরিত্রের প্রতিলিপি এঁরা। বইটি নানা দিক থেকে স্মরণীয়। (১) ১৮৭৩-এ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তরুর উৎসাহিত সংস্কৃত চর্চার ফসল এই বইটি। (২) তরুর ঐতিহ্য ভাবনা এবং ভারতীয় মূল্যবোধের প্রতীক এটি। (৩) খ্রীস্টান তরুর নিভৃত হিন্দু বিশ্বাসের প্রতিফলন আছে এতে। (৪) ইউরোপীয়ানদের কাছে ভারতীয় পুরাভিত্তির বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক গ্রন্থ হিসাবে এর একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। (৫) তরুর ইংরাজমনস্কতার পরিবর্তনের সূচক এই গ্রন্থটি।

তরু দত্তের ইংরাজিতে অনূদিত কবিতার সংখ্যা কম নয়। বেশির ভাগটাই ফরাসী উৎসের ইংরাজি অনুবাদ। বর্তমান গ্রন্থটি সংস্কৃত কাহিনী উৎসের ইংরাজি অনুবাদ। ভারতীয় ঐতিহ্যকে বিনা পরিবর্তনেই পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখা হয়েছে এখানে। ক্লাসিক ভারতীয় কাহিনীর সঙ্গে যোগসূত্রতা স্থাপনের এই দৃষ্টান্তটিই বিস্ময়বহ। তথ্যে জানা যায়, পুরো চার বছর বিদেশে থেকে ভারত প্রত্যাবর্তনের পর সংস্কৃত ভাষা চর্চায় তরু একাগ্রভাবে মন দিয়েছিলেন। এ কাজে পিতার অনুপ্রেরণা ও সাহায্যও পেয়েছেন তিনি। তথ্যে এ-ও জানা যায়, ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরের চারটে বছর (১৮৭৭-এ তিনি প্রয়াত হন) স্বদেশ ত্যাগের অস্থিরতায় কাটিয়েছেন তিনি। প্রায় প্রতি বছরই বিদেশী বন্ধুকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন একই কথা—ইংলণ্ডে settle করা এবং ভারতে আর না ফেরা। এই মানসিকতার সঙ্গে ভারতীয় পুরাকাহিনীর চর্চা করা এবং ইংরাজি অনুবাদের মাধ্যমে বিদেশে তাকে বিজ্ঞাপিত করার প্রয়োজন অনুভব করা আপাত

দৃষ্টিতে সঙ্গতিহীন ব্যাপার। কিন্তু বিষয় বিশ্লেষণে এর কার্যকারণ সূত্র অবশ্যই ধরা পড়ার কথা।

যক্ষ্মা ব্যাধি সংক্রামিত হয় ধীরে ধীরে। জীবনের শেষ দু বছর (১৮৭৬ ও ১৮৭৭) অসুস্থতায় কাতর ছিলেন তরু। ন' বছর বয়সে দাদা ও আঠারো বছর বয়সে দিদির একই ব্যাধিজনিত মৃত্যুর অভিজ্ঞতা যার আছে, তার পরিণতি জ্ঞান খুবই স্বচ্ছ থাকার কথা। এই ব্যাধিজর্জর ক্লান্তির দিনে উৎসাহিত বিদেশ বাসের পরিকল্পনা ধীরে ধীরে মরে যেতে বাধ্য। পাশাপাশি আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষার দিনগুলিতে স্বাদেশিকতার অনুভূতি ভেতরে ভেতরে চেপে বসাটাই স্বাভাবিক। সংস্কৃত পাঠের মধ্য দিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি একটা গাঢ় অনুরক্তি আগেই তৈরি হয়ে থাকবে। দুয়ের সংযোগে এ রকম একটা অনুবাদ কর্মসূচীর জন্ম নেওয়াটাও একেবারে স্বাভাবিক।

তরু ধর্মান্তরিত হন ছ বছর বয়সে, তা-ও নিজের ইচ্ছাক্রমে নয়। বাকি বছরগুলিতে তাঁর মধ্যে বিদেশী ভাষা-সাহিত্য ও স্থানপ্রীতি জন্ম নিয়েছে। কিন্তু অনুষঙ্গ হিসাবে কোনো খ্রীস্টান সংস্কার তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয় না। অন্তত তাঁর রচনায় এমন কোনো ছাপ মেলেনি। মধুসূদনের মতো স্বেচ্ছা-ধর্মান্তরিত মানুষের মধ্যে উত্তরজীবনে যদি দেশপ্রীতি এবং দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ জন্ম নিয়ে থাকে, তবে অপরিণত বয়সে ধর্মান্তরিত তরুর পক্ষে ব্যাপারটা তো খুবই স্বাভাবিক।

হিন্দু মূল্যবোধ ও আদর্শের ছাপ এ বইতে নির্বাচিত চরিত্রগুলিতে খুবই স্পষ্ট। সাবিত্রী আদর্শ পত্নীর, লক্ষ্মণ আদর্শ ভ্রাতার, বুত্তু আদর্শ শিক্ষার্থীর, প্রহ্লাদ আদর্শ ঈশ্বর-ভক্তের, দশরথ ও ভরত আদর্শ রাজার মডেল। এই গুরুত্বেই নির্ধারিত ব্যক্তিদের বেছেছেন তরু। পুরাণমতেও এঁদের আচরণধর্ম দৃষ্টান্তবাহী, তরুও বিনা পরিবর্তনে তাই মনে করেছেন। তাহলে প্রতিষ্ঠাকামী কেন্দ্রাতিগ জীবনের গভীরেও আদর্শ জীবন-কল্পনার একটা ছক তৈরি হচ্ছিল নিঃশব্দে। নিষ্ঠায়, কর্তব্যবোধে, প্রেমে, ভক্তি-ভাবাপন্নতায় একটা সুশৃঙ্খল জীবনের কাঠামো গড়ে উঠছিল, ঠিক যখন মৃত্যুর প্রহর গুণতে হচ্ছে তাঁকে। হয়তো এটাই ছিল তাঁর জীবনের ভবিতব্য!

ধ্রুব এবং ভরতের মহত্তম জীবন সন্ধানের দৃষ্টান্ত তরুকে উদ্বুদ্ধ করেছে ভীষণ-ভাবে। রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করে ধ্রুব 'highest good, the loftiest place' সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। সিংহাসনের বড় আর এক সিংহাসন ছিল তাঁর লক্ষ্যবস্তু। শুধু শিক্ষাদর্শেই এ কাহিনী সংগ্রহের প্রেরণা মিলেছে, এমনটা না-ও হতে পারে। নিরলস বিদেশ-চারণার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষা এর গভীরে থাকা অসম্ভব নয়। 'The Royal Ascetic...' কবিতাটির শেষে Personal Note-টিও তরুর উজ্জীবিত মনের খবর দেয়—

Not in seclusion, not apart from all,
Not in a place elected for its peace,
But in the heat and bustle of the world
'Mid sorrow, sickness, suffering and sin,
Must he still labour with a living soul
Who strives to enter through the narrow gate.

সমগ্র বিশ্বের সমর্মিতায় ভরতের দিব্য ভালবাসাকে ভাস্বর করে তোলার এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে তরুণী কবির গাঢ় জীবন অভীপ্সাকে। সত্যই ভারতীয় পুরাণ তরুর মনে উপাদান সরবরাহ করা শুরু করেছিল।

বর্তমান কাব্যে ন'টি আখ্যান কবিতার মধ্যে 'সিন্ধু' কবিতাটি করুণ রসাদ্র আবেগে ভরপুর। নিশ্চিতভাবে মথিত কবিচিত্তেরই প্রকাশ। সিন্ধুর অকস্মাৎ মৃত্যুতে মাতা-পিতার শূন্যতার চিত্রে তরুর পারিবারিক জীবনের ছায়া আছে। দাদা ও দিদির মৃত্যু-স্মৃতির দংশনই এই lamentation-এর দরজা খুলে দিয়েছে। 'সীতা' কবিতার গোড়ায় তিনটি বিস্ময়বিহ্বল শিশু সীতার বঞ্চিত নারী জীবনের প্রতি ট্র্যাজিক সহানুভূতি প্রকাশ করেছে। এও তরুর পারিবারিক ফটোগ্রাফের একাংশ। শৈশবের কলমুখর সখ্যের স্মৃতি তরুকে সারা জীবন নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। দুটি কবিতার বাতাবরণই এই সন্তাপের দ্বারা সৃষ্ট। ধ্রুব এবং প্রহ্লাদ কবিতায় ভক্তিরসোন্মুখ একটি নারী মনেরও হদিশ পাওয়া যায়। Christian faith নয়, একেবারে সাবেকী হিন্দু ভক্তিভাব। এই মনোভাবটিও তরুর মন পরিবর্তনের সূচক। Ancient Ballads and Legends of Hindustan লেখার সময়ে তরুর মানসিকতা পরিবর্তনের বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছিল, সন্দেহ নেই।

তরু দত্ত পুরা-দৃষ্টান্তের কোনো কাঠামোগত পরিবর্তন করেন নি, পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু এই Narrative Tales কোনো যান্ত্রিক translation মাত্র নয়। তরুর স্বাধীনতাপ্রীতি, আধুনিক জীবনমনস্কতা এবং মানবানুভূতির ছাপ রয়েছে এদের মধ্যে। যমের সঙ্গে সাবিত্রীর বিতর্কে যে স্নিগ্ধ চরিত্রদীপ্তি, স্বাতন্ত্র্যবোধ ও অধিকার-জ্ঞান প্রকাশ পেয়েছে, তা নিঃসন্দেহে তরুকে মুগ্ধ করেছে। নৈতিক আদর্শের চেয়ে সাবিত্রীর প্রতিরোধী ব্যক্তিত্ব Freedom lover তরুকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করেছে, সন্দেহ নেই। সব কটি কবিতার মধ্যে সাবিত্রীই দীর্ঘতম। এতটা দৈর্ঘ্য অকারণ নয়। মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাবিত্রীর অদম্য সাহসিকতার প্রতিটি স্তর পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে অনুধাবন করতে চেয়েছেন কবি। মৃত্যুর কাছে তাঁদের পারিবারিক পরাজয়ের গ্লানি এবং আত্মজীবনে একই অমোঘ পরিণতির নিশ্চিত পুনরাবৃত্তির বেদনা তরুকে বিষয়-প্রকোষ্ঠে একেবারে বন্দী করে ফেলেছিল। 'বুত্তু'র কাহিনীতে দলিত শ্রেণীর ক্ষোভ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। একজন সৎ শিক্ষার্থীর ঐকান্তিকতা আনুগত্যের নামে লুণ্ঠিত ও

প্রতারিত হয়েছে, এই ব্যাখ্যা অপরিবর্তিত কাহিনীর গভীর থেকেও উঠে আসে। আধুনিক সঙ্গতি-ভাবনার কাছে এ কাহিনীর একটা প্রশ্নবিদ্ধ রূপ রয়েছে। অনেক পৌরাণিক আচরণের গূঢ়তাই এ কালের লজিকে অসমর্থনযোগ্য। এ কাহিনীও তাই।

ভরত ও হরিণশিশু গল্পের দিব্যপ্রেমও তরুকে আকৃষ্ট করেছিল প্রবলভাবে। চেতন জগতের মধ্যে ভাব সংযোগের যে ইচ্ছা রোমান্টিক গীতিকবিদের সবসময়ে তাড়না করেছে, বর্তমান গল্পে তারই এক বিচিত্র নমুনা রয়েছে। অসম ভাবসাযুজ্যের এই দৃষ্টান্ত তরুকে কতটা নাড়া দিয়েছিল, কবিতার উত্তরভাগে তার আবেগগর্ভ ভাবানুষঙ্গেই তা প্রকট। প্রহ্লাদ কবিতার তন্নিষ্ঠ ভক্তিভাবের গভীরে এক অনমনীয় বিশ্বাসের দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে। হিন্দুধর্মের এই দিকটা তরুকে ভেতরে ভেতরে আকৃষ্ট করেছিল। উমার শাঁখা কেনার লোককাহিনীটিতে একই বিশ্বাসের সারল্য প্রকাশ পেয়েছে। মর্তের জীবনলিপ্সার সঙ্গে দেবতার মানসসংযুক্তির এই দৃষ্টান্তেও তরু উৎসাহিত বোধ করেছেন। 'মিথ'কে ঘিরে গড়ে ওঠে লোকবিশ্বাস, আবার লোক-বিশ্বাস জন্ম দেয় কৃত্য ও অনুষ্ঠানের। এই ছকটি তরু দত্তের 'যোগাধ্য উমা' কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। শাঁখা শিল্পীদের বিশ্বাস, উমার শাঁখা পরা ও অদৃশ্য হওয়ার দিনটি থেকেই তাদের শিল্পে সাফল্য এসেছে। তরু গল্পটির অবাস্তবতা ও অতিকথন দোষ সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু মৌখিক গল্পপ্রবাহের অনুক্রমে বক্তারও একটা ভূমিকা থাকে। কারণ বিশ্বাসবোধ সঞ্চারের ভূমিকাটি তাঁরই। কবি সেই ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছেন—

Absurd may be the tale I tell,
Ill-suited to the marching times,
I love the lips from which it fell,
So let it stand among my rhymes.

শেষে এ কাব্যগ্রন্থের একটি উপযোগিতার কথা বলি। তরুর এই কাব্যরচনা বাঙ্গালী পাঠকের অনুপ্রেরণাস্থল হয়তো নয়, কিন্তু য়ুরোপীয় পাঠকগোষ্ঠীর কাছে এ প্রতিবেদনের ঐতিহাসিক উপযোগিতা অনেক। ভারতীয় পুরাণের শিক্ষাদর্শ ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে কিছু বিজ্ঞপ্তি তো এখানে রয়েছেই। তরু ইংরাজমনস্ক হয়েও ইংলন্ডের সুধী সমাজে ভারতীয় tradition কে বয়ে নিয়ে গেলেন। এখানে ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের একটা দিক থাকছে। রেনেসাঁর সুফল সবটাই তরু দত্ত ঘরে তুলেছেন, তাঁর প্রত্যর্পণ কানাকড়িও নেই—বিচারে এ সিদ্ধান্ত টিঁকছে না। তরুর ঐতিহ্য-অনুরক্তির মূল্যে য়ুরোপবাসী যদি ভারত সম্বন্ধে কিছুটা কুতূহলী হন, তাতে আমাদের অনেক লাভ।

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

তথ্যসূত্রের জন্য পদ্মিনী সেনগুপ্তের *Taru Dutt* এবং সন্তোষ চক্রবর্তীর *Four Indo-Anglian Poets* বই দুটির সাহায্য নিয়েছি।

বাংলার নবজাগরণে রবীন্দ্রনাথ

রামমোহনই ছিলেন বাংলার নবজাগরণের প্রকৃত হোতা, তিনিই এর সূচনা করে যান। একদা রামমোহন, দ্বারকানাথ, ডিরোজিও, অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখের নেতৃত্বে বাংলার নবজাগরণের যে সূচনা হয়, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই যেন আমরা তার পূর্ণ বিকাশ এবং একটা পরিণত রূপ দেখতে পাই।

বাংলার নবজাগরণে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্থান ও ভূমিকার স্বরূপটি বুঝতে হলে আমাদের সমকালীন বিশ্বের এবং সেই সঙ্গে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস এবং তার মূল স্রোতোধারার বৈশিষ্ট্য ও গতিপথটিকেও জানতে এবং উপলব্ধি করতে হবে।

প্রসঙ্গত, একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার, ইউরোপের রেনেশাঁস ছিল সাধারণভাবে যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী। পক্ষান্তরে বাংলার নবজাগরণ, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের যুগে, স্পষ্টতই বিশ্বমানবিক এবং বৈজ্ঞানিক। বিশ্ব-মানুষ এবং মানবমুক্তি বলতে ইউরোপ ইউরোপের মানুষকে বুঝতো। ইউরোপের বাইরে এশিয়া-আফ্রিকা নিয়ে পৃথিবীর বাকি অংশের এবং শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণকায় বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের মুক্তির বা মর্যাদার স্থান ছিল না তাঁদের চিন্তা ও চেতনায়। ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে লেখা চিঠির এক জায়গায় রামমোহন লিখলেন যে কথা :

'...all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches. Hence enlightened men in all countries must feel a wish to encourage and facilitate human intercourse in every manner by removing as far as possible all impediments to it in order to promote the reciprocal advantage and enjoyment of the whole human race.'

রামমোহনের মতো এমন করে তাঁর সমকালীন আর কোনো ইউরোপের মানুষ (দু / চার জন মনীষীর কথা বাদ দিলে) একথা বলতে পারলেন না। শুধু ইউরোপের নয়, ইউরোপের বাইরেও বাকি বিশ্বের কোনো জায়গা থেকেই এমন কথা উচ্চারিত হল না সেদিন।

বলা বাহুল্য, রামমোহনের এই বিশ্ববোধ ও মানব-চিন্তা রবীন্দ্রমানসকে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছে রামমোহনই ছিলেন আদর্শ পুরুষ। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ব' ও 'মানব' আরো অনেক বড় এবং বিস্তৃত। রবীন্দ্রনাথের মানুষ অনন্ত শক্তিধর।

এই বিশ্ব ও মানব-চেতনাই ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাধনার মূল প্রেরণা বা চালিকাশক্তি। এই আলো, এই চেতনাই তাঁর সর্বতোমুখী অতুলনীয় সৃষ্টিপ্রতিভাকে সব দিকে প্রসারিত করেছে। একটা সম্পূর্ণ অখণ্ড বিরাট-পুরুষ রবীন্দ্রনাথ, যেন দশটা রবীন্দ্রনাথ হয়ে দশ দিকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে ধাবিত হয়েছে—সব পথ আলোকিত করে।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসী—সেই সঙ্গে তিনি বিশ্ববাসীও। তিনি বিশ্বনাগরিক—বিশ্বমানবকে যিনি নিয়তই হৃদয়ে ধারণ করে তাকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা করেছিলেন। মানুষের মিলনক্ষুধায় অস্থির হয়ে তিনি প্রায় সারা জীবনই দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। তাঁর স্বদেশচিন্তায় যেমন স্বদেশের শক্তিলাভ ও মঙ্গলচিন্তা, তেমনি সারা বিশ্বের তথা সমগ্র মানুষের এবং মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বার্থচিন্তা স্থান পেয়েছে। রামমোহনের মতোই তিনি পৃথিবীর সমস্ত অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার ধ্বংস কামনা করে গণতন্ত্রের বিজয় কামনা করেছেন। রামমোহনের মতোই তিনি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। কবি যেন যুদ্ধবিধ্বস্ত একটা সমগ্র যুগের বেদনা ও যন্ত্রণায় অনুক্ষণ বিদ্ধ হয়ে যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতির নিপাত কামনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনই নির্ভীক ও যুক্তিনিষ্ঠ স্বাধীন চিন্তার এবং চিত্তমুক্তির বাণীর জয়গান করেছেন: 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির'। স্বদেশকে ভালবেসে স্বদেশের বন্দনায় রবীন্দ্রনাথ বিস্তর কবিতা ও গান রচনা করেছেন, আবার সেই সঙ্গে মানুষের মহান আত্মশক্তির জয়গান করে মানববন্দনা করেছেন: 'আমি মানুষকে বিশ্বাস করি'—'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'—'ওই মহামানব আসে'।

যুদ্ধবিধ্বস্ত সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে বাংলার 'নবজাগরণে'র একটি মহান বাণীর অর্ঘ্য আছে, আর সেই অর্ঘ্য রবীন্দ্রনাথ।

ইউরোপীয় রেনেশাঁস-রিফর্মেশন-রেভলুশনের ধারা বেয়ে যে চিত্তমুক্তির এবং সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্তির ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল, তারই প্রচণ্ড অভিঘাতে ঊনিশ শতকের বাংলার সুপ্তিভঙ্গের এবং নবজাগরণের প্রচণ্ড আকুতি দেখা দিয়েছিল। বলা বাহুল্য, রামমোহনই বাংলার এই নবজাগরণের প্রধান হোতা, তিনিই তাঁর মহান সূচনা করেন। রামমোহনের প্রধান কৃতিত্ব এই, তিনিই ইতিহাসের এই অমোঘ নির্দেশ, এই মহান বাণীকে শুনতে পেয়ে তাকে আবাহন ও সকল দিকে উদ্বোধিত করার সূচনা করে গেলেন। রামমোহন চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি এবং আধুনিক

ভারতেতিহাসে তাঁর বিশেষ ভূমিকাটি নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন :
'আপনারা শুনিয়াছেন যে, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে রামমোহন জন্মলাভ করেন। ঐ বিপ্লবের যুগে যে বিশ্ববাণী ধ্বনিত হইতেছিল তাহা কেমন করিয়া শিশু রামমোহনের প্রাণ স্পর্শ করে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

'শিখরে যখন প্রথম আলোকসম্পাত হয়, তখন নিম্নভূমি গভীর অন্ধকারে আবৃত থাকে। বঙ্গভূমি যখন নানা কুসংস্কার ও অজ্ঞতার গভীরে অন্ধকারে আচ্ছন্ন তখন বালক রামমোহন অলৌকিকরূপে বিশ্ববোধের আলোক লাভ করিয়াছিলেন। এই জ্ঞানলাভের পক্ষে দেশ অনুকূল ছিল না, বরং সমস্তই তাঁহার প্রতিকূলে ছিল।'

[ভারতপথিক রামমোহন রায়, পৃষ্ঠা ১৪৯]

রবীন্দ্রনাথ আরো বলেন :

'রামমোহন রায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গসমাজের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন বঙ্গসমাজ সেই প্রেতভূমি ছিল। তখন শ্মশানস্থলে প্রাচীনকালের হিন্দুধর্মের প্রেতমাত্র রাজত্ব করিতেছিল···রামমোহন রায়ের সময়ে হিন্দুসমাজের ভগ্নভিত্তির সহস্র ছিদ্রে সহস্র বাস্তু অমঙ্গল উত্তরোত্তর পরিবর্ধমান বংশপরম্পরা লইয়া প্রাচীনতা ও জড়তার প্রভাবে অতিশয় স্থূলকায় হইয়া উঠিতেছিল। রামমোহন রায় সমাজকে এই সহস্র নাগপাশ বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে নির্ভয়ে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই নিদারুণ বন্ধন অনুরাগবন্ধনের ন্যায় সমাজকে জড়াইয়াছিল, এজন্য সমস্ত বঙ্গসমাজ আর্তনাদ করিয়া রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে উত্থান করিল।'

[ভারতপথিক রামমোহন রায়, পৃষ্ঠা ১১০]

বলেন :

'Rammohan Roy inaugurated the Modern age in India. ···He is the great path-maker of this century who has removed ponderous obstacles that impeded our progress at every step, and initiated us into the present Era of world-wide cooperation of humanity.

'Rammohan was the only person in his time, in the whole world of man, to realize completely the significance of the Modern Age. He knew that the ideal of human civilization does not lie in the isolation of independence, but in the brotherhood of interdependence of individuals as well as of nations in all spheres of thought and activity...

In social ethics he was an uncompromising interpreter of

the truths of human relationship, tireless in his crusade against social wrongs and superstition, generous in his co-operation with any reformer both of this country and of outside, who came to our aid in a genuine spirit of comradeship...'

[The Father of Modern India]

ইউরোপীয় সাহিত্যে রেনেশাঁসের আলো একদা কীভাবে বাংলার যুবচিত্তে আলোড়ন ও প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, কবি স্বয়ং তার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখছেন :

'য়ুরোপে যখন একদিন মানুষের হৃদয়প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত সংযত ও পীড়িত করিবার দিন ঘুচিয়া গিয়া তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়াস্বরূপে রেনেসাঁসের যুগ আসিয়াছিল, শেক্‌স্‌পীয়রের সমসাময়িককালের নাট্যসাহিত্যে সেই বিপ্লবের দিনেরই নৃত্যলীলা। য়ুরোপীয় সমাজের সেই হোলিখেলার মাতামাতির সুর আমাদের এই অত্যন্ত শিষ্ট সমাজে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ আমাদিগকে ঘুম ভাঙাইয়া চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল।...

'ইংরেজি সাহিত্যে আর-একদিন যখন পোপ-এর কালের ঢিমাতেতালা বন্ধ হইয়া ফরাসি-বিপ্লবনৃত্যের ঝাঁপতালের পালা আরম্ভ হইল, বায়রন সেই সময়কার কবি। তাঁহার কাব্যেও সেই হৃদয়াবেগের উদ্দামতা আমাদের এই ভালোমানুষ সমাজের ঘোমটাপরা হৃদয়টিকে, এই কনেবউকে, উতলা করিয়া তুলিয়াছিল। [জীবনস্মৃতি, পৃষ্ঠা ১০১]

রবীন্দ্রনাথ যৌবনের প্রায় সূচনাতেই আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ হিন্দুধর্ম সংস্কারকদের বিরুদ্ধে নানা বিষয় নিয়ে বিস্তর তর্ক-যুদ্ধেও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তবু পারিবারিক ধর্মসাধনা বা বিশ্বাসকে তিনি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি। বস্তুত পারিবারিক অধ্যাত্মসাধনা অপেক্ষা তখনকার নিরীশ্বরবাদের প্রতিই যেন তাঁর আন্তরিক আকর্ষণটা বেশি ছিল। কবি স্বয়ং এ সম্পর্কে লিখছেন :

'তখনকার কালের য়ুরোপীয় সাহিত্যে নাস্তিকতার প্রভাবই প্রবল। তখন বেন্থাম, মিল ও কোঁতের আধিপত্য। তাঁহাদেরই যুক্তি লইয়া আমাদের যুবকেরা তখন তর্ক করিতেছিলেন। · নাস্তিকতা আমাদের একটা নেশা ছিল।...

'যদিও এই ধর্মবিদ্রোহ আমাকে পীড়া দিত, তথাপি ইহা যে আমাকে একেবারে অধিকার করে নাই তাহা নহে। যৌবনের প্রারম্ভে বুদ্ধির ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এই বিদ্রোহিতা আমার মনেও যোগ দিয়াছিল। আমাদের পরিবারে যে ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই। আমি কেবল আমার হৃদয়াবেগের চুলাতে হাপর করিয়া মস্ত একটা আগুন জ্বালাইতেছিলাম।'

[জীবনস্মৃতি, পৃষ্ঠা ১০৩]

বাংলার নবজাগরণে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন ও সেতুবন্ধনের প্রয়াসকে রবীন্দ্রনাথ যে চোখে দেখেছিলেন :

'অধুনাতনকালে, দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড় মনীষী, তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিশাইয়া লইবার কাজেই জীবনযাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন।···

'দক্ষিণ-ভারতে রানাডে পূর্ব-পশ্চিমের সেতুবন্ধনকার্যে জীবনযাপন করিয়াছেন। যাহা মানুষকে বাঁধে, সমাজকে গড়ে, অসামঞ্জস্যকে দূর করে, জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাশক্তির বাধাগুলিকে নিরস্ত করে, সেই সৃজনশক্তি, সেই মিলনতত্ত্ব রানাডের প্রকৃতির মধ্যে ছিল।···

'অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন।··তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষের দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

'একদিন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যেদিন অকস্মাৎ পূর্ব-পশ্চিমের মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিলেন, সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে অমরতার আবাহন হইল তিনিই বাংলা সাহিত্যে পূর্ব-পশ্চিমের আদান-প্রদানের রাজপথকে আপন প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনতত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।'

[রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৫-৬৬]

ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে

বাংলার 'নবজাগরণ'-এর সবচেয়ে বড় অবদান, আধুনিক যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী দৃষ্টিতে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের ধারার প্রবর্তন। রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই ধর্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ধারার নানা স্ববিরোধিতা এবং সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে তা অব্যাহত ছিল। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথই ছিলেন রামমোহনের যথার্থ উত্তরসূরী বা উত্তরসাধক। ভারতের আশু ও প্রধান লক্ষ্য, জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্যই শুধু ভারতের অখণ্ড জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজন নয়, দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির স্বার্থেই বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও মানবিকতাবাদী দৃষ্টিতে ধর্ম ও সমাজসংস্কারের কর্মসূচী নিয়ে দেশ-নেতাদের এগিয়ে আসার জন্য রবীন্দ্রনাথ

বারবার আবেদন জানিয়ে এসেছিলেন। 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের প্রাথমিক পরাজয়ের পর কবি তাঁর 'ব্যাধি ও প্রতিকার' শীর্ষক নিবন্ধে (১৯০৭) বললেন :

'আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক ক্ষেত্রের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখদুঃখে মানুষ—তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই।

'... যদি-বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয়, তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ স্বজাতি স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কোনো দিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশের ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহার গতি নাই।'

একদা ইউরোপে মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও তামসিকতার গর্ভ হতে তার ধর্মসংস্কার আন্দোলন কীভাবে দেশে দেশে রাজনৈতিক চেতনা ও মুক্তির পথকে প্রশস্ত ও আলোকিত করে দেয় কবি তার উল্লেখ করতে বলেন ঃ

'সমাজে সকল বিভাগেই ধর্মতন্ত্রের শাসন একসময় য়ুরোপেও প্রবল ছিল। তারই বেড়াজালটাকে কাটিয়ে যখন বাহির হইল তখন হইতেই সেখানকার জনসাধারণ আত্মকর্তৃত্বের পথে যথেষ্ট লম্বা করিয়া পা ফেলিতে পারিল।

'আজ য়ুরোপের ছোটো-বড়ো যে-কোনো দেশেই জনসাধারণ মাথা তুলিতে পারিয়াছে, সর্বত্রই ধর্মতন্ত্রের অন্ধ কর্তৃত্ব আলগা হইয়া মানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। গণসমাজে যেখানে এই শ্রদ্ধা ছিল না, যেমন জার-কর্তার রাশিয়ায়, সেখানকার সমাজ বেওয়ারিস ক্ষেত্রের মতো নানা কর্তার কাঁটাগাছে জঙ্গল হইয়া উঠিয়াছিল।'

আমাদের দেশে সেই সময়ে 'জাতীয় পুনরুজ্জীবন'-এর নামে যাবতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারগুলিকে রক্ষা করার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, কবি তার তীব্র নিন্দা করে ও ধিক্কার জানিয়ে এই নিবন্ধেই বললেন :

'যত রাজ্যের জাতের বেড়া, আচারের বেড়া মেরামত করিয়া পাকা করাই যদি পুনরুজ্জীবন হয়, যদি এমনি করিয়া জীবনের ক্ষেত্রকে বাধাগ্রস্ত ও বুদ্ধির ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করাই আমাদের গৌরবের কথা হয়, তবে সেইসঙ্গে এ কথাও বলিতে হয়, এই অক্ষমদের দুই বেলা পালন করিবার জন্য দল বাঁধো।

[কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, ১৩২৪]

সোভিয়েত গভর্নমেন্ট সেখানকার জনগণের ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে যে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিল সেটা রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছিল। 'রাশিয়ার চিঠি'র এক জায়গায় কবি লিখেছেন :

'নিজের দেশের চাষীদের মজুরদের কথা মনে পড়ল। মনে হল, আরব্য উপন্যাসের জাদুকরের কীর্তি। বছর-দশেক আগেই এরা ঠিক আমাদেরই দেশের জন-মজুরদের মতোই নিরক্ষর নিঃসহায় নিরন্ন ছিল, তাদেরই মতো অন্ধসংস্কার এবং মূঢ় ধার্মিকতা। দুঃখে বিপদে এরা দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়েছে; পরলোকের ভয়ে পাণ্ডাপুরুতদের হাতে এদের বুদ্ধি ছিল বাঁধা, আর ইহলোকের ভয়ে রাজপুরুষ মহাজন ও জমিদারদের হাতে; যারা এদের জুতো-পেটা করত তাদের সেই জুতো সাফ করা এদের কাজ ছিল। হাজার বছর থেকে এদের প্রথাপদ্ধতির বদল হয়নি;··· ক'টা বছরের মধ্যে এই মূঢ়তার অক্ষমতার অভ্রভেদী পাহাড় নড়িয়ে দিলে যে কী করে, সে কথা এই হতভাগ্য ভারতবাসীকে যেমন একান্ত বিস্মিত করেছে এমন আর কাকে করবে বলো।'

বস্তুতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অভিযানকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা এবং অভিনন্দন জানিয়েছেন:

'যে পুরাতন ধর্মতন্ত্র এবং পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্র বহু শতাব্দী ধরে এদের বুদ্ধিকে অভিভূত এবং প্রাণশক্তিকে নিঃশেষপ্রায় করে দিয়েছে, এই সোভিয়েট বিপ্লবীরা তাদের দুটোকেই দিয়েছে নির্মূল করে; এত বড়ো বন্ধনজর্জর জাতিকে এত অল্পকালে এত বড়ো মুক্তি দিয়েছে দেখে মন আনন্দিত হয়। কেননা, যে ধর্ম মূঢ়তাকে বাহন ক'রে মানুষের চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট করে, কোনো রাজাও তার চেয়ে আমাদের বড়ো শত্রু হতে পারে না—সে রাজা বাইরে থেকে প্রজাদের স্বাধীনতাকে যতই নিগড়বদ্ধ করুক না।'

'সোভিয়েতরা রুশসম্রাট-কৃত অপমান এবং আত্মকৃত অপমানের হাত থেকে এই দেশকে বাঁচিয়েছে—অন্য দেশের ধার্মিকেরা ওদের যত নিন্দাই করুক আমি নিন্দা করতে পারব না। ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো। রাশিয়ার বুকের 'পরে ধর্ম ও অত্যাচারী রাজার পাথর চাপা ছিল; দেশের উপর থেকে সেই পাথর নড়ে যাওয়ায় কী প্রকাণ্ড নিষ্কৃতি হয়েছে, এখানে এলে সেটা স্বচক্ষে দেখতে পেতে।'

স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ

ঊনিশ শতকের বাংলার ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার, স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদ, শিল্প ও সাহিত্য-সাধনা—এই ত্রয়ী সাধনার ধারা ঠাকুর পরিবারের মধ্যেই সবচেয়ে প্রবল এবং সার্থকভাবে প্রবাহিত হয়েছিল। পারিবারিক এই বিশেষ আবহাওয়ার মধ্যেই রবীন্দ্র-মানসে স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশচেতনা বিকশিত হয়েছিল। কবি এ সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন:

'···আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার···পরিবারস্থ

সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।...আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।'

নবগোপাল মিত্র এবং ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগে সে সময়ে যে 'হিন্দু মেলা'র প্রবর্তন হয়েছিল, সে সম্পর্কে কবি লিখছেন :

'ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।'

স্মরণ রাখা দরকার, এই 'হিন্দু মেলা' প্রাঙ্গণে বালক রবীন্দ্রনাথ (নবম ও একাদশ অধিবেশনে) স্বরচিত দুটি স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা পাঠ করেন। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু মেলার একাদশ অধিবেশনে কবি তাঁর যে বিখ্যাত কবিতাটি পাঠ করেন তার ধুয়াটি ছিল :

'ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না,
আমরা গাব না হরষ গান,
এস গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।'

স্মরণ রাখা দরকার, 'বঙ্গভঙ্গ' ও স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নেতৃত্বে সারা দেশে স্বদেশী-ভাবধারা ও স্বদেশপ্রেমের যেন জোয়ার এসেছিল। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'ও আমার দেশের মাটি', 'আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি', 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি', 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' প্রভৃতি বিখ্যাত স্বদেশী সঙ্গীতগুলি রচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'জনগণ-মন-অধিনায়ক' এবং 'আমার সোনার বাংলা' এই দুটি গান আজ ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশী সঙ্গীতগুলি বাংলাদেশের জাগরণ ও বিস্ফোরণের, তাদের ঐতিহাসিক মুক্তিসংগ্রামের গান হয়ে গিয়েছিল।

মাতৃভাষায় জনশিক্ষা সম্পর্কে

বাংলার 'নবজাগরণে'র পুরোধা ও প্রাণপুরুষেরা আধুনিক শিক্ষার প্রসারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম মাতৃভাষার (অর্থাৎ বাংলা ভাষার) মাধ্যমে ব্যাপক জনশিক্ষার প্রসারের ওপর প্রধান গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, দেশবাসীর

রাজনৈতিক চেতনা এবং অধিকারবোধের জন্যই এই শিক্ষার প্রয়োজন। যৌবনের সূচনাকালেই তাঁর বিখ্যাত 'ন্যাশনাল ফন্ড' প্রবন্ধে বললেন (ভারতী—কার্তিক ১২৯০):

'· আমরা গবর্নমেন্টের কাছে ভিক্ষা মাগিতেছি কেন? এখনো আমাদের অধিকার জন্মে নাই বলিয়া অধিকার বিশেষের জন্য আমরা প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়া। যখন কেবল দুই চারিজন নয়, আমরা সমস্ত জাতি অধিকার বিশেষের জন্য প্রস্তুত হইব তখন কি আমরা ভিক্ষা চাহিব, তখন আমরা দাবী করিব, গভর্নমেন্টকে দিতেই হইবে।'

'তাহার এক উপায় আছে, বিদ্যাশিক্ষার প্রচার। আজ যে ভাবগুলি গুটি দুই তিন মাত্র লোক জানে, সেই ভাব সাধারণে যাহাতে প্রচার হয় তাহারই চেষ্টা করা, এমন করা, যাহাতে দেশের গাঁয়ে-গাঁয়ে পাড়ায়-পাড়ায়, নিদেন গুটিকতক করিয়া শিক্ষিত লোক পাওয়া যায় এবং আমাদের দ্বারা অশিক্ষিতদের মধ্যেও কতকটা শিক্ষার প্রভাব ব্যাপ্ত হয়। কেবল ইংরাজী শিখিলে কিংবা ইংরাজীতে বক্তৃতা দিলে এইটি হয় না। ইংরাজীতে যাহা শিখিয়াছ, তাহা বাঙ্গলায় প্রকাশ কর, বাঙ্গালা সাহিত্য উন্নতিলাভ করুক ও অবশেষে বঙ্গ বিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সমুদয় শিক্ষা বাঙ্গালায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরাজীতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না। তোমরা দুটি চারটি লোক ভয়ে ভয়ে ও কি কথা কহিতেছ? সমস্ত জাতিকে একবার দাবি করিতে শিখাও। কিন্তু সে কেবল বিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা হইবে—Political agitation-এর দ্বারা হইবে না।'

সর্বজনীন আবশ্যিক শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনই সর্বজনীন শিক্ষা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু ১৯১০ সালে মহাত্মা গোখলে যখন ইম্পীরিয়াল লেজিস-লেটিভ কাউন্সিলে সর্বজনীন শিক্ষার জন্য বিল আনেন, তখন বাংলার এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী তার বিরোধিতা করলে রবীন্দ্রনাথ খুবই ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হন। কিছু দিন পর তিনি তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখলেন:

'…এখনকার দিনে সর্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না। মহাত্মা গোখলে এই লইয়া লড়িয়া-ছিলেন। শুনিয়াছি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের কাছ হইতেই তিনি সব চেয়ে বাধা পাইয়াছেন। বাংলাদেশে শুভবুদ্ধির ক্ষেত্রে আজকাল হঠাৎ সকল দিক হইতেই একটা অদ্ভুত মহামারীর হাওয়া বহিয়াছে। ভূতের পা পিছন দিকে, বাংলাদেশে সামাজিক সকল চেষ্টারই পা পিছন ফিরিয়াছে।'

['শিক্ষার বাহন'—পৌষ ১৩২২ / শিক্ষা, পৃষ্ঠা ১৮৭]

জনশিক্ষা নীতি সম্পর্কে

১৯৩০ সালে সোভিয়েত দেশ ভ্রমণে গিয়ে কবির চোখ খুলে যায়। সেখানকার জনশিক্ষার বিস্ময়কর বিস্তার ও সাফল্য দেখার পর বার বার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সে শিক্ষা শুধু অক্ষরজ্ঞান নয়—গোটা সমাজটার আগাগোড়া পরিবর্তন ঘটিয়েছে। 'রাশিয়ার চিঠি'তে এক জায়গায় কবি বলছেন :

'...রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্যে। দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল আজ তারা সমাজের অন্ধ কুটুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে, তা কল্পনা করা কঠিন। এদের এত কালের মরা গাঙে শিক্ষার প্লাবন বয়েছে দেখে মন পুলকিত হয়। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত সচেষ্ট সচেতন।'

আর এক জায়গায় কবি লিখছেন :

'আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে! শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্যেও এদের সমান চেষ্টা। অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষেরা এদের অধার্মিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম কি কেবল পুঁথির মন্ত্রে, দেবতা কি কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে।'

ইউরোপীয় রেনেশাঁসের অসঙ্গতি সম্পর্কে

ইউরোপীয় রেনেশাঁস-রিফর্মেশন-রেভলুশনের ঐতিহ্যধারার আলো কীভাবে আমাদের দেশে নবজাগরণের ও নবসৃষ্টির উন্মাদনা এনেছিল তারই স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেন :

'আমরা প্রথম যখন ইংরেজি সাহিত্যের সংস্রবে আসি তখন সেটা ছিল ওদের প্রসারণের যুগ। য়ুরোপে ফরাসিবিপ্লব মানুষের চিত্তকে যে নাড়া দিয়েছিল সে ছিল বেড়া-ভাঙবার নাড়া। এইজন্যে দেখতে দেখতে তখন সাহিত্যের আতিথেয়তা প্রকাশ পেয়েছিল বিশ্বজনীনরূপে। সে যেন রসসৃষ্টির সার্বজনিক যজ্ঞ। তার মধ্যে সকল দেশেরই আগন্তুক অবাধে আনন্দভোগের অধিকার পায়। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, ঠিক সেই সময়েই য়ুরোপের আহ্বান আমাদের কানে এসে পৌঁছল—তার মধ্যে ছিল সর্বমানবের

মুক্তির বাণী। আমাদের তো সাড়া দিতে দেরি হয়নি। সেই আনন্দে আমাদের মনে নবসৃষ্টির প্রেরণা এল। সেই প্রেরণা আমাদেরও জাগ্রত মনকে পথনির্দেশ করলে বিশ্বের দিকে।...

একদা ফরাসি বিপ্লবকে যাঁরা ক্রমে-ক্রমে আগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন বৈশ্বমানবিক আদর্শের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ। ধর্মই হোক রাজশক্তিই হোক, যা-কিছু ক্ষমতালুব্ধ, যা-কিছু ছিল মানুষের মুক্তির অন্তরায়, তারই বিরুদ্ধে ছিল তাঁদের অভিযান। সেই বিশ্বকল্যাণ-ইচ্ছার আবহাওয়ায় জেগে উঠেছিল যে সাহিত্য সে মহৎ; সে মুক্তদ্বার-সাহিত্য সকল দেশ সকল কালের মানুষের জন্য; সে এনেছিল আলো, এনেছিল আশা।'

সেই ইউরোপে বিভিন্ন দেশে যখন স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট-বর্বরতার প্রকাশ পেতে থাকল, তারই বেদনাদায়ক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বললেন:

'... রাষ্ট্রতন্ত্রে একদিন আমরা য়ুরোপকে জনসাধারণের মুক্তিসাধনার তপোভূমি বলেই জানতুম—অকস্মাৎ দেখতে পাই, সমস্ত যাচ্ছে বিপর্যস্ত হয়ে। সেখানে দেশে দেশে জনসাধারণের কণ্ঠ ও হাতে পায়ে শিকল দৃঢ় হয়ে উঠছে; হিংস্রতায় যাদের কোনো কুণ্ঠা নেই তারাই রাষ্ট্রনেতা। ...এইজন্যে বড়ো বড়ো শক্তিমান পাহারাওয়ালাদের কাছে দেশের লোকে আপন স্বাধীনতা, আপন আত্মসম্মান বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত আছে। এমন-কি, স্বজাতির চিরাগত সংস্কৃতিকে খর্ব হতে দেখেও শাসনতন্ত্রের বর্বরতাকে শিরোধার্য করে নিয়েছে। [সাহিত্যের স্বরূপ: পৃষ্ঠা ২১-২৩]

ইউরোপ সম্পর্কে মোহভঙ্গের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি তাঁর বিখ্যাত 'কালান্তর' শীর্ষক নিবন্ধের এক জায়গায় বললেন (১৯৩৩):

'ক্রমে ক্রমে দেখা গেল য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে। তাই একদিন কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড একসঙ্গে বর্ষিত হল চীনের মর্মস্থানের উপর। ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন সর্বনাশ আর কোনোদিন কোথাও হয় নি—এক হয়েছিল য়ুরোপীয় সভ্যজাতি যখন নব্যাবিষ্কৃত আমেরিকায় স্বর্ণপিণ্ডের লোভে ছলে বলে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে 'মায়া' জাতির অপূর্ব সভ্যতাকে।

'...যে-য়ুরোপ একদিন তৎকালীন তুর্কিকে অমানুষ বলে গঞ্জনা দিয়েছে তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজমের নির্বিচার নিদারুণতা। একদিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আজ দেখছি য়ুরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠছে।'

ইউরোপীয় সভ্যতার আলোক যে-সব দেশ উজ্জ্বলতম করে জ্বালিয়েছে—সেই ইতালি ও জার্মানীতেই ফ্যাসিজমের দানবিক অভ্যুত্থানে কবি মর্মবেদনা ও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন:

'পোলিটিক্যাল মতভেদের জন্যে ইটালি যে দ্বীপান্তরবাসের বিধান করেছে, সে কি-রকম দুঃসহ নরকবাস, সে কথা সকলেরই জানা আছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার আলোক যে-সব দেশ উজ্জ্বলতম করে জ্বালিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান স্থান নিতে পারে জর্মনি। কিন্তু আজ সেখানে সভ্যতার সকল আদর্শ টুকরো টুকরো করে দিয়ে এমন অকস্মাৎ, এত সহজে উন্মত্ত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে নিলে, এও তো অসম্ভব হল না! যুদ্ধপরবর্তীকালীন য়ুরোপের বর্বর নির্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জভাবে চার দিকে উদ্ঘাটিত হতে থাকল তখন এই কথাই বার বার মনে আসে, কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপিল পেঁছিবে আজ। ·· বর্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্বরতা।' [পৃষ্ঠা ২১-২৪]

বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিকতাবাদ

বাংলার নবজাগরণ, শুধু বাংলার নয়—তার একটা মহান বিশ্ববাণীও আছে। বাংলার নবজাগরণের প্রধান বা প্রাণপুরুষ রামমোহনই সর্বপ্রথম ভারতীয়, যিনি যুদ্ধ ও রক্ত-পাতের পথ পরিহার করে বিশ্ব-মৈত্রী বা আন্তর্জাতিকতার আদর্শে বিশ্ববাসীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। বস্তুত এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন রামমোহনের যথার্থ অনুগামী বা উত্তর-সাধক। তাঁর বালক বয়সের রচনা (১৬ বছর), 'কবিকাহিনী' (ভারতী-১২৮৪) থেকে শুরু করে একেবারে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কবি এই আদর্শের কথা বার বার ঘোষণা করে গেছেন। 'কবিকাহিনী'র শেষ সর্গে কবি গাইলেন :

'কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে—
রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ কোলাহল
দিতেছে মানবমনে বিষ মিশাইয়া!

* * *

কত দেশ করিতেছে শ্মশান অরণ্য,
কোটি কোটি মানবের শান্তি স্বাধীনতা
রক্তময়পদাঘাতে দিতেছে ভাঙ্গিয়া,
তবুও মানুষ বলি গর্ব করে তারা,
তবু তারা সভ্য বলি করে অহংকার!

* * *

অত্যাচার-গুরুভারে হোয়ে নিপীড়িত
সমস্ত পৃথিবী, দেব, করিছে ক্রন্দন!

সুখ শান্তি সেথা হোতে লয়েছে বিদায়!
কবে, দেব, এ রজনী হবে অবসান?

* * *

সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস!
নাই ভিন্ন জাতি আর নাই ভিন্ন ভাষা
নাই ভিন্ন দেশ, ভিন্ন আচার ব্যাভার।

* * *

সে দিন আসিবে গিরি, এখনিই যেন
দূরে ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবন্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানবহৃদয়।

পৃথ্বী সে শান্তির পথে চলিতেছে ক্রমে,
পৃথিবীর সে অবস্থা আসে নি এখনো,
কিন্তু এক দিন তাহা আসিবে নিশ্চয়।'

বস্তুত, এই ভূমিকা করেই—এই আশা এবং দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেই যেন রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্য ও শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর সারা জীবনের শিল্প-সাহিত্য এবং কর্ম-সাধনার যেন ভূমিকা লেখা হয়ে গেছে, তাঁর এই কবিতায়।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য-বিস্তারের জন্য ভয়াবহ যুদ্ধ-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। কবি তাঁর তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ক্ষোভ ও ধিক্কার জানিয়ে বললেন (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮):

'য়ুরোপীয় সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী লইয়া ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি পড়িবে তাহার পূর্ব সূচনা দেখা যাইতেছে।'

এরই বছরখানেক পর লিখলেন (আষাঢ় ১৩০৯):

'বাণিজ্য জাহাজে উনপঞ্চাশ পালের হাওয়া লাগিয়াছে, য়ুরোপের প্রান্তরে উন্মত্ত দর্শকবৃন্দের মাঝখানে সারি সারি যুদ্ধঘোড়ার ঘোড়দৌড় চলিতেছে, এখন ক্ষণকালের জন্য থামিবে কে?…বর্তমানকালে সাম্রাজ্যলোলুপতা সকলকে গ্রাস করিয়াছে এবং জগৎ জুড়িয়া লঙ্কাভাগ চলিতেছে।'

এর প্রায় ১৪ বছর পর প্রথম মহাযুদ্ধ বাধে (১লা আগস্ট ১৯১৪)। কবি শান্তিনিকেতন মন্দিরে এক ভাষণে ('মা মা হিংসী') বললেন:

'সমস্ত য়ুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে। কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল।...এক-এক জাতি নিজ-নিজ গৌরবে উদ্ধত হয়ে সকলের চেয়ে বলীয়ান হয়ে ওঠবার জন্য চেষ্টা করেছে। বর্মে চর্মে অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্যের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হবার জন্যে তারা ক্রমাগতই তলোয়ারে শান দিয়েছে।...

'আজ অশ্রুঝর্ণার মধ্যে, রক্তস্রোতের মধ্যে এই বাণী সমস্ত মানুষের ক্রন্দনধ্বনির মধ্যে জেগে উঠেছে। এই বাণী হাহাকার করতে করতে আকাশকে বিদীর্ণ করে বয়ে চলেছে। সমস্ত মানবজাতিকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। এই বাণী যুদ্ধের গর্জনের মধ্যে মুখরিত হয়ে আকাশকে বিদীর্ণ করে দিয়েছে।'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এবং তার মহাবিধ্বংসী হত্যালীলার সংবাদে কবির হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। ফ্রান্সের পতনের মুখেই কবি লিখলেন (২২ মে ১৯৪০):

'শ্মশান-বিহার বিলাসিনী
ছিন্নমস্তা, মুহূর্তেই মানুষের সুখস্বপ্ন জিনি
বক্ষ ভেদি দেখা দিল আত্মহারা
শত স্রোতে নিজ রক্তধারা
নিজে করি পান।
এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপ যুগের অন্ত হবে
মানব তপস্বী-বেশে
চিতা ভস্ম-শয্যা তলে এসে
নবসৃষ্টির ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।'

আন্তর্জাতিকতাবাদ ও পরাধীন দেশের মুক্তি-সংগ্রামের সমর্থনে

রামমোহন বিশ্বের সমস্ত নিপীড়িত ও পরাধীন দেশের মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি তাঁর পূর্ণ নৈতিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছিলেন। অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীর হাতে নেপলস্-বাসীদের পরাজয়ের সংবাদে রামমোহনের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে যায়। তিনি তাঁর মনোবেদনা ব্যক্ত করে বন্ধু সিল্ক বাকিংহামকে এক পত্রে লিখেছিলেন ঃ

(১১ আগস্ট ১৮২১)

'...I consider the cause of the Neopolitans as my own, and

their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful.'

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এই আশ্চর্য বোধ ও চেতনাটি সক্রিয় দেখা যায়। তাঁর অল্প বয়সের রচনা 'চীনে মরণের ব্যবসায়' (১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ) থেকে শুরু করে, একেবারে তাঁর শেষ রচনা 'সভ্যতার সংকট' পর্যন্ত। একবার জনৈক ইংরেজ মহিলা কবির ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে এক চোখোমির অনুযোগ করলে, কবি তার জবাবে লেখেন (১১ এপ্রিল ১৯২১):

'...I deeply feel for all the races who are being insulted and injured by the ruthless exploitation of the powerful nations belonging to the West or the East. I feel as much for the Negroes, brutally lynched in America, often for economic reasons, and for the Koreans, who are the latest victims of Japanese imperialism as for any wrongs done to the helpless multitude of my own country.'

এশিয়ার দেশে দেশে এই স্বাধীনতা ও মুক্তি-চেতনা, এই 'নবজাগরণ'কে প্রত্যক্ষ এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করার জন্য কবি এশিয়ার দেশে দেশে গিয়েছেন। ১৯৩২ সালে তাঁর সর্বশেষ বিদেশ-ভ্রমণে পারস্যে গিয়ে কবি বললেন:

'আমরা আজ মানুষের ইতিহাসে যুগান্তরের সময়ে জন্মেছি। য়ুরোপের রঙ্গভূমিতে হয়তো বা পঞ্চম অঙ্কের দিকে পটপরিবর্তন হচ্ছে। এশিয়ার নবজাগরণের লক্ষণ এক দিগন্ত হতে আর-এক দিগন্তে ক্রমশই ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। মানবলোকের উদয়গিরিশিখরে এই নবপ্রভাতের দৃশ্য দেখবার জিনিস বটে—এই মুক্তির দৃশ্য। মুক্তি কেবল বাইরের বন্ধন থেকে নয়, সুপ্তির বন্ধন থেকে, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসের বন্ধন থেকে।

'আমি এই কথা বলি, এশিয়া যদি সম্পূর্ণ না জাগতে পারে তা হলে য়ুরোপের পরিত্রাণ নেই। এশিয়ার দুর্বলতার মধ্যেই য়ুরোপের মৃত্যুবাণ। এই এশিয়ার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে যত তার চোখ-রাঙারাঙি, তার মিথ্যা কলঙ্কিত কুট কৌশলের গুপ্ত-চরবৃত্তি। ক্রমে বেড়ে উঠেছে তার সমরসজ্জার ভার, পণ্যের হাট বহুবিস্তৃত করে অবশেষে আজ অগাধ ধনসমুদ্রের মধ্যে দুঃসহ করে তুলেছে তার দারিদ্র্যতৃষ্ণা।

'নূতন যুগে মানুষের নবজাগ্রত চৈতন্যকে অভ্যর্থনা করবার ইচ্ছায় একদিন পূর্ব-এশিয়ায় বেরিয়ে পড়েছিলুম।... দেখলুম জাপান য়ুরোপের অস্ত্র আয়ত্ত করে এক দিকে নিরাপদ হয়েছে, তেমনি অন্য দিকে গভীরতর আপদের কারণ ঘটল। তার

রক্তে প্রবেশ করেছে য়ুরোপের মারী, যাকে বলে ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্‌, সে নিজের চারি দিকে মথিত করে তুলছে বিদ্বেষ। তার প্রতিবেশীর মনে জ্বালা ধরিয়ে দিল।'

[পারস্যযাত্রী, পৃষ্ঠা ১৮-১৯]

স্মরণ রাখা দরকার, এর কয়েক বছর পর—১৯৩৮ সালে জাপানী কবি নোগুচি 'এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য' এই অজুহাত তুলে চীনে জাপ আগ্রাসনের সমর্থনের চেষ্টা করলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তীব্র পত্র-বিতর্ক হয়।

বিজ্ঞানশিক্ষা ও চেতনা

রামমোহন-দ্বারকানাথ প্রমুখ বাংলার নবজাগরণের পুরোধা-মানুষেরা আধুনিক বিজ্ঞান এবং আধুনিক কৃষি, যন্ত্রশিল্প ও কারিগরী বিদ্যা আয়ত্ত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উদ্যোগে বাংলাদেশে বিজ্ঞানচর্চা শুরু হলে রবীন্দ্রনাথ পরম উৎসাহভরে তাকে স্বাগত অভিনন্দন জানান। ডাঃ মহেন্দ্রলাল প্রতিষ্ঠিত 'সায়ন্স অ্যাসোসিয়েশনে'র, (Indian Association for the Cultivation of Science) সম্পর্কে কবির গভীর আগ্রহ ও আশা ছিল। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষা ও চর্চার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি বললেন (১৩০৫) :

'…বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হইবে…।'

'আপাতত মাতৃভাষার সাহায্যে সমস্ত বাংলাদেশকে বিজ্ঞানচর্চায় দীক্ষিত করা আবশ্যক, তাহা হইলেই বিজ্ঞানসভা সার্থক হইবে।'

তিনি বললেন, বিজ্ঞান-চেতনার ফলেই মনের যাবতীয় অন্ধকার দূর হয়, সমস্ত অন্ধ কুসংস্কারের হাত থেকে মানুষ মুক্তি পায়। আর এই কারণেই আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষা ও চর্চার বেশি প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনই বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষা ও গবেষণাচর্চার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর চরকাতত্ত্ব বা 'হিন্দ্‌-স্বরাজ'-এর আর্থনীতিক দর্শনকে একেবারেই মেনে নিতে পারেন নি। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এবং প্রায় সারা জীবন ধরে গান্ধীজীর আর্থনীতিক-দর্শনের প্রবল বিরোধিতা করে আধুনিক বিজ্ঞান, যন্ত্রশিক্ষা এবং প্রযুক্তিবিদ্যার সপক্ষে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে কবি তাঁর বিখ্যাত 'শিক্ষার মিলন' শীর্ষক ভাষণের শুরুতেই বললেন :

'এ কথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে।

পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মতো দোহন করছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছি।…

'এমন অবস্থায়, পশ্চিমের লোকে যে বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেছে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা, বিদ্যা যে সত্য ·

'…বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়মের কোথাও একটুও ত্রুটি থাকতে পারে না, এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। পশ্চিমের লোকে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভর করে নিয়মকে চেপে ধরেছে, আর তারা বাহিরের জগতের সকল সংকট তরে যাচ্ছে।'

স্মরণ রাখা দরকার, স্বদেশী আন্দোলনের শেষ পর্বে আধুনিক কৃষি ও উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান এবং গো-পালন বিদ্যা শিখে আসার জন্য পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে কবি আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন। দেশে ফেরার পর তাঁদেরকে যন্ত্রচালিত বৈজ্ঞানিক চাষ-আবাদ ও গো-পালনকেন্দ্রে স্বয়ং উৎসাহ দিয়ে কাজে লাগিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, দেশে 'কো-অপারেটিভ' বা সমবায়-ভিত্তিক যন্ত্রচালিত-কৃষিখামার আন্দোলনের রবীন্দ্রনাথই প্রথম সূচনা করেন। সোভিয়েত দেশের বিজ্ঞান-শিক্ষার এবং সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রথায় আধুনিক যন্ত্রচালিত সমবায় খামারগুলির বিস্ময়কর অগ্রগতির সাফল্য দেখে কবি খুবই বিস্মিত হয়ে বার-বার তার তারিফ করেছেন। রাশিয়ার চিঠি-র এক জায়গায় কবি লিখছেন :

'একটা কথা মনে রেখো, এরা নানা জাতির লোক কল-কারখানার রহস্য আয়ত্ত করবার জন্যে এত অবাধ উৎসাহ এবং সুযোগ পেয়েছে, তার একমাত্র কারণ যন্ত্রকে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না। যত লোকেই শিক্ষা করুক তাতে সকল লোকেরই উপকার, কেবল ধনীলোকের নয়। আমরা আমাদের লোভের জন্যে যন্ত্রকে দোষ দিই, মাতলামির জন্যে শাস্তি দিই তালগাছকে।

'সেদিন মস্কো কৃষি-আবাসে গিয়ে স্পষ্ট করে স্বচক্ষে দেখতে গেলুম, দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ার চাষীরা ভারতবর্ষের চাষীদের কত বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে।'…

…'কৃষি সম্বন্ধে বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালা আজরবাইজান উজবেকিস্তান জর্জিয়া য়ুক্রেন প্রভৃতি রাশিয়ার প্রত্যন্তপ্রদেশেও স্থাপিত হয়েছে।'

ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে

সংবাদপত্রের এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবীতে রামমোহন-দ্বারকানাথ থেকে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নরেশ সেনগুপ্ত প্রমুখ বাংলার প্রায় সমগ্র

নবজাগরণ পর্যায়ের লেখক-শিল্পীদের এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য আছে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের। ১৮৯৭ সালে র‍্যান্ড হত্যার পর তিলক ও নাটু-ভাইদের গ্রেপ্তার এবং Sedition Bill ও অন্যান্য ফৌজদারী বিধির প্রতিবাদে যে আন্দোলন শুরু হয়, রবীন্দ্রনাথ তার পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এই স্বৈরতন্ত্রী দমননীতির প্রতিবাদে কলকাতার টাউন হলে যে জনসভা হয়, তাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐতিহাসিক 'কণ্ঠরোধ' শীর্ষক ভাষণটি পাঠ করেছিলেন। সেদিন কবি ইংরেজ শাসন-কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন :

'...যদি রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটিয়া থাকে তবে তাড়াতাড়ি ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া ভয়কে আরও পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলিতেছ কেন।...

'সিপাহিবিদ্রোহের পূর্বে হাতে-হাতে যে রুটি বিলি হইয়াছিল তাহাতে একটি অক্ষরও লেখা ছিল না—সেই নির্বাক নিরক্ষর সংবাদপত্রই কি যথার্থ ভয়ংকর নহে। সর্পের গতি গোপন এবং দংশন নিঃশব্দ, সেইজন্যই কি তাহা নিদারুণ নহে। সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে, স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করিতে পারিবে না।'

এর অনতিকাল পরে 'বঙ্গভঙ্গ' ও স্বদেশী আন্দোলন কালে পুলিশী সন্ত্রাস, প্রথম মহাযুদ্ধ কালে 'ভারতরক্ষা আইন' ও ইংরাজ দমননীতির বিভীষিকা, 'রাওলাট বিল' ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, অ্যান্ডারসনী দমননীতির ও হিজলী গুলি-চালনার, আন্দামান ও রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি আন্দোলনে, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে—দেশের এমনি ঘোর দুর্দিনে যখনই কবির ডাক পড়েছে, তখনই তিনি তাতে সাড়া দিয়েছেন—ময়দানে বিক্ষুব্ধ জনসভায় দাঁড়িয়ে সারা দেশের নির্বাক মনের আপত্তি ও প্রতিবাদকে বাণীদান করেছেন। সারা জীবনই কবি সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ত দমননীতির তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবীতে সোচ্চার হয়েছেন। স্মরণ রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'All India Civil Liberties Union'-এর সভাপতি। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে ডাঃ নেভিনসনের আবেদনে সাড়া দিয়ে তিনি বিলেতের 'National Council for Civil Liberties'-এর সহ সভাপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন।

নারীমুক্তি ও নারীপ্রগতি সম্পর্কে

রবীন্দ্রনাথ যৌবনের সূচনাকাল থেকেই এবং প্রায় সারা জীবনই পুরুষশাসিত সমাজে নারীর ওপর পীড়ন-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করেছেন। সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে পুরুষশাসিত সমাজের পীড়ন অত্যাচারে নারীর ক্রন্দন ও আর্তনাদ

ধ্বনিত হয়েছে। প্রায় সারাজীবন ধরেই কবি নারী-শিক্ষা, নারী মুক্তি ও নারী-প্রগতির পক্ষে লেখনী ধারণ করেছেন। ভবিষ্যতে কোনো একদিন নারী মুক্তির পর—নরনারী উভয়ে সচেতন ও যুক্তভাবে এই ধরণীতেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে, এই ছিল নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মূলকথা! তিনি বলেন:

'...the union of man and woman will represent a perfect co-operation in building up a human history on equal terms in every department of life. The future Eve will lure away the future Adam from the wilderness of a masculine dispensation and mingle her talents with that of her partner in a joint creation of a paradise of their own......'

শিল্প-সাহিত্য-ললিতকলা প্রসঙ্গে

সকলেই জানেন, রামমোহন ও দ্বারকানাথই আমাদের দেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলন এবং সমন্বয়সাধনের সূচনা করেন। এই দিক থেকে জোড়াসাঁকো এবং পাথুরে-ঘাটা—ঠাকুর পরিবারের এই দুই শরিকের বংশধারার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ যত সঠিকভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছেন, এমনটি এদেশে তখন আর কেউ করতে সমর্থ হন নি। আর শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-নাট্য-নৃত্যকলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তিনি নিজে যেসব সৃষ্টি করে গেছেন তার তো তুলনা নেই।

'বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠার পর কবি কীভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এবং আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন, সে ইতিহাস আজ অনেকেই জানেন। কিন্তু আমাদের নবজাগরণের শেষার্ধে 'জাতীয় পুনরুজ্জীবনে'র নামে একটা উগ্র প্রাচ্যামির রক্ষণশীলতা আমাদের তখন গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল। একসময়ে রবীন্দ্রনাথ তাতে কিছুটা ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। কিন্তু 'বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাথকে স্বয়ং এই 'প্রাচ্যামির ভূত'-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলন-মিশ্রণের ওপর গুরুত্ব দিতে হল। শুধু শিল্প ও সাহিত্য ক্ষেত্রেই নয়, এমনকি সঙ্গীত ও নৃত্যের ক্ষেত্রেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-ধারার সঙ্গীত নৃত্যের এই মিলন ও সমন্বয় সম্ভব এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা আরও বৈচিত্র্য ও প্রাণশক্তি দান করতেও পারে।

পারস্য-ভ্রমণকালে এমন একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হলে কবি স্পষ্ট বললেন:

'...I have always felt sad that European music has not had any direct influence on our own, that great European composers

such as Beethoven have, unlike great European poets or philosophers wielded little or no influence on Eastern cultural movements. For European music is unquestionably great and without doubt our own music will be richer if it can absorb into its living texture creative influences from European music."

[পারস্যযাত্রী : পৃষ্ঠা ১৬১]

এই প্রসঙ্গে 'পারস্যযাত্রী'র ডায়েরীতে কবি আরও লিখছেন :

'...এশিয়ার প্রায় সকল দেশেই আজ পাশ্চাত্য ভাবের সঙ্গে প্রাচ্য ভাবের মিশ্রণ চলছে। এই মিশ্রণে নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা।...আন্তরিক মিলন ক্রমে ঘটে, যদি সে মিলনে প্রাণশক্তি থাকে ; কলমের গাছের মতো নূতনে পুরাতনে ভেদ লুপ্ত হয়ে ফলের মধ্যে রসের বিশিষ্টতা জন্মে। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে এটা ঘটেছে, সংগীতেও কেন ঘটবে না বুঝি নে। যে চিত্তের মধ্যে দিয়ে এই মিলন সম্ভবপর হয় আমরা সেই চিত্তের অপেক্ষা করছি ; য়ুরোপীয় সাহিত্যচর্চা প্রাচ্য শিক্ষিত সমাজে যে পরিমাণে অনেক দিন ধরে অনেকের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে, য়ুরোপীয় সংগীত চর্চাও যদি তেমনি হত তা হলে নিঃসন্দেহেই প্রাচ্য সংগীতে রসপ্রকাশের একটি নূতন শক্তি সঞ্চার হত। য়ুরোপের আধুনিক চিত্রকলায় প্রাচ্য চিত্রকলার প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে এ তো দেখা গেছে ; এতে তার আত্মত্ব পরাভূত হয়না, বিচিত্রতর প্রবলতর হয়।'

ইউরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের বিরাট এবং প্রায় মৌল পার্থক্যের কথা কবি ভাল করেই জানতেন। তা সত্ত্বেও এ মিলন ও সমন্বয় যে সম্ভবপর — একথা কবি দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করতে গিয়ে বললেন :

'...আমাদের রাগরাগিণী স্বরসংগতিকে স্বীকার করেও আত্মরক্ষা করতে একেবারেই পারে না এ কথা জোর করে কে বলতে পারে ? সৃষ্টির শক্তি কী লীলা করতে সমর্থ, কোনো-একটা বাঁধা নিয়মের দ্বারা আমরা আগে হতে তার সীমা নির্ণয় করতে পারি নে। কিন্তু সৃষ্টিতে নতুন রূপের প্রবর্তন বিশেষ শক্তিমান প্রতিভার দ্বারাই সাধ্য, আনাড়ির বা মাঝারি লোকের কর্ম নয়। য়ুরোপীয় সাহিত্যের যেমন তেমনি তার সংগীতেরও মস্ত একটা সম্পদ আছে। সে যদি আমরা বুঝতে না পারি তবে সে আমাদের বোধশক্তিরই দৈন্য ; যদি তাকে গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব হয় তবে তার দ্বারা আভিজাত্যের প্রমাণ হয় না।'

অতীতের অন্ধ অনুবর্তন করে যে আমরা কিছুতেই অগ্রসর হতে পারব না, একথা কবি শেষ জীবনে আমাদের বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া মানুষ কখনোই তার অতীতকে নিয়ে এমনকি বর্তমানকে নিয়েও সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। আরো, আরো বেশি করে পাওয়ার—আরো বেশি এগিয়ে যাওয়া-র আকাঙ্ক্ষা তাকে নিয়তই সামনের দিকে তাড়না করছে। ১৯৩৪ সালে নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্বোধনী

ভাষণে (২৭ ডিসেম্বর) কবি বার বার শিল্পীদের একথাটিই স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন :

'... ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাণের যে গতি প্রতিনিয়ত অগ্রসর হচ্ছে তার কল্লোল, তার ধ্বনি একটা কোনো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। এক সময়ে মোগলের আমলে রাজৈশ্বর্য যখন উচ্ছ্বসিত সেই সময় তানসেন প্রভৃতি সুধিগণ সংগীতের যে রূপ দিয়েছিলেন তা তৎকালীন সাম্রাজ্যের সঙ্গে জড়িত। তখনকার কালের শ্রোতাদের কানে যে গান যথার্থ তাঁদের নিজের অন্তরের জিনিস হবে সেই গানই তাঁরা উপহার দিয়েছিলেন। তা তৎকালীন পারিপার্শ্বিক ক্রিয়াবান প্রত্যুত্তর। সেই surroundings যে আজকে নেই একথা নিঃসন্দেহ...'

তিনি আরও বলেন :

'Classical আমাদের কাছে দাবী করে নিখুঁত পুনরাবৃত্তি। তানসেন কি গেয়েছেন জানি না, কিন্তু আজ তাঁর গানে আর কেউ যদি পুলকিত হন, তবে বলব তিনি এখন জন্মেছেন কেন ?...

'আমি স্বীকার করবো, ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের সৌন্দর্যের সীমা নেই, যেমন অজন্তার মত কারুকার্য আর কোথাও হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু ছোটো ছেলের মত তার উপর দাগ বুলিয়ে পূর্ণ চিত্রিত করা, সেই কি আমাদের ধর্ম, সেই কি আমাদের আদর্শ ?'

কিন্তু এদেশে আধুনিকতার নামে ইউরোপের আধুনিক কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীদের অন্ধ যান্ত্রিক অনুকরণ কবিকে শেষ জীবনে খুবই পীড়িত করেছিল। তিনি বার বার শুধু এই বলে সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন যে, ইউরোপের আধুনিক শিল্প সাহিত্যকে এমন যান্ত্রিক নকল করলেই তা আধুনিক ভারতীয় আর্ট হবে না, তেমনি 'Oriental Art'-এর নাম করে অজন্তা-ইলোরা-কাংড়ার অনুবৃত্তি করলেও তাকে সজীব ভারতীয় আর্ট বলা যাবে না। এই প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা এক পত্রে কবি (২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯) লিখছেন :

'কোনো এক সময়কার যে প্রাচ্য আর্ট সত্য ছিল সজীব ছিল তারি ছাঁচে ঢালা নকল পদার্থকেই আজ ওরিয়েন্টেল বলে। অবনের মধ্যে যদি প্রাচ্যশিল্পের প্রেরণা থাকে সেটা ভিতর থেকেই কাজ করবে, তাঁর চিত্র-দেহের বাইরের রূপ যদি কেবলই অজন্তা কার্নিভ্যালি আর মোগল আর্টেরই দাগা বুলানো হতে থাকে তাহলে ব্যবসায়ী যাচনদারেরা তাকেই ওরিয়েন্টাল আর্ট বলে খাতির করবে বটে কিন্তু তাকে স্বভাবসিদ্ধ আর্ট বলা চলবে না। অবনের আর্টের যদি স্বাভাবিক প্রাণগত অভিব্যক্তি থাকে তবে তাকে একান্ত বিশেষ শ্রেণীগত মার্কার বেষ্টনীভুক্ত করা চলবেই না। তেমনি আমাদের দেশে হাল আমলের কাব্য, যাকে আমরা আধুনিক বলছি যদি দেখি তার দেহরূপটাই অন্য দেহরূপের প্রতিকৃতি তাহলে তাকে সাহিত্যিক জীবসমাজে নেব কী করে ? যে কবিদের কাব্যরূপ

অভিব্যক্তির প্রাণিক নিয়মপথে চলেছে তাঁদের রচনার স্বভাব আধুনিকও হতে পারে, সনাতনীও হতে পারে অথবা উভয়ই হতে পারে, কিন্তু তার চেহারাটা হবে তাঁদেরই, সে কখনোই এলিয়টের বা অডিনের বা এজরা পাউন্ডের ছাঁচে ঢালাই করা হতেই পারে না।…যে কবির কবিত্ব পরের চেহারা ধার করে বেড়ায় সত্যকার আধুনিক হওয়া কি তার কর্ম?'

সমকালীন জীবন, সমাজ সমস্যা, সংস্কৃতি বা রাজনৈতিক-আর্থনীতিক—সমস্ত বিষয়েই তাঁর বক্তব্য এতই সুস্পষ্ট যে, এর আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। শিক্ষা ও সমাজজীবন বা শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন মিশ্রণ বা সমন্বয়ের সার্থক সৃষ্টি শক্তিধর মানুষ ও শিল্পস্রষ্টাদের পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব হবে, এ বিষয়ে কবি সুনিশ্চিত ছিলেন।

□ নেপাল মজুমদার

বঙ্গীয় নবজাগরণের অগ্রপথিক

(একটি অসম্পূর্ণ তালিকা)

[১৭৪০ থেকে ১৮৬১—এই ১২১ বছরে জন্মেছেন বা প্রধানত বাংলায় কাজ করেছেন যে সব মনীষী, এঁদের মধ্যে থেকে ৩৭ জনকে আমরা বেছে নিয়েছি। নব জাগৃতি আন্দোলনে তাঁদের অবদান সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ কিছু সূত্রাকার আলোচনা এ বইতে করা হয়েছে।

কিন্তু এইটুকুই সব নয়। সেই কালের ইতিহাসে আরো অনেকগুলি উজ্জ্বল নাম স্মরণীয় হয়ে থাকার মতো। সকলের সম্মিলিত অবদানেই সে সময়ে নতুন কালের জন্মের সূচনা হয়েছিল। এঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই অসংখ্য বিস্ময়কর তথ্য ইতিহাস এখনো লুকিয়ে রেখেছে। এই পূর্বসূরী মনীষীদের সম্বন্ধে, আরো গবেষণা, আরো তথ্যানুসন্ধান স্বদেশের প্রকৃত ইতিহাস রচনার জন্যই প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যেই সমসাময়িক কালে (১৭১২—১৮৮০) জন্মেছেন এমন আরো ১৯৬ বিশিষ্ট মনীষীর নাম ও তাঁদের আয়ুষ্কাল উৎসাহী পাঠক ও গবেষকদের জন্য সংযোজিত হল !]

১. ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ১৭১২—১৭৬০
২. রামপ্রসাদ সেন আনুঃ ১৭২০—১৭৮১
*৩. জেমস্ অগাস্টাস হিকি ১৭৪০—?
৪. মোহনপ্রসাদ ঠাকুর ১৮শ—১৯শ শতাব্দী
৫. হটী বিদ্যালঙ্কার ?—আনুঃ ১৮১০
৬. রামরাম বসু ১৭৫৭—৭.৮.১৮১৩
৭. জোশুয়া মার্শম্যান ২০.৪.১৭৬৮—৫.১২.১৮৩৭
৮. চণ্ডীচরণ মুনশী আনুঃ ১৭৬০—২৬.১১.১৮০৮
৯. রামকিশোর তর্কচূড়ামণি ?—১৮১৯
*১০. উইলিয়াম কেরী ১৭.৮.৬১—৯.৬.১৮৩৪
১১. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার আনুঃ ১৭৬২—১৮১৯
১২. ব্রজমোহন মজুমদার ?—৬.৪.১৮২১
১৩. গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ?—১৮৩১ (?)

১৪. হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী ১৭৬২—১৭.১.১৮৩২
*১৫. রামমোহন রায় ১৭৭২—২৭ ৯.১৮৩৩
*১৬. লালন ফকির ১৭ ১০.১৭৭২—১৭.১০ ১৮৮৮
১৭. তারিণীচরণ মিত্র আনুঃ ১৭৭২—১৮৩৭
*১৮. ডেভিড হেয়ার ১৭.২.১৭৭৫—১ ৬.১৮৪২
১৯. জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ৭.১০.১৭৭৫—১৩.৪.১৮৪৬
২০. গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ১৯শ শতাব্দী
২১. নীলরত্ন হালদার ?—আনুঃ ১৮৫৫
২২. হটু বিদ্যালঙ্কার (রূপমঞ্জরী) ১৭৭৫ ?—১৮৭৫ ?
২৩. কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ?—৮.১০.১৮৪৩
২৪. তিতুমীর ১৭৮২—১৮৩১
২৫. রাধাকান্ত দেব ১০.৩.১৭৮৩—১৯.৪.১৮৬৭
২৬. রামকমল সেন ১৫.৩.১৭৮৩—২.৮.১৮৪৪
২৭. রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৭৮৬—২.৩.১৮৪৫
২৮. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৮৭—২০.২.১৮৪৮
২৯. কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন আনুঃ ১৭৮৮—৮.১১.১৮৫১
৩০. মতিলাল শীল ১৭৯২—২৯.৫ ১৮৫৪
৩১. রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ১৭৯৩—১৮৪৫
৩২. জন ক্লার্ক মার্শম্যান ১৮.৮.১৭৯৪—৮.৭ ১৮৭৭
৩৩. জন ম্যাক ১২.৩.১৭৯৭—৩০.৪.১৮৪৫
৩৪. উইলিয়াম ইয়েটস্ ১৫.১২.১৭৯৭—৩.৭.১৮৪৫
৩৫. সিদ্ধু মাঝি ?—১৮৫৬
৩৬. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তর্কবাগীশ ১৭৯৯—৫.২.১৮৫
৩৭. মধুসূদন গুপ্ত ১৮০০—১৫ ১১.১৮৫৬

*৩৮. ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ১৮০১—১২.৮.১৮৫১
৩৯. গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ১৯ শতাব্দী
৪০. আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু) ১৮০৩—২৯ ১.১৮৫৬
৪১. রাধামোহন সেন ১৯ শতাব্দী
৪২. তারাশঙ্কর তর্করত্ন ?—১৫.১১.১৮৫৮
*৪৩. আলেকজান্ডার ডাফ্ এপ্রিল ১৮০৫—ফেব্রু. ১৮৭২
৪৪. জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন এপ্রিল ১৮০৬—১২.১১.১৮৭২
৪৫. দ্রবময়ী ১৯শ শতাব্দী

৪৬. নীলমণি বসাক—আনুঃ ১৮০৮—৬.৮.১৮৬৪
৪৭. হরচন্দ্র ঘোষ (১) ২৩ ৭.১৮০৮—৩.১২.১৮৬৮
*৪৮. ডিরোজিও ১৮.৪.১৮০৯—২৬.১২.১৮৩১
৪৯. মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ? —১.৩.১৮৬০
*৫০. ঈশ্বর গুপ্ত মার্চ ১৮১২—২৩.১.১৮৫৯
*৫১. রাধানাথ শিকদার ১৮১৩—১৭.৫.১৮৭০
*৫২. রামতনু লাহিড়ী ১৮১৩—১৮.৮.১৮৯৮
*৫৩. কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪.৫ ১৮১৩—১১.৫.১৮৮৫
৫৪. শ্যামাচরণ সরকার ২৭.৩.১৮১৪—১৪.৭.১৮৮২
*৫৫. প্যারীচাঁদ মিত্র ২২.৭.১৮১৪—২৩.১১.১৮৮৩
৫৬. রামচন্দ্র মিত্র ১৮১৪—১৮৭৪
*৫৭ রামগোপাল ঘোষ ১৮১৫—২৫.১.১৮৬৮
৫৮. শশধর তর্কচূড়ামণি ১৮১৫—১৯২৮
৫৯. হরচন্দ্র ঘোষ (২) ১৮১৭—১৮৮৪
৬০. মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮১৭—৯.৩.১৮৫৮
৬১. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫.৫.১৮১৭—১৯.১.১৯০৫
*৬২. পাদরী লং ১৮১৮—১৮৮৭
*৬৩. দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ৪.৮.১৮১৯—২৩.৮.১৮৮৬
৬৪. অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ?—২৮.৮.১৮৭৩
৬৫. আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ১৮১৯—১৬.৯.১৮৭৫
*৬৬. অক্ষয়কুমার দত্ত ১৫.৭.১৮২০—১৮.৫.১৮৮৬
৬৭. কানু মাঝি আনুঃ ১৮২০—ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬
*৬৮. বিদ্যাসাগর ২৬.৯.১৮২০—২৯.৭.১৮৯১
৬৯. সাগরলাল দত্ত ১৮২১ ?—১৮৮৬ ?
*৭০. রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৬.২.১৮২২—২৬.৭.১৮৯১
৭১. গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ২৬.৯.১৮২২—৩.১২.১৯০৩
৭২. রামনারায়ণ তর্করত্ন ২৬ ১২.১৮২২—১৮৮৬
*৭৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ২৫.১.১৮২৪—২৯.৬.১৮৭৩
*৭৪. হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এপ্রিল ১৮২৪—১৬.৬.১৮৬১
*৭৫. শশীচন্দ্র দত্ত ১৮২৪—৩০.১২.১৮৮৫
*৭৬. রেভাঃ লালবিহারী দে ১৮.১২.১৮২৪—২৮.১০.১৮৯৪
*৭৭. রাজনারায়ণ বসু ৭.৯.১৮২৬—১৮.৯.১৮৯৯
৭৮. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৭—১৩.৫.১৮৮৭

৭৯ উমেশচন্দ্র দত্ত (১) ১৮২৭ – ১৮৬১
৮০. ভূদেব মুখোপাধ্যায় ২২.২.১৮২৭ – ১৫.৫.১৮৯৪
*৮১. দীনবন্ধু মিত্র ১৮৩০—১.১১.১৮৭৩
৮২. রামগতি ন্যায়রত্ন ৪,৭.১৮৩১—৯.১০.১৮৯৪
৮৩. মনোমোহন বসু ১৪.৭ ১৮৩১—৪.২.১৯১২
*৮৪. কাঙ্গাল হরিনাথ ১৮৩৩—১৬.৪.১৮৯৬
৮৫. রামকমল ভট্টাচার্য ১৮৩৪—১১.৬.১৮৬০
৮৬. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৪—১৮৮৯
৮৭. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ১৮৩৪—১৩.১.১৯০৭
৮৮. বিহারীলাল চক্রবর্তী ২১.৫.১৮৩৫—২৪.৫.১৮৯৪
৮৯ নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু ১৮৩৫—১৮৬২
৯০. বলদেব পালিত ১৮৩৫—৭.১.১৯০০
৯১. ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী যোগশাস্ত্রী ?—১৯০৩
৯২. চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার নভেম্বর ১৮৩৬ – ২.২.১৯১০
*৯৩. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭ ৪.১৮৩৮—২৪ ৫ ১৯০৩
*৯৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৬ ৬.১৮৩৮—৮.৪. ১৮৯৪
৯৫. কেশবচন্দ্র সেন ১৯.১১.১৮৩৮ ৮ ১.১৮৮৪
৯৬. গোবিন্দচন্দ্র রায় ১৮৩৮—১৯১৭
৯৭. সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৮৩৮—১৮৭৮
৯৮. হরিশচন্দ্র মিত্র আনুঃ ১৮৩৮/৩৯—১ ৪.১৮৭২
৯৯. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১.৩.১৮৪০—১৯.১ ১৯২৬
১০০. উমেশচন্দ্র দত্ত(২) ২৬.১২.১৮৪০—১৯.৬.১৯০৭
*১০১ কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৪০—২৪.৭ ১৮৭০
১০২. বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ১৮৪০—১৯০১
*১০৩. শিশিরকুমার ঘোষ ১৮৪০—১০.১ ১৯১১
১০৪. কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ১৮৪০—১৩.৮.১৯৩২
১০৫. গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪১—১৬ ৫ ১৮৬৯
১০৬. কালীবর বেদান্তবাগীশ ১৮৪২—১৯১১
১০৭. ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৪২—১৯১৬
১০৮. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১.৬.১৮৪২—৯.১. ১৯২৩
১০৯. কালীপ্রসন্ন ঘোষ ২৩.৭.১৮৪৩—২৯.১০.১৯১০
১১০. তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৪৩—১৮৯১
*১১১. গিরিশ ঘোষ (২) ২৮.২.১৮৪৪—৮.২.১৯১২
১১২. মনোমোহন ঘোষ (১) ১৩.৩.১৮৪৪—১৬.১০.১৮৯৬

১১৩. দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২০.৪.১৮৪৪—২৭.৬.১৮৯৮
১১৪. চন্দ্রনাথ বসু ৩১.৮.১৮৪৪—১৯/২০ ৬.১৯১০
১১৫. চণ্ডীচরণ সেন জানুয়ারী ১৮৪৫—১০.৬.১৯০৬
১১৬. যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ১২.৭.১৮৪৫—১২.৬.১৯০৪
১১৭. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৩১.১০.১৮৪৫—১০ ১০.১৮৮৬
১১৮. রামদাস সেন ১০.১২.১৮৪৫—১৯.৮.১৮৮৭
১১৯. লালমোহন বিদ্যানিধি ১৮৪৫—২৮ ৯.১৯১৬
১২০. সত্যব্রত সামশ্রমী ২৮.৫.১৮৪৬—১ ৬ ১৯১১
১২১. ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন ১৮৪৬—১৯১৮ (?)
১২২. অক্ষয়চন্দ্র সরকার ১১.১২.১৮৪৬—২.১০.১৯১৭
*১২৩. শিবনাথ শাস্ত্রী ৩১.১.১৮৪৭—৩০ ৯.১৯১৯
১২৪. নবীনচন্দ্র সেন ১০.১.১৮৪৭—২৩ ১.১৯০৯
১২৫. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৪৭—৩.১১.১৯১৯
*১২৬. মীর মশার্‌রফ হোসেন ১৩.১১.১৮৪৭—১৯২২
*১২৭. রমেশচন্দ্র দত্ত ১৩.৮.১৮৪৮—৩০.১১.১৯০৯
১২৮. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪ ৫.১৮৪৯—৪.৩.১৯২৫
১২৯. ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪.৫.১৮৪৯—২৩.৩.১৯১১
১৩০. রজনীকান্ত গুপ্ত ১৩.৯.১৮৪৯—১৩.৬.১৯০০
১৩১. রাজকৃষ্ণ রায় ২১.১০.১৮৪৯—১১.৩.১৮৯৪
১৩২. চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ২৭.১০.১৮৪৯—১৯.১০.১৯২২
১৩৩. হৃষীকেশ শাস্ত্রী ১৮৫০—৯ ১২.১৯১৩
১৩৪. অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ৭.৯.১৮৫০—১৮৯৮
১৩৫. ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ১৮৫১—১৯০৩
১৩৬. দীনেশচরণ বসু ১৮৫১—১৮৯৮
১৩৭. উমেশচন্দ্র বটব্যাল ৩০ ৮.১৮৫২—১৬,৭.১৮৯৮
১৩৮. মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ?—১৮.১১.১৯১২
১৩৯. নবীনচন্দ্র দাস ২৭.২.১৮৫৩—২১.১২.১৯২৪
১৪০. অমৃতলাল বসু ২৭.৪.১৮৫৩—১ ৭.১৯২৯
১৪১. নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪ ৭.১৮৫৩—১৯২২
১৪২. গিরিশচন্দ্র বসু ২৯.১০.১৮৫৩—১.১.১৯৩৯
১৪৩. দামোদর মুখোপাধ্যায় ১৮৫৩—১৯০৭
১৪৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৬.১২.১৮৫৩—১৭ ১২.১৯৩১
১৪৫. যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ৩০.১২.১৮৫৪—১৮.৮.১৯০৫

১৪৬. আনন্দচন্দ্র মিত্র ১৮৫৪—১৯০৩
১৪৭. হরিশচন্দ্র নিয়োগী ১৮৫৪—১৯৩০
১৪৮. অধরলাল সেন ১৮৫৫—১৮৮৫
১৪৯. গোবিন্দচন্দ্র দাস ১৬ ১.১৮৫৫—১৯১৮
*১৫০. স্বর্ণকুমারী দেবী ২৮.৮.১৮৫৫—৩.৭.১৯৩২
*১৫১. তরু দত্ত ৪.৩ ১৮৫৬—৩০ ৮ ১৮৭৭
১৫২. ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫ ৩.১৮৫৬—১২.৬.১৮৯৭
১৫৩. অতুলকৃষ্ণ মিত্র ২১.১১.১৮৫৭—১৯১২
১৫৪. দেবেন্দ্রনাথ সেন ১৮৫৮—২১.১১.১৯২০
১৫৫. যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩.৪.১৮৫৮—২৯.১.১৯০৯
১৫৬. গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ১৮ ৮.১৮৫৮—১৬ ৮.১৯২৪
১৫৭. বিপিনচন্দ্র পাল ৭.১১ ১৮৫৮—২০.৫.১৯৩২
১৫৮. ভূপেন্দ্রনাথ বসু ১৮৫৯—১৬.৯.১৯২৪
১৫৯. সরলা রায় ১৮৫৯ ?—২৯ ৬.১৯৪৫ ?
১৬০. নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ২৯.৪.১৮৫৯—৪ ৯.১৯৩৯
১৬১. স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন ১৮৬০—১৯৩৯
১৬২. শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ১৮৬০—২৫.৩.১৯১৩
১৬৩. অক্ষয়কুমার বড়াল ১৮৬০—১৯.৬.১৯১৯
১৬৪. শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ১৮৬০—১৯০৮
১৬৫. মোজাম্মেল হক ১৮৬০—১৯৩৬
১৬৬. জলধর সেন ১৩.৩.১৮৬০—১৫.৩.১৯৩৯
১৬৭. স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ২৭.৫.১৮৬০—১২.১১.১৯৩০
১৬৮. ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১১.২.১৮৬১—২৭ ১০.১৯০৭
১৬৯. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ১.৩.১৮৬১—১০.২.১৯৩০
*১৭০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭ ৫ ১৮৬১—৭ ৮.১৯৪১
১৭১ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ৯. ৬. ১৮৬১—৪.৭.১৯০৭
১৭২. শরৎকুমারী চৌধুরাণী ১৫.৭.১৮৬১ -১১ ৪.১৯২০
১৭৩. নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৬১—২৮.১২.১৯৪০
১৭৪ হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ১৬.৮.১৮৬২—এপ্রিল ১৯৩৮
১৭৫. আলাউদ্দিন খাঁ ৮.১০.১৮৬২—৬ ৯ ১৯৭২
১৭৬. কাকুজো ওকাকুরা ২৬.১২.১৮৬২—২ ৯.১৯১৩
১৭৭. স্বামী বিবেকানন্দ ১২.১ ১৮৬৩—৪.৭.১৯০২
১৭৮. মানকুমারী বসু ২৩.১.১৮৬৩—২৬.১২.১৯৪৩

১৭৯. কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫.২ ১৮৬৩—২৯.১১.১৯৪৯
১৮০. ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ১২.৪.১৮৬৩—৪.৭.১৯২৭
১৮১. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৯ ৭ ১৮৬৩—১৭.৫.১৯১৩
১৮২ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ১৮৬৪—১৯৩৮
১৮৩. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ২০ ৮ ১৮৬৪—৬.৬ ১৯১৯
১৮৪. কামিনী রায় ১২.১০.১৮৬৪—২৭.৯.১৯৩৩
১৮৫ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২৯ ৫.১৮৬৫—৩০ ৯.১৯৪৩
১৮৬. রজনীকান্ত সেন ২৬.৭ ১৮৬৫—১৩.৯ ১৯১০
১৮৭. প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহামহোপাধ্যায় ১৮৬৫—১৯৪৪
১৮৮ নিত্যকৃষ্ণ বসু ১৮৬৫—১৪ ৬.১৯০০
১৮৯. নিখিলনাথ রায় ডিসেম্বর ১৮৬৫—৪.১১.১৯৩২
১৯০. যোগীন্দ্রনাথ সরকার ২৭.৯.১৮৬৬—২৭.৫.১৯৩৭
১৯১. পঞ্চানন তর্করত্ন ১৮৬৬—১৯৪০
১৯২ দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ ১৮৬৬—১৯৪৮
১৯৩. দীনেশচন্দ্র সেন ৩.১১.১৮৬৬—২০.১১.১৯৩৯
১৯৪. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ২০.১২.১৮৬৬—১৫.১১ ১৯২৩
১৯৫. ক্ষীরোদ নট্ট ১৮৬৮—১২.৩.১৯৭৫
১৯৬. প্রমথ চৌধুরী ৭.৮.১৮৬৮—২ ৯.১৯৪৬
১৯৭. ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ ১০.১৮৭৮—২৮ ১১.১৯২৯
১৯৮. পদ্মনাথ ভট্টাচার্য ১৮৬৮—১৯৩৮
১৯৯. ব্যোমকেশ মুস্তফী ১৮৬৮—১.৪.১৯১৬
২০০. জগদানন্দ রায় ১৮.৯.১৮৬৯—২৫ ৬.১৯৩৩
২০১. রামপ্রাণ গুপ্ত ১৮৬৯—১৯২৭
২০২. সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৯—৭ ১১.১৯২৯
২০৩. দীনেন্দ্রকুমার রায় ২৬.৮.১৮৬৯—২৭.৬.১৯৪৩
২০৪. সখারাম গণেশ দেউস্কর ১৭.১২.১৮৬৯—২৩.১১ ১৯১২
২০৫. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ১৮৭০—১.১.১৯২১
২০৬. স্যার যদুনাথ সরকার ১০.১২.১৮৭০—১৯৫৮
২০৭. চিত্তরঞ্জন দাস ৫.১১.১৮৭০—১৬ ৬.১৯২৫
২০৮. বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬.১১.১৮৭০—২০.৮.১৮৯৯
২০৯. প্রমীলা নাগ ১৮৭১—১৮৯৬
২১০. অতুলপ্রসাদ সেন ২০.১০.১৮৭১—২৬.৮.১৯৩৪
২১১. রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় ৪.১১.১৮৭১—৩০.৪.১৯৪২

২১২. শশাংকমোহন সেন ১৮৭২—১৯২৮
২১৩. সরলাদেবী চৌধুরাণী ৯.৯.১৮৭২—১৮.৮.১৯৪৫
২১৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৩.২.১৮৭৩—৫.৪.১৯৩২
২১৫. ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ২৯.১২ ১৮৭৩—১২.৮.১৯৪৫
২১৬. সরলাবালা সরকার ৯/১০.১২.১৮৭৫—১ ১২.১৯৪৫
২১৭. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ২৪.১.১৮৭৬—২৮.১.১৯৪২
২১৮. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৫.৯ ১৮৭৬—১৬.১.১৯৩৮
২১৯. হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ২২ ১০.১৮৭৬ – ২৬.১২.১৯৪৫
২২০. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১১.১০.১৮৭৭— ১৭.১২.১৯৩৮
২২১. যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯.১২.১৮৭৭—৫.৯.১৯৩০
২২২. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ১৮৭৭—৪.৪.১৯৪০
২২৩. চারুচন্দ্র দত্ত ১৮৭৭—১৯৫২
২২৪. চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩১.১২.১৮৭৭—৫.১১.১৯৫৪
২২৫. যতীন্দ্রমোহন বাগচী ২৭.১১.১৮৭৮—১.২.১৯৪৮
২২৬. বিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী ১৮৭৮—১৯৫৭
২২৭. মুকুন্দ দাস ১৮৭৮—১৮ ৫.১৯৩৪
২২৮. সুবোধ বসুমল্লিক ৯.২ ১৮৭৯—১৪.১১.১৯২০
২২৯. সরোজিনী নাইডু ১৩ ২.১৮৭৯—১.২.৩ ১৯৪৯
২৩০. রোকেয়া বেগম ১৮৮০—৯.১২.১৯৩২
২৩১. শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ২৯.৩.১৮৮০—২৯.৩.১৯৪৫
২৩২. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ৪.৯.১৮৮০—২৫.১/২.১৯৪৫
২৩৩. যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) ৮.১২.১৮৮০
—১০.৯.১৯১৫

* চিহ্নিত নামগুলি গ্রন্থের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।